বনফুলের

গল্প-সংগ্রহ

॥ তৃতীয় শতক ॥

বনফুলের গল্প-সংগ্রহ
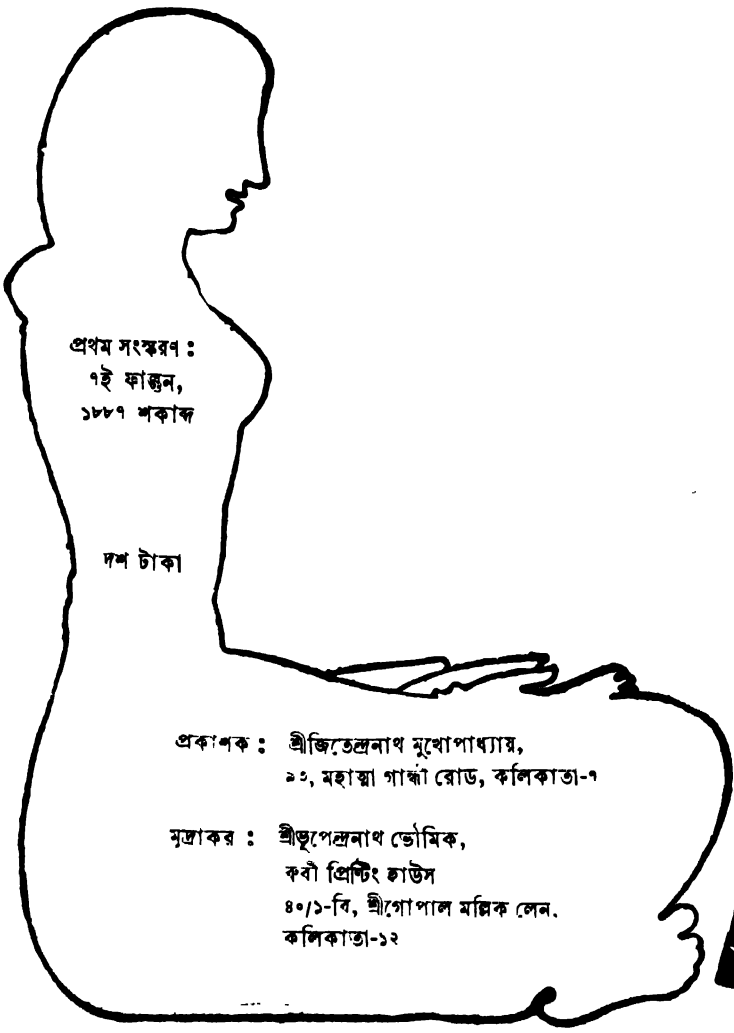
তৃতীয় শতক

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

'বনফুল'

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড্, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই ফাল্গুন,
১৮৮৭ শকাব্দ

দশ টাকা

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভৌমিক,
রুবী প্রিণ্টিং হাউস
৪০/১-বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন.
কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

সহধর্মিণী শ্রীমতী লীলাবতী দেবী

করকমলেষু

নিবেদন

গল্পসংগ্রহ তৃতীয় শতকে যে গল্পগুলি একত্রিত হইল, সেগুলি ১৩৬২ হইতে ১৩৬৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব স্বনামধন্য অধ্যাপক, বাংলা ও ভারতীয় সাহিত্যের বিদগ্ধ গবেষক ও ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে সম্মানিত ও কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

১৯-৯-৬৫

ভাগলপুর

"বনফুল"

ভূমিকা

সাহিত্যসংসারে ছোটগল্প নবজাতক। নবজাতকের আদর ও অনাদর দুই-ই তার ভাগ্যে ঘটেছে। আদর তার বিচিত্র লীলায় মনোহরণের জন্যে, অনাদর তার ক্ষণিকতার ও অভাবনীয়তার জন্যে। আসলে কিন্তু দুই-ই এক কথা। শিশুর মনোহারিতা তার ক্ষণলীলায়, তার হাসি-অশ্রুতে, রৌদ্রমেঘের খেলায়। কিন্তু পরিপক্ক প্রবীণ জানেন যে ছেলেখেলা নিয়ে থাকলে সময় কাটে ভালো তবে সংসার চলে না। তাই এখন সাহিত্যসংসার চালাচ্ছে উপন্যাস। বিচক্ষণ পাঠক এখানে আপত্তি তুলতে পারেন, তাহলে কবিতা-নাটক করছে কি। কবিতা আছে বুড়ো কর্তা হয়ে, খাতির খুব কিন্তু চাকরি করেন না, পেনসনও নেই। ঘরসংসারের কাজে লাগেন না তবে ঘাঁটি আগলে আছেন। আর নাটক? সে তো ভাড়াটে কর্মচারী, দৈবাৎ দেখা দেন, প্রায়ই অনুপস্থিত।

সাহিত্যসংসারে ছোটগল্প নবজাতক বটে। সে সবার ছোট বলেই নবজাতক। নইলে সে বুড়ো কর্তার চেয়েও বড়। সে সাহিত্যসংসারের পূর্বতম পুরুষ, নতুন জন্ম নিয়ে এসেছে। সাহিত্যসংসারের ছাপা কুলজি ফর্দে তার নাম নেই, অথচ এমন দিন ছিল না যে সে কোনো-না-কোনোরূপে নেই। পণ্ডিতেরা বলেন, সাহিত্যের প্রথম ফসল কবিতা। তাঁরা জানেন না যে "সাহিত্য" হিসাবে গল্পের বীজ কবিতারও আগে দেখা দিয়েছিল। গোড়ায় গোড়ায় কবিতা ছিল মন্ত্রের সামিল, দেবতা ও পুরুতের যোগসূত্র, মানুষের সংসারে ব্যবহারের কোন কথাই তখন ছিল না। সে মন্ত্র-কবিতা শুনলে মানুষের লাগত ভয়, জাগত মোহ। সে কবিতা-মন্ত্রের আনন্দময় গার্হস্থ্য প্রতিরূপও ছিল—ছেলেভুলানো ছড়া। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি তখন সে ছড়ায় অর্থের দানা বাঁধেনি, সে শুধুই সুরে গাঁথা শব্দসমষ্টি।

খাঁটি কথা হল এই যে মানুষ যখনই পরস্পর কথা চালাচালি করতে সমর্থ হল তখন থেকেই গল্পের আরম্ভ। সে গল্প হল নিছক নিষ্প্রয়োজনের,—তার ব্যবহার সময় কাটাবার জন্যে, ঔৎসুক্য জাগাবার জন্যে। কিন্তু এমন বাগ্‌বস্তুকে স্থায়ী রূপ দেবার চিন্তা যুগযুগ যাবৎ কেউ স্বপ্নেও করে নি। নিরর্থ মন্ত্র থেকে সমর্থ ছড়া, তার থেকে সুঠাম পদ্য, তার থেকে মনোহর কবিতা, সে কবিতার বিচিত্র রূপ—এমনি

করে পায়ে পায়ে মানব-সাহিত্য এগিয়ে চলল, তারপর দৌড় দিলে। তার গল্পও চলল সঙ্গে সঙ্গে এবং অন্তরালে, বেগার চাকর হয়ে।

সংস্কৃতের একান্নবর্তী সংসার ভেঙে গিয়ে ভারতীয় সাহিত্য যখন বিভিন্ন প্রাকৃতভাষা অবলম্বন করে নূতন নূতন ভাবে মেতে উঠে নূতন নূতন সংসার পাতলে, তখন দেখা গেল যে বেগার চাকরটি না হলে কারো চলছে না। তখন থেকে সাহিত্যসংসারের প্রকাশ্য পরিজনের তালিকায় তার নাম উঠল। কোন সংসারে তার নাম হল 'জাতক', কোন সংসারে 'অবদান', কোন সংসারে 'কথা'। সেকালে সাহিত্যসংসার চলত ধর্মের কারবারে। ধর্মের ভারী ভারী মাল সব গল্পভৃত্যই বইতে লাগল। কালক্রমে—কালক্রমটি কম নয়, হাজার খানেকেরও বেশি বছর হবে—তার কিছু স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ঘটল। ধর্মের ভার বহন থেকে সে মাঝে মাঝে ছাড়া পেতে লাগল গল্পের জন্যেই গল্প লেখা হল। তবে সে কদাচিৎ। ধর্মের বোঝা হাল্‌কা হলে পর গল্পের উপর চাপল নীতির বোঝা। কিন্তু নীতির বোঝা ধর্মের মতো নিরেট ভারি নয়। সে বোঝা এমনিই হাল্‌কা, তাকে আরও হাল্‌কা করা শক্ত নয়, অনীতি এমন কি দুর্নীতিও চালানো যায়। ভারতীয় সাহিত্যে গল্পের মুক্তি এই দিক দিয়েই ঘটেছিল। ধর্মকথা থেকে নীতিকথায় এসে গল্প হাঁফ ছাড়লে। নীতিকথা থেকে পরিহাস কথায় এসে তার দাম বাড়ল। তখন সাহিত্যকর্ম ছিল পণ্ডিতের হাতে। শাস্ত্রশাসন ও নীতিকথন তাঁরা করতেনই, তবে সাধারণ মানুষের মতো খোশগল্পও করতেন। সে খোশগল্পের রস সর্বদা অনাবিল ছিল না, অধিকাংশই হয়ত এখনকার দিনের উপযুক্ত নয়। তবে কোন কোন গল্পের উপভোগ্যতা এখনও আছে। বিশেষ করে কালিদাসকে পাত্র করে গড়া গল্পগুলি। এগুলি নিতান্তই সেদিনের সাহিত্যের ক্ষুদ্রতম খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যে ছোটগল্প আমদানি করলেন। তার আগে ছিল গল্প,—সাহিত্যে নয়, লোকব্যবহারে। সে গল্প ছিল দু'রকমের—খোশগল্প আর রূপকথা। এই দু রকমের গল্পের সাহিত্যমূল্য, বিশেষ করে রূপকথার—রবীন্দ্রনাথই নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং নিজেও লিখে এদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তবে তাঁর স্বসৃষ্ট ছোটগল্প যেমন সমাদৃত ও পরিশীলিত হয়েছে রূপকথা ও খোশগল্প তেমন কেন প্রায় কিছুই হয় নি। তার অবশ্য কারণ আছে।

বনফুলের গল্পের পরিচয় দিতে গিয়ে উপরোক্ত দীর্ঘ ঐতিহাসিক ভূমিকার

প্রয়োজন সম্বন্ধে পাঠকের মনে সংশয় হতে পারে। উত্তরে একটু ধৈর্য ধরতে বলি।

বনফুলের গল্প পড়তে আমার ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে সেই কথাটুকু বলতে চাইছি। বাংলা সাহিত্য ছোটগল্পে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ভালো গল্প লিখেছেন ও লেখেন এমন সাহিত্যিকের খুব অভাব নেই। তাঁদের অনেকেরই গল্পে নিজস্বতা আছে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে বাংলা ছোটগল্পে সুস্বাদের ও সুবাসের বৈচিত্র্য কম। তাঁদের কেউ কেউ জলের মতো ঘুরে ঘুরে অথবা দক্ষিণ হাওয়ার মতো ফিরে ফিরে চমৎকারভাবে একই কথা কন। সেই এক কথার একতারা-দোতারাতেই তাঁদের বিশেষ মহিমা। বনফুলের গল্পে একতারা-দোতারা বাজে নি, বেজেছে বহুস্বর কলকণ্ঠ। লেখকের মনের তার যে কোথাও গুঞ্জন তোলে নি তা বলছি না, বলছি এই যে সে গুঞ্জন গল্পের নরনারীর হৃৎস্পন্দনের তালে তালে মিলে গেছে। এমনি বনফুলের সিম্প্যাথি।

বনফুলের গল্পে কারিগরির দিকে ঝোঁক নেই, ঝোঁক আছে আস্ত জীবনের দিকে, যে জীবন বহু-বিচিত্র বহু-বিসর্পিত। নিজের দৃষ্টি, নিজের অনুভব কল্পনার তাঁতে আত্মভাবনার জাল বুনে বুনে তাঁর গল্পগড়া নয়। এঁর গল্প প্রচণ্ড, হয়তো স্থানে স্থানে মোলায়েম নয়, কিন্তু সর্বদা হৃদ্য এবং পরিতৃপ্তিকর। বনফুলের গল্পে যে-সব নরনারী উপস্থাপিত হয়েছে, আমাদের অভিজ্ঞতার ভূমিতে হয়ত তাদের কেউই কখনো দেখা দেয় নি, অথচ মনে হয় তারা যে অপরিচিত নয়, তাদের মতো কাউকে যেন কোথাও দেখে থাকব, তাদের কথা শুনে থাকব। বনফুলের লেখনীর বলিষ্ঠতার পরিচয় এখানে। বনফুলের গল্পে জীবনের ছবি ফুটেছে—ফোটোগ্রাফ ওঠে নি। এও তাঁর গল্পের এক বিশিষ্টতা। বহুদিন পূর্বে প্রভাতকুমারের গল্পে এই রকম আস্বাদ কিছু পাওয়া গিয়েছিল। তবে প্রভাতবাবুর গল্পের ছবিতে খুশির উজ্জ্বল আলো পড়েছে বনফুলের গল্পে খুশি-অখুশির আলোছায়ার আলপনা আঁকা হয়েছে।

বিশেষ করে বলতে চাই আর একটা কথা। বনফুল তাঁর গল্পে—ছোটগল্পে ও ছোট ছোট গল্পে—বহু এবং বিচিত্র রস সঞ্চারিত করেছেন এবং সেই সঙ্গে মজলিশি গল্পকে আধুনিক সাহিত্যের শ্রেণীতে তুলে দিয়েছেন। এ কাজ যে আর কোন গল্প-লেখক কখনো করেন নি তা নয়। তবে বনফুল এ কাজ করে এসেছেন প্রচুর এবং অনায়াসে। বাংলা গল্পে বনফুল যে নব নব রস জমিয়ে তুলেছেন, তার মধ্যে একটা

উদাহরণ দিচ্ছি, যাকে নাম দিতে পারি "ডাক্তারি রস"। এ রস সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণভাবে ফুটেছে এই তৃতীয় সংগ্রহের প্রথম গল্পটিতে। আশংকা হচ্ছে অনেকে হয়ত গল্পটির মর্ম গ্রহণ করতে পারবেন না। তবুও গল্পটিকে প্রথম স্থান দেওয়া অনুচিত হয় নি। আর একটি গল্পকে, যদিও এটা ঠিক গল্প নয়, আনুষ্ঠানিক ছোটগল্প তো নয়ই, প্রথম স্থান দেওয়া যেতে পারত—'সাঁতারের পোশাক'। ইংরেজ দোকান-ম্যানেজার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পয়সা বাকি রেখে সাঁতারের ভালো পোশাক দিয়ে দিলেন, বাঙালী দোকানদার গরজ দেখিয়ে খারাপ পোশাক দিয়ে শেষ পর্যন্ত দাম নিলেন না; শেষে সিদ্ধপুরুষ বেংকট বাবা যিনি মন্তরের চোটে সবকিছু যখন খুশি আনিয়ে দিতে পারেন, তাঁর কাছে সুইমিং কস্ট্যুম চাওয়া হলে তিনি যে জবাব দিলেন তাতেই গল্পের নির্যাস ঘনীভূত। "সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'সাঁতার কাটবার জন্যে আবার পোশাকের দরকার কি? বাবা, সমস্ত ত্যাগ করে' ভবসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে না পড়লে পার মিলবে না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে শেখ বাবা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে শেখ। পোশাক নিয়ে কি হবে'।—"

বনফুলের গল্পের যে বিশিষ্টতাটি বুঝতে দেরি হয় না সে হল গল্পের অনপেক্ষিত অথচ সুসঙ্গত সমাপন। এই বিষয়ে এবং বহু বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ করণে বনফুলের সঙ্গে ও-হেনরিরই তুলনা মনে আসে। যেমন, 'চুনোপুঁটি', 'ঋণশোধ', 'চম্পামিশির', 'যোগেন পণ্ডিত', 'যুগলযাত্রী', 'টিয়া-চন্দনা' ইত্যাদি ইত্যাদি। ও-হেনরির রচনা সবই পড়া না থাকলে আমি কিছুতেই ভাবতে পারতুম না যে বনফুলের 'শিল্পী' ও-হেনরির কোন গল্পের ছায়াবলম্বনে লেখা নয়।

আর বেশি বলা নয়। রসজ্ঞ পাঠককে আহ্বান করছি—স্বাগতং ভো মহদ্ ভোজ্যং বঃ সমুপস্থিতম্।

শ্রীসুকুমার সেন

দাবি

ডাক্তার অরূপকুমার ক্রমাগত চিৎকার করিতেছেন, "আর কার কার দাবি আছে জানতে চাই—"

ব্যাপারটা তাহা হইলে গোড়া হইতে শুনুন।

ডাক্তার অরূপকুমার নিজে অবশ্য উদরের দাবিতে ব্যাপারটিতে লিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, কোন ব্যাপারেই নির্বিঘ্নে লিপ্ত হওয়া যায় না। সুখাদ্যও কেহ যদি মুখে পুরিয়া দেয়, তবু তাহা চর্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয়। দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরা আটকাইয়া এই সরল ব্যাপারটাও সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে, তুচ্ছ একটা খড়্কের জন্য তখন অস্থির হইয়া পড়িতে হয়।

ডাক্তার অরূপকুমারকেও বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। তিনি যদি সোজাসুজি ডিস্পেনসারি খুলিয়া আর পাঁচজন ডাক্তারের মতো প্র্যাক্‌টিস করিতে বসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্যা হয়তো এতটা জটিল হইত না। কিন্তু তিনি মফঃস্বল শহরে প্যাথোলজিস্ট হইয়া ডব্লিউ. আর (W. R.) নামক দুরূহ রক্ত পরীক্ষা করিয়া অর্থোপার্জন করিবেন মনস্থ করিলেন, সুতরাং প্রথমেই তাঁহাকে গিনিপিগের সন্ধানে ট্যারা পাখি-ওলাটার শরণাপন্ন হইতে হইল। কলিকাতা শহর নয়, মফঃস্বলে গিনিপিগ যোগাড় করা শক্ত। ট্যারা পাখি-ওলাটাই যোগাড় করিয়া দিতে পারে। অরূপ জানিতেন, লোকটা চড়াই পাখিকে 'আগ্‌গিন' এবং বাঁশপাতিকে 'হরবোলা' বলিয়া চালায়, অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সাধারণ পায়রাই 'গেরবাজ' নাম দিয়া বিক্রয় করে। চুরির অপরাধে একবার জেলও খাটিয়াছিল। কিন্তু এই লোকটার খোশামোদ না করিলে মফঃস্বলে গিনিপিগ যোগাড় করা শক্ত। কেবলমাত্র পয়সায় কাজ হইবে না। কলিকাতা হইতে অবশ্য আনানো যায়, কিন্তু তাহা বড়ই ব্যয়সাধ্য। সুতরাং তাঁহাকে ট্যারা পাখি-ওলাটার শরণ লইতে হইল। প্রথমে সে তেমন গা করিল না। অনেক অনুরোধ করার পর বলিল, চেষ্টা করিয়া দেখিবে। চার পাঁচ দিন পরে দেখা গেল, তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই, কয়েকটি

শীর্ণ লোম-ওঠা গিনিপিগ আনিয়া সে হাজির করিয়াছে। বলিল, অনেক কষ্টে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সুতরাং প্রতিটি গিনিপিগের জন্য পাঁচ টাকা করিয়া দিতে হইবে। বলিল, ডাক্তারবাবুকে খাতির করে বলিয়া সে কম দামই চাহিতেছে। যদিও আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে লাগিল, তবু ডাক্তার অরূপকুমার দরদস্তুর করিতে ছাড়িলেন না। অবশেষে তিন টাকাতে রফা হইল। গিনিপিগ জুটিল, এবার খরগোশ এবং ভেড়া চাই।

পাখি-ওলা বলিল, "আমিই আপনাকে খরগোশ দিতে পারতাম। কিন্তু এ অঞ্চলের যত খরগোশ সব দীনু মিঞা কিনে চালান দিচ্ছে। আপনি তাকে ধরুন। আমার কাছে মাঝে মাঝে সাঁওতালরা জংলী খরগোশ বিক্রি করে যায়। তা-ও আমি দীনু মিঞার কাছেই পাঠিয়ে দিই। তার কাছেই আপনি খরগোশ পাবেন—"

দাড়িতে মেহেদি লাগানো দীনু মিঞাকে অরূপবাবু মৎস্য-ব্যবসায়ী বলিয়াই জানিতেন। সে যে খরগোশের ব্যবসায় ধরিয়াছে, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল। দীনু মিঞার সহিত দেখা করিয়া তিনি দেখিলেন শুধু খরগোশ নয়, নেউল, ইঁদুর, কাছিম, জোঁক প্রভৃতি জানোয়ারও দীনু মিঞা নানাস্থানে চালান দেয়। এসব নাকি তাহার শাখা-ব্যবসায়। অরূপবাবুকে বলিল, "সাদা খরগোশ তো সব চালান হয়ে গেছে। তবে ব্রৌন কাবুলী খরগোশ একজোড়া আছে। দাম একটু বেশী লাগবে। পঁচিশ টাকা জোড়ায় বেচি, আপনি কুড়ি টাকা দেবেন।"

অরূপকুমার কাবুলী বিড়ালের কথা আগে শুনিয়াছিলেন, কাবুলী খরগোশের কথা প্রথম শুনিলেন। দীনু মিঞা খরগোশ যখন বাহির করিল, তখন কিন্তু দেখা গেল 'কাবুলী' বিশেষণ সত্ত্বেও খরগোশ দুইটি সাধারণ খরগোশের মতোই। রঙটা কেবল বাদামী। পুনরায় দরদস্তুর। কিছু দাম কমিল। অরূপবাবু বলিলেন, "আমার একটা ভেড়াও চাই মিঞা সাহেব—"

"ভেড়া তো আমি রাখি না। আপনি কিষণগঞ্জের হাটে লোক পাঠান। সেখানে সস্তায় ভেড়া পাবেন।"

ষোল টাকা দামে একটি ছোট ভেড়াও পাওয়া গেল।

এই ব্যাপারের জন্য ডাক্তারবাবুকে কয়েকটি মূল্যবান যন্ত্রপাতিও ইতিপূর্বে কিনিতে হইয়াছিল। দরদস্তুর করিবার সুযোগ পান নাই; কারণ যন্ত্রগুলি সবই

বিদেশী, কিংবা বিদেশী জিনিসের স্বদেশী সমন্বয়, দাম একেবারে বাঁধাধরা। ইলেক্‌ট্রিক ওয়াটারবাথ, ইনকিউবেটার, সেনট্রিফিউজ, রেফ্রিজারেটার, কেমিক্যাল ব্যালান্স এবং খুঁটিনাটি আরও নানারকম কাচের জিনিসপত্র কিনিতে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা লাগিয়া গিয়াছিল। টাকাটা তাঁহার শ্বশুর দিয়াছিলেন।

অতঃপর, তিনি কাজ শুরু করিলেন। হিতৈষী ডাক্তারদের সুপারিশে পরীক্ষা করিবার জন্য রক্তও জুটিতে লাগিল। ডাক্তার অরূপের ক্লিনিকে সিফিলিস রোগাক্রান্ত নরনারীরা ভিড় করিতে লাগিলেন। তিনি গিনিপিগ্‌, খরগোশ এবং ভেড়ার রক্তের সহিত রোগী-রোগিণীর রক্ত মিশাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন কাহার রক্তে ভাসারম্যান রিয়াক্‌শন্‌ (Wassermann Reaction) কিরূপ। এই টেস্‌ট্‌ পজিটিভ হইলে বোঝা যায় রোগীর রক্তে উপদংশের বিষ আছে কি না।

কিছুদিন তাঁহার ব্যবসায় ভালই চলিল। গুরুতর সমস্যাটি দেখা দিল পরে। দাবির প্রশ্নটা সম্ভবত খবরের কাগজের মাধ্যমেই তাঁহার মনে সঞ্চারিত হইয়াছিল। আমাদের দেশের কাগজে কাগজে সীমানা-বিভাগ লইয়া তুমুল আন্দোলন শুরু হইয়াছিল, ঠিক ইহার কিছুদিন পূর্বে। প্রত্যেক প্রদেশবাসী তার-স্বরে ঘোষণা করিতেছিল, ভারতবর্ষের মাটির উপর কাহার কতখানি দাবি। বিনোবাজীর ভূদান যজ্ঞেও এই একই দাবির প্রশ্ন—জমিতে আসল দাবি কাহার, জমিদারের, না চাষীর? প্রতিদিন দাবি-বিষয়ক প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতেই সম্ভবত ডাক্তার অরূপের মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ তিনি অতিশয় ভাবপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রবন্ধ লিখিলেন না, তর্ক করিলেন না, বক্তৃতাও করিলেন না। স্বপ্ন দেখিলেন। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন।

দেখিলেন—একটি রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে তিনি এবং একটি বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি যেন মুখোমুখি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বলিষ্ঠকায় ব্যক্তিটি তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ কটমট করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তুমি যে রক্ত পরীক্ষা করে রোগীপিছু ষোল টাকা করে 'ফী' নাও, সে টাকায় কি তোমার একার দাবি? কতগুলি দাবিদার আছে দেখ।..."

যবনিকা সরিয়া গেল। অরূপ ডাক্তার সবিস্ময়ে দেখিলেন ট্যারা পাখি-ওলা

এবং দাড়িতে-মেহেদি-লাগানো দীমু মিঞা দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা হাসিয়া বলিল, "আমরা আপনার জন্যে যা করেছি ক'টা টাকা দিয়ে যে তার মূল্য শোধ করা যায় না তা নিশ্চয়ই জানেন। আপনি শিক্ষিত লোক, আমাদের আসল দাবির কথাটা আশা করি মনে রাখবেন। আমাদের দাবি সর্বাগ্রে—"

কথা কয়টি বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিং উঁচাইয়া প্রবেশ করিল ভেড়াটা। চোখোচোখি হইবামাত্র শুদ্ধ ভাষায় বলিল, "সপ্তাহে দুইবার করিয়া আমার রক্ত লইয়াছ। আমার দাবির কথা বিস্মৃত হইও না।" ভেড়া অন্তর্হিত হইল। তাহার পর আসিল গিনিপিগ-খরগোশ-পার্টির সম্মিলিত শোভাযাত্রা। ডাক্তার অরূপ আশ্চর্য হইয়া গেলেন। প্রত্যেকেই পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া মানুষের মতো চলিতেছে। প্রত্যেকের হাতে রক্তবর্ণ পতাকা, তাহাতে বড় বড় করিয়া লেখা রহিয়াছে—"আমরা বুকের রক্ত দিয়েছি···" শোভাযাত্রা চলিয়া গেল। তাহার পর আসিলেন তিনজন বিদেশী। ভাষা শুনিয়া বোঝা গেল: একজন জার্মান, একজন সুইস্ এবং আর একজন ইংরেজ। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষায় বলিলেন, "আমরা যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তোমাকে যদি সরবরাহ না করিতাম, তাহা হইলে কি তুমি রক্ত পরীক্ষা করিতে পারিতে? পাখি-ওলা এবং দীমু মিঞা ঠিক কথাই বলিয়াছে, কেবলমাত্র অর্থমূল্য দিলেই দাবি শেষ হয় না। ইহার একটা নৈতিক মূল্যও আছে। একটু ভাবিয়া দেখিও। গুড্ বাই···"

ডাক্তার অরূপ একটু বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বিদেশী তিনজন চলিয়া যাইবার পর যিনি আসিলেন তাহাকে দেখিয়া ডাক্তারবাবু অপ্রস্তুতও হইলেন। তিনি অন্য কেহ নন, তাঁহার পূজনীয় শ্বশুরমশায়, যিনি যন্ত্রাদি কিনিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন। তিনি অবশ্য কিছু বলিলেন না, তাঁহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর একে একে আসিতে লাগিলেন তাঁহার শিক্ষকবৃন্দ। পাঠশালার পণ্ডিতমহাশয় হইতে শুরু করিয়া মেডিকেল কলেজের প্রফেসাররা পর্যন্ত। ইহারাও কেহ কোনও কথা বলিলেন না। তাঁহার দিকে গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর একে একে চলিয়া গেলেন। অরূপবাবুর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তাঁহাদের দাবি তুচ্ছ করিবার মতো নয়। বেশ ঘাবড়াইয়া গেলেন। পর মুহূর্তেই কিন্তু আরও ঘাবড়াইতে হইল। শিক্ষকরা চলিয়া গেলে আসিলেন সেইসব ডাক্তারেরা যাঁহারা তাঁহাকে বরাবর রোগী সরবরাহ করিয়াছেন। তাঁহারাও মুখে

কেহ কিছু বলিলেন না, দুই একজন ডাক্তার কেবল ভুরু নাচাইলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের বক্তব্য বুঝিতে অরূপবাবুর কোনও কষ্ট হইল না। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারাও তাহার উপার্জনের কিছু অংশ দাবি করেন। ডাক্তাররা চলিয়া যাইবার পর যাহা ঘটিল, তাহা অপ্রত্যাশিত এবং রোমাঞ্চকর। অরূপবাবুর মৃত পিতামাতা আসিয়া রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন। পিতা বলিলেন, "আমরাই তোমাকে জন্মদান করিয়াছি, লালন-পালন করিয়াছি, লেখাপড়া শিখাইয়াছি। তোমার উপার্জনে আমরাও কিছু দাবি রাখি।" তাঁহারা অন্তর্হিত হইবার পর যাহা পরপর ঘটিল, তাহা আরও চমকপ্রদ। আরও দুই জোড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দেখা দিলেন। এক জোড়া বলিলেন, "আমরা তোমার মাতামহ-মাতামহী।" তাহার পর চারজনেই সমস্বরে বলিলেন, "আমাদের ভুলো না।" বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাহার পর বহু বৃদ্ধবৃদ্ধার সমাগম হইল, সমস্ত রঙ্গমঞ্চটা যেন ভরিয়া গেল। প্র-বৃদ্ধ অতি-বৃদ্ধ পিতামহ-পিতামহী মাতামহ-মাতামহীরা আসিয়া নিজ নিজ দাবির কথা বলিতে লাগিলেন। ডাক্তারবাবুর মনে হইল ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের সকলেই বোধ হয় আসিয়াছেন। তাঁহারা কিছুক্ষণ কলরব করিলেন, তাহার পর সহসা একযোগে অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর দেখা দিল ভবিষ্যৎ বংশধরেরা। অম্লান কুসুমের মতো একদল শিশু। আধো আধো ভাষায় তাহারা বলিল, "আমরা এখনও জন্মাইনি, কিন্তু আমাদের কথাও মনে রেখ। আমাদের জন্যেও কিছু রেখ—।" শিশুরা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল, রঙ্গমঞ্চ কয়েক মুহূর্তের জন্য নির্জন হইল। তাহার পর কলকণ্ঠের একটা হাসি ভাসিয়া আসিল। পরক্ষণেই স্খলিতবসনা স্খলিতচরণা এক তরুণীর পিছু পিছু দুই হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিল এক তরুণ। তাহারা দুইজনেই ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমরা দুজনে যদি বিপথে না যেতাম তাহলে কার রক্ত নিয়ে ডব্লিউ. আর করতেন আপনি? সুতরাং আমাদেরও কিছু দাবি আছে, মনে রাখবেন!"—হাসিতে হাসিতে তাহারা চলিয়া গেল।

অরূপকুমার প্রত্যহ এই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। রাত্রে তো বটেই, দিনেও। চোখ বুজিলেই রঙ্গমঞ্চটা চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে।

শেষে তিনি ক্ষেপিয়া গেলেন।

● তৃতীয় শতক ●

পাগলা গারদে বসিয়া দিনরাত চিৎকার করেন, "আর কার কার দাবি আছে জানতে চাই—"

পাগলা গারদের ডাক্তার দাবি করিয়াছেন, "ডাক্তার অরূপকুমারের রক্ত ডব্লিউ. আর পরীক্ষার জন্য পাঠানো হউক।"

অরূপকুমার রক্ত দিতে চান নাই। অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া রক্ত লওয়া হইয়াছে।

ফলাফল এখনও জানা যায় নাই।

শূন্যের দান

ভাদুড়ী মহাশয় গঙ্গার ধারে তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়া সেদিনও উপবেশন করিলেন। রোজই উপবেশন করেন। বৈকালে রোদটা যখন পড়িয়া আসে, তখন তিনি আর ঘরে থাকিতে পারেন না। একটা অদ্ভুত আকর্ষণ তাঁহাকে গঙ্গার ওই স্থানটির দিকে টানিতে থাকে।

স্থানটির যে বিশেষ কোন একটা বৈশিষ্ট্য আছে তাহাও নয়। হেলিয়া পড়া একটা বটগাছের আড়ালে সামান্য একটু স্থান। আশেপাশে ঝোপ-ঝাড়, ময়লা আবর্জনাও আছে। ভাদুড়ী মহাশয় যে স্থানে প্রত্যহ বসেন, কেবল সেই স্থানটি ছোট আসনের মত একটু জায়গা—বেশ পরিচ্ছন্ন। মনে হয় কেহ যেন পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। আসলে কিন্তু তাহা নয়, ভাদুড়ী মহাশয় রোজ ওই স্থানটিতে বসেন বলিয়া স্থানটি তৃণশূন্য। ভাদুড়ী মহাশয় প্রত্যহ আসিয়া যখন বসিতে যান তখন ওই তৃণশূন্য স্থানটুকু তাঁহার মনে অদ্ভুত একটা ভাবের সঞ্চার করে। একটু তিক্ত হাসি হাসিয়া ভাবেন, "আমার ছোঁয়াচ লেগে কচি ঘাসগুলো পর্যন্ত পুড়ে গেল!" ভাবেন, কিন্তু ঠিক সেই স্থানটিতেই আবার উপবেশন করেন। উপবেশন করিবার পূর্বে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া স্থানটি একবার ঝাড়িয়া লন। বহুদিন হইতেই এই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি চলিতেছে।

ভাদুড়ী মহাশয়ের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। গভর্নমেণ্টে চাকরি করিতেন। ভাল চাকরিই করিতেন, পঞ্চান্ন বছর বয়সে রিটায়ার করিয়াছেন। যখন চাকরি করিতেন, তখন তাঁহার মোটর ছিল, আরদালি-চাপরাশি ছিল, মানসম্ভ্রম ছিল, অনেক লোক ঝুঁকিয়া সেলাম করিত, ভাল ভাল বাড়িতে বাস করিতেন, তিন পুত্র এবং রূপসী পত্নী লইয়া তিনি বহুলোকের ঈর্ষাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর কিছু নাই, সব গিয়াছে। বড় ছেলেটি কুসঙ্গে পড়িয়া বহুদিন পূর্বে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার কোন খবর তিনি আর সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। মেজ ছেলের পত্নীর সহিত তাঁহার পত্নীর বনিবনাও হয় নাই, সে বহুকাল পূর্বে পৃথক হইয়া গিয়াছে। এখন মীরাটে চাকরি করে। চিঠিপত্রও লেখে না। মেজ ছেলের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবার ঠিক পরেই তিনি রিটায়ার করেন।

ঠিক এই সময়ে তাঁহার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরানন্দ স্বামীর সহিত দেখা হয়। তাঁহার এক বন্ধু স্বামীজীর নিকট মন্ত্র লইয়াছিলেন। বন্ধুর সহিত কয়েকদিন স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিয়া সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে যে-সব কথা তিনি শুনিলেন, তাহা নিজের অভিজ্ঞতার সহিতও মিলিয়া গেল। ইহাও তাঁহার মনে হইল এতকাল তো সংসারের মোহে আবদ্ধ হইয়া কলুর বলদের মত ঘানি টানিয়াছেন, এখন রিটায়ার করার পরও সংসার-পঙ্কে ডুবিয়া আছেন। এইবার পরলোকের চিন্তায় মন দেওয়া উচিত। তাঁহার বন্ধু বিনোদ লস্কর যখন দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থানে আলো দেখিতে পাইয়াছেন, মারোয়াড়ী পুরণমল যখন মন্ত্রের সাহায্যে নিজের আসন হইতে প্রায় এক বিঘৎ উঠিয়া শূন্যে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন তিনিই বা ব্যর্থকাম হইবেন কেন? ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার উহাই যদি পথ হয়, তাহা হইলে সে পথে চলিবার যোগ্যতা তাঁহারও নিশ্চয় আছে কিংবা হইবে। বিনোদ লস্কর স্কুলে, কলেজে, চাকরির ক্ষেত্রে সব সময়ই তাঁহার তুলনায় হীনপ্রভ ছিলেন। স্বামীজীও তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন। সুতরাং রিটায়ার করার পর তিনি দীক্ষা লইয়া গুরু-প্রদর্শিত পন্থায় ভগবানের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত রহিলেন।

কিছুদিন ইহা লইয়া, আর কিছু না হোক, সময়টা বেশ কাটিতে লাগিল। নির্জন একটা ঘরে পদ্মাসনে বা সুখাসনে বসিয়া প্রাণায়াম করিতে ভালই লাগিত। সেই সময়টা অন্তত গৃহিণীর বাক্যবাণ হইতে রেহাই পাওয়া যাইত। এই পথে লাগিয়া থাকিলে হয়ত তিনিও ভ্রূ-যুগলের মধ্যে আলোকবিন্দু দেখিতে পাইতেন, শূন্যেও হয়ত উঠিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি লাগিয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রথমত তাঁহার কৃতী তৃতীয় পুত্রটি হঠাৎ যখন যক্ষ্মারোগে মারা গেল, তখন তিনি সহসা ধর্মেই বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলেন। কোনও করুণাময় সর্বশক্তিমান সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার শক্তিই যেন তাঁহার আর রহিল না। দ্বিতীয়ত, কিছুদিন হইতে প্রাণায়াম করিবার সময় বুকের এক পাশে তিনি একটা বেদনা অনুভব করিতেছিলেন, একথা শুনিয়া একজন ডাক্তার তাঁহাকে প্রাণায়াম করিতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং গুরু-প্রদর্শিত পথে তিনি চলিতে পারিলেন না। গুরুর সংস্রবও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল। কারণ রিটায়ার করিয়া কলিকাতার যে বাসাটি ভাড়া করিয়া তিনি ছিলেন, পুত্রের মৃত্যুর পর সে বাসায় থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি দেশে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গার তীরে এক অখ্যাত পল্লীতে বহুকাল পুর্বে তাঁহার পুর্বপুরুষেরা বাস করিতেন। ভাদুড়ী মহাশয়ের পিতাও রিটায়ার করিবার পর দেশে গিয়াই বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দেশের বাড়ি খালি পড়িয়া ছিল। ভাদুড়ী মহাশয়ের কল্পনা ছিল সুবিধা মত খরিদ্দার পাইলে বাড়িটা বিক্রয় করিয়া দিবেন। স্থির করিয়াছিলেন কলিকাতাতেই বাকি জীবনটা অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। যে পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি কলিকাতার গৃহস্থালি পাতিয়াছিলেন, সেই পুত্রই যখন বাঁচিল না তখন কলিকাতার সম্বন্ধে আর কোনও মোহ তাঁহার রহিল না। এমনিতেই কলিকাতায় বাস তাঁহার পক্ষে সুখকর ছিল না। যখন চাকরি করিতেন, তখন ফাঁকা জায়গায় সুনির্মিত বড় বড় বাড়িতে তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইত। সে-সব বাড়ির তুলনায় কলিকাতার এঁদো গলির মধ্যে অবস্থিত সঙ্কীর্ণ বাসাটি নরকবৎ। তাছাড়া প্রত্যহ থলি হাতে ভিড় ঠেলিয়া বাজার করা অত্যন্ত অপ্রীতিকর ব্যাপার ছিল তাঁহার পক্ষে। এ সব কাজ পুর্বে তাঁহার আরদালিরা করিত। কিন্তু এখন অত বেতন দিয়া চাকর রাখিবার সামর্থ্য নাই। নিজেকেই বাজার করিতে হয়! আয় কমিয়া গিয়াছিল, তৃতীয় পুত্রের পড়া তখনও শেষ হয় নাই। তাছাড়া চিররুগ্না গৃহিণীর চিকিৎসার জন্য অনেক খরচ হইত। চাকর রাখিবার মত উদ্বৃত্ত অর্থ হাতে থাকিত না। পুত্রের জন্যই কষ্ট করিয়া কলিকাতায় ছিলেন, পুত্রই যখন চলিয়া গেল, তখন তিনি কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া পুর্বপুরুষদের ভিটায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রথম প্রথম কিছুদিন বেশ সুখেই ছিলেন। বাড়িটা পাকা, বেশ প্রশস্ত উঠান। পাশেই একটি পুষ্করিণী। উঠানে তরিতরকারি লাগাইয়া, পুকুরে মাছ ধরিয়া, পাড়াপড়শীদের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করিয়া একটা নূতন জীবনের স্বাদ কিছু দিনের জন্য তিনি পাইয়াছিলেন। কিন্তু মাত্র কিছু দিনের জন্য। গৃহিণীর স্বাস্থ্য পুর্বেই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, বাতের প্রকোপে তিনি সাধারণতঃ শয্যাগতই থাকিতেন, পল্লীগ্রামে আসিয়া ইহার উপর তাঁহাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিল। ডাক্তার থাকেন দুই ক্রোশ দূরে। পদব্রজে গিয়া তাঁহাকে খবর দিতে হয়। খবর দিবার পরও তিনি সঙ্গে সঙ্গে আসেন না, আসিতে পারেন না। অনেক সময় একদিন, কখনও কখনও দুইদিন পরে আসেন। পোস্টাফিস হইতে ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনিন কিনিয়া কিছুদিন চালাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পোস্টাফিসও কাছে নয়, প্রায় মাইল দুই দূরে।

কুইনিন ফুরাইয়া গেলে পোস্টাফিস হইতেও আনা সব সময় হইয়া উঠিত না। কারণ তিনি নিজেও মাঝে মাঝে অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। কম্প দিয়া জ্বর আসিত, পেটে গোলমাল তো ছিলই, তাছাড়া বয়স ক্রমশ বাড়িতেছিল, দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। সুতরাং এমন দিনও মাঝে মাঝে উপস্থিত হইতে লাগিল যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অসুখে পড়িয়া আছেন, ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিবার লোক নাই। পল্লীগ্রামে চাকর বা রাঁধুনী পাওয়া সহজ নয়, অনেক খোশামোদ করিয়া একটি স্থবিরা ব্রাহ্মণীকে তিনি পাচিকা-রূপে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে-ও মাঝে মাঝে অসুস্থ হইয়া পড়িত। একটি বাগ্দী বউ আসিয়া কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা প্রভৃতি করিত। কিন্তু তাহাকে লইয়াও শান্তি ছিল না। সে যুবতী ছিল, কথায় কথায় ফিক ফিক করিয়া হাসিত, ভাদুড়ী মহাশয়ের সহধর্মিণী সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে, বৃদ্ধ ভাদুড়ী মহাশয় গোপনে গোপনে হয়ত উহার সহিত অবৈধ প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। কোনও প্রমাণ ছিল না। কিন্তু সন্দেহ প্রমাণের উপর নির্ভর করে না।

ভাদুড়ী মহাশয় চলৎশক্তিরহিত না হইলে প্রায়ই বাড়ির বাহিরে চলিয়া যাইতেন। কিন্তু বাহিরে গিয়া তাঁহাকে আরও বিপদে পড়িতে হইত। বাহিরে বসিবার স্থান কোথায়? একটু দূরে মিত্র মহাশয়ও আছেন, ভাদুড়ী মহাশয় গেলে তিনি অভ্যর্থনাও করেন, কিন্তু ভাদুড়ী মহাশয় সেখানে যাইতে চান না। পরনিন্দা, পরচর্চা, বর্তমান গভর্নমেণ্টের অক্ষমতা, খাদ্যদ্রব্যের অভাব প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোনও প্রকার আলোচনা করিতে মিত্র মহাশয় হয় অপারগ না হয় অনিচ্ছুক। ভাদুড়ী মহাশয়ের ওসব ভাল লাগে না। সুতরাং তিনি মিত্র মহাশয়কে পারতপক্ষে এড়াইয়া চলেন।

মিত্র মহাশয়কে বাদ দিলে কাছাকাছি আর দুইটি মাত্র বাড়ি বাকি থাকে। কিন্তু সে দুইটিও অগম্য। একটি চৌধুরীদের বাড়ি, সেখানে নানাবয়সের বহু বিধবা বাড়ির বৃদ্ধ চাকর নিতাইচরণের তত্ত্বাবধানে থাকে। বাড়ির কর্তা কলিকাতার 'চৌধুরী অ্যাণ্ড দাস' নামক লৌহব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্ধস্বত্বাধিকারী। তিনি নিজে সপরিবারে কলিকাতায় বাস করেন, আত্মীয় বিধবাগুলিকে তিনি দেশের বাড়িটি ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিছু জমি আছে, বৃদ্ধ ভৃত্য নিতাইচরণের আনুকূল্যে সেই জমি হইতে বৎসরের খাবারটা সংগৃহীত হয়। চৌধুরী মহাশয় মাসে মাসে ত্রিশটি টাকাও নিতাইচরণের নিকট পাঠান। জনশ্রুতি এই ত্রিশ টাকার অংশ লইয়া বারটি বিধবার মধ্যে মাঝে মাঝে তুমুল কলহ বাধিয়া যায়। যেদিন পিওন আসিয়া টাকাটি

দিয়া যায় তাহার পর তিন চারিদিন বাড়িতে নাকি কাক-চিল পর্যন্ত বসিতে সাহস করে না।

দ্বিতীয় বাড়িটি অপুত্রক কেনারাম চক্রবর্তীর। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শুচিবায়ুগ্রস্ত। স্নান করা, হাত ধোয়া, চতুর্দিকে গোবরজল এবং গঙ্গাজল ছিটানো এই সব লইয়াই থাকেন তাঁহারা। ভাদুড়ী মহাশয় দুই একবার তাঁহাদের বাড়িতে গিয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চক্রবর্তী মহাশয় লোক খারাপ নন, হাসিমুখেই আলাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই ভাদুড়ী মহাশয়ের কেমন যেন সন্দেহ হইয়াছিল যে যদিও কেনারামবাবু মুখে ভদ্রতার চূড়ান্ত করিতেছেন, কিন্তু মনে মনে তাঁহার একটা অস্বস্তি হইতেছে। তাঁহার চোখের ভাষা অন্যরকম। একদিন তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, তিনি উঠিয়া আসিবার পরই চক্রবর্তী-গৃহিণী ভিতর হইতে এক বালতি গোবরজল পাঠাইয়া দিলেন এবং যে স্থানে ভাদুড়ী মহাশয় বসিয়াছিলেন সেই স্থানটি চক্রবর্তী মহাশয় স্বহস্তে পূর্ণ উদ্যম সহকারে ধুইতে লাগিলেন। ইহার পর ভাদুড়ী মহাশয় আর চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়িতে পদার্পণ করেন নাই।

সুতরাং বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ভাদুড়ী মহাশয় একটু মুশকিলে পড়িয়া যাইতেন। কোথাও আশ্রয় নাই। কলিকাতার পার্কগুলির কথা মনে পড়িত, চায়ের দোকানগুলি, বিশেষ করিয়া বোস মহাশয়ের ছোট দোকানটির ছবি, মানসপটে ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু কলিকাতায় ফিরিবার আর উপায় নাই, ইচ্ছাও নাই। লজ্জার মাথা খাইয়া মেজছেলেকে একটা চিঠি লিখিয়াছিলেন, মেজ ছেলে তাহার উত্তরও দিয়াছিল। লিখিয়াছিল 'আপনি ও মা এখানে চলিয়া আসুন। দেশে কষ্ট করিয়া পড়িয়া থাকিবার দরকার কি!' তাঁহার স্ত্রী কিন্তু যাইতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন, শ্বশুরের ভিটা আঁকড়াইয়া শত কষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি গ্রামে পড়িয়া থাকিবেন, তবু পুত্রবধূর হাততোলা হইয়া থাকিতে পারিবেন না। স্বামীর আত্ম-সম্মানহীনতার জন্য তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি গঞ্জনাও দিলেন। ভাদুড়ী মহাশয় অনুভব করিলেন তিনি পঁকে অর্থাৎ কর্দমে আটকাইয়া গিয়াছেন এবং এইভাবেই বাকি জীবনটা কাটাইতে হইবে। কাটাইতে তাহার আপত্তি ছিল না, অসুস্থ এবং রুগ্ন-স্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিয়া, ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া, এই অজ পাড়াগাঁয়ে বাকী জীবনটা কাটাইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল কি লইয়া থাকিবেন? মনের কিছু একটা অবলম্বন চাই তো। ধর্মের উপর আর আস্থা ছিল না, সময়

পাইলে মাঝে মাঝে বই পড়িতেন, কিছু বই তাঁহার ছিল। কিন্তু কতক্ষণ বই পড়া যায়? সর্বাপেক্ষা মুশকিল হইত বিকাল বেলাটা। যখন চাকরি করিতেন, ক্লাবের মেম্বর ছিলেন, টেনিস খেলিতেন, ব্রিজ খেলিতেন, সময় কাটাইবার কত উপায় ছিল। কিন্তু এই গ্রামে ক্লাব দূরের কথা, পোস্টাফিস নাই, রেলওয়ে স্টেশন নাই। গঙ্গার ওপারে স্টেশন। সেখানে নামিয়া নৌকাযোগে এখানে আসিতে হয়।

ভাদুড়ী মহাশয় অবশেষে বাধ্য হইয়া একদিন গঙ্গাতীরে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন ওই স্থানটুকু ছাড়া গ্রামে নির্ঝঞ্ঝাটে বসিবার আর কোন স্থান নাই। এদিক-ওদিক চাহিয়া হেলিয়া-পড়া বটগাছটার নীচে ওই স্থানটুকু তিনি আবিষ্কার করিলেন। গঙ্গাতীরে ওই স্থানটুকু যে তাহার সমস্যার সমাধান করিবে একথা অবশ্য তিনি কল্পনা করেন নাই। কিন্তু বসিবামাত্র তিনি অনুভব করিলেন—ঠিক কি যে অনুভব করিলেন তাহা বর্ণনা করা শক্ত—তবে একটা অননুভূতপূর্ব আরাম যেন তাঁহার সত্তাকে সহসা আচ্ছন্ন করিয়া দিল। আকাশের দিকে চাহিয়া সহসা তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন, নির্নিমেষে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। উত্তরবাহিনী গঙ্গা সোজা গিয়া উত্তর আকাশে মিশিয়াছে, বামে পশ্চিম আকাশের মেঘমালায় অস্তায়মান সূর্যের বিচিত্র বর্ণমালা, সে বর্ণের আভা গঙ্গার বুকে এবং উত্তর আকাশের স্তূপীকৃত মেঘে প্রতিফলিত হইয়াছে। গঙ্গা চিরকালই বহিতেছে, আকাশে মেঘের আবির্ভাবও কোনও নূতন ঘটনা নহে, কিন্তু সেদিন তাঁহার চক্ষে সবই যেন বড় নূতন ঠেকিল। তিনি মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর হইতে রোজই তিনি ওই স্থানটিতে গিয়া বসেন। গত দশ বছর হইতে প্রত্যহ বসিতেছেন। প্রতিদিন ওই উত্তর আকাশে নূতন ছবি দেখিতে পান। কোনদিন মেঘ থাকে, কোনদিন থাকে না। যে দিন থাকে সেদিন নূতন ধরনে থাকে, কখনও একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হয় না। রোজই নূতন ছবি, সে ছবিও চোখের সামনেই ধীরে ধীরে বদলাইতে থাকে। পশ্চিম আকাশেও ঠিক তাই। প্রতিদিনে নূতন ঢং নূতন দৃশ্য। গঙ্গার তরঙ্গমালাও যেন প্রতিদিন নূতন রূপে সাজিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। বৈকালের এই সময়টুকুর জন্য ভাদুড়ী মহাশয় উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকেন, এই সময়টুকুও যেন অভিনব সাজে সাজিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করে। এই দশ বৎসরে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তাঁহার মেজছেলেটিও আর নাই, প্লেগে আক্রান্ত হইয়া সে সপরিবারে মারা গিয়াছে। যে স্থবিরা ব্রাহ্মণী তাঁহার বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করিত, সে বহুপূর্বেই দেহরক্ষা

করিয়াছে। বাগ্‌দী মেয়েটি শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছে। ভাদুড়ী মহাশয় এখন সম্পূর্ণ একা—একবেলা স্বপাক খান। রান্নার আয়োজন করিতে সকালটুকু কাটিয়া যায়। আহার করিয়া সামান্য একটু বিশ্রাম করেন, তাহার পর গঙ্গার ধারের ওই স্থানটুকুতে গিয়া বসেন।

যেদিনের কথা বলিতেছি সেদিন ভাদুড়ী মহাশয় আহারাদির পর একটা পুরাতন মাসিক পত্রিকা খুলিয়াছিলেন। তাহাতে ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি একটা অদ্ভুত জিনিস পাঠ করিলেন—'যখন অস্তিত্বও ছিল না, নাস্তিত্বও ছিল না, যখন পৃথিবী ছিল না, পৃথিবীর উর্ধ্বে আকাশও ছিল না, তখন কি ছিল? তখন কে সেই মহা অন্ধকারের গর্ভে নিহিত ছিলেন? যখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত্যুও ছিল না, দিবারাত্রির বিভেদ যখন ছিল না, তখন সেই নিগূঢ় অন্ধকারের মধ্যে, সেই মহাশূন্যে অপ্রত্যক্ষভাবে তিনিই স্পন্দিত হইতেছিলেন। তিনিই কালক্রমে তেজোরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। প্রথমে আবির্ভূত হইল কামনা…'

এই ধরনের অনেক কথা ছিল। পড়িতে পড়িতে ভাদুড়ী মহাশয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। গঙ্গার তীরে বসিয়া কথাগুলি পুনরায় তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল মহাশূন্যের মধ্যেই সৃষ্টি-সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাঁহার জীবনও তো এখন মহাশূন্য, সে শূন্যতার মধ্যে কোনও সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে কি? তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার মুখে একটা তিক্ত অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি উত্তর আকাশের মহাশূন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। উত্তর আকাশে কিছু দুগ্ধ-শুভ্র স্তূপ-মেঘ একাধারে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা ভাদুড়ী মহাশয়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল খানিকটা মেঘ আকাশ হইতে খুলিয়া গিয়া যেন তাঁহার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। একটু পরেই অবশ্য তাঁহার ভুল ভাঙিল। মেঘ নয়, নৌকার পাল। নৌকাটির দিকেই তিনি চাহিয়া রহিলেন। কতক্ষণ চাহিয়া ছিলেন তাঁহার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন নৌকাটি খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটের ঘাটেই ভিড়িল। নৌকায় একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। পাশেই একটি সুন্দরী মহিলা। চার পাঁচটি নানা বয়সের ছেলেমেয়েও রহিয়াছে।

ভদ্রলোক নৌকা হইতে নামিয়া ভাদুড়ী মহাশয়কেই প্রশ্ন করিলেন, "বলতে পারেন হরনাথ ভাদুড়ীর বাড়ি কোন্‌টা—?"

"কেন—তাঁর বাড়ি খুঁজছেন কেন আপনি ?"

"আমি তাঁর বড় ছেলে। অনেকদিন বিদেশে ছিলাম। অনেকদিন পরে ফিরেছি। কলকাতায় তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি বললেন বাবা এখানেই আছেন।"

"কে নবু—?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত সবিস্ময়ে ভাদুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নবকুমার পিতাকে সত্যই চিনিতে পারেন নাই। তাহার পর হঠাৎ পারিলেন এবং আসিয়া প্রণাম করিলেন।

"এরা কে—"

"আমি রেঙ্গুনে বিয়ে করেছিলাম। সবাইকে নিয়ে এসেছি—"

সকলে আসিয়া একে একে প্রণাম করিতে লাগিল। পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী সবাই আবার তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার শূন্য জীবন অপ্রত্যাশিতভাবে আবার পূর্ণ হইয়া গেল।

ভ্রাতৃপ্রেম

প্রৌঢ় ভবানন্দ সেন নিজের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তখন কালাজ্বরের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। ডাক্তার ব্রহ্মচারী তখন সবে তাঁহার গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার ঔষধ বাজারে তখনও চালু হয় নাই। ভবানন্দ সেনের কালাজ্বর হইয়াছিল। স্বয়ং ব্রহ্মচারীই চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন, ভবানন্দের পুত্র শ্যামানন্দ মেডিকেল কলেজে পড়িত, সুতরাং ছোট বড় মাঝারি আরও কয়েকজন ডাক্তারও জুটিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফলই হইতেছিল না। সকলে হিম-সিম খাইতেছিলেন মাত্র। কুইনাইন এবং আর্সেনিকের শ্রাদ্ধ হইতেছিল, তাহার সঙ্গে গোপনে গোপনে চলিতেছিল হোমিওপ্যাথি এবং কবিরাজী পাঁচন। বাংলা দেশের অনেকেই সময়নিষ্ঠ নহেন, জ্বর কিন্তু এক মিনিটও দেরি করে না। ঠিক যথাসময়ে আসে। ভবানন্দের বেলাতেও ইহার অন্যথা হইল না। ঠিক ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া জ্বর প্রত্যহ দুইবার করিয়া হাজিরা দিতে লাগিল। ভবানন্দ-গৃহিণী তখন অনন্যোপায় হইয়া কুলপুরোহিত কালিকানন্দ শর্মাকে খবর দিলেন।

তিনি আসিয়া ব্যবস্থা দিলেন চণ্ডীপাঠের এবং কালীপূজার। তাহাও চলিতে লাগিল।

ডাক্তাররা সকলেই একটি কথা বারবার বলিয়া যাইতে লাগিলেন, সাবধান, পেট যেন না খারাপ হয়। পেট ভাঙিলেই সর্বনাশ হইয়া যাইবে। কালাজ্বর রোগীরা সাধারণতঃ খুব লোভী হয়, কুপথ্য করার দিকেই তাহাদের ঝোঁক বেশী। এ বিষয়ে যেন একটু কড়া নজর রাখা হয়। পুত্র শ্যামানন্দ এবং গৃহিণী মৃন্ময়ী সর্বতোভাবে মনোযোগী হইলেন এ বিষয়ে। বাড়িতে মসলা কেনাই বন্ধ হইয়া গেল। মৌরলা মাছ ছাড়া অন্য কোনও প্রকার মাছও আর তাঁহারা কিনিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু এ সব সাবধানতা সত্ত্বেও একদিন পেটের গোলমাল দেখা দিল।

ডাক্তাররা আসিয়া মৃন্ময়ীকে জেরা করিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ী বলিলেন দশ বৎসরের পুরাতন চাউল এবং মৌরলা মাছের মসলাহীন ঝোলের অপেক্ষা গুরুতর কোনও পথ্য স্বামীকে তিনি দেন না।

একজন ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, "দুধ কতটা খাচ্ছেন?"

"ছু-বেলায় তিন পোয়া"—

"জল মিশিয়ে দেন তো !"

"না, জল মেশাই না। কোলকাতার তুধে এমনিই তো জল অনেক থাকে—"

"না, জল মিশিয়ে দেবেন।"

জল মিশাইতে গিয়া মৃন্ময়ী অনুভব করিলেন যে জল মিশাইলে দুধের রং-ও বজায় থাকিবে না। কিন্তু ডাক্তারদের নির্দেশ অমান্য করিতে তিনি সাহস করিলেন না।

পেটের গোলমাল কিন্তু যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। জ্বরও। ভবানন্দ দেখিলেন ডাক্তাররা তাঁহার খাবার ছাড়া আরও কিছুই কমাইতে পারিতেছেন না। হঠাৎ তিনি মরিয়া হইয়া উঠিলেন। মৃন্ময়ীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এরা আমাকে না খেতে দিয়েই মেরে ফেলবে দেখছি। এদের কথা আমি আর শুনব না। আমি আজ রাত্রে আর বার্লি খাব না, লুচি খাব !"

"লুচি ?"

"হ্যাঁ, গরম ফুলকো লুচি খেলে পেটটা ধরে' যেতে পারে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে—"

"কিন্তু শামু এসে যদি শোনে আমি তোমাকে লুচি দিয়েছি তাহলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে সে।"

"তাকে শোনাবার দরকার কি। সে তো সাড়ে আটটার আগে ফিরবে না। তার আগেই আমি খেয়ে নেব।"

"কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে ?"

"খুব ঠিক হবে, আমি যা বলছি তাই কর। বেশী নয়, গোটা পাঁচ ছয় লুচি বেগুন-ভাজা দিয়ে খাব। আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, আমার ইচ্ছায় আর তোমরা বাধা দিও না।"

মৃন্ময়ীর চোখে জল আসিয়া পড়িল। তিনি লুচি ভাজিবারই আয়োজন করিতে গেলেন।

...উনুনের কাছেই ভবানন্দ খাইতে বসিয়াছিলেন। সবে একখানি মাত্র লুচি

থালার উপর দেওয়া হইয়াছে, অত্যন্ত গরম বলিয়া ভবানন্দ সেটি তখনও ভালভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। এমন সময়, পুত্র শ্যামানন্দ আসিয়া উপস্থিত।

"এ কি!—"

"উনি লুচি খাবেন বলে জেদ ধরেছেন"—মৃন্ময়ী বলিলেন।

"ডাক্তাররা বার্লি দিতে বলেছে, তুমি লুচি দিচ্ছ?"

"আমি কি করব বাবা! ওঁকে বল—"

ভবানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "আমি লুচি খাবই। তোমার ও ডাক্তারেরা গবেট্, কিচ্ছু জানে না"—

"না, লুচি খাওয়া হবে না।"

"আমি খাবই"—ভবানন্দ গর্জন করিয়া উঠিলেন। শ্যামানন্দ তর্ক না করিয়া লুচি-সুদ্ধ থালাটা তুলিয়া লইল। ভবানন্দ রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন। সেদিন রাত্রে জলস্পর্শ পর্যন্ত করিলেন না।

পরদিন প্রভাতে ভবানন্দ পাটনা-প্রবাসী ভ্রাতা পরমানন্দকে নিম্নলিখিত পত্রটি লিখিলেন।

কল্যাণবরেষু,

কিছু টাকার জন্য ইতিপূর্বে একটি পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তাহার কোনও উত্তর পর্যন্ত দিলে না। এখানে জলের মতো অর্থব্যয় হইতেছে, কিন্তু অসুখের কোনও উপশম নাই। মনে হইতেছে আর বেশী দিন বাঁচিব না। তোমার বউদিদি এবং শামুও আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেছে। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। হাতী কাদায় পড়িলে ব্যাঙেও তাহাকে লাথি মারে। তুমি যদি আমাকে শেষ দেখা দেখিতে চাও, এই পত্রকে টেলিগ্রাম জ্ঞান করিয়া অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। হাতে পয়সা থাকিলে টেলিগ্রামই করিতাম, কিন্তু পয়সা তোমার বউদির কাছে থাকে। চাহিলে দেয় না। তাহার ধারণা হাতে পয়সা পাইলে আমি কুপথ্য কিনিয়া খাইব। এখন মরাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তুমি পত্র পাইয়াই চলিয়া আসিবে। সাক্ষাতে সব কথাই বলিব। আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্বাদক
ভবানন্দ সেন

● তৃতীয় শতক ●

পরমানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেরই চোখে জল আসিয়া পড়িল। এমন কি শ্যামসুন্দরেরও।

"আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে। আমরা বাবাকে আর সামলাতে পাচ্ছি না।"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে পরমানন্দ উত্তর দিলেন, "ভয় কি, সব ঠিক হয়ে যাবে—"

শ্যামানন্দ নিশ্চিন্ত হইয়া কলেজে চলিয়া গেল।

ইহার কিছুক্ষণ পরে ঘরে খিল বন্ধ করিয়া দুই ভ্রাতায় মিলিয়া কি যে পরামর্শ করিলেন তাহা মৃন্ময়ী টের পাইলেন না। দ্বারে কান দিয়া শুনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ কিছু শুনিতে পান নাই।···

···বেলা তিনটার সময় পরমানন্দ দিবানিদ্রা সাঙ্গ করিয়া উঠিলেন। রাত্রে ট্রেনে নাকি ঘুম হয় নাই।

মৃন্ময়ী প্রশ্ন করিলেন, "চা করে' দেব ঠাকুরপো?"

"না। দাদাকে নিয়ে এখুনি একবার বেরুব। আমার পরিচিত একটি ভালো হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছেন, তাঁকে একবার দেখিয়ে নিয়ে আসি। অনেক কালাজ্বর রোগী তিনি আরাম করেছেন শুনেছি।"

"তাঁকে বাড়িতেই 'কল' দাও না। তোমার দাদা কি যেতে পারবেন?"

"তিনি 'কল' দিলে আসেন না। তাঁর বাড়িতে যেতে হয়। আমরা গাড়ি করে' যাব। তুমি চাকরটাকে বল একটা রিক্শা ডেকে দিক—"

"এই পাড়াতেই একটা রিক্শা-ওলা থাকে, চেনা-শোনা লোক। মোহন দেখ তো চামরু যদি থাকে তাকে ডেকে আন!"

চামরুর রিক্শাতে আরোহণ করিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে দুই ভাই রিক্শাতে চড়িয়া যাত্রা করিলেন। ফিরিলেন ঘণ্টা দুই পরে।

শ্যামানন্দও তখন কলেজ হইতে ফিরিয়াছিল। সে খুড়ামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ ডাক্তারের কাছে বাবাকে নিয়ে গিয়েছিলেন?"

"সে তুই চিনবি না, আমার এক গুরুভাই। বেলেঘাটায় থাকে।"

রাত্রে শুইবার সময় পরমানন্দ লক্ষ্য করিলেন টেবিলের উপর একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া ভবানন্দ খবরের কাগজ পড়িতেছেন। 'বাল্‌ব'টা হঠাৎ ফিউজড হইয়া গিয়াছিল। শুইয়া শুইয়া কিছুক্ষণ না পড়িলে ভবানন্দের ঘুম আসে না। মোমবাতির

কাছে মশারিটা বাতাসে দুলিতেছে। পরমানন্দের আশঙ্কা হইতে লাগিল মশারিতে আগুন ধরিয়া গেলেই মুশকিল !...এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

"পর্মা, ওরে পর্মা—"

ভবানন্দের কাতর ডাকে পরমানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল। মশারির ভিতর তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি উজ্জ্বল আলো তাঁহার চোখ ধাঁধাইয়া দিল। ভবানন্দের পাশেই যে বাথরুম এবং তাহাতে যে একটি বেশী শক্তিশালী 'বাল্‌ব' লাগানো আছে তাহা পরমানন্দ জানিতেন না। তিনি মশারির ভিতর বসিয়াই পট পট করিয়া নিজের মশারির দড়িগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পরই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

ইহার একটু পরেই গুরুভার পতনের শব্দে শ্যামানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল আপাদমস্তক মশারি জড়াইয়া পরমানন্দ পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে গুরুতর চোট লাগিয়াছে।

ভবানন্দ ক্ষীণকণ্ঠে বাথরুম হইতে বলিলেন, "শামু এখানে আয়। আমি উঠতে পাচ্ছি না। জলের মতো পায়খানা হয়ে যাচ্ছে খালি।"

শামু একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া উভয়কে লইয়া মেডিকেল কলেজে চলিয়া গেল।

পরদিন রিক্‌শা-চালক চামরু বলিল, উঁহারা কোন ডাক্তারের কাছে যান নাই, একটি খাবারের দোকানে বসিয়া লুচি, বুটের ডাল, আলুর দম এবং রাজভোগ খাইয়াছেন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এখনও উল্লেখ করি নাই। ভবানন্দ সেন একজন প্রবীণ ডাক্তার এবং পরমানন্দ সেন প্রবীণ শিক্ষক।

বীরেন্দ্রনারায়ণ

শীতের রাত্রি। সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলাম। সদ্য বিবাহিতা পত্নী পাশের ঘরে সেতার সাধিতেছিলেন। কাফির গৎটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ রস-ভঙ্গ হইল। নীচে কড়াটা নড়িয়া উঠিল এবং একটু পরে ভৃত্য মণিলাল একটি পত্র হস্তে প্রবেশ করিল।

"নবীপুরের জমিদার বাড়ি থেকে আপনাকে ডাকতে এসেছে—"

লেপ ছাড়িয়া উঠিতে হইল। পত্রটি দেখিলাম স্বয়ং জমিদারবাবুই লিখিয়াছেন।

ডাক্তারবাবু,

আমার ছেলেটি বড় অসুস্থ। আপনি পত্র পাইবামাত্র চলিয়া আসুন। আপনার জন্য নৌকা পাঠাইলাম। ইতি—

বীরেন্দ্রনারায়ণ

পত্রটার অভব্য ভঙ্গীতে আত্মসম্মান ঈষৎ আহত হইল। আমি উহার খাতকও নহি, কর্মচারীও নহি। আমাকে এমন আদেশের ভঙ্গীতে চিঠি লেখার অর্থ কি? একটা 'নমস্কারান্তে নিবেদন' বা 'বিনীত বীরেন্দ্রনারায়ণ' লিখিলে ক্ষতি কি ছিল! লোকটা শুনিয়াছি দুর্দান্ত জমিদার। টাকার জোরে সত্যকে মিথ্যা এবং দিনকে রাত্রি করিয়া নিজের জমিদারির সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে, বাহিরের লোকেদেরও নিস্তার নাই। সকলকে শাসাইয়া চোখ রাঙ্গাইয়া নিজের মহিমা-পতাকাটাকে সদর্পে সমুচ্চ করিয়া রাখাটাই যেন লোকটার একমাত্র লক্ষ্য। আমি মাত্র মাসখানেক আগে এই গ্রামে প্র্যাকটিস করিতে আসিয়াছি। গ্রামটি বীরেন্দ্র-নারায়ণেরই জমিদারিভুক্ত, কিন্তু তাহার সহিত চাক্ষুস আলাপ এখনও পর্যন্ত হয় নাই। লোকটার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে আলাপ করিবার আগ্রহও মনে জাগে নাই।

চিঠিটার দিকে কয়েক মুহূর্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। 'আমার ছেলেটি বড় অসুস্থ'—এই কথা কয়টিই আমাকে যাইতে বাধ্য করিল।

রাত্রি বারোটার সময় জমিদার ভবনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম জমিদারের ম্যানেজার জমদগ্নি মিশ্র আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। লোকটার দুশমনের মত চেহারা। মুখে চাপ চাপ গোঁফদাড়ি, যে অংশটুকু রোমহীন তাহাতে বসন্তের দাগ। নাকটা যেন ছোট একটি উই ঢিপি। "নমস্কার ডাক্তারবাবু। আসুন, বসুন। পথে আশা করি কোনও কষ্ট হয় নি—"

"এখানে বসে আর কি হবে? চলুন একেবারে রোগীর ঘরে যাই।"

"আমিই রোগী। আপনার ফি-টা আগে নিয়ে নিন।"

তিনি একটা টাকার থলি আমার দিকে আগাইয়া দিলেন।

"পাঁচ শ' টাকা আছে ওতে। যদি আরও চান আরও দেব। আমাকে কিন্তু বাঁচাতে হবে।"

"ব্যাপারটা কি—?"

"একটা খুনের মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছি। দাঙ্গা হয়েছিল, একটা লোক মারা গেছে। বিপক্ষ দলেরা আমাকে আসামী করেছে। উকীল পরামর্শ দিয়েছেন যে ডাক্তারের সার্টিফিকেট যোগাড় করতে হবে। তাতে লেখা থাকবে, যে তারিখে ওই খুনটা হয়েছে সেই তারিখে আমি কঠিন রোগে আপনার বাসায় আপনার চিকিৎসাধীন ছিলাম—"

বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

জমদগ্নি আমার মুখের দিকে সোৎসুকে চাহিয়া চাপদাড়িতে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

"ফাঁসির দড়ি গলায় জড়িয়ে গেছে ডাক্তারবাবু। বাঁচান আমাকে দয়া করে।"

"আমাকে মাপ করবেন। আমি ডাক্তার, মিথ্যা সার্টিফিকেট লেখা আমার পেশা নয়। এমনভাবে এত রাত্রে আমাকে ডেকে এনে খুবই অন্যায় করেছেন আপনারা। যাক, আমি চললাম। নমস্কার—"

আমি গমনোন্মুখ হইয়া দ্বারের দিকে ফিরিয়াছি এমন সময় জমদগ্নি বলিলেন, "যাবার আগে একটা কথা শুনে যান, নবীপুরে চোখ রাঙাবার অধিকার মাত্র একটি লোকেরই আছে, তিনি জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ। তিনি যদি বিরূপ হন তাহলে তাঁর জমিদারিতে আপনি বাস করতে পারবেন না।"

"বেশ, বাস করব না। কালই না পারি দু' একদিনের মধ্যেই আমি অন্যত্র চলে

যাব। আপনাদের এই ব্যবহারের পর আমারই আর এখানে থাকবার প্রবৃত্তি হবে না। আচ্ছা চলি—"

"শুনুন আর একটা কথা। পাঁচ-শ'র জায়গায় যদি পাঁচ হাজার টাকা দিই, তাহলেও আপনি এই উপকারটি করবেন না?"

"লক্ষ টাকা দিলেও করব না।"

"বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে বলিলাম, "এখানকার বাস উঠল। জিনিসপত্তর গুছিয়ে ফেল। কাল সন্ধ্যার ট্রেনেই চল কোলকাতায় চলে যাই—"

"কেন হঠাৎ?"

সমস্ত শুনিয়া গৃহিণীও আমার সহিত একমত হইলেন।

পরদিন দ্বিপ্রহরে একটা গরুর গাড়িতে আমার জিনিসপত্র বোঝাই করিতেছি, এমন সময় ধাববান অশ্বপৃষ্ঠে একজন বলিষ্ঠ সুদর্শন যুবক আসিয়া আমার বাসার সামনে অশ্বের গতিরোধ করিলেন। অশ্বের ঘর্মাক্ত কলেবর দেখিয়া বুঝিলাম, বেশ দ্রুতবেগেই তাহাকে আসিতে হইয়াছে।

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যুবক সহাস্য মুখে আগাইয়া আসিলেন।

"নমস্কার। আপনিই ডাক্তারবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি?"

"আমি বীরেন্দ্রনারায়ণ। আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। এসব কি—"

গরুর গাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

"আমার মালপত্র। আমি আজই চলে যাচ্ছি এখান থেকে—"

"পাগল না কি! আপনাকে কিছুতেই আমি যেতে দেব না। আপনার মতো লোকের সঙ্গ লাভ করা একটা সৌভাগ্য! টাকা খরচ করলে মিথ্যে সার্টিফিকেট অনেক পাওয়া যায়—জমদগ্নি সিভিল সার্জনের কাছ থেকেই সার্টিফিকেট এনেছে, কিন্তু আপনার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছি আমি। দুপুর রোদে তাই নিজেই ছুটে এলাম। যাওয়া আপনার হবে না, প্লীজ—"

বীরেন্দ্রনারায়ণ হাতজোড় করিলেন।

যাওয়া হইল না।

বন্য মহিষ

রাত বারোটা বেজে গেছে। নীলমণিবাবু তখনও ফেরেন নি। নীলমণি-পত্নী সুলোচনা লোচন দুটি রক্তবর্ণ করে' বসে আছেন রেগে। নীলমণিবাবুর বিধবা বোন মায়াও বসে আছেন একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে। বৌদি দাদার নামে যে সব কটূক্তি করছেন তার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু করবার সাহস নেই। বৌদির অনুগ্রহ না থাকলে এ বাড়িতে টেঁকা সম্ভব নয়।

…ঘড়িতে টং করে' যখন সাড়ে বারোটা বাজল তখন সুলোচনা পুনরায় তিক্তকণ্ঠে মায়াকে বললেন, "কাণ্ডখানা দেখেছ তোমার দাদার। তা-ও যদি বুঝতাম নিজের কাজের জন্যে এত খেটে মরছে তাহলেও বা মানে ছিল। কিন্তু কোথাকার কে হাড়হাবাতে মাছের ব্যবসা করবে তার জন্যে ওর ঘুম হচ্ছে না। সারাজীবনটা এই করছে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সীমা আছে তো একটা—"

নীলুবাবু ফিরলেন রাত দেড়টার সময় কিছু টাটকা বাটা মাছ নিয়ে। নিদ্রিতা সুলোচনাকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, "ওগো, শুনছ, ফার্স্ট ক্লাস বাটা মাছ পেয়ে গেলাম মহলদারের কাছে। ভদ্রলোকের ভাগ্য ভালো, ঝাল করে' ফেল দিকি মাছগুলোর—!"

"এখন, এত রাত্রে ? উনুনে আঁচ নেই—তোমার আক্কেলও কি নেই ?"

"আঁচ দিয়ে দাও, কতক্ষণ লাগবে ! আমি মাছগুলো বেছে দিচ্ছি। মাছ সঙ্গে করে' নিয়ে এলুম, ভদ্রলোককে নিরামিষ খেতে কি দেওয়া যায় !"

মায়া বলল—"আমি সব করে দিচ্ছি।"

দুই ভাই বোনে মহা উৎসাহে লেগে পড়ল। সুলোচনাকেও লাগতে হ'ল, সে কিন্তু গজগজ করতে লাগল সমানে। যাই হোক, রাত্রি আড়াইটের সময় উক্ত আগন্তুক ভদ্রলোককে পরিতৃপ্তি সহকারে মাছ-ভাত খাইয়ে নীলুবাবু সত্যিই পরিতৃপ্ত হলেন।

যে ঘটনাটা বললাম সেটা একটা উদাহরণ মাত্র। নীলমণিবাবু সারাজীবন ধরে' এই কাজ করে এসেছেন। তিনি সামান্য লোক, স্থানীয় জমিদারের স্টেটে সামান্য গোমস্তার কাজ করেন। কিন্তু তাঁর এমন দিলদরিয়া স্বভাব যে বিশ্বের যাবতীয়

লোককে দু'হাত বাড়িয়ে সাদরে অভ্যর্থনা করবার সাহস তাঁর আছে। ঘরের খেকে অনেক বুনো মোষ তাড়িয়েছেন তিনি জীবনে! আর সুলোচনাও এ নিয়ে অনেক বাক্যযন্ত্রণা দিয়েছে তাঁকে। কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করেন নি।

একবার অসুস্থ হয়ে কোলকাতা শহরে গিয়ে পড়তে হ'ল নীলুবাবুকে। গ্রামের ডাক্তার তাঁর অসুখ সারাতে পারলেন না। কোলকাতা শহরে নীলুবাবু বড়ই বেকায়দায় পড়ে' গেলেন। এখানে কেউ তাঁকে চেনে না। প্রতি পদক্ষেপে পয়সা দরকার। দিলদরিয়া নীলুবাবু জীবনে বিশেষ কিছু জমাতে পারেন নি। জমিদারের কাছ থেকে শ'দুই টাকা ধার করে' নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন একটি খোলার ঘরে। যে ডাক্তার বাবুটির চিকিৎসায় তিনি আত্মসমর্পণ করলেন তাঁর ফি আট টাকা। তাঁকে বার দুই ডেকেই নীলুবাবুর জিব বেরিয়ে পড়ল। অবশেষে ডাক্তারবাবুকে নিজের অর্থ-কৃচ্ছ্রতার কথা নিবেদন করলেন। ডাক্তারবাবু বললেন, "আমার প্রত্যহ আসবার দরকার নেই। সাতদিন পরে পরে আমি আসব। আপনি সকাল বিকেল একটু একটু বেড়াবেন পার্কে গিয়ে। যে ওষুধ দিয়ে গেলাম ওইটেই এখন চলুক—"

নীলুবাবু সুলোচনাকে এবং নিজের একটি অবিবাহিতা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। মায়া গ্রামের বাড়িতে ছিল। সবাই চলে এলে ঘরদোর দেখবে কে? আর তাঁর একমাত্র পুত্র জগন্নাথ ছিল বোর্ডিংয়ে। গ্রামে হাইস্কুল ছিল না, তাই তাকে বিদেশ পাঠাতে হয়েছিল। সে যেখানে ছিল সেটাও একটা গ্রাম। শহরে পাঠাবার সামর্থ্য নীলমণির ছিল না।

ডাক্তারের কথা শুনে নীলমণি বললেন—"জগুকে না হয় আসতে লিখি। একা একা বেড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব এই কোলকাতা শহরে—"

সুলোচনা বললে—"জগুই বা কোলকাতা শহরের কি চেনে। সেও তো কখনও আসে নি—"

"তবু সঙ্গে একটা কেউ থাকলে ভরসা হয়। রাস্তাঘাট দু'দিনেই চিনে নেবে—"

"তাহলে জগুকে লিখে দাও সে যেন কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসে। কখনও তো কোলকাতায় আসে নি। হাওড়া স্টেশনে নেমে এই গলির-গলি তস্য গলির ঠিকানা সে কি বার করতে পারবে?"

"আমি হরেনকে লিখে দিচ্ছি। সে-ই ওকে পৌঁছে দিয়ে যাবে।"

নীলমণিবাবুর বন্ধু হরেন জগুকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এর পরই সমস্যাটা হঠাৎ খুব জটিল হ'য়ে উঠল। নীলমণিবাবু ঠিক করেছিলেন ট্রামে চড়ে' হেদো পর্যন্ত যাবেন, হেদোয় গিয়ে বেড়াবেন। জগুকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন তিনি। ট্রাম স্টপেজের কাছে গিয়ে জগুকে তিনি বললেন, "ট্রামটা এলেই টপ্ করে' উঠে পড়বি। ট্রাম বেশীক্ষণ থামবে না।" ট্রাম যখন এল তখন জগু ঠিক চড়ে' পড়ল, কিন্তু চড়তে পারলেন না নীলমণিবাবু। তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, ভিড় ঠেলে ওঠা সম্ভবপর হ'ল না তাঁর পক্ষে। তিনি চেঁচিয়ে জগুকে বললেন, পরের স্টপেজে নেমে পড়িস। জগু সে কথা শুনতে পেলে না। ট্রাম যখন কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে গিয়ে থামল তখন নামল সে। কণ্ডাক্টার নামিয়ে দিলে। নেমেই দিশাহারা হয়ে পড়ল বেচারী। কেবল আশা করতে লাগল বাবা হয়তো পরের ট্রামেই এসে পড়বেন। কিন্তু উপর্যুপরি তিন চারটে ট্রাম এল, বাবা এলেন না। নীলমণিবাবু আসতেন, কিন্তু তাঁর এমন মাথা ঘুরতে লাগল যে তিনি আর ট্রামে উঠতে সাহসই করলেন না। আস্তে আস্তে বাড়িই ফিরে এলেন। ভাবলেন জগু ঠিক ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু সে এল না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হ'ল, ক্রমশ রাত্রি আটটা বাজল, তবু জগুর দেখা নেই। কান্না জুড়ে দিলেন সুলোচনা। নীলমণিবাবুও খুব চিন্তিত হলেন। অসুস্থ শরীর নিয়েই বেড়িয়ে পড়লেন আবার। প্রতিবেশী জীবনবাবুর কাছে গেলেন। জীবনবাবুর ফোন ছিল। তিনি ফোন করে' হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিলেন, দু'চারটে থানাতেও খবর দিলেন। তারপর বললেন, "আপনি বাড়ি যান। যদি কোনও খবর আসে আমি আপনাকে বলে' আসব। চোদ্দ পনর বছরের ছেলে যখন, তখন ভয় নেই। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, ঠিক ফিরে আসবে—হয়তো একটু দেরি হবে, আসবে ঠিক।"

"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মশাই। খবর পেলে দয়া করে জানাবেন আমাকে। আমরা জেগেই থাকব—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে—"

রাত দশটা পর্যন্ত জগু এল না। নীলমণিবাবু এবং সুলোচনার মনোভাব অবর্ণনীয়। দুজনেই কাতর ভাবে ভগবান্‌কে ডাকছিলেন। আর কিছু করবার ছিল না।

যা ঘটেছিল তা এই।

জগু প্রায় ঘণ্টাখানেক কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাবার জন্যে অপেক্ষা করল। যখন অন্ধকার হ'য়ে এল, তখন তার মনে হ'ল এবার ফেরা উচিত। কিন্তু এখান থেকে হেঁটে সে কি বাড়ি ফিরতে পারবে? সরকার বাই লেন নামটা মনে আছে, কিন্তু সেটা ঠিক কোনখান থেকে বেরিয়েছে তা তো ঠিক মনে নেই। ট্রামে যাবার উপায়ও বন্ধ, সঙ্গে পয়সা নেই একটিও। টিকিট ছিল না বলেই ট্রাম কণ্ডাক্‌টার নামিয়ে দিয়েছিল তাকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চিন্তা করল সে অনেকক্ষণ। তারপর একটা বুদ্ধি মাথায় এল। একটা রিক্‌শায় চড়ে' গেলে কেমন হয়। ওরা অনেক লেনের খবর জানে। বাড়ি গিয়ে ওকে পয়সা দিলেই হবে। একটা রিক্‌শা-ওলাকে জিজ্ঞেস করলে—"সরকার বাই লেন চেন?"

"খুব চিনি আসুন—"

রিক্‌শা যখন চলতে লাগল তখন জগুর মনে হ'ল সে ঠিক উল্টো দিকে চলছে। বলল সে কথা। কিন্তু রিক্‌শা-ওলা ধমকে উঠল—"ঠিক নিয়ে যাচ্ছি বাবু, আপনি বৈসে থাকুন না—"

পাড়াগাঁয়ের ছেলে জগু, চুপ করে রইল। তার মনে হ'ল কোন 'শর্ট কাট্' দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হয়তো। খানিকক্ষণ পরে সে জগুকে নিয়ে যে লেনে ঢুকল তা যে সরকার বাই লেন নয় তা বুঝতে জগুর দেরি হল না। চেহারাই সে রকম নয়।

"এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে—"

"এইতো শাঁখারিটোলা লেন—"

"আমি বললাম সরকার বাই লেনে যাব—"

"সরকার বাই লেন কোথা! তখন বললেন শাঁখারিটোলা, এখন অন্য বাত বলছেন!"

"সরকার বাই লেনে নিয়ে যেতে গোড়াতেই বলেছি।"

"সরকার বাই লেন কোথা আমি জানি না। আপনি আমার ভাড়া দিয়ে দিন, অন্য সোয়ারি করে' যান।"

"আমার কাছে পয়সা নেই যে। আমাকে বাড়ি নিয়ে চল তখন পয়সা দেব।"

"সরকার বাই লেন আমি চিনি না।"

বচসা শুরু হল। কোলকাতার রিক্‌শা-ওলা সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। জগুও

নিরুপায়। কথা কাটাকাটি চলতে লাগল। গোলমাল শুনে একটা বাড়ির দরজা খুলে গেল।

"কি হয়েছে খোকা—"

জগুর তখন চোখে জল। সে সব কথা খুলে বলল ভদ্রলোককে।

"ও, তুমি এই প্রথম কোলকাতা এসেছ বুঝি। কোথায় বাড়ি তোমার?"

"মানসাই। পুর্ণিয়া জেলায়—"

"ও! তোমার বাবার নাম কি?"

"নীলমণি মুখোপাধ্যায়—"

"নীলমণিবাবুর ছেলে তুমি? এস এস।"

ভদ্রলোক রিক্শা-ওলাকে বিদায় করলেন।

তারপর বললেন, "সরকার বাই লেন কোথায় তা আমিও চিনি না। তবে বার করতে পারব আশা করি। তুমি ততক্ষণ একটু কিছু খাও।"

জগুর ক্ষিধে পেয়েছিল, সে আর আপত্তি করলে না। প্রচুর খাওয়ালেন ভদ্রলোক। তারপর একটা বই খুলে সরকার বাই লেনের পাত্তা লাগালেন।

"এইবার চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—"

বিরাট মোটর বার করলেন একটা গ্যারেজ থেকে। দশ মিনিটের মধ্যে এসে হাজির হলেন নীলমণিবাবুর বাসায় রাত্রি সাড়ে দশটায়।

"চিনতে পারেন আমাকে—?"

নীলমণিবাবু চিনতে পারলেন না।

"সেই যে মাছের ব্যবসা উপলক্ষে আপনার কাছে গিয়েছিলাম বছর কয়েক আগে? সেই যে রাত্রে বাটা মাছের ঝোল দিয়ে গরম গরম ভাত খাইয়েছিলেন, মনে নেই?"

নীলমণিবাবুর তখন সব মনে পড়ল।

"আপনার আশীর্বাদে মাছের ব্যবসা করে' ভালই হয়েছে আমার। আপনার সাহায্যেই আমার প্রথম হাতে খড়ি। যোগাযোগ দেখুন, কতদিন পরে আবার দেখা। এখানে এসেছেন অসুখের চিকিৎসা করাতে? কোন্ ডাক্তার দেখছে—"

"ডাক্তার এস. কে. মিত্র—"

"আমি কাল নীলরতন সরকারকে নিয়ে আসব। তিনি আমার বাড়ির ডাক্তার।

এটি কে? মেয়ে? বা চমৎকার দেখতে তো। বিয়ে হয় নি দেখছি। সুপাত্র আছে হাতে। আমার ভাগ্নে। আচ্ছা সে সব কথা পরে হবে এখন। আগে সেরে উঠুন—”

নীলমণিবাবু সেরে উঠলেন। তাঁর মেয়েরও বিয়ে হ’য়ে গেল ভদ্রলোকের ভাগ্নের সঙ্গে। নীলমণিবাবু খুব আনন্দিত হলেন অবশ্য, কিন্তু খুব বেশী বিস্মিত বা বিচলিত হলেন না। তাঁর মনে হ’ল যা ঘটা উচিত ছিল তাই ঘটল, এর মধ্যে অপ্রত্যাশিত বা বিস্ময়কর তিনি কিছু দেখতে পেলেন না। উক্ত মৎস্যব্যবসায়ী যদি এসব না করতেন, তাহলেই বরং তিনি আশ্চর্য হতেন। ভদ্রলোকমাত্রেই তো ভদ্রতা করবে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে!

সুলোচনা কিন্তু ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন।

কোলকাতা থেকে ফিরে আসবার প্রায় মাস ছয়েক পরে একদিন নীলমণিবাবু প্রতিবেশী মহাদেববাবুর গাভীটির সেবা করছিলেন, নিজের হাতেই ঘাস দিচ্ছিলেন তাকে। কারণ মহাদেববাবু আসন্নপ্রসবা গাভীটিকে তাঁর কাছে রেখে নিশ্চিন্তমনে তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এমন সময়ে জন দুই কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে থানার নূতন দারোগাটি এসে হাজির হলেন।

বললেন, “দিন সাতেক আগে দুটি ভদ্রলোক কি আপনার বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন?”

“হ্যাঁ। কেন বলুন তো? খদ্দরধারী দুটি ছোকরা—”

“তারা পলিটিকাল আসামী। আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে—”

“চলুন—”

হাত ধুয়ে তিনি পুলিসদের অনুগমন করলেন। আর ফিরলেন না। বিচারে তাঁর জেল হ’ল এবং জেলে মৃত্যু হ’ল।

পাঁচ বছর পরে বিধবা সুলোচনা এই নিয়ে দুঃখ করছিলেন তাঁর বোনের কাছে।

“চিরকালটা ভাই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে গেছেন। কত মানা করতাম, কিন্তু আমার কথা কানে তুলতেন না। কোথা থেকে যে অচেনা দুটো লোক এল! আর বাড়িতে কোন লোক এলে তো ওঁর জ্ঞান থাকত না, একেবারে

অস্থির হয়ে উঠতেন। কত মানা করতাম আমি। এখন হাতে পয়সা নেই, জগুরও চাকরি হয় নি—"

হঠাৎ জগন্নাথ উত্তেজিত হ'য়ে এসে ঢুকল।

"মা, আমার চাকরি হয়ে গেল। অনেক ভালো ভালো ক্যাণ্ডিডেট ছিল। কিন্তু আমারই হয়ে গেল। কি করে' হ'ল জান? সেই যে দুটি লোক একবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল যার জন্যে বাবাকে পুলিসে ধরে নিয়ে যায়, তাদেরই একজন মিনিস্টার এখন। আমার পরিচয় শুনে বললেন—"ও, তুমি নীলমণিবাবুর ছেলে! তোমাকে নিশ্চয়ই নেব। তোমার বাবা সেদিন রাত্রে আশ্রয় না দিলে হয়তো ফাঁসিই হয়ে যেত আমার। বস, বস—।" খুব আদর যত্ন করলেন। তারপর বললেন, "তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও, তোমার চাকরি হয়ে যাবে।"

সুলোচনা অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন।

নীলকণ্ঠ

নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় যে গুণী লোক এর একটা অকাট্য প্রমাণ আমি এসেই পেয়েছিলাম। আমার এক মাস্টার মশাই আমাকে বলেছিলেন যদি কোনও শহরে গিয়ে কোনও লোকের নামে নিন্দা শোন, তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে আলাপ কোরো, জেনো লোকটির মধ্যে বস্তু আছে কিছু। বাঙালী জাতটা সমঝদার জাত, শ্রী-র স্বরূপ চিনতে দেরি হয় না তাদের, কিন্তু সেই শ্রী পর-শ্রী হলে বেচারারা কাতর হয়ে পড়ে একটু। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে মর্যাদা দেয় খুব, সেলামই করে, কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে। বাঙালীর মুখনিঃসৃত নিন্দাটা প্রশংসারই নামান্তর জেন। বাজে লোকের নিন্দা তারা করে না। মাস্টার মশাই-এর এ উপদেশটা যে নিতান্ত বাজে নয় তার প্রমাণ একাধিকবার পেয়েছি।

নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে আলাপ করা অবশ্য শক্ত একটু। তিনি থাকেন শহর থেকে বেশ একটু দূরে। তাঁর বাড়ির সিংহ দরজাটি লৌহনির্মিত এবং সেটি প্রায় সর্বদাই বন্ধ থাকে। সেটি খুলতে হলে গলার বেশ জোর থাকা চাই। কারণ যে ভৃত্য সেটি খোলে সম্ভবত সে একটু বধির, থাকেও বাড়ির ভিতর দিকে। উচ্চকণ্ঠে অনেক ডাকাডাকি না করলে তাকে কর্তব্য বিষয়ে সচেতন করা যায় না। তাছাড়া কুকুর আছে একটি, সেটি আবার কর্তব্য বিষয়ে একটু বেশি সচেতন। গেটের কাছে কেউ এসে দাঁড়ালেই হল, তার দাঁড়ানোর সন্তোষজনক হেতুনির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত সে তারস্বরে চিৎকার করে। সম্ভবত তার চিৎকারেই নীলকণ্ঠবাবুর অর্ধবধির দ্বারপাল বুঝতে পারে যে কেউ এসেছে।

এতরকম বাধা থাকা সত্ত্বেও নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল ভদ্রলোককে। সাহিত্যবিষয়ে দু'চারটি মাত্র কথা বলেছিলেন। একটি কথা এখনও মনে আছে।

বলেছিলেন, "বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে লক্ষ্য করেছেন কি ?"

ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারি নি।

"কি ধরনের বেকার-সমস্যা! আমাদের দেশে সাহিত্যিক মাত্রেই বোধ হয় বেকার—"

"না, তা ঠিক নয়। যাঁরা কোনরকম সার্থক সৃষ্টি করেন না, অথচ যাঁরা লেখেন হয় পেটের দায়ে, না হয় মানসিক কণ্ডুয়ন নিবৃত্তির জন্য তাঁদেরই আমি বেকার বলছি। এঁরা প্রায়ই দেখবেন সমালোচক হন। এঁদের চেহারা দেখিনি কারও, কিন্তু আমার মনে হয় এঁরা সকলেই বোধ হয় রোগা। সাহিত্য এবং সাহিত্যকদের নিয়ে এঁরা যে-রকম ভাবনা ভাবেন, তাতে মনে হয় রাত্রে ঘুমই হয় না হয়তো অনেকের। বাংলাসাহিত্যের এই গার্জেনদের জটিল ভাষায় লেখা প্রবন্ধগুলো পড়লেই বুঝতে পারি বাংলাসাহিত্যের প্রাঙ্গণেও বেকারের দল ভিড় করছে। ওদের প্রবন্ধ পড়লে আমার একজনকে মনে পড়ে।"—বলে' তিনি স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "মনে পড়ে নিধু পাগলাকে। নিধু পাগলা গাছেদের লক্ষ্য করে' হাত-পা নেড়ে নেড়ে ক্রমাগত উপদেশ দিত। একবার দেখেছিলাম একটা ফলন্ত কাঁঠাল গাছকে লক্ষ্য করে' নিধু বলছে—একটিও কাঁঠাল ভাল হয়নি বাপু তোমার। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়, যাক আর গুণে সময় নষ্ট করতে চাই না, অনেক কাঁঠাল ফলিয়েছ মানছি, কিন্তু একটিও ভাল ফল হয়নি। আমাদের অনেক সমালোচকদের সেই দশা। এঁদের কেউ মানে না কিন্তু এঁরা সব মোড়ল সেজে বসেছেন—"

গুরুগম্ভীর সমালোচকদের তিনি নিধু পাগলার সঙ্গে তুলনা করলেন শুনে বেশ মজা লেগেছিল সেদিন। লোকটিকে কিন্তু আরও ভাল লেগেছিল। আমি যখন গেলাম তখন তিনি খুব ধুমধাম করে' ঘরে ধুনো দিচ্ছিলেন। চতুর্দিক গন্ধে ও ধূমে পরিপূর্ণ। বড় বড় চারটে পেতলের ধুনুচিতে জ্বলছিল ধুনো, গুগ্‌গুল, অগুরু আর চন্দন, কিছুদূরে বনবন করে' ঘুরছিল বড় ইলেকট্রিক ফ্যান একখানা, দেখে মনে হল ধুনুচির আগুন যাতে নিবে না যায় তাই এই ব্যবস্থা।

লোকটি প্রৌঢ়, ঈষৎ স্থূলকায়। মুখে কিন্তু শিশুর সারল্য। মন মনে হ'ল আরও কচি।

আমাকে বললেন, "কিসমিস খাবেন? অনেকদিন কিসমিস খাইনি, তাই কিছু আনিয়েছিলাম কাল।"

নিজেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। একটু পরেই একটা সাদা

পাথরের রেকাবি করে' প্রচুর কিসমিস এনে বললেন, "খান। একটু গোলাপ জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। গোলাপ জলের গন্ধ ভাল লাগে তো আপনার। এই সবই হল আসল কাব্য! আসুন—"

প্রচুর কিসমিস খেয়েছিলাম সেদিন।

"আসুন, আর একটা মজার জিনিস দেখাই আপনাকে। টবের উপর ওটা কি বলুন তো, চেনেন?"

দেখলাম লতা একটা, ঠিক চিনতে পারলাম না। একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ করে' রইলাম।

"অপ্রস্তুত হবার দরকার নেই। এদেশে কেউ কিছু চেনে না। আমিও চিনতাম না কিছুদিন আগে। ওটা লজ্জাবতী লতা। কিন্তু এখন আর লজ্জা নেই, বেহায়া হয়ে গেছে, ছুঁয়ে দেখুন—"

ছুঁয়ে দেখলাম, বিশেষ কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না।

"আগে ছোঁওয়ামাত্র পাতাগুলো মুড়ে যেত। এখন ক্রমাগত ছুঁয়ে ছুঁয়ে লজ্জাহীনা করে তুলেছি ওকে।"

কেমন যেন অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর একটু হেসে একটু শিস্ দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। পরমুহূর্তেই দেওয়ালের দিকে ভুরু কুঁচকে চাইলেন। দেখলাম সবুজ পোকা একটা চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"চেনেন ওটাকে?"

"না।"

"কাচপোকা। আমার স্ত্রীর খুব শখ ছিল কাচপোকার টিপ পরবার। অনেক টিপ পরিয়েছি তাকে। সে এখন নেই, পোকাগুলোকে দেখলে তার কথা মনে পড়ে। ভাবি ভাগ্যে তার টিপ পরার শখ ছিল তাই পোকাগুলো আর পোকা নেই, সবুজ স্মৃতি হয়ে গেছে আমার চোখে—"

আরও হয়তো আলাপ চলত কিছুক্ষণ। কিন্তু একটা ছোঁড়া চাকর এসে বললে, "খোকাবাবু ডাকছে আপনাকে ওপরে—"

"এই রে মাটি করেছে! আপনি এসেছেন টের পেয়ে গেছে বোধ হয়। আমার কাছে কোনও লোক আসে, এটা ও পছন্দ করে না। আচ্ছা, চললুম—" নমস্কার করে দ্রুতপদে চলে গেলেন। মনে হ'ল মনিবের ডাকে চাকর ছুটে গেল বুঝি।

আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম নীলকণ্ঠবাবুকে দেখে সেদিন। এত বড় বিদ্বান লোক, ইয়োরোপের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু দিন কাটিয়েছেন, ফরাসী, জার্মানী, ইংরেজী ভাষায় ভাল ভাল বইও রচনা করেছেন অনেক—লোকটি কিন্তু একেবারে ছেলেমানুষ যেন।

ওঁর নিন্দায় কিন্তু সকলেই শতমুখ। লোকটি নাকি অহঙ্কারী, স্বভাব-চরিত্রও নাকি ভালো নয়, ওঁর বইও নাকি ওঁর লেখা নয়, বিদেশে কোন মেমসাহেবের প্রেমে পড়েছিলেন, সেই নাকি সব বই ওঁর নামে লিখে দিয়েছিল, বড়লোকের ছেলে বলেই সব মানিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি অনেক রকম কথাই ওঁর বিরুদ্ধে শুনেছিলাম। ওঁর ছেলেটি এম-এ'তে ফার্স্ট হয়েছিল, কিন্তু লোকে বলত তা-ও নাকি অনেক রকম তদ্বির করার ফলে হয়েছে। টাকা ঢাললে সবই সম্ভব নাকি আজকাল।

যাই হোক যে প্রসঙ্গে নীলকণ্ঠবাবুর নামটা মনে পড়ল, সেই প্রসঙ্গটা এবার বলি। শহরে একটি ছোটখাটো লাইব্রেরি ছিল। ছেলে-ছোকরাদের শখ হল সেই লাইব্রেরিতে একটি বাংলাসাহিত্য সভা স্থাপন করবার। আমাদের শখ আছে—কিন্তু সামর্থ্যে কুলোয় না। শখ মেটাবার জন্যেও ভিক্ষাপাত্র হাতে করে' দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়, ঘুরেও সব সময় আশানুরূপ অর্থ জোটে না। একজন উপদেশ দিলেন, 'এখানে যে নূতন কমিশনার সাহেব এসেছেন (তখনও আমরা স্বাধীনতা পাইনি) তিনি একজন সাহিত্যামোদী ব্যক্তি, তিনি ইচ্ছে করলে গবর্ণমেণ্টের তহবিল থেকে কিছু সাহায্য করতে পারেন।' কয়েকজন মিলে কমিশনার সাহেবের কাছে গেলেন। কমিশনার সব শুনে বললেন, "শুনেছি নীলকণ্ঠ ব্যানার্জি এখানে থাকেন। আমি তাঁর সঙ্গে অক্সফোর্ডে পড়তাম। তিনি যদি তোমাদের সভার ভার নেন তাহলে আমি শ' পাঁচেক টাকা দেব তোমাদের।"

নীলকণ্ঠ ব্যানার্জির উপর কেউ প্রসন্ন নন, কিন্তু স্বয়ং কমিশনার যখন তাঁর উপর প্রসন্ন তখন আর কথা কি। লোকটাকে দলে টানলে যদি শ'পাঁচেক টাকা পাওয়া যায় মন্দ কি! তাকেই না হয় সাহিত্যসভার সভাপতিই করে' দেওয়া যাক। উপায় কি তাছাড়া। কথা ছিল শহরের একজন বড় উকিলকে সভাপতি করা হবে। তিনি নগদ পাঁচ টাকা চাঁদাও দিয়েছিলেন। কেবল মাসিকপত্রের পাতা উল্টে সাহিত্যিক হতে চান যাঁরা তাঁদের মধ্যে একজন উক্ত উকিলকে ভোটে হারিয়ে দিয়ে নিজেই

সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু সব ভেস্তে গেল। ওই অহঙ্কারী লোকটারই দ্বারস্থ হতে হল শেষকালে সবাইকে।

নীলকণ্ঠবাবু রাজি হলেন না। বললেন, "আমি নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, ওসব ঝামেলার মধ্যে আমি যেতে পারব না। আমাকে মাপ করুন আপনারা। যদি কিছু চাঁদা চান, দিয়ে দিচ্ছি—"

লোকটার স্পর্ধা দেখে মনে মনে সবাই জ্বলে গেলেন কিন্তু মুখে খোশামোদ করে' যেতে হল। প্রথমত কমিশনার সাহেব, দ্বিতীয়ত পাঁচশ' টাকা। কমিশনার সাহেবের একজন ক্লার্ক (যাঁর পাকা মাথা থেকে বিলেতের মেম-সাহেবের কাহিনীটা বেরিয়েছিল) গললগ্নীকৃতবাসে শেষকালে বলে' বসলেন, "আপনি যদি এ সভায় না যোগ দেন, তাহলে আমার চাকরি যাবে। সাহেব যখন গোঁ ধরেছে তখন আর উপায় নেই। আপনি না গেলে একটি পয়সা তো দেবেই না, আমাদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠবে। আপনি দয়া করুন। অন্তত যেদিন সভার উদ্বোধন হবে সেদিনটি আপনি সভাপতি হোন—"

নীলকণ্ঠবাবু আর আপত্তি করতে পারলেন না। সভার দিন স্থির হল: নীলকণ্ঠবাবু প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি ঠিক পাঁচটার সময় সভায় উপস্থিত হবেন।

কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন না। পাঁচটা, সওয়া পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল তবু নীলকণ্ঠবাবুর দেখা নেই।

সভায় লোক গিসগিস করছে, মাঝে মাঝে হাত-তালি, শিস-দেওয়া যথারীতি চলছে, কলরবে চীৎকারে কান পাতবার উপায় নেই, সভার উদ্যোক্তারা এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করছেন কিন্তু নীলকণ্ঠবাবুর দেখা নেই। কাছে-পিঠে বাড়ি হলে কেউ ডাকতে যেত, কিন্তু তাঁর বাড়ি শহর থেকে বেশ দূরে, তাছাড়া তাঁর লোহার গেট, কালা চাকর আর কুকুরের কথা ভেবে যেতেও উৎসাহ হচ্ছিল না কারো, একটা বাইক যোগাড় করে' আমিই যাব ভাবছিলাম এমন সময় তাঁর মোটরটা দেখা গেল।

সভায় যথারীতি সংবর্ধনা-সঙ্গীত, অঙ্গভঙ্গী সহকারে আবৃত্তি, গীত-বিতান হারমোনিয়ামের উপর রেখে নাকিসুরে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রভৃতি প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে একে একে হ'ল। সভাপতি তাঁর ভাষণে শেষকালে বললেন যে, সভায় ঠিক সময় আসতে পারেননি বলে' তিনি দুঃখিত। তাঁর বাড়িতে একজন অতিথি কিছুদিন ছিলেন,

তিনি হঠাৎ চলে গেলেন, তাঁর বিদায়কালীন ব্যবস্থা করতে গিয়ে বিলম্ব হয়ে গেল একটু। সবাই যেন তাঁকে ক্ষমা করেন। তারপর সাহিত্য সম্বন্ধে বেশ একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন।

সভা শেষ হয়ে যাবার পর জানা গেল তাঁর একমাত্র ছেলেটি ঠিক সাড়ে চারটের সময় হার্টফেল করে' মারা গেছে। সে নাকি অনেকদিন থেকে হৃদরোগে ভুগছিল।

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে

উমাশঙ্করবাবু বিনয়কে যখন দেখিয়াছিলেন তখন তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন নাই। পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা ছিল না। বিনয় ট্রেনের একটি কামরা হইতে মুখ বাড়াইয়া প্ল্যাটফর্মের উপর কাহার সহিত যেন কথা কহিতেছিল, উমাশঙ্করের বন্ধু তিনকড়ি দেখাইয়া দিয়াছিল, "যে ছেলেটির কথা তোমাকে বলছিলাম ওই দেখ সেই ছেলেটি। চমৎকার দেখতে, নয়?"

তিনকড়িও বিনয়কে ভাল করিয়া চিনিতেন না। তিনিও তাঁহার বন্ধু হরপ্রসাদের নিকট সন্ধানটি পাইয়াছিলেন এবং কলিকাতার ট্রামে তাহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন। দৈবাৎ আজ ট্রেনে আবার তিনি বিনয়কে দেখিতে পাইলেন এবং উমাশঙ্করকে দেখাইয়া দিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত উমাশঙ্করের কন্যা প্রতিমার জন্য তিনি সৎপাত্রের খোঁজে ছিলেন। হরপ্রসাদ তাঁহাকে বিনয়ের সন্ধান দিয়াছিলেন।

উমাশঙ্কর এবং তিনকড়ি স্টেশনে আসিয়াছিলেন অন্য প্রয়োজনে। অপ্রত্যাশিতভাবে বিনয়ের দেখা পাওয়া গেল। বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা। উমাশঙ্করের খুব পছন্দ হইয়া গেল। কিন্তু তাহাকে ভালো করিয়া দেখিবার (শুদ্ধ বাংলায় যাহাকে পর্যবেক্ষণ করা বলে) সুযোগ পাওয়া গেল না। ট্রেন ছাড়িয়া গেল। উমাশঙ্করবাবু ইহার পরেও বিনয়কে দেখিবার সুযোগ পান নাই। বিনয় থাকে বেরিলিতে, উমাশঙ্করবাবু থাকেন বর্ধমানে। বিনয়কে দেখিতে হইলে অনেকগুলি গাঁটের পয়সা খরচ করিতে হয়। প্রয়োজন বুঝিলে উমাশঙ্করবাবু হয়তো তাহা করিতেন, কিন্তু তিনি প্রয়োজনই বোধ করিলেন না। পাত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিবার জন্য কেহই বিশেষ ব্যগ্র হয় না, পাত্রী হইলে বরং কথা ছিল। সুতরাং বিনয়কে ট্রেনের কামরায় একনজর দেখিয়াই উমাশঙ্কর সন্তুষ্ট রহিলেন।

বিবাহের কথাবার্তা কিন্তু চলিতে লাগিল। তিনকড়ির সঙ্গেই একদা উমাশঙ্কর কলিকাতানিবাসী হরপ্রসাদের দ্বারস্থ হইলেন। হরপ্রসাদ বলিলেন, "বিনয়ের বাবাকে আমি চিনতাম। এক আপিসেই আমরা কাজ করতাম সিমলায়। তিনি অবশ্য মারা গেছেন, বিনয়ের মা-ও নেই। কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে ওদের, ছেলেটিও

ভালো। বিয়ের মালিক ও নিজেই। লিখে দেখি ও যদি রাজী হয়। আপনি ছেলেটিকে দেখেছেন তো—"

"দেখেছি, খুব পছন্দ হয়েছে আমার।"

"ওর আর একটা ঝোঁক আছে। ও লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করতে চায়। আপনার মেয়ে লেখাপড়া করেছে কতদূর?"

"বি-এ পাস করেছে। বাংলায় এম-এ পড়ছে।"

"বাঃ, তাহলে তো ভালই। আমি তাকে চিঠি লিখছি, আপনিও লিখুন, ঠিকানা দিচ্ছি আপনাকে। ছেলেটিকে আপনি দেখেছেন তো ভাল করে, না দেখে থাকেন তো গিয়ে দেখে আসুন।"

"না, আর দেখবার দরকার নেই, যতটুকু দেখেছি তাই যথেষ্ট।"

"তাহলে বিবাহের প্রস্তাব করে চিঠি লিখুন, আমিও লিখছি, আমার মনে হয় হয়ে যাবে। বিনয় আদর্শবাদী ছেলে, পণটন-ও আপনার লাগবে না তেমন।"

হরপ্রসাদ আসল কথাটি জানিতেন, কিন্তু ভাঙ্গিলেন না। বন্ধুপুত্র বিনয়ের একটি ভালো বিবাহ দিবার জন্য তিনিও বহুদিন হইতে চেষ্টিত ছিলেন।

...চিঠিপত্র চলিতে লাগিল। বিনয়ের পত্র পাইয়া উমাশঙ্কর অবাক হইয়া গেলেন। এ যুগে এমনটা হওয়া যে সম্ভব তাহা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। বিনয় মেয়ে পর্যন্ত দেখিতে চাহিল না। লিখিয়াছে, 'আপনার কন্যা বি-এ পাস করিয়াছে, তাহাকে দেখিতে গেলে সে হয়তো অপমানিত বোধ করিবে। ভাবী বধূকে অপমান করিবার ইচ্ছা আমার নাই। আপনি তো লিখিয়াছেনই মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী, ইহার পর মেয়ে দেখিতে যাওয়ার অর্থ আপনাকে অবিশ্বাস করা। তাহা করা কি উচিত? এই সব ভাবিয়া স্থির করিলাম মেয়ে দেখিতে যাইব না।'

উমাশঙ্কর অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সত্যই এতটা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার আশা হইল এতদিনে বোধ হয় মেয়েটার সদ্‌গতি হইবে। একমাত্র মেয়ে, উমাশঙ্করের অবস্থাও নিতান্ত খারাপ নয়, তবু তিনি কন্যার জন্য সৎপাত্র জুটাইতে পারেন নাই। যখনকার কথা বলিতেছি তখন ইংরেজের আমল, স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিযুগ চলিতেছে, বাঙ্গলার নবজাগ্রত যৌবনকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দিবার জন্য প্রতাপশালী ইংরেজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রতিটি যুবক-যুবতীর পিছনে স্পাই ঘুরিতেছে।

যাঁহারা সরকারী চাকরি করেন, অথবা যাঁহারা ইংরেজের পদলেহী, তাঁহারা বোমারুদের সংস্রব যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন, সুযোগ পাইলে কেহ কেহ আবার তাহাদের ধরাইয়াও দেন। তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল একদল লোকও অবশ্য ছিলেন, তাঁহারা তাহাদের ভক্তি করিতেন, কেহ কেহ সাহায্যও করিতেন। উমাশঙ্কর এই শেষোক্ত দলের লোক। গোপনে পোগনে তিনি বোমারুদের অর্থ-সাহায্য করিতেন, মাঝে মাঝে দুই একজন পলাতক বোমারুকে আশ্রয়ও দিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃহীন কন্যা নন্দিনীরও অনুরূপ মনোভাব ছিল, শোনা যায় বাক্সের ভিতর সে ক্ষুদিরাম, কানাই, যতীন, উল্লাসকরের ছবিও নাকি লুকাইয়া রাখিত। ব্যাপারটা কিন্তু বেশী দিন চাপা থাকে নাই, অনেকেই জানিয়া ফেলিয়াছিল যে উমাশঙ্কর বোমারুদের প্রতি সহানুভূতিশীল। চাকুরিয়া এবং পদলেহীরা তাঁহাকে তাই এড়াইয়া চলিত। কন্যার জন্য পাত্র সংগ্রহ করাও তাই তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। যে সম্প্রদায় হইতে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ কন্যার জন্য পাত্র সংগ্রহ করেন, সে সম্প্রদায়ের অধিকাংশই চাকরিজীবী। তাহারা যেই শুনিল যে উমাশঙ্করবাবুর সহিত টেররিস্টদের সম্পর্ক আছে, অমনি তাহারা পিছাইয়া গেল। ওই বাড়িতে বিবাহ দিয়া কে পুলিসের কবলে পড়িতে যাইবে! পিতৃনাম স্মরণ করিয়া সকলেই তাঁহাকে এড়াইয়া যাইতে লাগিল।

উমাশঙ্করবাবু সত্যই বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনকড়ির সহায়তায় বিনয়ের নাগাল পাইয়া তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। বিনয় নামটাও তাঁহার খুব পছন্দ হইয়া গেল। বিপ্লবীদের ইতিহাসে 'বিনয়' নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। বলা বাহুল্য, নন্দিনীও মনে মনে খুব খুশী হইয়াছিল। বিনয়ের চিঠি পড়িয়া তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। উমাশঙ্করবাবু তো আনন্দের সপ্তম স্বর্গে উত্তীর্ণ হইলেন।

স্বর্গ হইতে কিন্তু পতন হইল। বিবাহের দিন বিনয় যখন ট্রেন হইতে নামিল তখন উমাশঙ্করবাবুর চক্ষু কপালে উঠিল। তিনি এবং পাড়ার আর একজন মাতব্বর লোক মোটর লইয়া বিনয়কে স্টেশন হইতে আনিতে গিয়াছিলেন, দেখিলেন বিনয় ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে ট্রেন হইতে নামিল। বিনয় খোঁড়া। ভয়ঙ্কর খোঁড়া, লাঠির সাহায্য ছাড়া চলিতেই পারে না। সঙ্গে বরযাত্রী একজনও নাই। সে একাই

আসিয়াছে। উমাশঙ্করবাবু বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। যে মাতব্বরটি সঙ্গে আসিয়াছিলেন তিনি একবার উমাশঙ্করের দিকে চাহিয়া উপরের ঠোঁট দিয়া নিচের ঠোঁটটি চাপিয়া ধরিলেন, তাহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল, চক্ষুর্দ্বয় জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। কিন্তু স্টেশনে ইহা লইয়া হুজ্জৎ করা শোভন নহে। খোঁড়া বিনয়কেই মোটরে চড়াইয়া তাঁহারা বর ও বরযাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িটিতে লইয়া গেলেন। মাতব্বর ব্যক্তিটি যাইবার পূর্বে আড়ালে উমাশঙ্করকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, "খাইয়ে-দাইয়ে বিদেয় করে দাও। ব্যাটাচ্ছেলে, জোচ্চোর !..."

"সেটা কি ভালো হবে।"

"তোমার একমাত্র মেয়েকে খোঁড়া পাত্রের হাতে সম্প্রদান করবে না কি! যারা ঘটক তারা কোথায় ?"

"তাদের তো আসবার কথা ছিল, কিন্তু কেউ এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছয় নি।—"

"সব যোগসাজস্, ষড়যন্ত্র, বুঝতে পারছ না, দূর করে দাও ব্যাটাকে—" মোটরে চড়িয়া মাতব্বর ব্যক্তি চলিয়া গেলেন। মোটরটি তাঁহারই। উমাশঙ্কর ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া অবশেষে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করাই সমীচীন মনে করিলেন। গত্যন্তরও ছিল না।

"আচ্ছা, তোমার পা এমনভাবে খোঁড়া হয়ে গেল কি করে ?"

"হাঁটুতে খুব চোট লেগেছিল একবার, বছর পাঁচেক আগে।"

"কি করে চোট লাগল, খেলতে গিয়ে কি ?"

"মাপ করবেন, তা আমি বলতে পারব না।"

"কেন বলতে বাধাটা কি ?"

"বলতে বাধা আছে।"

এ উত্তর শুনিয়া উমাশঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। গোপন করিবার অর্থ কি ? বিশেষতঃ হবু-শ্বশুরের কাছে! উমাশঙ্কর কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া দ্বিতীয় প্রশ্নটি করিলেন।

"তোমার সঙ্গে একজনও বরযাত্রী আসেনি কেন ?"

"দু'চারজন আসতে চেয়েছিল কিন্তু ইচ্ছে করেই আনি নি। আমার হাঁটুতে কি হয়েছিল সেটা দু'একজন জানে, তাদের মুখ থেকে কথাটা হয়তো প্রকাশ হয়ে যাবে এই ভয়ে তাদের এড়িয়ে একলাই চলে এসেছি।"

"হরপ্রসাদবাবু কি জানেন ব্যাপারটা ?"

"জানেন। কিন্তু তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ব্যাপারটা কোথাও ফাঁস করবেন না।"

বিনয় হাসিমুখে উমাশঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উমাশঙ্কর আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না। তাঁহারও সন্দেহ হইল ইহার অন্তরালে কোনও ভীষণ ষড়যন্ত্র প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

পাড়ায় একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। যাঁহারা কোনও কালেই উমাশঙ্করের হিতৈষী ছিলেন না, তাঁহারা সহসা অত্যন্ত হিতৈষী হইয়া পড়িলেন। সকলেই লাঠি উঁচাইয়া বলিল, "ব্যাটা জোচ্চোরকে মেরে দূর করে দাও—।"

উমাশঙ্করের অনেক আত্মীয়স্বজন বিবাহ উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও সকলে এ বিষয়ে একমত ছিলেন। উমাশঙ্করের বিষয়টি হস্তগত করিবার আশায় পাড়ার লক্ষ্মীকান্তবাবু তাঁহার নন্-ম্যাট্রিক পুত্রটির সহিত নন্দিনীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া একদা বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল। তিনি পুনরায় প্রস্তাবটি করিলেন।

"ওই খোঁড়া অজ্ঞাতকুলশীল লোকটার হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে আমার গদাইয়ের হাতে দেওয়া শতগুণে ভাল। ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকবে। গদাই আজকাল কণ্ট্রাক্টরি করে' বেশ রোজগার করছে—"

উমাশঙ্কর হাঁ-না কিছুই বলিলেন না। সত্যই তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। উমাশঙ্করের দূরসম্পর্কীয় যে মাতুলটি আসিয়াছিলেন তিনিই অবশেষে বলিলেন, "ওর হাতে আমরা মেয়ে দেব না। তোমার বলতে যদি চক্ষুলজ্জা হয়, আমিই বলে আসছি গিয়ে।"

তিনি গিয়া দেখিলেন, বিনয় নাই।

চাকরটি মুচকি হাসিয়া বলিল, "তিনি নিজেই গাড়ি ডাকিয়ে স্টেশনে চলে গেছেন।"

ইহার খানিকক্ষণ পরেই কলিকাতা হইতে হরপ্রসাদ ও তিনকড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কি একটা বিশেষ কাজে আটকাইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া সময় মতো উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর স্টেশনের ওয়েটিং রুমে যে ঘটনা ঘটিল তাহাকে নাটকীয় আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হইবে না। দৃশ্যটা এইরূপ। উমাশঙ্কর, উমাশঙ্করের মাতুল এবং তিনকড়ি তিনজনেই করজোড়ে বিনয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, বিনয় স্মিতমুখে তাঁহাদের বক্তব্য শুনিতেছেন।

উমাশঙ্কর বলিতেছিলেন, "আমাদের অপরাধ নিও না বাবা, আমরা তো জানতাম না, হরপ্রসাদবাবুর কাছে সব শুনলাম। রাত তিনটের সময় আর একটা লগ্ন আছে, চল।"

বিনয় প্রশ্ন করিল, "আপনার মেয়ের মত নিয়েছেন?"

মাতুল বলিলেন, "সে বলছে আপনার সঙ্গে যদি বিয়ে না হয় তাহলে সে আর বিয়েই করবে না।"

তিনকড়ি বলিলেন, "উমাশঙ্করবাবু মেয়ের বাপ, তাঁর মনোভাবটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি শিক্ষিত লোক, আপনাকে বেশী বলা বৃথা। চলুন—"

বিনয় বলিল, "যেতে পারি একটি শর্তে। তামা তুলসী গঙ্গাজল আর গীতা স্পর্শ করে আপনাদের শপথ করতে হবে যে, যা শুনেছেন তা জীবনে কখনও প্রকাশ করবেন না।"

তিনজনেই সমস্বরেই উত্তর দিলেন—"আমাদের কিছু আপত্তি নেই।"

বিনয় হ্যাংচাইতে হ্যাংচাইতে গিয়া পুনরায় মোটরে উঠিল।

হরপ্রসাদবাবু পরিস্থিতির গুরুত্ব দেখিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন যে বিনয় একদা একটি বিপ্লবী দলে ছিল। একবার সেই দল স্বদেশী ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। পুলিসের সহিত সজ্ঘর্ষের ফলে তাহার হাঁটুতে গুলি লাগে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পুলিস তাহাকে ধরিতে পারে নাই, তাহার দলের লোকেরা তাহাকে কাঁধে করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়। দলের কেহই ধরা পড়ে নাই। তাহাদের মধ্যে দুই চারিজন এখন চাকরিও করিতেছে। কথাটা প্রকাশ হইয়া গেলে তাহাদের চাকরি থাকিবে না। তাই বিনয়ের এই সাবধানতা।

নির্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

পালোয়ান

আপনারা আজকালকার ছেলেদের যত বোকা মনে করেন তত বোকা তারা নয়। তাদের প্যাণ্ট পরা, তাদের গোঁফ ছাঁটা, তাদের পরীক্ষায় ফেল করা, তাদের গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানো প্রভৃতি নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামিয়ে অমূল্য সময় নষ্ট করেন, তাঁদের কাছে সবিনয়ে আমি একটি নিবেদন কেবল করব। তাঁরা আজকালকার ছেলেদের চেনেন না, চিনলে অতটা হতাশ হয়তো হতেন না। ইংরেজরা প্রথমে যখন এদেশে এসেছিলেন তখন আমাদের দেশের যে কি দুর্দশা ছিল তা ইতিহাসের পাতা ওল্‌টালেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের পূর্বপুরুষরা যে কত রকম কসরৎ করে' কত রকম ইংরেজী অভিধান মুখস্থ করে' কত রকম কায়দায় ইংরেজদের সেলাম করে' তাদের বাণিজ্য বিস্তারে সহায়তা করে' তাদের সভ্যতার নকল করে' যে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন তা-ও ইতিহাসের পাতা ওল্‌টালেই জানতে পারবেন। আপনারা আড্ডায়, খবরের কাগজে, সভায় যাদের নিন্দা পঞ্চমুখে করেও শেষ করতে পারছেন না আমি সবিনয়ে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তারাও পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক মহাজনদেরই আধুনিকতম বংশধর। জীবজগতে কোথাও যা হয় না, মানুষের বেলাতেই বা তা হবে কেন? আম গাছে আমই ফলবে, আমড়া নয়। ফলছেও, বাঙালীর ছেলের ঘিলু এখনও গোবর হয়ে যায়নি, কেবল রাজনীতির ছকটা একটু বদলে গেছে বলে' বেচারারা চাকরি পাচ্ছে না। কিন্তু তবু তারা দমে' যায়নি, তার প্রমাণ চোখ মেললেই দেখতে পাবেন। কোনও সিনেমা, কোনও ফুটবল ম্যাচ, কোনও নাচ-গানের জলসা, কোনও সাহিত্যের মজলিস, কোনও রাজনৈতিক সভা তারা বাদ দেয় না। তাঁদের পোশাক পরিচ্ছদ দেখুন, মনে হবে কি যে এই ছোকরা বেকার? হবে না। তারা তাদের বাইরের মর্যাদাটুকু অন্তত অক্ষুণ্ণ রেখেছে। পালোয়ান পাকড়াশীর কাণ্ড দেখে সত্যি তাই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি।

বার চারেক ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করে' পালোয়ান আবিষ্কার করলে যে, সে চৌকোণা চৌকস লোক, ম্যাট্রিকুলেশনের গোল গর্তে তার পক্ষে ঢোকা অসম্ভব। বাবাকে সে কথা বোঝাতেও চেষ্টা করলে, বাবা কিন্তু সেকেলে মানুষ, বুঝতে

পারলেন না ব্যাপারটা, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে জুতো নিয়ে তাড়া করে গেলেন। এরকম অবুঝ লোকের অধীনে বাস করে' নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার ছেলে পালোয়ান নয়। পালোয়ান পালালো একদিন বাড়ি থেকে। ছেলে পালিয়ে যাওয়া নিয়ে অনেকেই দেখি আজকাল নানারকম মন্তব্য করে' আড্ডায় আসর গুলজার করেন। একটা কথা তাঁরা ভুলে যান, বুদ্ধদেবও বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেকালে খবরের কাগজ থাকলে সম্ভবত রাজা শুদ্ধোধনও 'নিরুদ্দেশ' শিরোনামা দিয়ে কাগজের সাহায্যে ছেলের খোঁজ করতেন।

পলাতক পালোয়ান পাকড়াশীও সিদ্ধার্থের মতো স্বকীয় ভাবনা অনুযায়ী সিদ্ধিলাভ করেছিল। যে সিদ্ধিলাভের জন্য বাঙালীর ছেলে নোটবুক মুখস্থ করে' দলে দলে পরীক্ষা পাস করছে সেই সিদ্ধিই লাভ করেছিল সে।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বলে গঙ্গাই সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী, কিন্তু এ যুগে জেনেছি ওটা বাজে কথা। সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী যদি কিছু থাকে তার নাম রাজনীতি। পালোয়ান বাড়ি থেকে পালিয়ে রাজনীতি তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। সিদ্ধি-সমুদ্র-মুখিনী এ তরঙ্গিণীর বৈশিষ্ট্য অন্য তরঙ্গিণীর মতোই। এর তরঙ্গে গা ভাসালেও এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা সম্ভবপর হয় না। প্রগতিশীলা এ তরঙ্গিণীর প্রবাহে একবার পড়লে নানা ঘাটের জল খেতে হয়।

পালোয়ানকেও খেতে হয়েছিল। সেও ক্রমান্বয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী কমিউনিস্ট, র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাট প্রভৃতি হয়ে নানা ঘাটের জল খেয়ে খেয়ে শেষকালে যখন তীরে উঠল, তখন চাকরি জুটে গেছে তার একটা। মাইনে বেশী নয়, কিন্তু ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা আছে।

এই সময় তার সঙ্গে দেখা হল একদিন হঠাৎ রাস্তায়। সহপাঠী ছিল, অনেকদিন পরে দেখা হওয়াতে আনন্দিত হলাম। কথা কইতে কইতে কখন যে কলেজ স্ট্রীট থেকে জগুবাবুর বাজারের কাছাকাছি এসে গেছি খেয়াল ছিল না। হেঁটেই যাচ্ছিলাম, পালোয়ানের রাজনৈতিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনতে শুনতে।

পালোয়ান হঠাৎ থেমে বললে—"এই কাছেই আমার মেস, যাবি ?"

গেলাম তার মেসে। তেতলার একখানি পুরো ঘর নিয়ে পালোয়ান থাকে দেখলাম। মার্জিত রুচির পরিচয় ঘরের চতুর্দিকে ছড়ানো। বললে মাত্র একশ কুড়ি

টাকা মাইনে পায়, তাতে এরকম ভাবে থাকে কি করে ? প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আরও বিস্ময়জনক ঘটনা ঘটল। এ ঘটনার পূর্বাভাস পেলে পালোয়ান আমাকে তার মেসে নিয়ে যেত না হয়তো। একটি লোক ঘরে ঢুকে বলল—

"সুখলালবাবু, আপনাকে নীচে ফোনে ডাকছে—"

"ও আচ্ছা, যাচ্ছি আমি!" আমার দিকে ফিরে বললে—"আসছি ভাই এখুনি—" সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম—পালোয়ানেব ভাল নাম কি সুখলাল? জানতাম না তো? টেবিলের উপর দেখলাম চিঠি রয়েছে অনেক। প্রত্যেকটির উপর যে নাম রয়েছে তা পালোয়ান পাকড়াশী নয়, সুখলাল রায়। সত্যিই বেশ অবাক হয়ে গেলাম। একটু পরেই পালোয়ান ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করলাম, "সুখলাল নাম তোর আগে শুনিনি।"

পালোয়ান স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইল ক্ষণকাল। তারপর হেসে বললে—"নাম বদলেছি। নামটা তো বাইরের পোশাক, দরকার মতো ওটা বদলাতে হয়। সুখলাল রায় নামটা কি খারাপ হয়েছে? চমৎকার গোল নাম, নিজেকে বাঙালী, বেহারী, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ এমন কি হরিজন বলেও চালানো যায়—"

তারপর আর একটু হেসে বললে, "চা খাবি, না কফি—"

"কিছু দরকার নেই। তুই নামটা বদলালি কেন সেইটেই বরং বল, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে—"

"না, তোকে বলতে আর বাধা কি। তবে কথাটা বলে' বেড়াস না যেন। চল, বেরুই তাহলে, রাস্তায় যেতে যেতে বলব। আমাকে যেতেও হবে এক জায়গায়—"

দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম।

পালোয়ান হেসে বললে, "এক জায়গায় মেয়ে দেখতে যাচ্ছি। যাবি?"

"মেয়ে? কার জন্যে?"

"তোর যদি পছন্দ হয় তুইই বিয়ে করতে পারিস। তোকে আমার ভাই ব'লে পরিচয় দেব—"

ব'লে হাসলে একটু। তারপর আসল কথাটা বললে। মেয়ে দেখে বেড়ানো ওর পেশা একটা। রোজ দু'টো করে' মেয়ে দেখে, একটা সকালে, একটা বিকেলে।

ওতেই প্রায় দু' বেলার খাওয়াটা হয়ে যায়। কন্যাপক্ষরা অভ্যর্থনার ত্রুটি করেন না।

বছর খানেক পরে—তখন আমি মেডিকেল কলেজে হাউস সার্জন, হঠাৎ একদিন ইডেনের সামনে পালোয়ানের সঙ্গে আবার দেখা।

"কিরে এখানে কেন—?"

"আমার বউ-এর পেটে অপারেশন হয়েছে—"

"কি, অপারেশন—?"

"হিস্টেরেক্টমি। জরায়ুটা কেটে বাদ দিয়েছে একেবারে—"

"ছেলে পিলে হয়েছে তোর ?"

"না—"

"চল দেখে আসি।"

গিয়ে দেখলাম পালোয়ানের বউকে। বেশ রূপসী বউ। দুঃখ হ'ল তার আব ছেলে-মেয়ে হবে না ভেবে। অমন সুন্দরী মেয়ে, মা হলে কি চমৎকার মানাতো। নিঃসন্তান জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে বেচারার।

একেবারে ব্যর্থ কিন্তু হয়নি। উক্ত ঘটনাব বছর খানেক পরে আবার দেখা হয়েছিল পালোয়ানের সঙ্গে চৌরঙ্গীতে। দেখলাম একটা দামী মোটরে সে তার বউকে তুলে দিচ্ছে। আমি যে ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়েছিলাম তা' সে টের পায়নি। মোটরটা যখন চলে' গেল তখন ফিরেই সে আমাকে দেখতে পেলে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"মোটরে তোর বউ গেল, না ?"

"হ্যাঁ"

"প্রাইভেট কার দেখলাম। তোর না তোর শ্বশুরের—?"

পালোয়ান হাসল একটু।

"চল, ওপরে চল, সব বলছি। হ্যাঁ, এই সিঁড়ি, আজকাল এইখানেই থাকি। ওপরে একটা ফ্ল্যাট্ নিয়েছি—"

আমার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল, এখানে ফ্ল্যাট্ নিয়ে থাকা সোজা নয়, অনেক পয়সা লাগে।

ওপরে গিয়ে একেবারে হকচকিয়ে গেলাম। রীতিমত আমিরী কাণ্ড-কারখানা।

পালোয়ান হঠাৎ আমার দু' কাঁধে দু'টো হাত রেখে বললে—"তোর কাছে লুকোব না কিছু! বউকে আমি ভাড়া দিই। মাসে অ্যাভারেজে হাজার দুই টাকা রোজগার হয়!"

বজ্রপাত হলেও আমি অত বিস্মিত হ'তাম না।

"তোর বউ আপত্তি করে না?"

"প্রথম প্রথম করত, এখন আর করে না। কিছুদিন পরে ছবির পর্দাতেও ওকে দেখতে পাবি—"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুই নিজে এতে সুখী হয়েছিস্?"

"আমি আর একটা বিয়ে করেছি। সাদামাটা গেরস্ত ঘরের মেয়ে। মাস দুই আগে একটি খোকা হয়েছে। তোকে নিয়ে যাব একদিন সেখানে। যাবি?"

গিয়েছিলাম। সত্যিই দেখলাম পালোয়ানের ছোট্ট সংসারটি চমৎকার। তার স্ত্রী অবশ্য একথা জানত না যে তার সংসার খরচের টাকা যোগাচ্ছে তার সুন্দরী সতীন। সতীনও পালোয়ানের দ্বিতীয় সংসারের খবর জানত না।

কিছুদিন আগেই চার্লি চ্যাপলিনের মঁশিয়ে ভারডু দেখেছিলাম, দেখে মুগ্ধও হয়েছিলাম। সুতরাং পালোয়ানের উপর রাগ করতে পারলাম না।

আপনারাও করবেন না।

কাক চরিত্র

আমি যেখানে বসিয়া লিখি তাহার ঠিক সামনেই একটি জানালা আছে। জানালা দিয়া খানিকটা আকাশ এবং একটি সজিনা গাছ দেখা যায়। সজিনা গাছের একটি ডাল আমার জানালার দিকে প্রসারিত। মনে হয় সে যেন আমার ঘরে ঢুকিয়া আমার সহিত আলাপ জমাইতে চায়। তাহার পত্র-পল্লব-ফুল-ফলের নীরব আলাপ দূর হইতেই রোজ শুনি, প্রতি ঋতুতে তাহার আলাপের স্বর বদলাইয়া যায় তাহাও লক্ষ্য করি, কিন্তু সবটা যে বুঝিতে পারি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তবু রোজ চাহিয়া থাকি। প্রত্যহ লিখিতে বসিয়া ওই তরুণ সজিনা-শাখাটির জন্য অনেকটা সময় ব্যয় করিতে হয়। একদিন এই সজিনা-শাখায় একটি কাক আসিয়া বসিল। শুধু বসিল না, নানাভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। মনে হইল সে-ও যেন আমার সহিত আলাপ করিতে উৎসুক। এ বিষয়ে আমার ঔৎসুক্য কম নয়। আড্ডা দিতে চিরকালই ভালবাসি। অবশ্য আড্ডাটা যদি মনোমত হয়। মানে, তাহাতে যদি পরনিন্দা এবং পরচর্চার মসলা থাকে। সাধারণ লোকেদের সহিত এ বিষয়ে আমাদের (মানে, লেখকদের) বিশেষ কোনও তফাত নাই। একটু তফাত অবশ্য আছে। সাধারণ লোকেরা সকলের সহিত সমানভাবে আড্ডা দিতে পারে না। লেখকরা পারে। আকাশ, বাতাস, ফুল, পশু, পক্ষী সকলেরই সহিত আড্ডা দিবার ক্ষমতা আছে তাহাদের, এ সব ক্ষেত্রে যে ভাষাও তাহারা ব্যবহার করে তাহা সাধারণ মানুষের ভাষা নয়, হৃদয়ের ভাষা। কল্পনার ভাষাও বলিতে পারেন।

এই ভাষায় উক্ত কাকের সহিত আমার আলাপ জমিয়া গেল। আপনাদের সুবিধার জন্য সে আলাপ বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছি। হয়তো কিছু মজা পাইবেন।

"আপনাকে মশায় রোজ ঐ টেবিলে বসে থাকতে দেখি। কখনও হাঁটু দোলান, কখনও দাড়ির ভিতর আঙুল চালান, কখনও আকাশের দিকে চেয়ে শিস্ দেন। কি করেন বলুন তো ওখানে বসে?"

"লিখি।"

"মানুষদের মধ্যে অনেকেই লেখেন দেখেছি। আমাদের খাজাঞ্চি মশাইও রোজ হিসেব লেখেন। আপনি?"

"আমি গল্প লিখি, কবিতাও লিখি—"

"কিসের গল্প— ?"

"মানুষেরই গল্প। তাদের সুখ-দুঃখ, রং-ঢং এই সব আর কি।"

"ও, তা আমি আপনাকে অনেক গল্প বলতে পারি। অনেক লোকের বাড়িতে যাই তো, অনেকেরই হাঁড়ির খবর রাখি। আমার কাছে কেউ কিছু গোপন করে না, মনে করে ও একটা কাক তো! কিন্তু আমি সব বুঝতে পারি। বেশ মজা লাগে। আপনি আপনার পাশের বাড়ির লোকের যে খবর জানেন না, আমি তা জানি—"

"পাশের বাড়িতে তো নগেনবাবু থাকেন—"

"হ্যাঁ। তার কি খবর জানেন আপনি বলুন!"

"পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে ভদ্রলোক বলেই তো মনে হয়। কথাবার্তাও ভালো। খুব দামী স্যুট পরে' রোজ বেরিয়ে যান আপিসে, মনে হয় ভালো চাকরিই করেন।"

"চাকরির খবর জানি না, কিন্তু বাড়িতে কি খান তা জানি। একবেলা মুড়ি, আর একবেলা এক-তরকারি ভাত, তাও নিরামিষ। ন'মাসে ছ'মাসে মাছ ঢোকে বাড়িতে। ভদ্দরলোক বাইরে খুব ফিটফাট বটে কিন্তু বগলে দাদ আছে, রোজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মলম লাগান। জানতেন এ-সব কথা?"

স্বীকার করিতে হইল জানিতাম না।

ঘাড়টি বাঁকাইয়া কাক পুনরায় শুরু করিল—"নিকুঞ্জবাবুকে চেনেন?"

"চিনি বই কি। খুব গোঁড়া ধার্মিক লোক—"

"কক্ কক্ কক্—"

মনে হইল হাসিতেছে।

"নিকুঞ্জবাবু ধার্মিক হয় তো, কিন্তু ওঁর স্ত্রীটি ডুবে ডুবে জল খান। আমি রোজ সেই সময় ওদের উঠোনে গিয়ে ওদের এঁটো থালা-বাসন হাঁটকে দেখি যদি খাবারের টুক্‌রোটাক্‌রা পাওয়া যায় কিছু। প্রায়ই থাকে না, ওরা অধিকাংশ দিনই ডিম খায় কি না—"

"নিকুঞ্জবাবুর অতবড় টিকি, গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক, উনিও ডিম খান?"

"উনি ডিমের যম একটি!"

কাক পুনরায় কক্ কক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

"দেখুন, আপনি আপনার পাড়া-পড়শীর কোন খবরই রাখেন না। আপনার জানালা দিয়ে দূরে ওই যে প্রকাণ্ড সাদা দোতলা বাড়িটা দেখছেন ওর খবর রাখেন কিছু?"

"ওটা তো শালিকপুরের জমিদারদের বাড়ি—"

"এককালে ছিল হয়তো। এখন ওর বংশের একগাদা ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী হয়েছে। শালিকপুরের জমিদারি ভাগ হয়ে চটকস্য মাংসের চেয়েও কম পড়েছে প্রত্যেকের ভাগে। কিন্তু ওদের ঠাটটা দেখেছেন?"

"তাতো দেখেছি—"

"পয়সা আসে কোত্থেকে?"

"তাতো জানি না—"

"শুনুন তাহলে। হাবুলবাবু কালোবাজারের দালালি করেন, কমলবাবু করেন ঘুসের দালালি। বড় বড় অফিসাররা ওঁর মারফত ঘুস নেয়, উনি কমিশন মারেন। চামেলী মেয়েটা একটা মাড়োয়ারীর সঙ্গে ভাব করেছে। রোজ বিকেলে প্রকাণ্ড একখানা মাস্টার বুইক আসে, দেখেন নি? শেফালী সিনেমা-ডিরেক্টারকে বিয়ে করেছে। মণ্টু জুয়ার আড্ডায় ভিড়েছে। জানতেন এ-সব খবর?"

না—"

"আরও শুনুন— "

কাক ক্রমাগত বলিয়া যাইতে লাগিল। অবাক হইয়া গেলাম। এতগুলি প্রতারক দুশ্চরিত্র নর-নারীর সান্নিধ্যে বাস করিতেছি, অথচ তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। একটা লোকও ভাল নয়। কি আশ্চর্য!

"আবার আসব। আরও অনেক গল্প শোনাব আপনাকে—"

কাক উড়িয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। মনে হইল সজিনার ডালটাও যেন আমার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

কাকটি উপর্যুপরি তিন দিন আসিল না।

চতুর্থ দিনে পুনরায় তাহার দেখা পাইলাম। মনে হইল কেমন যেন বিমর্ষ উস্কখুস্ক ভাব।

"কি খবর ?"

"খবর খুব সাংঘাতিক—"

"কি রকম— ?"

"এখনই আবিষ্কার করলাম যে বাচ্ছাগুলিকে এতদিন নিজের বলে' মনে করছিলাম—সেগুলি আমার বাচ্ছা নয়, কোকিলের বাচ্ছা। একটিও আমার নয়—"

তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম কি করিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে।

কাক উত্তর দিল—"আমাকে কি আপনি নিকুঞ্জবাবু পেয়েছেন ? কি করে' সম্ভব হয়েছে তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। ওর সঙ্গে আর পোষাবে না। থাকুক ও কোকিলের বাচ্ছা নিয়ে। আমি আবার একটা জুটিয়ে নেব। ওদের তো অভাব নেই।—"

কা কা করিতে করিতে কাক উড়িয়া গেল।

দুইটি ছবি

ভ্রমর কুসুমকে ঘিরিয়া গান করে, চিরকালই করিতেছে। ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। সেদিন কিন্তু কিছু নূতনত্ব হইল। যে যুবক-ভ্রমরটি অর্ধস্ফুট মালতী মুকুলের দিকে আবেগভরে উড়িয়া আসিতেছিল, সে সহসা থামিয়া গেল। মালতীমুকুলের কাছে ওটা কি? সাপ না কি! সাপের মতোই ফণা তুলিয়া আছে যেন! ভ্রমর দূর হইতেই উড়িয়া উড়িয়া দেখিতে লাগিল ব্যাপারটা কি। দেখিল জিনিসটা অনড়। সাপ হইলে নড়িত নিশ্চয়। সহসা খানিকটা রোদের ঝলক পড়িল তাহার উপর। চক্‌চক্ করিয়া উঠিল ভ্রমরের বিস্ময় বাড়িয়া উঠিল। কি ওটা!……

সহসা তাহার চোখে পড়িল মালতীমুকুল আর একটু ফুটিয়াছে। আর সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। উড়িয়া গিয়া তাহাকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করিতে লাগিল। ঠিক পাশেই সাপের মতো ফণা তুলিয়া যে অদ্ভুত জিনিসটা ছিল তাহার অস্তিত্বই সে ভুলিয়া গেল।

কাছেই আরও দুইজন লোক আরও কয়েকরকম যন্ত্র লইয়া বসিয়াছিল, ভ্রমর তাহাদেরও দেখিতে পাইল না।

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

দেখিতেছি সেই ভ্রমর এখনও সেই মালতীমুকুলকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করিতেছে। অর্ধ-স্ফুট মুকুল এখনও পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় নাই। যেমন ছিল তেমনি আছে। সবই আছে নাই কেবল……

"ছি, ছি কি করছ, ছাড লাগে'—"

"দুষ্টু কোথাকার, মিথ্যুক!—"

"সত্যি লাগছে!—"

হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর একটা ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কি বলিতেছিলাম? সবই আছে, নাই কেবল সেই সজীব শ্যামল কানন-

কুঞ্জটি। ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে ছায়া-ছবির পরদায়। দুই বৎসর পূর্বে কৌশলী বিজ্ঞানীরা তাহার অভিসার-লীলার ছবি তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। সহসা মনে হইল দ্বিতীয় যে ছবিটি আমার মানসপটে জাগিল, যাহা বহুকাল পূর্বে হারাইয়া গিয়াছে, তাহা কি কোথাও কোনও ছায়াছবিতে এমনি করিয়া বাঁচিয়া আছে?

দ্বিবিধ দৃষ্টিকোণ

তিনি বলিতেছিলেন, সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছিল।

"দেখ, আমরা সকলেই ভ্রমণশীল, কেহই এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। বসিয়া থাকিবার উপায় নাই, জীবনই আমাদের চালিত করিতেছে, আন্তরিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই আমরা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি। কত স্থানে যে গিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সেদিন যে অদ্ভুত দেশে আমি গিয়া পড়িয়াছিলাম, তেমন বিচিত্র দেশে আমি আর কখনও যাই নাই, যাইব বলিয়া কল্পনাও করি নাই। সে দেশের গল্পই আজ তোমাদের শুনাইব।

আমি সেদিন যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই বাহির হইয়াছিলাম তাহা নয়। আমি বাহির হইয়াছিলাম খাদ্য-সন্ধানে। যে স্থানে প্রত্যহ খাদ্য পাই, সেই স্থানেই আমি গিয়াছিলাম, খাদ্যের সন্ধানও পাইয়াছিলাম। একাগ্র চিত্তে খাদ্য সংগ্রহ করিতেছি, এমন সময় এক প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। আমি যে স্থানটায় ছিলাম, সেই স্থানটাই যেন উৎক্ষিপ্ত হইয়া দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। আমি স্থানচ্যুত হইয়া একটা ঘন জঙ্গলের ভিতর পড়িয়া গেলাম। বিস্ময়ের ভাবটা যখন কাটিয়া গেল চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, স্থানটা নিতান্ত মন্দ নহে। মোটামুটি খাদ্যদ্রব্য সবই পাওয়া যায়। কিছু কিছু সংগ্রহ করিলাম। তাহার পর ইচ্ছা হইল বাড়ি ফিরি, আমার বিলম্ব দেখিয়া তোমরা হয়তো ভাবিতেছ। কি যে ঘটিয়াছে তাহা তোমাদের বলিবার জন্যও মনটা ছটফট করিতেছিল। সেই ঘন অরণ্য হইতে বাহির হইয়া কিন্তু ঘরের দিকে ফিরিতে পারিলাম না। একটা অপরূপ গন্ধ আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিসের গন্ধ তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম, ওই গন্ধকে অনুসরণ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নাই। একটা অদৃশ্য হস্ত যেন আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম জানি না, কিছুক্ষণ পরে আবিষ্কার করিলাম আমি একটা কালো রঙের ঢিপির উপর উঠিয়াছি। ঢিপি হইতে নামিতে যাইব এমন সময় দেখিলাম, ঢিপিটাই চলিতেছে। সে-ও যেন গন্ধটাকেই অনুসরণ করিতেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তাহার পর লক্ষ্য করিলাম,

ঢিপির উপর লম্বা গাছের মত কি যেন রহিয়াছে। সেটা বাহিয়া উঠিতে লাগিলাম, কিছুদূর উঠিয়াই কিন্তু বিপন্ন হইতে হইল। কে যেন ঝট্‌কা মারিয়া আমাকে ফেলিয়া দিল। যেখানে আমি পড়িলাম তাহা পাথরের মত কঠিন, ঘোর রক্তবর্ণ এবং অতিশয় মসৃণ। এরূপ দেশ পুর্বে কখনও দেখি নাই। সবুজের কোন চিহ্ন বা মাটির কোনও আভাস কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। সেই মধুর গন্ধটা কিন্তু আরও তীব্র—আরও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিল। তাহা যেন আমার সমস্ত সত্তাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। আমি আচ্ছন্নের মত দ্রুতপদে সেই মসৃণ কঠিন রক্তবর্ণ দেশ অতিক্রম করিতে লাগিলাম, সেই মধুর গন্ধই যেন আমার বাহক হইল। কিছুক্ষণ চলিবার পর আর একটি আশ্চর্যজনক বৃক্ষ দেখিলাম। বাদামী রঙ, সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্বে এইরূপ একটি অদ্ভুত বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলাম, এই বৃক্ষটিতে উঠিব কি না ইতস্তত করিতে লাগিলাম। আমার ইতস্তত-ভাব কিন্তু বেশীক্ষণ টিকিল না। যে গন্ধ আমাকে আকৃষ্ট করিতেছিল, মনে হইল তাহার উৎস যেন ঊর্ধ্বে, অদৃশ্য শতধারায় তাহা যেন শূন্য হইতে বর্ষিত হইতেছে। আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না, সেই অদ্ভুত বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এবার কিন্তু কোনও বিপদ হইল না। বৃক্ষশীর্ষে উঠিয়া দেখিলাম, আর একটি নূতন দেশে উপনীত হইয়াছি। চতুর্দিক শ্যামল। এমন অদ্ভুত সবুজ রঙ্ আমি ইতিপূর্বে আর দেখি নাই। মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে হইল, ইহাই বুঝি স্বর্গ। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আরও মুগ্ধ হইতে হইল। দেখিলাম, বিরাট এক দুধের নদী সেই শ্যামল দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম। তাহার পর আগাইয়া গিয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিলাম। আকণ্ঠ পান করিলাম। এমন সুস্বাদু সুমিষ্ট দুগ্ধ বহুকাল পান করি নাই। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছিল, বুকটা যেন জুড়াইয়া গেল। সেই সুমধুর গন্ধ কিন্তু তখনও আমাকে উন্মনা করিয়া তুলিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, কাছাকাছি কোনও ফুল ফুটিয়াছে কি না। ফুল দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু গন্ধের উৎসটি দেখিতে পাইলাম। দুগ্ধ-নদীর পরপারে বিরাট একটি হ্রদ রহিয়াছে, জলপূর্ণ হ্রদ নয়, মধুপূর্ণ হ্রদ। সেই হ্রদ হইতেই যে এই অপূর্ব সৌরভ নিঃসৃত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ রহিল না। সেই হ্রদের সমীপবর্তী হইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলাম। কিন্তু সেই বিরাট দুগ্ধ-নদী অতিক্রম করিব কিরূপে? শাখা-প্রশাখা বিস্তার

করিয়া তাহা সমস্ত দেশটাই জুড়িয়া রহিয়াছে। নদীর তীরে তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, যদি সন্তরণযোগ্য কোনও ক্ষীণ ধারা পাই।......”

যিনি কাহিনীটি বলিতেছিলেন তিনি রবিনসন্ ক্রুশো, গালিভার অথবা সিন্ধবাদ নহেন, সামান্য একটি পিপীলিকা মাত্র। তাঁহার দৃষ্টি দিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন মানবীয় দৃষ্টিতে তাহা এইরূপ—

এক কাঠুরিয়া একটি গাছের ডাল কাটিতেছিল। ডাল যখন ছিন্ন হইল, তখন তাহা একটি ঝোপের মধ্যে পড়িল। ডালে একটি পিপীলিকা ছিল, সেটিও ঝোপে পড়িয়া গেল। যে ব্যক্তি গাছের ডাল কাটাইতেছিলেন তিনি ঝোপের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। পিপীলিকা ঝোপ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার জুতার উপর উঠিল। তিনি যখন বাড়ি ফিরিলেন তখন পিপীলিকা তাঁহার পা বাহিয়া হাঁটুতে উঠিয়াছে। তিনি হাত দিয়া তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পিপীলিকা তখন লাল সিমেণ্ট বাঁধানো ঘরের মেঝের উপর পড়িল। সেখান হইতে সে একটি টেবিলের নিকট উপনীত হইল। টেবিলের পায়া বাহিয়া সে সবুজ অয়েল-ক্লথ-মোড়া টেবিলে আরোহণ করিল। টেবিলের উপর একটু আগে খানিকটা দুধ পড়িয়া গিয়া নানা ধারায় বহিয়া যাইতেছিল। টেবিলের উপর একটি বড় কাচপাত্রে খানিকটা মধুও ছিল।

শিল্পী

অহির সহিত নকুলের অথবা ঘাসের সহিত ছাগলের বন্ধুত্ব আছে ইহা কল্পনা করা কঠিন। জিতুবাবুর সহিত কিন্তু পানুর বন্ধুত্ব ছিল, যদিও তাহাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। জিতুবাবু সুদখোর মহাজন আর পানু তাঁহার কবলস্থ খাতক। উভয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই ছিল না, চেহারারও নয়, বয়সেরও নয়। জিতুবাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি, পানুর বয়স চল্লিশের নিচে। জিতুবাবু কালো, বেঁটে এবং ঈষৎ কুঁজো, সামনের দিকে ঝুঁকিয়া থাকেন, সোজা দাঁড়াইতে পারেন না। পানু ছিপছিপে লম্বা, উন্নত-মস্তক এবং সুদর্শন। মতেরও কিছুমাত্র মিল নাই। জিতুবাবু সুদখোর মহাজন, অর্থসঞ্চয় করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য এবং আনন্দ। পানু চিত্রকর, ছবি আঁকিয়া আনন্দ পায়, রং আর তুলি লইয়া খেলা করে এবং পয়সা পাইলেই উড়াইয়া দেয়। তবু দুইজনের বন্ধুত্ব আছে এবং তাহাকে প্রগাঢ় বিশেষণে ভূষিত করিলেও মিথ্যাভাষণ হয় না। জিতুবাবু কখনও যাহা করেন না, পানুর ক্ষেত্রে তাহা করেন অর্থাৎ বিনা সুদে, বিনা হ্যাণ্ডনোটে তাহাকে টাকা দেন। আর পানুও কখনও যাহা করে না, জিতুবাবুর ক্ষেত্রে তাহা করে—অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি মতো ঠিক দিনে ঋণটি পরিশোধ করিয়া দেয়। দুই চারিদিন পরে আবার তাহাকে জিতুবাবুর নিকট হাত পাতিতে হয়, জিতুবাবুও পুনরায় টাকা দিতে আপত্তি করেন না। এইভাবেই বহুকাল হইতে চলিতেছে। জিতুবাবুর ধারণা, পানু একটা লক্ষ্মীছাড়া, পানুর ধারণা জিতুবাবু লোকটি স্বল্পবুদ্ধি জানোয়ার বিশেষ। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুকম্পাশীল, অথচ বন্ধুত্বও খুব।

সেদিন জিতুবাবু পানুর ঘরে ঢুকিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার আনন ঈষৎ ব্যায়ত হইয়া গেল। জিতুবাবু নিঃশব্দ চরণে প্রবেশ করিয়াছিলেন, পানু টের পায় নাই। সে পিছন ফিরিয়া ছবি আঁকিতেছিল। কুব্জ জিতুবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরবে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর কথা কহিলেন।

"ওটা কি আঁকছ, পেত্নীর ছবি না কি—"

পানু ঘাড় ফিরাইয়া মৃদু হাসিল।

"আর একটু দূর থেকে দেখুন, তা' হলে বুঝতে পারবেন।"

জিতুবাবু একটু পিছাইয়া গেলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আর একবার দেখিয়া বলিলেন, "হুঁটকো কালো মেয়েমানুষ একটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে রয়েছে। এই তো? বুকের কাছটা কি বিশ্রী করেছ, এ যে অশ্লীল একেবারে হে! দাঁত বার করে হাসছে আবার! এই ছবি বাজারে বার করবে না কি?"

"বহরমপুরের এক জমিদার হাজার টাকা দিয়ে কিনেছেন ছবিটা।"

"বল কি! হাজার টাকা! পেয়েছ টাকাটা?"

"না পাইনি এখনও। ছবি যেদিন নেবেন সেইদিনই টাকাটা দেবেন বলে গেছেন।"

"ও—"

জিতুবাবু কপালের উপর বাম হাতটা রাখিয়া পুনরায় ছবিটি দেখিলেন। তাহার পর মন্তব্য করিলেন, "আমার বিশ্বাস তিনি আর আসবেন না। বদ্ধ পাগল না হলে এ ছবি পয়সা দিয়ে কেউ কেনে না। মেয়েমানুষই যদি আঁকলে একটা ভদ্র চেহারা আঁকলে না কেন। এই হুঁটকো মেয়ে আঁকবার কল্পনা তোমার হল কি করে—?"

পানু ক্ষণকাল স্মিতমুখে জিতুবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর প্রশ্ন করিল—"কালিদাস কে জানেন?—"

"জানি বই কি। ব্যাংকের সেই কেরানী ছোক্‌রা তো—"

"না, আমি কবি কালিদাসের কথা বলছি।"

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—শুনেছি নামটা।"

"তাঁর মেঘদূতের সঙ্গে যদি পরিচয় থাকত তাহলে বুঝতে পারতেন ছবির মানেটা—"

"কি রকম—"

"তাতে কবি যক্ষ-প্রিয়ার যে বর্ণনাটা দিয়েছেন তা অনেকটা এই রকম—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি
মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ ॥
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ—"

জিতুবাবু ঈষৎ ব্যায়ত আননে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত বিখ্যাত শ্লোকটির আবৃত্তি

শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, ছোক্‌রার গুণ আছে অনেক। এই সব কারণেই পান্নুকে ভালবাসেন তিনি।

"শ্লোকের মানে কি ?—"

"যক্ষ-প্রিয়ার চেহারা কেমন ? না, তিনি তন্বী, মানে ছিপছিপে, আপনার ভাষায় সুঁটকো, শ্যামা কিনা শ্যামাঙ্গিনী, শিখরিদশনা মানে যার দাঁতের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি মানে যার নীচের ঠোঁট পাকা তেলাকুচো ফলের মতো, মধ্যে ক্ষামা, যার কোমর খুব সরু, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা—যার চোখ দুটি চকিতহরিণীর মতো, নিম্ননাভিঃ—যার নাভিদেশ খুব গভীর, শ্রোণীভারাদলসগমনা—যিনি নিতম্বের ভারে আস্তে আস্তে চলেন, স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং—স্তনের ভারে যিনি ঈষৎ অবনত—"

জিতুবাবু হাত তুলিয়া পান্নুকে থামাইয়া দিলেন।

"হয়েছে হয়েছে থাম। আমি তো গোড়াতেই বলেছিলাম—পেত্নী! —কবি কালিদাস না হয় সংস্কৃতে বলেছেন যক্ষ-প্রিয়া। যক্ষ মানে ভূত! যাক—আমি যেজন্য এসেছিলাম বলি। টাকাটা সোমবার দিতে পারবে ?"

"আমার তো টাকা দেবার কথা বুধবার—"

"তা জানি। কিন্তু সোমবার পেলে আমার ভাল হত!"

"আপনি তো ব্যাংকে জমা দেবেন ? বুধবারেই দেবেন না হয়, সেদিনও তো ব্যাংক খোলা—"

"ব্যাংকে জমা দেব না। অন্য কাজ আছে—"

"কেন আমাকে মিছে ধাপ্পা দিচ্ছেন। আমি জানি এ টাকা আপনি একটিও খরচ করেন না, সব জমা দেন—"

জিতুবাবুও হাসিয়া ফেলিলেন।

"না খরচ করব না। তবে ব্যাংকেও পাঠাব না—"

"পুঁতবেন না কি ?"

জিতুবাবু বিস্মিত হইয়া গেলেন।

"কি করে জানলে তুমি ?"

"আন্দাজ করলুম—"

"কথাটা ঘুণাক্ষরে যেন প্রকাশ না পায় ভাই। ইন্‌কাম্ ট্যাক্সের যে রকম ব্যাপার

ব্যাংকের অ্যাকাউণ্ট দেখতে চায়। তাই ভেবেছি যে-সব টাকার খবর খাতায় নেই সেগুলো পুঁতে রাখব।"

"বেশ, বুধবারেই পুঁতবেন—"

"সোমবার ভাল দিন। আমি দু' তিনজনকে দিয়ে পাঁজি দেখিয়েছি। মাত্র একশোটা টাকা তো—দিয়ে দিও ভাই"।

"আমার কাছে এক কপর্দকও নেই এখন। বহরমপুরের জমিদার মঙ্গলবার লোক পাঠাবেন বলে গেছেন, সেইদিনই না হয় টাকাটা দিয়ে দেব আপনাকে সন্ধ্যাবেলা—"

"না, সোমবার সকালে আমার চাই। দিও বুঝলে—"

জিতুবাবু পানুর হাত দুইটি ধরিয়া ফেলিলেন।

পানু স্মিতমুখে বিপন্ন জিতুবাবুর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া ফেলিল। কি অসহায় জীব!

"বেশ, চেষ্টা করব—"

"চেষ্টা নয়, চাই-ই সেদিন!"

"বেশ—"

শুক্রবার সকালে পানু এক ঝুড়ি লিচু লইয়া জিতুবাবুর বাসায় হাজির হইল। হাতে একটি পাঁজি। পাঁজি খুলিয়া পানু বলিল, "আজও দিন ভাল, এই দেখুন। শিবু ভট্চাজ দেখে দিয়েছে—"

"সোমবার দিন তো আমি কাজ চুকিয়ে ফেলেছি। আর ভাল দিন দেখে কি হবে!"

পানু হাসিয়া বলিল—"আমি সেদিন আপনাকে যে একশ' টাকার নোটটা দিয়েছিলাম সেটা বার করে এই টাকাগুলো সেখানে রেখে দিন—"

"কেন?"

"সে নোটটা জাল ছিল। আমি এঁকে দিয়েছিলাম। আপনি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করেন, কিন্তু আপনার চোখে ধুলো দেওয়া কত সহজ দেখুন। এই নিন —একশ' টাকার কয়েন—"

গণিয়া গণিয়া টাকাগুলি জিতুবাবুর সম্মুখে রাখিয়া পানু বলিল, "আপনি লিচু ভালবাসেন তাই আপনার জন্য কিছু লিচু কিনে নিয়ে এলাম। আপনার

জন্যে খুব ভাল একটা স্টীল-বক্সেরও অর্ডার দিয়েছি। কাল নাগাদ পেয়ে যাবেন—”

জিতুবাবু বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন।

“এ সব বলছ কি তুমি ?”

“ঠিকই বলছি। বহরমপুরের জমিদার মঙ্গলবার দিন এসে ছবিটা নিয়ে গেছেন। আমি বুধবারেই আসতাম, কিন্তু শিবু ভট্‌চাজ বললে বুধ বৃহস্পতি দুটো দিনই খারাপ। তাই আজ এসেছি, আজ দিন ভালো। নোটটা আমাকে বার করে দিন—”

“হাজার টাকা দিয়ে ছবিটা কিনে নিয়ে গেল ?”

“হ্যাঁ। আগামী সপ্তাহে কিন্তু আমার কিছু চাই। বেশী নয় গোটা পঞ্চাশেক—”

“হাজার টাকা তো পেয়েছ—?”

“সব ফুঁকে দিয়েছি—”

পানুর চোখের দৃষ্টিতে হাসি ঝলমল করিতে লাগিল।

রূপান্তর

দৈত্যটিকে দেখে আমি মোটেই ভয় পেলাম না, বরং খুশীই হলাম। দৈত্য আমার দিকে খানিকক্ষণ হাসিমুখে চেয়ে রইল, তারপর বলল, "আমি সর্বশক্তিমান, তোমার কি চাই বল—?"

"একটি চাকরি—"

"কি রকম চাকরি ?"

"ভালো চাকরি—"

"বেশ, তাহলে তুমি এইখানে অপেক্ষা কর। আমি একটু ঘুরে আসি"

প্রকাণ্ড দৈত্য লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে' গেল। আমি চুপ করে' বসে' রইলাম। দৈত্যটির গগনচুম্বী শির, তালগাছের মতো প্রকাণ্ড চেহারা, প্রকাণ্ড বড় বড় চোখ দেখে আমি বসে' বসে' আশা করতে লাগলাম, এতবড় শক্তিমান পুরুষ নিশ্চয়ই আমার জন্যে ভাল চাকরি যোগাড় করতে পারবেন একটা।

কিছুক্ষণ পরে দৈত্য ফিরল। তার বগলে প্রচুর কাগজ, হাতে একটা ফাউণ্টেন পেন।

"দরখাস্ত লেখ"

"কোথায় দরখাস্ত লিখতে হবে ?"

"ঠিকানা এনেছি"

কয়েকটি খবরের কাগজ আমার সামনে ফেলে দিয়ে দৈত্য বললে—"এগুলোর মধ্যে অনেক চাকরির খবর আছে। সব জায়গায় দরখাস্ত করে দাও। তারপর আমি ওগুলো নিয়ে টাইপ করিয়ে যেখানে যেখানে দেবার দিয়ে আসব।"

পঁচিশখানা দরখাস্ত লিখে দৈত্যের হাতে দিলাম। দৈত্য চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে যখন সে আবার ফিরল তখন বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। দৈত্য আর দৈত্য নেই, বামন হয়ে গেছে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে সে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"কি হল—?"

কোনও কথা বললে না, দু'হাতের বুড়ো আঙুল নাড়তে লাগল শুধু।

"আপনি এত ছোট হয়ে গেলেন কি করে ?"

"অপমানে! আগে বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝছি চাকরি দেবার যাঁরা মালিক তাঁরা আমার চেয়েও ঢের বেশী শক্তিমান"

"আমার গতি তাহলে কি হবে?"

"গতি করেছি একটা"

বামন পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একটু ইশারা করতেই একটি ভদ্রলোক শূন্য থেকে আবির্ভূত হলেন।

"এঁর একটি সুন্দরী বয়স্থা মেয়ে আছে। তাকে তুমি বিয়ে কর। ইনি তোমাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পণ দেবেন। সেই টাকা দিয়ে ছোটখাটো ব্যবসা কর একটা—"

এই বলে বামন অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পূর্বে যার ললাট গগন স্পর্শ করেছিল, দেখতে দেখতে শূন্যে মিলিয়ে গেল সে।

বামনের আদেশ অমান্য করিনি। এই যে মনোহারী দোকানটি দেখছেন এটি আমার শ্বশুর মশায়ের টাকাতেই করেছি।

দৈত্য আর বামনের কথা শুনে আপনারা হয়তো অবিশ্বাসের হাসি হাসছেন, ভাবছেন হয়তো গাঁজা-টাজা খাই।

না, সে সব কিছু নয়। জ্ঞান-সমুদ্রে আমি যে জালটি ফেলেছিলাম তাতে একটি কলসী উঠেছিল, আর সে কলসীর ভিতর ছিল ওই দৈত্যটি! কলসীটির নাম ডিগ্রি আর দৈত্যটির নাম অহমিকা। আরব্য উপন্যাসে এই কাহিনীরই আপনারা যে রূপ দেখেছেন, এ গল্পে সে রূপ নেই। থাকবে কি করে? আমি তো আরবী নই, আমি বাঙালী; আর দেশটাও আরব নয়, ভারতবর্ষ।

প্রারব্ধ

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, বিশ্বম্ভর তখনও আপিস হইতে ফিরিল না। পত্নী দুর্গামণি খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার পাশেই শুইয়া ছিল। পাশের বাড়ির ঘড়িতে দশটা বাজার শব্দে উঠিয়া বসিল। এখনও উনি আপিস হইতে ফিরিলেন না কেন? বিশ্বম্ভর ব্যাংকে কাজ করে, আপিস হইতে ফিরিতে তাঁহার একটু দেরি-ই হয়, কিন্তু এতো দেরি তো কোনদিন হয় না। ইহার পর দুর্গামণির মনে পড়িল ও-বেলার রাঁধা ভাত ডাল তরকারি খারাপ হইয়া গেল না তো! চাল ডাল ফুরাইয়াছে, এবেলা তাই সে রাঁধিতে পারে নাই। বাজার করিতে গিয়াই কি উনি এত দেরি করিতেছেন? কিন্তু আজ তো মাহিনা পাইবার দিন নয়, কাল মুদির দোকান হইতে ধারেই জিনিসপত্র কিনিয়া দিবেন বলিয়া গিয়াছেন, এত রাত্রে কি মুদির দোকান খোলা আছে? এই ধরনের নানা চিন্তা দুর্গামণির মনে জাগিতে লাগিল। তাহার পর মনে পড়িল এ মাসে কাপড়ও কিনিতে হইবে। একটা মশারি কিনিলেও ভালো হয়, যে মশারিটা আছে তাহা বড়ই পুরাতন হইয়া গিয়াছে, একটু টান পড়িলেই ছিঁড়িয়া যায়, তালির পর তালি পড়িয়াছে, আর কত তালি দেওয়া যায়, দিয়া লাভও নাই, ঠিক তালির পাশটিতেই ছিঁড়িয়া যায় আবার। তাহার পর মনে পড়িল দুই মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকি পড়িয়াছে। বাড়ি-ওলা প্রত্যহ আসিতেছে। সেমিজ ছিঁড়িয়াছে, বালিশের ওয়াড় নাই। এসব কথা স্বামীর কাছে বলিতেও তাহার সঙ্কোচ হয়। মাত্র পঁচাত্তর টাকা তো মাহিনা। আগে কিছু বাঁচিত কিন্তু খোকা হওয়ার পর খরচ বাড়িয়াছে। দুধের রোজ করিতে হইয়াছে, টুকিটাকি নানা জিনিসও কিনিতে হয়। উনি সংসারের ন্যায্য খরচের বিষয় কৃপণ, কিন্তু খোকনের বেলায় দিলদরিয়া। সেদিন পট্ করিয়া গোটা দুই রঙীন ফ্রক কিনিয়া আনিয়াছেন, কিছুই দরকার ছিল না অথচ সমস্ত মাসের খরচ দুই সের ডাল তাহা প্রাণ ধরিয়া কিনিয়া দিতে পারেন না। বলেন দেড় সের হইলেই চলিয়া যাইবে। খোকনের বয়স তিনমাস হইতে না হইতেই তাহার জন্য একটি রঙীন ঝারা কিনিয়া আনিয়াছিলেন, নগদ দুই টাকা খরচ করিয়া! এমনি নানা কথা মনে পড়িতে লাগিল দুর্গামণির। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে আবার খোকনের পাশে শুইয়া পড়িল।

…বিশ্বম্ভর ফিরিল রাত্রি বারোটার পর। দুর্গামণি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

"তুমি কি ক'রে এলে, সদর দরজা তো বন্ধ!"

"চুপ! আমি জানলা গ'লে ঢুকেছি!"

"কেন?"

"চেঁচিও না সব বলছি। এই নাও—"

বিশ্বম্ভর একটা কাগজের প্রকাণ্ড পুলিন্দা হাতে দিলেন।

"কি এতে?"

"টাকা। ত্রিশ হাজার টাকা—"

"ত্রিশ হাজার টাকা! কোথা পেলে?"

"কালই জানতে পারবে। আমি এখন চললুম। টাকাটা সাবধানে রেখ, লুকিয়ে রেখ। এই টাকা দিয়ে খোকনকে মানুষ কোরো, আমি হয়তো আর ফিরব না, ফিরতে পারব না। কিন্তু তোমরা সুখে আছ, টাকার অভাবে কষ্ট পাচ্ছ না, এ ধারণাটাকেই আঁকড়ে যেখানেই থাকি আমি সুখে থাকব। টাকাটা কিন্তু সাবধানে রেখ, আর পারো তো কালই বাপের বাড়ি পালিয়ে যেও—আমি চললুম। খোকন ঘুমুচ্ছে?—"

ঘুমন্ত খোকনকে বুকে তুলিয়া বিশ্বম্ভর চুম্বন করিল। দুর্গামণিকেও করিল। তাহার পর ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আবার ফিরিয়া আসিল।

"ভেবে দেখলাম তোমাদের এখানে থাকা ঠিক নয়। তোমরাও আমার সঙ্গে চল। তোমাকে বাপের বাড়িতে রেখে দিয়ে যাই। টাকাটা তা না হলে হয়তো বেহাত হ'য়ে যাবে। এখুনি হয়তো পুলিস এসে পড়বে।"

পরদিন জানা গেল ব্যাংকের খাজাঞ্চিকে হত্যা করিয়া বিশ্বম্ভর ত্রিশ হাজার টাকা অপহরণ করিয়াছে। যথারীতি পুলিস তদন্ত করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর কিন্তু ধরা পড়িল না। পুলিস বিশ্বম্ভরের শ্বশুরবাড়িতে গিয়াও হানা দিয়াছিল, কিন্তু দুর্গামণির নিকট হইতে কোনও কথা বাহির করিতে পারে নাই। দুর্গামণি বলিয়াছিল বিশ্বম্ভর তাহাদের সেই রাত্রেই এখানে জোর করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। কেন, কি বৃত্তান্ত কিছুই বলে নাই। সেই রাত্রেই বিশ্বম্ভর চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর ফেরে নাই, কোনও খবরও দেয় নাই।

পুলিস প্রশ্ন করিয়াছিল—"টাকার কথা কিছু জান?"

"না—"

বিশ্বম্ভর স্বহস্তে টাকাটা মাটির নিচে পুঁতিয়া দিয়া গিয়াছিল। কোথায় পুঁতিয়াছে তাহা অবশ্য দুর্গামণির অবিদিত ছিল না।

বিশ্বম্ভর রাত্রির অন্ধকারে হাঁটিতে লাগিল। হাঁটিতে হাঁটিতে সে অবশেষে খড়্গপুর স্টেশনে পৌঁছিল। শুনিল একটু পরেই নাকি মাদ্রাজ মেল আসিবে। মাদ্রাজেরই একটা টিকিট কাটিয়া সে মাদ্রাজ মেলে চড়িয়া বসিল। মাদ্রাজে পৌঁছিয়া সে বেশ পরিবর্তন করিয়া কুলি সাজিল। কিছুদিন কুলি-গিরি করিয়াই কাটাইল। তাহার পর একটা মিলে কিছুদিন কাজ করিল। রিক্‌শা টানিল কিছুদিন। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর আসিল গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন। একজন নেতা দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য 'ভাড়া-করা' ভলান্টিয়ার নিযুক্ত করিতেছিলেন। বেশী মজুরির লোভে বিশ্বম্ভর কিছুদিন ভলান্টিয়ারিও করিল। কিন্তু বেশীদিন করিতে সাহস করিল না, মনে হইল পুলিসের সংস্রব এড়াইয়া চলাই ভালো। একটা হোটেলে কিছুদিন কাজ করিল, নানারকম রান্না শিখিল। তাহার পর একটা সাহেবের খানসামা হইয়া গেল। সাহেবের সিংহলে নারিকেলের ব্যবসা ছিল, মাদ্রাজ হইতে তিনি সিংহলে গেলেন। বিশ্বম্ভরও তাঁহার সহিত গেল। সাহেবের নারিকেল ব্যবসায় সিংহলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিয়ো প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জেও বিস্তৃত কারবার ছিল তাঁহার। বিশ্বম্ভর তাঁহার ভৃত্য-রূপে সর্বত্র ভ্রমণ করিল। তাহার আচার-ব্যবহার, বেশ-বাস, ভাব-ভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন ঘটিল, পূর্বপরিচিত অনেক কিছুই সে ভুলিয়া গেল, কিন্তু দুর্গামণি ও খোকনকে এক নিমেষের জন্য ভুলিল না। তাহারা যে সুখে আছে, অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে না, এই ধারণায় মশগুল হইয়া সে সর্বপ্রকার দুঃখকে তুচ্ছ করিতে লাগিল।

প্রায় ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যে সাহেবের অধীনে বিশ্বম্ভর চাকরি করিতেছিল সে সাহেবও আর বাঁচিয়া নাই। বিশ্বম্ভরের কর্ম-তৎপরতায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বিশ্বম্ভরকে তাঁহার একটা কুঠির ম্যানেজার পদে উন্নীত করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বম্ভরের আজ অর্থাভাব ঘুচিয়াছে। তাঁহার ব্যাংকে বেশ কিছু টাকা জমিয়াছে।

হঠাৎ কিন্তু একদিন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। মানসিক বিপর্যয়। বিশ্বম্ভরের মনে হইল সে নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্য প্রচুর অর্থ রাখিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু যে নিরীহ খাজাঞ্চিকে হত্যা করিয়া সে টাকাটা সংগ্রহ করিয়াছিল তাহার পরিবারের জন্য সে তো কিছুই করে নাই! খাজাঞ্চি লোক খারাপ ছিল না, তাহার বিস্ফারিত চক্ষু যুগল, রক্তাক্ত দেহটা বিশ্বম্ভরের মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। হাতুড়ির এক আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল, সে ভালো করিয়া আর্তনাদও করিতে পারে নাই। সে-ই হয়তো পরিবারের একমাত্র ভরসা-স্থল ছিল···চিন্তাটা ক্রমশ তাহাকে পাইয়া বসিল। সে অস্থির হইয়া উঠিল, তাহার আশঙ্কা হইতে লাগিল এই পাপের ফলে দুর্গামণি এবং খোকনও হয়তো কষ্ট পাইতেছে। টাকা পাইয়াও হয়তো কিছু সুবিধা হয় নাই, হয়তো পুলিসে টের পাইয়াছে, হয়তো চোরে বা ডাকাতে চুরি করিয়া লইয়াছে···। বিশ্বম্ভর বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে লাগিল। অবশেষে সে ঠিক করিল দেশে ফিরিবে, খাজাঞ্চির খোঁজ করিয়া, তাহার পরিবারবর্গকে কিছু অর্থ দিয়া আসিবে। সম্ভব হইলে দুর্গামণি ও খোকনের খবরও লইবে।

বিশ্বম্ভর দেশে ফিরিয়া প্রথমে খাজাঞ্চিরই খোঁজ করিল। শুনিল তাহার একটি পুত্র এক সওদাগরী অফিসে চাকরি করে। ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া সে তাহাদের বাসায় গিয়া হাজির হইল। বলিল, "আমি আপনাকে কিছু টাকা দিতে এসেছি। বিশ্বম্ভরবাবু টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন—"

"বিশ্বম্ভরবাবু কে!"

"যিনি আপনার বাবাকে খুন করেছিলেন—"

"ও! কোথায় তিনি?"

"মারা গেছেন। আমাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন, বলে' গেছেন আমি যেন টাকাটা আপনাকে দিয়ে দিই—"

"আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল কি করে?"

"সিলোনে আমরা একসঙ্গে ছিলাম।"

"ও, আচ্ছা। সন্ধ্যাবেলা আসবেন, তখনই টাকা নেব। এখন আমি একটু দরকারে বাইরে বেরুচ্ছি—"

বিশ্বম্ভর ভাবিয়াছিল ছেলেটির চোখে সে ধূলা দিতে পারিয়াছে। সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া কিন্তু তাহার ভুল ভাঙিল। ছেলেটি পুলিশে খবর দিয়াছিল।

ঘরে ঢুকিতেই তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। বিশ্বম্ভর আর স্ত্রী-পুত্রের সন্ধান লইবার সময় পাইল না।

বিচারে বিশ্বম্ভরের ফাঁসি হইয়া গেল।

একটি খবর জানিতে পারিলে বিশ্বম্ভরের মনোভাব কি হইত তাহা জানি না। হয়তো হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিত, কিংবা অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে বিস্মিত হইত। যে বিচারক তাহার ফাঁসির হুকুম দিল সে তাহার খোকন। যে অর্থ সে রাখিয়া গিয়াছিল সেই অর্থে-ই সুশিক্ষিত হইয়া বিলাত হইতে আই. সি. এস. পাস করিয়া খোকন জজ হইয়াছিল।

চুনোপুঁটি

পাঁচ বৎসর পরে পুঁটি দেশে ফিরিতেছে। দেশ মানে, মোহনপুর গ্রাম। এই মোহনপুর হইতে পুঁটিকে একদা পলায়ন করিতে হইয়াছিল। সে চুরি কিংবা খুন করে নাই, বস্তুত পিনাল কোডের কোনও ধারাই তাহার গ্রাম-ত্যাগের হেতু ছিল না। অপরাধ—সে কালো। তদুপরি পিতৃহীন এবং দরিদ্র। শতাধিক লোক তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহাকে বধূরূপে নির্বাচন করিবার প্রেরণা পায় নাই। পুঁটির বিধবা মা একজনের পায়ে পর্যন্ত ধরিয়াছিলেন, তবু তাহার মন গলে নাই। শরৎবাবুর 'অরক্ষণীয়া' গল্পেরই পুনরাবৃত্তি চলিতেছিল। এক্ষেত্রেও একজন বড়লোকের ছেলে ছিল। গ্রামেরই একজন ধনী মহাজনের পুত্র, ধীরেশ। পালটি ঘর বলিয়া পুঁটির মা সসঙ্কোচে একদিন তাহার নিকট কথাটা পাড়িয়াছিলেন। ধীরেশ তাহার প্রিয় বন্ধু কদমের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, পুঁটির বিধবা মা পুকুরে জল আনিতে যাইতেছিলেন। সুযোগ দেখিয়া পুঁটির মা কথাটা তাহার কাছে পাড়েন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, ধীরেশ যদি আশ্বাস দেয় তাহা হইলে তাহার বাবার পায়ে গিয়া আছড়াইয়া পড়িবেন। কথাটা শুনিয়া ধীরেশ কয়েক মুহূর্ত ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছোকরা বি. এসসি পর্যন্ত পড়িয়াছিল।

হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"নেপচুনের নাম শুনেছেন?"

"নেপচুন? না। নেপালের নাম শুনেছি। ও হ্যাঁ, আমাদের ফুলুর খোঁড়া ছেলের নাম নেংচু রেখেছিল, তার কথাই বলছ কি, ওরা তো এখানে নেই—"

কদম বলিল—"ও কথা ছেড়ে দিন মাসীমা। ধীরুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এক জায়গায়—"

"ও, তাতো জানতুম না বাবা। আমার পুঁটির জন্যে একটি পাত্র দেখে দাও না বাবা তোমরা—"

"চেষ্টা করব।"

পুঁটির মা চলিয়া গেলে কদম জিজ্ঞাসা করিল।

"হঠাৎ নেপচুনের কথা ওঁকে জিগ্যেস করলে কেন?"

"বামন হয়ে চাঁদে হাত কথাটা প্রচলিত আছে। কিন্তু বামন হয়ে নেপচুনে হাত দিতে চাইছেন উনি। সেই কথাটাই ওঁকে বুঝিয়ে দিতে চাইছিলাম—"

"কল্পনা বটে তোমার—"

কদম মুগ্ধ দৃষ্টিতে ধীরেশের দিকে চাহিয়া রহিল। ধীরেশ বলিল, "মেয়েটার রং যদি আর একটু ফরসা হ'ত তাহলেও ভেবে দেখতাম। মুখ চোখ গড়ন ভালই, কি বলিস—"

কদম বাম চক্ষুটি কুঞ্চিত করিয়া মনোভাব প্রকাশ করিল।

ইহার পর হইতে পুঁটির বাড়ির চারিদিকে গ্রামের যুবকদের আনাগোনা শুরু হইয়া গেল। কেহ 'সিটি' দিত, কেহ বাঁশী বাজাইত, কেহ কেহবা জটলা করিত।

পুঁটির মা অবশেষে পুঁটিকে লইয়া গভীর রাত্রিতে একদিন গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কাহাকেও বলিয়া গেলেন না, কোথায় যাইতেছেন।

পাঁচ বৎসর পরে পুঁটি তাহাদের জ্ঞাতিপুত্র চঞ্চলকুমারকে জানাইয়াছে যে, সে তাহার স্বামীর সহিত মোহনপুরে আসিতেছে। চঞ্চলকুমার যেন তাহার বাড়িটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইয়া রাখে। ইহার জন্য সে দুইশত টাকা টেলিগ্রাফিক মনি-অর্ডার যোগে পাঠাইয়াও দিয়াছে।

সকলে অবাক হইয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে পুঁটি ও তাহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। পুঁটির সাজসজ্জা রাণীর মতো। সঙ্গে তিনজন চাকর, দুইজন ঝি। পুঁটির স্বামী অনিন্দ্যকান্তি, ঠিক যেন রাজপুত্র! চোখ ধাঁধিয়া গেল সকলের। পুঁটি বলিল, "বছর খানেক আগে মা মারা গিয়েছেন। তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিল বাৎসরিক শ্রাদ্ধের পর গ্রামের লোকদের ভাল করে খাওয়াতে। সেই জন্তেই বিশেষ ক'রে এসেছি আমরা—"

বিরাট আয়োজন করিয়া বিরাট ভোজের আয়োজন করিল সে। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা, আপামরচণ্ডাল, ইতর ভদ্র কেহই বাদ গেল না। গরীব দুঃখীদের কাপড় দিল, পয়সা দিল। গ্রামের স্কুলে, মন্দিরে মোটা টাকা চাঁদা দিল। ধীরেশ এবং কদমেরও তাক লাগিয়া গেল। গরীব দুঃখীরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

গ্রামের পাড়াপড়শীরা যাহারা পূর্বে পুঁটির রূপ লইয়া কত ঠাট্টা, কত বিদ্রূপ করিত, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া শতমুখে পুঁটির রূপের এবং ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লজ্জাবোধ করিল না। পুঁটির স্বামীকে লইয়া গ্রামের ছোকরারা উন্মত্ত হইয়া উঠিল। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, যেমন ধনী, তেমনি দিলদরিয়া মেজাজ। চাহিতে না চাহিতে গ্রামের ফুটবল ক্লাবে, শখের থিয়েটারে, হরিসভায় ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া চাঁদা দিল। সকলের সহিত একদিন থিয়েটারও করিল। গানের কি গলা!

দুই সপ্তাহ মোহনপুরকে মাতাইয়া অবশেষে বিদায় লইল তাহারা।

বর্ধমান স্টেশন।

পুঁটি বলিল, "চুনো-দা এইখানেই নামবে?"

"হ্যাঁ। টাকাটা দিয়ে দাও—"

"দিচ্ছি। দুশো টাকাই নেবে?"

"বাঃ, তাই তো কথা হয়েছিল—"

"বেশ নাও"—

টাকাটা বাহির করিয়া দিল। তাহার পর বলিল, "কেমন যেন স্বপ্নের মতো পনেরটা দিন কেটে গেল! আহা, যদি সত্য হত—"

"স্বপ্ন কখনও সত্যি হয়? চললুম, আবার স্টুডিওতে দেখা হবে—"

চুনো-দা—ওরফে চুনীলাল নামিয়া গেল।

চুনীলাল এবং পুঁটি উভয়েই অভিনেতা অভিনেত্রী। মায়ের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য পুঁটি চুনীলালসহ গ্রামে গিয়া স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করিয়া আসিল।

ট্রেন চলিতেছে। প্রথম শ্রেণীর কামারায় খোলা জানলার সামনে দিগন্তের দিকে চাহিয়া পুঁটি একা বসিয়া আছে। মাথার চুল উড়িতেছে, শাড়িটা এলোমেলো হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই, নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে সে।

অনেক টাকা রোজগার করিয়াছে সে। বাড়ি গাড়ি সব হইয়াছে। অনেক শাড়ি, অনেক জামা, অনেক গহনা কিনিয়াছে, অনেক লোক তাহার পিছু-পিছু ঘোরে। কিন্তু—

সহসা তাহার চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

ভদ্রলোক

ভদ্রলোকের বিবেকেই গলদ ছিল, তাহার উপর ট্রেনটা ছিল লেট্। তিনি হাওড়া স্টেশনে নামিয়া ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রয়োজন ছিল না, তবু আরও কয়েক সেকেণ্ড ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঘড়িটার দিকেই চাহিয়া রহিলেন। ঘড়ি কোন সান্ত্বনা দিল না। প্ল্যাট্‌ফর্মের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চাহিয়া দেখিলেন, কেহই আসে নাই। একটু আরাম বোধ করিলেন। ভদ্রলোকের সহিত মুখোমুখি হইয়া গেলে একটু অপ্রস্তুত হইতে হইত। ভদ্রলোক আর একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। স্টেশনে না আসিবার অসংখ্য কারণ থাকিতে পারে—ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত নিশ্চয়ই নয়, হইতেই পারে না, কিন্তু যতীনবাবুকে স্টেশনে অনুপস্থিত দেখিয়া তিনি বেশ একটু আরাম বোধ করিলেন। কারণ তাঁহার বিবেকে একটু গলদ ছিল। বিবেকে যে গলদ আছে, তাঁহার আচরণ যে অশোভন হইতেছে, এতকাল তিনি যাহা ভাবিয়াছেন, লিখিয়াছেন, কার্যকালে যে ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছেন, একথা যতীনবাবু নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন! চিঠিতে অবশ্য সে কথার আভাস পর্যন্ত দেন নাই, বুদ্ধিমান লোক তো, কিন্তু মনে মনে হাসিয়াছেন নিশ্চয়ই। আবার তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, গৃহিণীর উপর রাগ হইল। উহারই প্ররোচনায় তিনি এই অপকর্মটি করিতে রাজি হইয়াছেন! সহধর্মিণী! হঠাৎ তাঁহার অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল 'কচু'! যে কুলিটি তাঁহার সুটকেসটি নামাইয়াছিল সে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। কান দুইটি লাল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "আমাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দাও—"

কুলি বলিল, "ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না।"

"কেন?"

"রাত হয়েছে। এত রাত্রে ট্যাক্সি আজকাল থাকে না। তার উপর হাল্লা হয়েছে মেছুয়াবাজারে একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে নাকি—সব ভেগেছে তাই।"

"রায়ট?"

"ঠিক জানিনা। রিক্‌শা, ঘোড়াগাড়ি পাবেন—"

ভদ্রলোকের ভ্রূযুগল আর একবার কুঞ্চিত হইল। ভাবিলেন, এই ওজুহাতে ফিরিয়া গেলে কেমন হয়!

"সাহেবগঞ্জে ফেরার ট্রেন কখন?"

"সকালের আগে কোনও ট্রেন নেই" অর্থাৎ সমস্ত রাত স্টেশনে বসিয়া থাকিতে হইবে। সহধর্মিণী দাক্ষায়ণীর মুখটাও মনে পড়িল। ভারী মাংসল মুখ। ভদ্রলোক মত পরিবর্তন করিলেন। দাঙ্গা বা যুদ্ধ যা-ই হোক, হাওড়া পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া চলিবে না। গেলে দাম্পত্য-সৌধ-শীর্ষে বজ্রপাত হইবে। যদিও লাইট্‌নিং কণ্ডাক্‌টার আছে, ভিত্তিও বেশ মজবুত, তবু ভদ্রলোক সাহস করিলেন না।

কুলিটি তাঁহাকে একটি ঘোড়ার গাড়িতেই তুলিয়া দিল। গাড়োয়ান প্রথমে কিছু বলে নাই, কিন্তু কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোড জাংশানে গাড়োয়ানী ভাষায় ব্যক্ত করিল যে, সে শ্যামবাজার অভিমুখে যাইবে না, কারণ তাহার ঘোড়া দুইটি ক্ষুধার্ত এবং পিপাসার্ত হইয়াছে। সে তাহাদের এইবার বউবাজারে অবস্থিত আস্তাবলে লইয়া যাইতে চায়।

ভদ্রলোক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর নামিয়া পড়িলেন। ঘোড়ার দুঃখে বিগলিত হইয়া নয়, একটি রিক্‌শা দেখিয়া। নিজের শক্তি সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন, রাতদুপুরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া গাড়োয়ানের সহিত বচসা করা যে তাঁহার সাধ্যাতীত ইহা তিনি জানিতেন, রিক্‌শাটা আসিয়া পড়াতে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া গাড়োয়ানের ভাড়া মিটাইয়া দিলেন। সোজা রিক্‌শায় উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রিক্‌শাওলাও তেমন যেন উৎসাহ দেখাইল না। সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভদ্রলোকের মুখে বেশ ঘন কাঁচা-পাকা চাপদাড়ি, গোঁফও বেশ ঝাঁকড়া, ভ্রূ-দুইটি যেন দুইটি শুঁয়োপোকা। মাথায় বাব্‌রি। চেহারাটা বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ-ছাগলের মতো। ইহার উপর ভদ্রলোকের পরিধানে মোটা খদ্দরের জামা কাপড়। রিক্‌শাওলার বিশেষ দোষ নাই।

"কোথা যাবেন?" রিক্‌শাওলা প্রশ্ন করিল।

"হেদোর ধারে নামিয়ে দিলেই হবে।"

সুযোগ বুঝিয়াই হোক বা তাঁহাকে এড়াইয়া যাইবার জন্যই হোক, রিক্‌শাওলা বলিল,—

"দেড় টাকা ভাড়া লাগবে বাবু!"

"তাই দেব, চল!"

ভদ্রলোক উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রিক্‌শাওলা হঠাৎ মত পরিবর্তন করিয়া ফেলিল।

"আমার অন্য একটা সোয়ারি আছে বাবু, হেতুয়া পর্যন্ত যেতে পারব না।"

বলিয়া সোজা শিয়ালদহের দিকে ছুট দিল। ভাগ্যি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা রিক্‌শা পাইয়া গেলেন, তাহা না হইলে একটু বিপদে পড়িতে হইত। দ্বিতীয় রিক্‌শাওলাটিকে দেখিয়া তিনি ভরসা পাইলেন। বেশ গম্ভীর লোক—আট আনা চাহিল।

কিছুদূর গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "এ অঞ্চলে কোন দাঙ্গা হয়েছে না কি?"

"মেছোবাজারে হয়েছিল একটা হাল্লা। কতকগুলো মাতালের কাণ্ড। এখন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে…"

ভদ্রলোকের সন্দেহ রহিল না যে, কিছু একটা ঘটিয়াছিল। তিনি রিক্‌শা হইতে অবতরণ করিয়া একটু মুশ্‌কিলে পড়িলেন। সুটকেশটি ফুটপাথে নামাইয়া বাড়ির দরজার কড়া নাড়িতে লাগিলেন। দরজা খুলিল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল রিক্‌শাওলাকে দিয়াই সুটকেসটি ভিতরে বহন করাইবেন। কিন্তু কয়েকবার কড়া নাড়িয়াও যখন উত্তর পাইলেন না, তখন রিক্‌শাওলাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। রিক্‌শাওলা চলিয়া গেলে বাড়ির নম্বরটি আর একবার ভাল করিয়া দেখিলেন। না, নম্বর ভুল হয় নাই। উপরের জানালা খুলিয়া গেল।

"কে?—"

"আমি।—"

"আমি কে? নাম বলুন—"

"যজ্ঞেশ্বর আইচ।"

"চি চান?"

"যতীনবাবুর সঙ্গে দেখা করব।"

পূর্বেই বলিয়াছি ভদ্রলোকের বিবেকে গলদ ছিল। যতীনবাবুর সহিত এইবার

অনিবার্যভাবে দেখা হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তাঁহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। তিনি একবার গলা খাঁকারি দিলেন। যে কোনও গলার আওয়াজ এমন কি নিজের গলার আওয়াজও বিপদের সময় মনে কিঞ্চিৎ বল-সঞ্চার করে। করিল। যতীনবাবুর সম্মুখীন হইবার জন্য সপ্রতিভতার ভান করিতে সক্ষম হইলেন। উপরের জানালা হইতে উত্তর আসিল—

"বাবা বাড়ি নেই।"

ভদ্রলোক একটু যেন আরাম বোধ করিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই সমস্যাটার অপর দিকটা মনে পড়াতে আবার একটু বিব্রতও হইলেন।

প্রশ্ন করিলেন—"তোমার মা কোথায় ?"—

"মাও বাবার সঙ্গে গেছেন।"

"কখন ফিরবেন ?—"

"তার ঠিক নেই। দু'তিনদিন দেরি হতে পারে। মামার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে গেছেন।"

"তুমি যতীনবাবুর কে হও ?"

"আমি তাঁর বড় মেয়ে। আমার কলেজ কামাই হবে বলে' আমাকে নিয়ে যাননি। আপনার কি দরকার বলে' যান, তিনি এলে তাঁকে বলব।"

"কপাটটা খোল তাহলে।"

"আপনাকে আমি চিনি না, কপাট খুলব কেমন করে ?..."

পাশের বাড়ির ছাদ হইতে কে একজন প্রশ্ন করিলেন, "বিজলী, কার সঙ্গে কথা কইচিস ?"—

"কি জানি আমি চিনি না। কপাট খুলতে বলছেন।"

"খবরদার খুলিস নি। দাঁড়া আমি দেখছি—"

হঠাৎ একটা টর্চের আলো ভদ্রলোকের মুখে পড়ল।

"ওরে বাবা, এ যে চাপদাড়ি। টম্! টম্!—"

পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড একটা অ্যাল্‌সেশিয়ান পাশের বাড়ির ছাদ হইতে উঁকি দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ট্যাক্সিও মোড় ঘুরিল। ভদ্রলোক আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"রোকো—"

উপরের জানালা হইতে শোনা গেল—

"বীরেন-দা, তোমার কুকুর ডেকে নাও। ছি, ছি, কি করছ তুমি—"

"যে রকম চেহারা। কিছু বলা যায় না—"

ট্যাক্সি চলিতে আরম্ভ করিল এবং ভদ্রলোক উহাদের কথাবার্তা আর শুনিতে পাইলেন না। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘর্মাক্ত কপালটিকে মুছিয়া ফেলিলেন।

দিন চারেক পরে যতীনবাবু যজ্ঞেশ্বর আইচের নিকট হইতে যে পত্রটি পাইলেন তাহা এই—

নমস্কারান্তে নিবেদন,

বিবাহের সময় মেয়েদের যে গরু ভেড়ার মতো করিয়া দেখা উচিত নয় এই মতবাদ আমি বহুকাল হইতেই পোষণ করিতেছি। তথাপি নিজের ভাবী পুত্রবধূকে ঘটা করিয়া দেখিতে গিয়াছিলাম। সমুচিত শিক্ষা হইয়াছে। আপনাকে একটি পোস্টকার্ড লিখিয়াছিলাম; বোধ হয় সেটি পান নাই। ভালই হইয়াছে, পাইলে হয়তো আপনি থাকিতেন এবং চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বিজলীর চুল, দাঁত, নখ, রং, চেহারা দেখিয়া, তাহার গান শুনিয়া, সে কি কি রান্না করিতে পারে তাহার ফর্দ লইয়া বিবেককে বলিদান দিয়া আসিতাম। আপনার হয়তো অসুস্থ আত্মীয়ের রোগশয্যাপার্শ্বে যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। পরমেশ্বর যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। তবু বিজলীকে আমি দেখিয়া আসিয়াছি, আমার খুব পছন্দ হইয়াছে। আপনার সুবিধা মতো যে দিন স্থির করিবেন, সেইদিনই তাহাকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া আনিব। আমার নমস্কার জানিবেন। বিজলীর মামা কেমন আছেন জানাইবেন। আশা করি আশঙ্কার কিছু নাই। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীযজ্ঞেশ্বর আইচ

ঋণশোধ

ছকুর কাছে এসেছিলাম। আমার দিকে এক নজর চেয়েই ছকু বুঝতে পারল কেন এসেছি। প্রায়ই আমাকে আসতে হয় এবং একই উদ্দেশ্যে আসতে হয়। ছকুর কাছে কিছু টাকা পাব, কিন্তু কিছুতেই সেটা পাচ্ছি না। প্রথম প্রথম দু'চারবার তাগাদা করেছিলাম, এখন আর তাগাদাও করি না। নিজেরই চক্ষুলজ্জা হয়। তবে আসি রোজ। তার দোকানটিতে বসে' খবরের কাগজটি পড়ি, রাজনীতি নিয়ে দু'চারটে টুকরো আলাপ করি, আর মনে মনে প্রত্যাশা করে' থাকি হয়তো ছকুই নিজে থেকে ঋণশোধের প্রসঙ্গটা তুলবে। কিন্তু তোলে না। ঘড়িতে টং টং করে' ন'টা বাজলে ছকু হাই তুলে টুস্‌কি দিয়ে সামনের দেওয়ালে রক্ষিত গণেশকে প্রণাম করে' দোকান বন্ধ করবার আয়োজন করে। আমিও উঠে বাড়ি চলে যাই। আবার তার পরদিন সন্ধ্যায় এসে হাজির হই। এমনি বহুকাল ধরে' চলছে। ব্যাংক থেকে করকরে পাঁচশ' টাকা বার করে' আমিই একদিন ছকুর এই ঘড়ির দোকানটি করে' দিয়েছিলাম।

বি-এ ফেল করে' বাড়িতে বসেছিল বেচারা, নানারকম চেষ্টা করে' কোথাও কিছু যোগাড় করতে পারছিল না, আমিই তাকে পরামর্শ দিই—"এ শহরে ভালো ঘড়ির দোকান নেই, তুমি একটা ঘড়ির দোকান কর। আগে ঘড়ি সারাতে শিখে এস, তারপর বাজারের মাঝখানে একটা ঘর ভাড়া করে' বসে যাও, কিছু কিছু হবেই।"

ছকু হেসে উত্তর দিয়েছিল—"তা কি আমি জানি না, কিন্তু ক্যাপিটাল পাচ্ছি কোথায়।" হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে আমি বলে' বসলাম, "যা ক্যাপিটাল লাগে আমি ধার দেব তোমাকে, তুমি লেগে পড়!"

ছকু লেগে পড়ল। আমার চেনা-শোনা এক ঘড়ির কারিগর ছিল কোলকাতায়। তার নামে একখানা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ছকুকে। ছকু কোলকাতায় গিয়ে প্রায় বছরখানেক রইল। থাকবার কোনও অসুবিধা হয় নি, ছকুর এক পিসেমশায় চাকরি করতেন খিদিরপুরে। তাঁর স্কন্ধারূঢ় হ'য়ে ঘড়ি সারানো বিদ্যেটা আয়ত্ত করে' ফেললে সে। তারপর আমাকে একদিন এসে বললে "এইবার ক্যাপিটাল দিন। বাজারের ঠিক মাঝখানে ভালো ঘর খালি হয়েছে একটা। গোটা পঞ্চাশেক টাকা

দিয়ে আজই ওটাকে 'বুক' করে' ফেলি, কিছু আসবাবপত্রও কিনতে হবে, ভাঙা ঘড়ি যোগাড় করেছি কয়েকটা, আপনার ঘরে যে দেওয়াল ঘড়িটা আছে সেটাও আমি দোকানে টাঙাব, আপনার একটা 'টাইম্‌পীস' তো রয়েছে, নতুন ঘড়িও কিনতে হবে দু'চারটে, ঘড়ির ব্যাণ্ড, কাচ, এসব-ও চাই"...হুড়হুড় করে' বলে' যেতে লাগল।

আমি একটু ভীত হ'য়ে পড়ছিলাম। বেশী টাকা তো আমার নেই, রিটায়ার করেছি, প্রভিডেন্ট ফণ্ডটুকুই সম্বল।

বললাম, "আমি শ দুই টাকার বেশী দিতে পারব না, ওতেই কুলিয়ে নাও এখন।"

ছকু চক্ষু দুটি কপালে তুলে বলল—"আপনি ক্ষেপেছেন নাকি! বিড়ির দোকান নয়, ঘড়ির দোকান! অন্তত হাজার খানেক টাকা ক্যাপিটাল না পেলে আরম্ভই করা যাবে না যে, পরে আরও লাগবে। এই দেখুন না লিস্ট—"। আমি লিস্ট দেখি নি। বলেছিলাম, "দেখ, হাজার টাকা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। খুব মেরে কেটে পাঁচশ' টাকা পর্যন্ত দিতে পারি।" ছকু চোখ বড় বড় করে' নাক ফুলিয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ আমার দিকে। তারপর বললে—"আপনি শেষে এমনভাবে বিট্রে (betray) করবেন জানলে আমি সাউথ আফ্রিকায় সেই চাকরিটা নিয়েই চলে' যেতাম।"

সাউথ আফ্রিকায় কোনও চাকরি অবশ্য সে পায়নি, খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপন দেখে দু'একদিন জল্পনা করেছিল মাত্র যাবে কি না। পাঁচশ' টাকাতেই রফা হল শেষ পর্যন্ত। ছকু ঘড়ির দোকান করে' ফেললে। এ প্রায় বছর পাঁচেক আগেকার কথা। দোকান নিশ্চয়ই ভালো চলছে। কারণ যে স্টাইলে সে থাকে, তাতে মনে হয় টাকাকড়ি রোজগার করে নিশ্চয়ই। তা' না-হ'লে অত সিগারেট, অত সিনেমা, অমন ছিম্‌ছাম হয়ে থাকা সম্ভব হ'ত না। চার পাঁচ রকম জুতোই পায়ে দেয়। এক জামা কখনও দু'দিন পরে না সে উপর্যুপরি। সুতরাং মনে হয় দোকান মন্দ চলছে না। আমাকে কিন্তু একটি পয়সা দেয় নি এখনও পর্যন্ত। আমি কিন্তু প্রায়ই যাই সন্ধ্যার পর। বসি খানিকক্ষণ। আশা করে' থাকি ছকু নিজেই হয়তো কথাটা তুলবে, কিন্তু তোলে না! আগেই বলেছি এখন আর মুখ ফুটে তাগাদা করতে পারি না, মনে মনে করি। কিন্তু সেদিন যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম এবং ছকুর মুখে তার যে ইতিহাস-সম্মত ব্যাখ্যা শুনলাম তাতে আশা ছাড়তে হ'ল।

দোকানের কোণটিতে বসে' রোজ যেমন করি সেদিনও তেমনি খবরের কাগজ খুলে কোরিয়া এবং লাল-চীন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম, এমন সময়ে একটি ছেলে দোকানে এসে ঢুকল। তার হাতে একটি ঘড়ির বাক্স।

"ছকুবাবু, এই রিস্ট ওয়াচটি বদলে দিতে হবে। এর পিছন দিকে একটা দাগ রয়েছে, তখন লক্ষ্য করে' দেখিনি, এই দেখুন—"

ছেলেটি বাক্স থেকে রিস্ট ওয়াচটি বার করে' দেখালে। পিছন দিকে সত্যিই একটা আঁচড়ের মতো দাগ ছিল।

ছকু মৃদু হেসে বললে—"সরি, এখন আর বদলে দিতে পারব না। নেবার সময় আপনার দেখে নেওয়া উচিত ছিল!"

ছেলেটি একটু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ল।

"তা অবশ্য ছিল, আমার দোষ হয়েছে সেটা। কিন্তু বিশ্বাস করুন ওটা, মানে ওই দাগটা, আপনার দোকান থেকেই হয়েছে। আমরা কেউ হাতও দিই নি ও ঘড়িতে, আজ হঠাৎ উল্টে দেখি—"

ছকু নির্বিকারভাবে উত্তর দিলে—"বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন প্রিন্সিপ্‌লের। জিনিস নেবার সময় সেটা ভালো করে' দেখে না নিলে উভয়তই মুশকিল। মাপ করুন আমাকে। পিছন দিকে ওটুকু দাগ থাকলে ক্ষতিই বা কি।"

"এমনিতে কোনও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু বিয়ের উপহার কি না, দাগী জিনিস দেওয়া যাবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমিই ব্যবহার করব, আমাকে আর একটা দিন—"

ছকু তাকে আর একটি ঘড়ি বিক্রি করলে। ছেলেটি এবার উল্‌টে পাল্‌টে ভাল করে' দেখে নিয়ে চলে' গেল।

আসল কথাটি আমি জানতাম। ঘড়িটা কোলকাতা থেকে ছকু যখন এনেছিল তখন ছকুই দেখিয়েছিল আমাকে দাগটা। বলেছিল—"এই দাগটুকুর জন্যে দাম পাঁচটাকা কম দিয়েছি। কিন্তু দেখবেন ঠিক কাউকে ক্যাটালগ প্রাইসে ঝেড়ে দেব—"

ছোকরাটি চলে গেলে ছকু উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে চাইলে আমার দিকে। আমি কেবল দু'টি মাত্র কথা বললাম—"অন্যায় করেছ"।

ছকু ইতিহাসের ছাত্র। সে ইতিহাসের নজীর তুলে বললে—"ব্যবসার সঙ্গে যুদ্ধের যে কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তা যদি মানেন তাহলে কিছুই অন্যায় করি নি। জিতেছি

এইটেই আমার সবচেয়ে বড় যুক্তি। এভ্রিথিং ইজ ফেয়ার ইন্ ওয়র এণ্ড লাভ্—"

"ব্যবসার সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক কি, ঠিক বুঝলাম না।"

"ইতিহাস পড়লেই বুঝতে পারবেন। আজকালকার যত যুদ্ধ তার মূলে আছে ব্যবসা। পুরাকালেও তাই ছিল। ক্রুসেডাররা ধর্মের জন্য যুদ্ধে নামে নি, নেমেছিল বাণিজ্যপথ দখল করবার জন্য। আমার মতে ব্যবসাটাই যুদ্ধ। খদ্দের হ'ল শত্রুপক্ষ, যে কোনও প্যাঁচে ফেলে তার পকেট থেকে পয়সাগুলো কেড়ে নিতে হবে। মিষ্টি কথা বলে', পিঠে হাত বুলিয়ে, লোভ দেখিয়ে, চোখ রাঙিয়ে যেমন করে' হোক—"

ছকুর বিদ্যাবত্তা আর চিন্তাশীলতা দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। ছকু উত্তেজিত হয়েছিল, সে বলেই যেতে লাগল—"এই হালের কথাই ধরুন না। ইংরেজরা যখন প্রথমে এদেশে এসেছিল তখন তাদের ব্যবসা-বুদ্ধি ভালো ছিল, তাই তারা এদেশে রাজ্য স্থাপন করতে পেরেছিল। ক্লাইভ উমিচাঁদকে লাল-কাগজ সাদা-কাগজের ভেল্কি দেখিয়ে ঠকিয়েছিল, হেস্টিংস নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়েছিল, আরও কত কি করেছিল। অর্থাৎ তখন তারা খাঁটি ব্যবসাদার ছিল। তাই শুধু ব্যবসা নয়, এত বড় সাম্রাজ্যও স্থাপন করতে পেরেছিল। কিন্তু এদেশে কিছুদিন থাকবার পর এদেশের জল-হাওয়ার ফল ফলল। জল-হাওয়ার গুণ যাবে কোথা, মহৎ হ'য়ে উঠল ব্যাটারা। তাদের ব্যবসাদারগুলো পর্যন্ত মহৎ হ'য়ে উঠল। বছর তিনেক আগের একটা ঘটনা বলছি শুনুন, আমার পার্সোনাল এক্স্পীরিয়েন্স। ঘটনাটা এতদিন কাউকে বলিনি। মল্লিকদের বাড়ির বিয়ের কথা মনে আছে আপনার? সেই যে কোলকাতা থেকে শানাই এসেছিল? ঘেঁটু মল্লিকের মেয়ের বিয়ে—"

"মনে আছে"—

"আমি তখন কোলকাতায়। ঘেঁটু মল্লিক আমাকে চিঠি লিখলে: 'ভাই, তুমি জামাইয়ের জন্য ভালো দেখে একটি রিস্টওয়াচ কিনে এনো। পাঁচশ' টাকা পর্যন্ত দাম দিতে রাজি আছি। ঘড়িটি সোনার হওয়া চাই।' একটা নামজাদা সায়েবী দোকানে গিয়ে খুব ভাল ঘড়ি একটা কিনে ফেললাম। দোকানের নামটা আর বলব না, নামটা প্রকাশ করতে চাই না। ঘড়িটা কেনবার পর আরও দু' তিনদিন

কোলকাতায় থাকতে হয়েছিল আমাকে। কি যে দুর্বুদ্ধি হ'ল ঘড়ি হাতে পরে' বেড়াতে লাগলাম। শ্যামবাজারে নন্দদের বাড়ি গেছেন আপনি? তাদের বৈঠক-খানার ফ্যানটা দেখেছেন? এমন নীচু করে' টাঙানো যে কোনও লম্বা লোক যদি হাত তোলে হাতে ব্লেড ঠেকে যায়। আমি জানেনই তো ছ'ফুট দু'ইঞ্চি। নন্দদের বাড়ি গেছি, বন্ বন্ করে' ফ্যান্‌টা ঘুরছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইতে কইতে হাতটা তুলেছি—ব্যস্! ব্লেড লেগে ঘড়ির কাচটা চুরমার, কাঁটাও একটা ভেঙ্গে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়লাম খানিকক্ষণের জন্য। পাঁচশ' টাকা দিয়ে নতুন ঘড়ি কিনে দেবার সামর্থ্য নেই আমার, কি করা যায়, ভাবতে ভাবতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। ভাঙা ঘড়িটা ঘড়ির বাক্সে পুরে ক্যাশ্‌মেমোটা নিয়ে হাজির হলাম সেই ঘড়ির দোকানে গিয়ে। দেখা করলাম বড় সাহেবের সঙ্গে। বললাম, আমি এই ঘড়িটা যখন নিয়ে গিয়েছিলাম তখন দেখে নিইনি, আজ খুলে দেখছি ঘড়িটা ভাঙ্গা। যদি কাইণ্ড্‌লি বদলে দেন, এটা ম্যারেজ প্রেজেণ্ট। সাহেব কয়েক সেকেণ্ড আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, চোখের উপর পাতা দুটো উঠল-পড়ল বার কয়েক, তারপর বললেন—'আপনি দেখে নেন নি? ও আচ্ছা, বসুন।' টং করে' ঘণ্টা বাজালেন, কর্মচারী এল একজন। সাহেব তাকে বললেন—'এই ঘড়িটা বদলে নিয়ে আসুন।' নতুন ঘড়ি নিয়ে সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম বটে, কিন্তু মনে মনে বুঝলাম ব্যাটাদের মরণ এবার ঘনিয়ে এসেছে। এইবার চাটিবাটি গুটিয়ে সরে' পড়তে হবে। পড়তেও হ'ল। মহাত্মাজি যেই কুট্ করে' বললেন : কুইট্ ইণ্ডিয়া, অমনি সুট সুট করে চলে যেতে হ'ল—"

ছকুর ব্যবসা-নীতি এবং ইতিহাস-বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে সেদিন আমার দৃঢ় ধারণা হ'য়ে গেল আমার টাকা আর ফেরত পাব না। ছকু কিন্তু আমার ঋণশোধ করেছিল, যদিও একটু তির্যক পথে। একদিন ছকুর বাড়িতে গিয়ে দেখি বাদল স্যাকরা বসে' আছে। প্রশ্ন করলাম—এখানে কেন? সে বলল, ছকুবাবুর স্ত্রীর জন্য একটা হার গড়িয়ে এনেছি। হারটি আমাকে দেখালে সে। বেশ ভাল হার।

"দাম কত পড়ল?"

"পাঁচশ' টাকা"—

"টাকাটা পেয়ে' গেছ তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করলাম। আমি না পেলেও আমার মেয়ে তো পেল পাঁচশ' টাকা। গল্পের রস হানি হবে বলে' আগে বলি নি—ছকু আমার জামাই।

● তৃতীয় শতক ●

ভেক

পিওন ডাক দিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নূতন প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষ মহাশয় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি একটি শুভ-সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। আগামীকল্য তাঁহার কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ, আমি যেন শুভকার্যে যোগদান করিয়া তাঁহাকে বাধিত করি। প্রতিশ্রুতি দিলাম, বাধিত করিব। ঘোষ মহাশয় চলিয়া গেলেন। তখন ডাকের চিঠিগুলি খুলিতে লাগিলাম। প্রতিদিন ডাকে একটি না একটি কৌতুকজনক পত্র থাকে, সেদিনও ছিল। যাঁহারা সাহিত্য-চর্চা করেন, তাঁহাদের ইহা অবিদিত নাই যে, সাহিত্য-জগতে এমন কতকগুলি জীব বিচরণ করেন যাঁহারা নিজেরা সাহিত্যিক নহেন, কিন্তু সাহিত্য ও সাহিত্যিকই যাঁহাদের সব। ইঁহাদের ঠিক শ্রদ্ধা করা যায় না, এড়ানোও যায় না। সাহিত্যিকদের নানারূপ সঙ্গত-অসঙ্গত, ফাই-ফরমাশ ইঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে খাটেন বলিয়া অনেক সময় ইঁহাদের সঙ্গ অপরিহার্য হইয়া পড়ে, অনেক সময় ইঁহারা স্নেহভাজনও হন। শ্রীমান রাইমোহন মাইতি আমার জীবনে এইরূপ একটি লোক। রাইমোহন লিখিতেছে—

শ্রীচরণেষু

দাদা, নূতন একটি কবির সন্ধান পেয়েছি। আমার মনে হয়, এঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এঁর দুটি কবিতা এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আমার বিশ্বাস আপনার ভাল লাগবে। যদি কোনও পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারেন ভাল হয়। আজকাল ভাল কবিতা তো চোখেই পড়ে না! মনে হয়, যে কোন সম্পাদক এ দুটি পেলে লুফে নেবেন। ইনি 'ভেক' এই ছদ্মনামে লিখতে চান। আপনার অমূল্য সময় আর নষ্ট করব না। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি,

প্রণত—রাইমোহন মাইতি।

এইবার কবিতা দুইটি শুনুন।—

সাগরের প্রতি

আমার মনের গোপন কথাটি জেনেছ তুমি
অথচ বল না কিছু
তোমার না-বলা-কথা-আলেয়ারে ধরিব বলি
ফিরি তার পিছু পিছু।
ধরিতে পারি না, ঠিকানা জানি না তার
আনমনে শুধু ঘোরাটাই হয় সার
ফুলেরা পাখিরা সূর্য-তারারা
আসে যায় বার বার
পথের চেহারা কভু সমতল,
কভু উঁচু, কভু নীচু।
অনেক আকাশ নেমেছে নেমেছে
অনেক সাগর-কোলে
তাদের মিতালি আমার শিথানে
নিদালি স্বপনে দোলে।—"ভেক"

কূপের প্রতি

তোমার মনের গোপন কথাটি জেনেছি আমি
তবু আছি নিশ্চুপ
দেখিতেছি শুধু নীরব বেদনে আপন মনে
জ্বলিছে মৌন ধূপ।
সাগরে ভাসিবে ময়ূর-পঙ্খী মোর
তাহারই আশায় কত নিশি হয় ভোর
জাগর-নয়নে নিদ নাহি নামে
সাগর যে মন-চোর।

তুমি তারে ওগো কেন চাও বল
তুমি যে ক্ষুদ্র কূপ।
আমি যে ভুখারী, আমি যে দিশারী
আমি যে তাতল তট
বুলবুলি-চরা মাঠে মাঠে আমি
গড়ি যে প্রেমের মঠ।—"ভেক"

কবিতা দুইটি বার দুই পড়িয়া রাখিয়া দিলাম। কাহাকে যে উল্লিখিত রত্নযুগল লুফিয়া লইবার সুযোগ দিব, সহসা ঠিক করিতে পারিলাম না।

পরদিন সকালে স্বয়ং রাইমোহন আসিয়া উপস্থিত। সে যে কলিকাতা হইতে সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইবে প্রত্যাশা করি নাই।

"কি রাইমোহন, হঠাৎ এসে পড়লে যে ?"

"যে কবিতা দুটো পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছেন ?"

"পেয়েছি।"

"কোথাও পাঠিয়েছেন নাকি ?"

"না।"

"যাক, বাঁচা গেল। কোথাও পাঠাতে হবে না, কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিন।"

"কেন, ব্যাপার কি ?"

"যত সব বোগাস—"

একবার শিস দিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর মাথার সামনের দিকের লম্বা চুলের গোছাটা দক্ষিণ মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। বুঝিলাম, যে কারণেই হোক, ছোকরা বেশ বিচলিত হইয়াছে।

"ব্যাপার কি বল তো ?"

"বলছি। কিছু খাওয়ান, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। শেষ মুহূর্তে যখন খবর পেলাম, ছুটে ট্রেন ধরেছি। পয়সাও বেশি ছিল না সঙ্গে। সমস্ত রাত অনাহারে অনিদ্রায় কেটেছে—"

চাকরকে ডাকিয়া চা ও খাবার আনিতে বলিলাম।

"ব্যাপারটা কি বল দেখি ?"

"পরশু পর্যন্ত আমাকে যা চিঠি লিখেছে, এখনও সঙ্গে আছে আমার, বিশ্বাস না হয় নিজের চোখেই দেখুন আপনি—"

"কে চিঠি লিখেছে ?"

"ওই ভেক ভেক, যার কবিতা আপনাকে পাঠিয়েছি। ও শেষে কুয়ার ভেতরই লাফিয়ে পড়ল। আপনারই পাশের বাড়িতে আছে তো। নিমন্ত্রণ-পত্র পান নি ?"

এতক্ষণে যেন কিঞ্চিৎ আলোক দেখিতে পাইলাম।

"ভেক মেয়েছেলে নাকি ?"

"হ্যাঁ, বিনোদিনী। এম-এ পাস, মার্জিত রুচি, কিন্তু বিয়ে করছে কাকে জানেন ? একটা নন্-ম্যাট্রিক জরদ্গবকে—"

"কেন ?"

"কোলকাতায় তার সাতখানা বাড়ি আছে। মিলও আছে একটা। ছি ছি, এতটা আশা করি নি। করা সম্ভব ? আপনিই বলুন। আমাকে পরশু পর্যন্ত যে চিঠি লিখেছে, দেখুন আপনি—"

"তা না হয় দেখব। কিন্তু আমি—।" থামিয়া গেলাম। কারণ আবার সে শিস দিবার চেষ্টা করিল, আবার চুল মুঠা করিয়া ধরিল। ধৃত-কেশ অবস্থায় নত-মস্তকে বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার রকম-সকম দেখিয়া আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে নিশ্চয়।

"ব্যাপারটা কি, বল দেখি খুলে। হঠাৎ এলে কেন তুমি ?"

"ট্রাজেডিটা স্বচক্ষে দেখব ব'লে এলাম। গ্রিম্ ট্রাজেডি। উঃ!"

আর সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কূপের খবর পাইয়াছিলাম। এইবার সাগরের খবর পাইলাম। প্রশান্ত মহাসাগর নয়, বঙ্গোপসাগর।

নারীর মন

স্থমিতা ঘরে এসে স্থইচ টিপল, কিন্তু আলো জ্বলল না। একটু বিব্রত হ'য়ে পড়ল বেচারী। বাল্‌বটা ফিউজ্‌ড হ'য়ে গেল না কি? হাতে একটিও পয়সা নেই, মাইনে পেতে এখনও দিন পাঁচেক দেরি আছে। অথচ আলো একটা না হ'লেও চলবে না। নবেন্দু থাকলে তার কাছ থেকে কিছু ধার চাওয়া যেত। কিন্তু সে-ও তো আজ বাড়ি চলে' গেল। দুপুরে দেখা করতে এসেছিল, তখনই যদি চেয়ে রাখত। কথাটা মনে হয়েছিল কিন্তু চাইতে লজ্জা করল। কেন লজ্জা করল? নবেন্দু তাকে ভালবাসে, চাইলে সে খুশীই হ'ত হয়তো, তবু কিন্তু চাইতে পারে নি। কেন? নবেন্দু যদি তার স্বামী হ'ত তাহ'লে এ সঙ্কোচ নিশ্চয়ই হ'ত না। অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে তার মনে হল নবেন্দু তাকে বিয়ে করবে কি? কই, কোন দিন তো মুখ ফুটে কিছু বলে নি। সঙ্গে সঙ্গে স্থরেনের কথাও মনে পড়ল। স্থরেনও আসে তার কাছে। তারও ভাব-ভঙ্গী থেকে মনে হয় সে-ও যেন তাকে চায়, কিন্তু সে-ও মুখ ফুটে বলে নি এখনও।

অন্ধকার ঘরে একা দাঁড়িয়ে নিঃস্ব স্থমিতা বড় অসহায় বোধ করতে লাগল। সে রোজগার করে, মাসে ষাট টাকা মাইনে পায়। কিন্তু কিছুতেই কুলোতে পারে না ওই ক'টা টাকায়। সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে, ভাল শাড়ি দেখলে লোভ সামলাতেই পারে না। তুচ্ছ পাথরের একটা হার, তাই কিনতেই দশটা টাকা বেরিয়ে গেল সেদিন। বুঝতে পারে অন্যায় করছে কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারে না কিছুতে। ওই হারটা না কিনলে মাসের শেষে এমন নিঃস্ব হ'য়ে পড়তে হ'ত না। যদি একজন সঙ্গী থাকত তাহলে দু'জনের রোজগারে স্বচ্ছন্দে চলে' যেত জীবন। অন্ধকারে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল স্থমিতা। এমন পয়সা নেই যে একটা মোমবাতি কিনে আনে। একটা বোর্ডিংয়ে খায় সে, মাইনে পেলে তাদের টাকা দিয়ে দেয়। একটা মনোহারী দোকানের সঙ্গে চেনা আছে, তারা মাঝে মাঝে তাকে স্নো পাউডার ধারে দিয়েছে, তাদের কাছে মোমবাতি পাওয়া যাবে কি? হঠাৎ চমকে উঠল স্থমিতা। দুয়ারে কে কড়া নাড়ছে! স্থরেন নিশ্চয়। কিন্তু এই অন্ধকার ঘরে স্থরেনকে ডেকে আনা কি ঠিক হবে? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। কোন সাড়া

দিল না। কড়া কিন্তু সমানে নড়ে চলেছে। শেষে ডাকও শোনা গেল।

"সুমিতা, সুমিতা, ঘুমিয়ে পড়লে না কি—!"

সুরেনের গলা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সুমিতা। কপাট খুলে বললে—

"ও, তুমি এসেছ। আমি বেরুচ্ছি একটু—"

"কোথায়—?"

"এই এমনি বেড়াতে—"

"চল, আমিও যাই। আমি তোমার সঙ্গে গল্প করবার জন্যেই এসেছিলাম—"

বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

সুমিতা বললে—"আমার কাছে কিন্তু একটিও পয়সা নেই, হাঁটতে হবে—"

"আমার কাছে আছে। চল, মাঠেই যাওয়া যাক—"

একটা ট্রামে উঠে বসল দু'জনে। সুমিতার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল লজ্জায়। কেন সে সুরেনের পয়সায় ট্রামে চড়ল? কেন সে তাকে বলতে পারল না যে আমি হেঁটেই যাব, আমার সান্নিধ্য তোমার যদি কাম্য হয় হেঁটেই চল আমার সঙ্গে। কেন একথা সে বলতে পারল না! পারে নি বলে কেমন যেন লজ্জিত হ'য়ে পড়ল সে মনে মনে। মনে হ'ল বরাবরই কাঙালিনীর মতো নিজের অজ্ঞাতসারেই কোন-না-কোন পুরুষের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে আছে সে মনে মনে। এই একটু আগে যে জীবনসঙ্গীব কথা সে ভাবছিল সে তার এই কাঙাল মনোবৃত্তিরই সৃষ্টি।

"চল এবার নাবা যাক—"

মাঠে এসে পড়েছিল তারা। একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে পাশাপাশি বসল দুজনে। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সুরেন গলা খাঁকারি দিয়ে বললে—

"আজ একটা কথা বলব বলে এসেছিলাম—"

"কি কথা?"

"তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই—"

সুমিতার সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল। তবু কিন্তু স্থির হ'য়ে বসে রইল সে। তারপর আত্মসংবরণ করে ধীর কণ্ঠে বললে,

"আমি যতদিন পর্যন্ত ভালভাবে রোজগার করতে না পারি ততদিন বিয়ে কবব না ঠিক করেছি। কারো গলগ্রহ হবার ইচ্ছে আমার নেই—"

"স্ত্রী কি কখনও স্বামীর গলগ্রহ হয় ?"

"হয়—"

সুরেন অনেক রকম যুক্তির অবতারণা করে' বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সুমিতা কিছুতেই বুঝল না। আত্মসম্মানের যে তুঙ্গশিখরে সে সহসা নীত হয়েছিল, সেখানে সুরেন তার নাগাল পেল না কিছুতে। হেঁটেই বাড়ি ফিরল সে। বাড়ি ফিরে' অন্ধকার ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে কাঁদতে লাগল। আবার দুয়ারে কড়া নড়ল একটু পরে।

"কে—?"

"আমি নবেন্দু—"

"আমার ঘরের আলোটা ফিউজ্‌ড্‌ হ'য়ে গেছে। শুয়ে পড়েছি আমি—"

"কপাট খোল। আমি বাল্‌ব এনেছি—"

"আশ্চর্য হ'য়ে গেল সুমিতা। নবেন্দু কি করে' জানলে যে তার 'বাল্‌ব'টা ফিউজ্‌ড্‌ হ'য়ে গেছে! কপাট খুলে' সেই প্রশ্নই করল সে।

"দুপুরে তুমি যখন চান করবার জন্যে বেরিয়ে গেলে তখন আমিই তোমার ভাল বাল্‌বটা খুলে নিয়ে তার জায়গায় ভিউজ্‌ড্‌ বাল্‌ব লাগিয়ে দিয়েছিলাম একটা—"

"সে কি! কেন—?"

"সুরেনকে ঠকাবার জন্যে। ভাবলাম ঘর অন্ধকার দেখলে সে হয়তো বসবে না—"

সুমিতার কর্ণমূলে অরুণিমা দেখা দিল।

"কেন, এলোই বা সুরেন! তোমার তাতে আপত্তি কিসের ?—"

"ঘোর আপত্তি। সে তোমাকে বিয়ে করবার তালে আছে। তোমার সঙ্গে তাকে একলা থাকবার সুযোগ কি আমি দিতে পারি ? —দাঁড়াও আলোটা লাগিয়ে দিই—"

টর্চের সাহায্যে বাল্‌বটা লাগিয়ে দিলে নবেন্দু।

সুমিতা মুচকি হেসে বললে—"সুরেনের সঙ্গে মাঠে গিয়েছিলাম। বিয়ের প্রস্তাব সে করেছে—"

"তাই নাকি! তুমি কি উত্তর দিলে—"

"বলেছি যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো রোজগার করতে না পারছি ততক্ষণ বিয়ে করব না। আমি স্বামীর গলগ্রহ হ'তে চাই না—"

"বেশ বলেছ!—কিন্তু—"

বিবর্ণ মুখে চুপ করে' গেল নবেন্দু। তারপর মুখে হাসি টেনে' এনে বলল—

"কিন্তু আমাকেও কি তুমি ওই উত্তর দেবে?"

সুমিতা বলতে পারলে না, 'দেব—'। সহসা বিপর্যয় ঘটে গেল তার মনে। বললে—

"তা জানি না। রাত হয়েছে, বাড়ি যাও তুমি।"

তারপর হেসে ফেললে।

সাঁতারের পোশাক

আমি মফঃস্বল হইতে যখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়িতে গেলাম তখন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী মহলে সাঁতার শেখার হুজুক খুব প্রবল। হেদুয়া পুষ্করিণী প্রত্যহ সকালে-বিকালে সাঁতারুদের এবং সন্তরণ-দর্শনার্থীদের কলরবে মুখরিত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত হুজুকে মাতিয়াছেন। আমারও বাসনা হইল সাঁতার শিখি। বন্ধুবর নগেন্দ্র হেদুয়ার সাঁতার-ক্লাবের একজন সভ্য। তাহারই শরণাপন্ন হইলাম। সে বলিল, "এ তো খুব ভাল কথা। কালই তোকে ক্লাবে নিয়ে যাব। তুই সাঁতার একেবারে জানিস না?"

"জানি। কতবার গঙ্গা পার হয়েছি। সাঁতার জানি বই কি—"

"বাঃ। তোকে পেয়ে আমাদের ক্লাবের লাভই হ'বে তাহলে। শান্তিদা তোকে লুফে নেবে একেবারে। আসছে বছর আমরা লম্বা একটা রেসে নাবব শান্তিদা বলছিলেন। তোর সুইমিং কস্ট্যুম আছে?"

"না।"

"কিনতে হবে একটা। চৌরঙ্গীর একটা সাহেবী দোকানে নানারকম ভালো ভালো কস্ট্যুম এসেছে শুনেছি। কাল নিয়ে যাব তোকে।"

হেদুয়া ক্লাবে ভর্তি হইয়া গেলাম। আমার সাঁতার দেখিয়া শান্তিদা খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনিও অবিলম্বে একটি সুইমিং কস্ট্যুম কিনিয়া ফেলিবার পরামর্শ দিলেন।

নগেনের সঙ্গে সেই দিনই বৈকালে গেলাম চৌরঙ্গীর সেই দোকানে। নগেনের সমস্তই জানা-শোনা ছিল, যেখানে গেলে সুইমিং কস্ট্যুম পাওয়া যাইবে, সেইখানেই সে আমাকে লইয়া গেল। কস্ট্যুম বাহির করিয়া আনিল একটি রূপসী তরুণী। অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু যে কস্ট্যম সে বাহির করিয়াছিল নগেনের তাহা পছন্দ হইল না।

"এ ছাড়া অন্য কোন রকম নেই?"

"আছে বই কি।"

ঘাড় দুলাইয়া মুচকি হাসিয়া তরুণী চলিয়া গেল এবং আর এক রকম বাহির করিয়া আনিল। এটাও নগেনের পছন্দ হইল না, আমারও হইল না।

"আর কিছু নেই?"

"আছে।"

সে আর একবার ভিতরে গেল এবং তৃতীয় প্রকার কস্ট্যুম আনিল। বলিল, "এটা বিশেষ রকম মজবুত সুতায় প্রস্তুত। অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারুদের খুব প্রিয়।"

কিন্তু গেঞ্জির কলারটা বড় বেশী লম্বা। পছন্দ হইল না।

"আরও দেখাচ্ছি আপনাদের।"

সুমিষ্ট হাসিয়া মেয়েটি আবার ভিতরে চলিয়া গেল এবং এবার একসঙ্গে চার পাঁচ রকম কস্ট্যুম বাহির করিয়া আনিল। একটাও পছন্দ হইল না।

"আর নেই?"

"আছে বই কি। প্লীজ ওয়েট্ এ মিনিট—"

আবার সে দ্রুতপদে ভিতরে গেল, আবার একগোছা বাহির করিয়া আনিল।

কিন্তু নগেনের পছন্দ-অপছন্দের মানদণ্ড এমনি সূক্ষ্ম যে, এবারও একটাও পছন্দ হইল না। কোনটার কলার ছোট, কোনটার বড়, কোনটার রং খারাপ, কোনটার বুনোট ভালো নয়, কোনটার হাতা ঢিলা, কোনটার বেশী টাইট্। কস্ট্যুম স্তূপীকৃত হইয়া গেল।

"আর নেই?"

"বাইরে আর নেই। ওয়েট্ এ বিট্—আজ নতুন একটা চালান এসেছে, তাতে হয়তো থাকতে পারে।"

মধুর হাসিয়া তরুণী আবার চলিয়া গেল। এবার সে যে-কস্ট্যুমগুলি লইয়া আসিল, সেগুলি বাস্তবিকই চমৎকার। আমাদের দু'জনেরই খুব পছন্দ হইল।

"দাম কত?"

"বেশী নয়। পাঁচ টাকা চোদ্দ আনা।"

এইবার একটু মুশকিলে পড়িতে হইল। আমাদের কাছে পাঁচ টাকার বেশী ছিল না। গলা খাঁকারি দিয়া নগেন বলিল, "আমাদের কাছে পাঁচ টাকা মাত্র আছে। ভেবেছিলাম পাঁচ টাকাতেই হ'য়ে যাবে। এইটেই কিন্তু আমাদের চাই। কাইণ্ডলি এটা একটু আলাদা করে রেখে দিন। এখনি এসে নিয়ে যাব আমরা।"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "ও ইয়েস্! আলাদা প্যাকেট করে' রেখে দিচ্ছি—"

লজ্জায় মাথা কাটা যাইতেছিল। পর-মুহূর্তেই আমরা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

নগেন বলিল, "এখনই এসে নিয়ে যেতে হবে ওটা।"

"নিশ্চয়ই!"

সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে চলিতেছিলাম, হঠাৎ 'বাবু বাবু' ডাক শুনিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইতে হইল। দেখিলাম একটি চাপরাশি গোছের লোক হাতছানি দিয়া আমাদেরই ডাকিতেছে। দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

"আপনারাই কি সুইমিং কস্ট্যুম কিনছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"বড় সাহেব আপনাদের ডাকছেন।"

"কোন্ বড় সাহেব?"

"দোকানের। চলুন না—"

একটু অবাক্ হইয়া গেলাম।

নগেন বলিল, "চল না, শোনাই যাক—কি বলে!"

চাপরাশি আমাদের একটি প্রশান্ত-বদন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। সাহেব দূরের একটি ঘরে বসিয়া আমাদের পোশাক-নির্বাচন-লীলা দেখিয়াছিলেন। আমরা যাইতেই বলিলেন, "আপনারা অতগুলো কস্ট্যুম দেখলেন, কিন্তু একটিও তো নিলেন না, পছন্দ হ'ল না বুঝি?"

অপ্রস্তুত মুখে সত্য কথাটা বলিলাম।

"কত কম পড়ছে?"

"চোদ্দ আনা—"

সাহেব ঘণ্টা টিপিলেন। চাপরাশি পুনরায় প্রবেশ করিল।

"মিস জেসিকো সেলাম দেও!"

যে তরুণী আমাদের কস্ট্যুম দেখাইতেছিলেন, তিনি আসিলেন। তিনি প্রবেশ করিতেই সাহেব নিজের পকেট হইতে চোদ্দ আনা পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এঁদের যে পয়সাটা শর্ট পড়েছে সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ওঁদের কস্ট্যুমটা দিয়ে ক্যাশমেমো দিয়ে দিন।"

তাহার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনারা খেলা-টেলা দেখতে নিশ্চয়ই এদিকে আসেন, তখন পয়সাটা আমাকে দিয়ে যাবেন।"

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার সাঁতারু-জীবনের প্রবেশদ্বারে সেই হাস্যমুখ সাহেবটির ছবি আজও টাঙানো আছে। আরও দুইটি ছবিও আছে। সে দুইটির কথাও শুনুন। আমি ডাক্তারি পাস করিতে পারি নাই, সাঁতারটা অবশ্য ভাল করিয়া শিখিয়াছিলাম। একটি সাঁতারু মেয়েকে বিবাহ করিয়া সাঁতারু-জীবনই যাপন করিতেছি।

সাঁতারের পোশাক সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি হইয়াছিল একটি মফঃস্বল শহরে। একটি সন্তরণ প্রতিযোগতায় যোগদান করিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলাম। এমনি দুর্দৈব, আমার সুটকেসটি ট্রেনে চুরি গেল। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, কে নামাইয়া লইয়াছে। সুটকেসের ভিতর আমার সাঁতারের পোশাক ছিল। সুতরাং ট্রেন হইতে নামিয়াই সাঁতারের পোশাক কিনিবার জন্য বাজারে বাহির হইয়া পড়িতে হইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু হতাশ হইলাম। অধিকাংশ দোকানদার সুইমিং কস্ট্যুমের নাম পর্যন্ত শোনে নাই। অধিকাংশ দোকানেই ধুতি, শাড়ি, গামছা, ছিট। একজন বলিল, "এখানকার সবচেয়ে বড় দোকান 'ভবতারণ ভাণ্ডার,' সেখানে গেলে পেতে পারেন।" ভবতারণ ভাণ্ডারেই গেলাম। সেখানে দেখিলাম বিরাট এক তাকিয়ায় হেলান দিয়া এক বিরাট পুরুষ গড়গড়া সংযোগে তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে তাঁহারই অনুরূপ ভীমকান্তি আর এক ভদ্রলোকের সহিত রাজনীতি আলোচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আমি দোকানে প্রবেশ করিলাম, তাঁহারা বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মডারেট্‌রা ভাল, না একষ্ট্রিমিস্ট্‌রা ভাল, এই আলোচনাই চলিতে লাগিল।

"সুইমিং কস্ট্যুম আছে কি?"

"পাশের দোকানে যান, আমরা কাটা কাপড় বেচি, পাশেই ডাক্তার মিত্তিরের ডিস্‌পেনসারি, সেখানেই খোঁজ করুন।"

বুঝিলাম, তাঁহারা সুইমিং কস্ট্যুমের নাম পর্যন্ত শোনেন নাই, ভাবিয়াছেন আমি বুঝি কোন ঔষধ কিনিতে আসিয়াছি। তখনই আমার চলিয়া আসা উচিত ছিল,

কিন্তু ললাট-লিপি খণ্ডন করা যায় না, তাই আমি বাংলা করিয়া বলিলাম, "ওষুধ নয়, আমি সাঁতারের পোশাক খুঁজছি।"

বুঝাইয়া বলিলাম।

"ও, বুঝেছি! কাগজে টাইট্ গেঞ্জি-প্যাণ্ট-পরা ছোক্‌রা-ছুক্‌রিদের ছবি দেখি বটে মাঝে মাঝে। না মশাই, ওসব জিনিস আমার দোকানে পাবেন না!"

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আজ এখানে শীলেদের বাঁধে সাঁতার কম্পিটিশন হ'বে যে। কলকাতার বিখ্যাত সাঁতারু দুলাল চাঁদ আসছেন—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনেছি বটে। লোকটা নামী লোক—"

আর আমি আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না। নিজের পরিচয় দিলাম।

"ও, আপনিই দুলালচাঁদ, বসুন, বসুন—"

উভয়েই খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

আমি উপবেশন করিলাম, এবং তাঁহাদের বুঝাইতে লাগিলাম সাঁতার কাটিতে হইলে সাঁতারের পোশাক কেন প্রয়োজন।

ভবতারণ ভাণ্ডারের মালিক সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, আপনি বিপদে পড়েছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু ও জিনিস তো আমার কাছে নেই। কারও কাছেই পাবেন না। আচ্ছা দাঁড়ান, গফুর, গফুর, ও গফুর!—

পাশের ঘর হইতে পর্দা ঠেলিয়া লুঙ্গিপরা একটি শীর্ণ ব্যক্তি প্রবেশ করিল।

"এই বাবুর হাফ প্যাণ্ট আর হাফ শার্টের মাপ নিয়ে নাও তো! যান আপনি ওর সঙ্গে। চারটে নাগাদ সাঁতারের পোশাক পেয়ে' যাবেন—"

"করিয়ে দেবেন বলছেন?"

"হাঁ হাঁ মশাই, ভার নিলুম যখন করিয়ে দেব। খুব ভালো কাপড়ের করিয়ে দেব। কলকাতায় এমনটি পাবেন না—"

"কী কাপড়ের?"

"সে দেখবেন তখন!"

ভদ্রলোকের চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া আর বেশী ইতস্তত করিতে সাহস হইল না। গফুর-দর্জির ঘরে গিয়া মাপ দিলাম। যাঁহার বাড়িতে উঠিয়াছিলাম, তিনিও আশ্বাস দিলেন, "ভবতারণবাবু স্বয়ং যখন ভার নিয়েছেন, তখন ঠিক পেয়ে যাবেন—"

সাড়ে পাঁচটার সময় সাঁতার আরম্ভ। ভবতারণবাবু ঠিক চারটের সময় যাইতে

বলিয়াছিলেন। গিয়া দেখিলাম দোকান বন্ধ, শুনিলাম ভবতারণবাবু এ-বেলা দোকান খুলিবেন না, সাঁতার দেখিতে যাইবেন। অনেক ডাকাডাকির পর গফুর-দর্জি পাশের একটি গলি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"ও, আপনি এসেছেন! টেঁকে রেখেছি, এইবার কলটা চালিয়ে দিচ্ছি। এক্ষুনি হয়ে যাবে—"

বারান্দাতেই বসিয়া রহিলাম। সওয়া পাঁচটার সময় গফুর কোনক্রমে কাজ শেষ করিল। দেখিলাম কাপড়টা কালো এবং খুব খস্‌খসে্ গোছের।

গফুর বলিল, "ছাতার কাপড়। বাবু বললেন, জলে ভিজবে কিনা, ছাতার কাপড়েরই ভাল হবে।"

হাফ প্যাণ্টটা একটু অাঁট এবং হাফ শার্টটা বেশ ঢিলা হইল। অদল-বদল করিবার আর সময় ছিল না। ওই কস্ট্যুম পরিয়াই প্রতিযোগিতায় নামিয়া গেলাম। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানই অধিকার করিয়াছিলাম, কিন্তু জল হইতে যখন উঠিলাম, তখন আমার সর্বাঙ্গ কালো হইয়া গিয়াছে। কাপড়ের রংটা কাঁচা ছিল।

একটা কথা কিন্তু না উল্লেখ করিলে অন্যায় হইবে। ভবতারণবাবু একটি পয়সাও দাম লন নাই। হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ওটা আপনাকে প্রেজেণ্ট করলাম। আপনি নামী লোক, গরিবের একটা স্মৃতিচিহ্ন থাক আপনার কাছে—"

সাঁতারের পোশাক সম্পর্কে একটি বিলিতি দোকানের এবং একটি স্বদেশী দোকানের গল্প বলিলাম। তৃতীয় গল্পটি আরও স্বদেশী। এক অজ পাড়াগাঁয়ে ভাগ্‌নের বিবাহ উপলক্ষে গিয়াছিলাম। সেখানে সকলে ধরিয়া বসিল, সাঁতার দেখাইতে হইবে। কয়েকজন উৎসাহী প্রতিযোগীও জুটিয়া গেল এবং স্পর্ধা করিতে লাগিল আমাকে হারাইয়া দিবে।

বলিলাম, "সঙ্গে তো সুইমিং কস্ট্যুম আনিনি। সুইমিং কস্ট্যুম না হ'লে সাঁতার কাটতে পারি না।"

ছোকরারা দমিয়া গেল। কিছুক্ষণ অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ একজন বলিল, "বেংকট বাবার কাছে গেল কেমন হয়। তিনি ছবির অসুখের সময়ে থার্মোমিটার বার করে দিয়েছিলেন, আমাদের অসময়ে কাঁটাল খাইয়েছিলেন, তিনি ইচ্ছে করলে সুইমিং কস্ট্যুমও আনিয়ে দিতে পারবেন। চলুন না তাঁর কাছে। বেশী দূর নয়—"

"বেংকট বাবা কে ?—"

"মস্ত বড় সিদ্ধপুরুষ একজন। ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন। সুখেনদাকে দামী একটা ঘড়ি আনিয়ে দিয়েছিলেন একবার।"

"কি করে আনিয়ে দিয়েছিলেন ?—"

"মন্তরের চোটে। আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর উঠে ঘড়িটা হাতে দিলেন। মনে হ'ল যেন তাঁর কাছেই ছিল।"

কৌতূহল হইল। গেলাম বেংকট বাবার কাছে। ক্ষুদ্র খর্বকায় ব্যক্তি, চক্ষু দুইটি লাল। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "সাঁতার কাটবার জন্যে আবার পোশাকের দরকার কি! বাবা, সমস্ত ত্যাগ করে' ভবসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে না পড়লে পার মিলবে না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হ'য়ে সাঁতার কাটতে শেখ বাবা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হ'য়ে সাঁতার কাটতে শেখ। পোশাক নিয়ে কী হবে !—"

বন্দেমাতরম্

শহরের গণ্যমান্য নাগরিক রায়বাহাদুর জগজ্জ্যোতি সিংহরায়ের কন্যা সুশীলা সহসা নিরুদ্দেশ হওয়াতে আমার কাজ আরও বাড়িয়া গেল। চোর ডাকাত খুনী জালিয়াত্ ইহাদের লইয়াই আমার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই, বিবিধ প্রকার পাপী ও শয়তানদের পিছু পিছু ঘুরিয়া দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করিয়া ফেলিতেছি—রায়বাহাদুরকে সবিনয়ে সে কথা নিবেদন করিলাম। তিনি কিন্তু না-ছোড়। অত বড় মানী লোক আমার কাছে হাতজোড় করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,

"ওসব কোনও ওজর শুনব না ভাই। সি-আই-ডি হিসেবে তোমার যে সুনাম শুনেছি তার মর্যাদা তোমাকে রাখতেই হবে। আমার মান সম্ভ্রম কলঙ্কে কালো হয়ে যাবে, আর তুমি বাঙালীর ছেলে হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে সেটা!"

কি আর বলিব, কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া শেষে কথা দিয়া আসিলাম।

সুশীলার যে এই পরিণাম হইবে, তাহা পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম। মনোমত পাত্র পাওয়া যায় নাই বলিয়া রায়বাহাদুর তাহার বিবাহ দিতে পারেন নাই। যে ধরনের পাত্র সাধারণতঃ আমাদের মনোমত হয় তাহা এদেশে দুর্লভ। অনেক টাকা খরচ করিয়াও মেলে না। এ যুক্তি কিন্তু বয়স বা যৌবনের উদ্দাম গতিকে রোধ করিতে পারে না। রায়বাহাদুর রোধ করিবার চেষ্টাও করেন নাই। বহুবিধ শৌখীন শাড়ি এবং অলঙ্কারে মেয়েকে সাজাইয়া ঐশ্বর্যের ময়ূরপঙ্খীটিতে তাহাকে তুলিয়া দিয়াছিলেন। সংসার সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে সে নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছিল। কোনও সিনেমা, কোনও থিয়েটার, কোনও পার্টি সে বাদ দিত না। কলেজে কো-এডুকেশন তো ছিলই। ইহাই আজকালকার হাওয়া এবং ইহাই না কি সভ্যতার মানদণ্ড। এ অবস্থায় যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিয়াছে, বিস্ময়ের কিছু নাই।

সুশীলার নাগাল কিন্তু সহজে পাইলাম না। দেখিতে দেখিতে প্রায় সাত আট মাস কাটিয়া গেল। রায়বাহাদুর পরিচিত মহলে প্রচার করিয়া দিলেন সুশীলা ব্যাঙ্গালোরে তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাছে গিয়াছে, সেখানে একজন খাঁটি মেমসাহেবের নিকট সে নাকি লেখপড়ার সহিত বিলাতী সহবৎ শিক্ষা করিতেছে। তাহার পর বিলাত

যাইবে। পরিচিত-মহল রায়বাহাদুরের সামনে দেঁতো হাসি হাসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। কিন্তু আড়ালে তাহারা যে হাসি হাসিল তাহা অন্য প্রকার। যাই হোক, এই ভাবেই চলিতে লাগিল। আমি পারতপক্ষে রায়বাহাদুরের সহিত দেখা করিতাম না। দেখা হইয়া গেলে সত্য কথাই বলিতাম, যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। লোক লাগাইয়া চেষ্টা করিবার উপায় ছিল না, কারণ, রায়বাহাদুর ব্যাপারটা গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন।

এলাহাবাদে সিধু গুণ্ডার পিছু লইয়াছিলাম। সিধু গুণ্ডাই যে প্রকাশ্য দিবালোকে একটা মাড়োয়ারীকে খুন করিয়া তাহার টাকার থলিটা ছিনাইয়া লইয়াছিল সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু লোকটা এমনই ধূর্ত যে কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিতেছিলাম না। সে যে এই শহরেই আছে তাহারও প্রমাণ পাইয়াছিলাম, কিন্তু কোথায় যে আছে তাহা নির্ণয় করা যাইতেছিল না। সমস্ত হোটেলে এবং খাবারের দোকানে আমার গুপ্তচর ছিল। একজন আসিয়া খবর দিল যে শহরের বাহিরে যে ডাস্ট্‌বিনটা আছে সেখানে নাকি গভীর রাত্রে সিধু খাবার লইবার জন্য আসে। একটা লোক সন্ধ্যার সময় সেই ডাস্টবিনের ভিতর তাহার জন্য খাবার রাখিয়া যায়। কাছেই একটা গাছ ছিল, সন্ধ্যার পর তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া রহিলাম। একটু পরে সত্যই দেখিলাম একটা লোক ডাস্টবিনে শালপাতা মুড়িয়া কি যেন রাখিয়া গেল। বুঝিলাম, একটু পরে সিধু আসিবে। সিধু অনেক রাত্রে আসিল এবং আসিল সাইকেল চড়িয়া। এটা আমি প্রত্যাশা করি নাই। আমি গাছ হইতে নামিতে না নামিতেই সে খাবার লইয়া অন্তর্ধান করিল। আমার কিংবা আমার সঙ্গের কনস্টেবল দুজনের সাইকেল ছিল না। আমরা পদব্রজেই সিধু যে পথে গিয়াছিল সেই পথেই চলিতে লাগিলাম। সাইকেলটা কিছুক্ষণ পরেই আঁধারে মিলাইয়া গেল। তবু আমরা চলিতে লাগিলাম। দুইদিকে ফাঁকা মাঠ, জনমানবের চিহ্ন নাই, গভীর অন্ধকার। ফিরিয়া আসিব কি না ভাবিতেছি, এমন সময় কিছুদূরে একটা পোড়ো বাড়ি চোখে পড়িল। কাছে গিয়া দেখিলাম, খোলার বাড়ি, দুই দিকে মাটির দেওয়াল কোনক্রমে দাঁড়াইয়া আছে। টর্চের আলো ফেলিয়া ফেলিয়া কাছে গেলাম এবং ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সাধারণ দেশী কুকুর, লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম কুকুরী।

তাহার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। সিধুকে দেখিতে পাইলাম না।

"কে আপনি?"

টর্চের আলো ফেলিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। শত ছিন্ন মলিন বসন, মাথার চুল রুক্ষ, একটি মেয়ে একটি সদ্যোজাত শিশুকে বুকে চাপিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। ঠিক পাশেই দেখিলাম কতকগুলি কুকুর ছানাও রহিয়াছে। তাহাদের মা-ও পরমুহূর্তে আসিল এবং তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বাচ্ছাগুলিকে ঘিরিয়া বসিল। সুশীলার চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি, দেখিলাম সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

আমি একটি কথাও বলিলাম না। বলিতে পারিলাম না। জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীকে মনে মনে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

অঙ্কুর ও বৃক্ষ

ভদ্রলোক সত্যই বিপন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন। আমিও বেশ বিপন্ন হ'য়ে পড়লাম। কম টাকা নয়, প্রায় দু'হাজার টাকা। আমার কথায় অত টাকা সে কি ছেড়ে দিতে রাজি হবে? আমাকে অবশ্য সে খুবই খাতির করে। কিন্তু খাতির ক'রে বলেই কি অসঙ্গত অনুরোধ করা যায়। ভদ্রলোক কিন্তু না-ছোড়। হাত জোড় করে বলতে লাগলেন—"দয়া করুন ডাক্তারবাবু, বিশ্বাস করুন, তিন দিন না খেয়ে আছি।" চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল তাঁর। নিরুপায় হয়ে শেষে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে তাঁর উত্তমর্ণকে অনুরোধ করব যাতে তিনি সুদের টাকাটা ছেড়ে দেন। তাকে বুঝিয়ে বলব যে বসতবাটী বিক্রি করেও সব টাকা দিতে পারবেন না ভদ্রলোক। যতটা দিচ্ছেন ততটা নিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সিভিল জেল দিয়ে আর লাভ কি? ক্ষতিই বরং। আমার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ভদ্রলোক চোখ মুছতে মুছতে উঠে গেলেন। অনাহারক্লিষ্ট চেহারা। পরনে ছিন্ন মলিন বসন। দেখে সত্যিই দুঃখ হ'ল।

একটা গল্প মনে পড়ছে। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। অনেকদিন আগেকার ঘটনা, প্রায় বিশ বছরের। আমার এক বন্ধু হঠাৎ একদিন সকালে আমার বাসায় এসে উপস্থিত।

"অনেকদিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি, তাই ভাবলাম নেবে পড়ি এখানে। পাটনায় যাচ্ছি একটা বিয়েতে। কাল বিয়ে, আজ রাত্রের ট্রেনে এখান থেকে রওনা হলেও ঠিক সময়ে পৌছান যায়। তারপর কেমন আছিস?—"

অনেকদিন পরে রতনকে দেখে খুব খুশী হলাম। রতনকে সত্যিই ভালবাসতাম, অন্য কোনও কারণে নয়, তার নিরহঙ্কার সরলতার জন্য। লক্ষপতির একমাত্র ছেলে সে, লেখাপড়াতেও খুব ভাল, কিন্তু তার পোশাক-পরিচ্ছদে বা কথা-বার্তায় কখনও কোন রকম চালিয়াতি লক্ষ্য করি নি। সদা-হাস্যময় আত্মভোলা লোক। অনেকদিন পরে দেখা হ'ল, দেখলাম একটুও বদলায় নি। তখন আমি সবে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছি, রোগীর ঝামেলা বিশেষ ছিল না, সমস্ত দিন খুব আড্ডা দেওয়া গেল তার সঙ্গে।

হঠাৎ রতন বলে উঠল—"ওহো, একটা জিনিস ভুল হয়ে গেছে! উর্ধ্বশ্বাসে ট্যাক্সি করে' এসে ট্রেন ধরেছি, শাড়িখানা কিনে আনা হয় নি! এখানে ভালো কাপড়ের দোকান আছে?"

আমি ব্যাপারটা ধরতে পারি নি প্রথমে।

"কিসের শাড়ি?"

"বাঃ, বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি, শুধু হাতে কি যাওয়া যায়? একটা ভালো বেনারসী শাড়ি নিয়ে যাব ভেবেছি। এখানে দোকান আছে?"

"আছে। বেশ বড় বাঙালীর দোকান আছে একটা।"

"চল তাহলে সেখানে। একটা শাড়ি কিনে ফেলা যাক—"

আমার পরিচিত জগৎবাবুর জগজ্জ্যোতি ভাণ্ডারে রতনকে নিয়ে গেলাম। জগৎবাবু নিজের মৃতা পত্নী জ্যোতির্ময়ী দেবীর নামের প্রথমার্ধের সঙ্গে নিজের নামের ব্যঞ্জন সন্ধি করে' দোকানটির নামকরণ করেছিলেন। দোকানটির তখন খুব চলতি।

আমরা যখন দোকানে গেলাম তখন বেলা আড়াইটে হবে। জগৎবাবু নিজেই দোকানে ছিলেন, কর্মচারী কেউ ছিল না। তারা খেতে গিয়েছিল বোধ হয়। জগৎবাবু একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ঢুলছিলেন। আমরা দোকানে ঢুকতেই তাঁর কাঁচা ঘুমটা ভেঙে গেল, মনে হ'ল একটু যেন অপ্রসন্ন হলেন। তাঁর ঈষৎ কুঞ্চিত ভ্রূযুগল দেখে তাই-ই অনুমান করলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তাই মুখে একটা ভদ্রতার হাসি টেনে আনলেন।

"ডাক্তারবাবু যে, আসুন! দুপুর রোদে বেরিয়েছেন যে!—"

"আমার এই বন্ধুটির কাপড় কেনার দরকার। বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে, একটা বেনারসী শাড়ি নিয়ে যেতে চায়। দিন একখানা—"

জগৎবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন। তারপর দোকানের শেল্ফগুলোর দিকে চেয়ে বললেন—"শাড়ি? বেনারসী? আছে বোধ হয় নাগালের মধ্যে। দেখি—"

তাকিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। উঠতে গিয়ে কাছাটা খুলে' গেল। সেটা গুঁজে কসিটা ঠিক করে' নিয়ে এগিয়ে গেলেন একটা শেল্ফের দিকে। সেখান থেকে একটা কাপড়ের বস্তা নামালেন ধপাস্ করে। তারপর তার পাশে উবু হ'য়ে বসে' বস্তাটি খুলে বা'র করলেন একখানি শাড়ি।

"নিন্ দেখুন—"

রতনের কিন্তু পছন্দ হ'ল না।

"আর একটা দেখান—"

আর একটা দেখালেন তিনি। সেটাও কিন্তু রতনের পছন্দ হ'ল না। তৃতীয় শাড়িখানাও যখন রতনের পছন্দ হ'ল না তখন জগৎবাবুর চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরেছে। গুম হ'য়ে নির্নিমেষে চেয়ে আছেন তিনি রতনের দিকে।

প্রশ্ন করলেন—"কি রকম শাড়ি চাই আপনার ?—"

মিতভাষী রতন বললে—"ভালো শাড়ি। আছে কি আপনার ?"

"আছে। আড়াই-শ' তিন-শ' টাকা দামের শাড়ি আছে—"

নির্বিকার কণ্ঠে রতন বললে—"বেশ, দেখান—"

"সত্যি সত্যি যদি নেন তাহ'লে দেখাই। তা না হ'লে শুধু শুধু সিঁড়িতে চড়ে' ওই ওপরের তাক থেকে নাবানোর কোন মানে হয় না !—নেবেন কি ?"

"থাক, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।"

মৃদু হেসে উঠে পড়ল রতন, দোকান থেকে বেরিয়ে এল। আমাকেও বেরিয়ে আসতে হ'ল।

"কিনবি না ?"

"অন্য দোকানে চল। এখানে কিনব না। অভদ্র লোক"

মনে পড়ল মথুরাদাসের কথা। মথুরাদাস আমার রোগী। ছোট একটি কাপড়ের দোকান করেছে সম্প্রতি। তার দোকানেই গেলাম। আমাদের দেখেই মথুরাদাস শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল এবং এমনভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করল যেন আমাদের পথ চেয়েই তার দিন কাটছিল।

"একখানা ভাল বেনারসী শাড়ি চাই শেঠজী, আমার দোস্তের জন্য—"

"আইয়ে বৈঠিয়ে—"

সাগ্রহে আহ্বান করল আমাদের, তারপর শাড়ি বার করতে লাগল। এক, দুই, তিন, চার—আর ছিল না বেচারীর দোকানে। রতনের একটাও পছন্দ হ'ল না। শেঠজী কিন্তু দমলেন না তাতে।

হিন্দী ভাষায় বললেন, "আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি আরও শাড়ি এনে দেখাচ্ছি। অন্য দোকান থেকে আনছি—"

দুপুরের রোদ তুচ্ছ করে' বেরিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কিছুক্ষণ পরে ফিরল একগাদা

শাড়ি নিয়ে, নানা দামের, নানা রঙের। একখানা শাড়ির জমি রতনের পছন্দ হ'ল, কিন্তু রংটা হ'ল না।

শেঠজী একটু অপ্রতিভ হ'য়ে প্রশ্ন করলেন, "বাবুজির কোন্ রং পছন্দ তাহলে ?—"

"ফিকে সবুজ—"

"হুজ্‌রিমলের দোকানটা এখন বন্ধ আছে। সেখানে ফিকে সবুজ রঙের কাপড় আছে। কাল এনে রাখব বাবু, কিংবা বলেন তো ডাক্তারবাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেব—"

"বাবু তো কাল পর্যন্ত থাকবেন না। আজ সন্ধ্যার ট্রেনে পাটনা যাচ্ছেন—"

"ও, আচ্ছা দেখি—"

বেরিয়ে এলাম আমরা দোকান থেকে।

রতন বললে—"পাটনাতেই পেয়ে যাব বোধ হয় !"

সন্ধ্যার সময় রতনকে স্টেশনে তুলে দিতে যাবার জন্য বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় মথুরাদাস মারোয়াড়ী এসে হাজির। হাতে ফিকে সবুজ রঙের তিনখানা শাড়ি। রতনের একখানা শাড়ি পছন্দ হ'ল ! সাড়ে আট শ' টাকা দিয়ে কিনলে শাড়িখানা।

পরে খবর নিয়ে জেনেছিলাম ওই শাড়িখানা বেচে একশ' টাকা লাভ করেছিল মথুরাদাস।

বিপন্ন ভদ্রলোকটিকে দেখে এই যে ঘটনাটা মনে পড়ল, এটাকে অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক মনে করবেন না। রীতিমত প্রাসঙ্গিক। কারণ ঐ বিপন্ন ভদ্রলোকটিই একদা-ধনী জগৎ চৌধুরী। জগজ্জ্যোতি ভাণ্ডার ঋণের বন্যায় বহুকাল আগেই ভেসে গেছে। আর যার কাছ থেকে টাকা ধার করে' তিনি এই বিপুল বন্যায় নিজের নাকটি কোনক্রমে বার করে' রাখতে সক্ষম হয়েছেন তার নাম শেঠ মথুরাদাস,—যে একদিন রতনকে ফিকে সবুজ রঙের শাড়ি বেচেছিল আমার বাড়িতে এসে। তার এখন চারটে দোকান, দুটো মিল, ব্যাঙ্কে লক্ষ লক্ষ টাকা।

আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন।

আমার অনুরোধে মথুরাদাস জগৎবাবুকে ঋণমুক্ত করে' দিয়েছিল।

● তৃতীয় শতক ●

অন্তরালে

পুরাতন বন্ধু উমানাথ বাজপেয়ী কর্ম হইতে অবসর লইয়া কাশীবাস করিতে যাইতেছিল। দিল্লী এক্সপ্রেস ভাগলপুর পর্যন্ত আসিয়া থামিয়া গেল। সামনের স্টেশনে একটি গাড়ি লাইনচ্যুত হইয়া পথ আটকাইয়াছিল। উমানাথ জানিত আমি ভাগলপুরে আছি। গাড়ি ছাড়িবার প্রচুর দেরি আছে দেখিয়া সে পুরাতন বন্ধুত্বটা ঝালাইয়া লইবার মতলবে নিজের জিনিসপত্র নামাইয়া একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে আরোহণ করিল এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমাকে বাহির করিয়া ফেলিল। পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বলিলাম,—

"আজ আর তোমার যাওয়া হচ্ছে না। এসেছ যখন থেকেই যাও দু'একদিন—"

"আজকের দিনটা তো থাকতেই হবে মনে হচ্ছে, কাল যদি গাড়ি চলে তখন দেখা যাবে—"

সন্ধ্যার পর ছাতের উপর ক্যাম্প-চেয়ার বিছাইয়া উভয়ে বিশ্রম্ভালাপে রত হইলাম। পূর্বজীবনের নানা কথার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"তুমি তো এস. পি. হয়েই রিটায়ার করলে—"

"হ্যাঁ। ডি. আই. জি. হওয়া আর হ'ল না।"

"চাকরি জীবনটা কেমন লাগল ?"

"রটন্‌। নরক বাস।..."

"পয়সা-কড়ি কেমন রোজগার হ'ল ?"

"তা মন্দ হয়নি। গোটা দুই ছেলে আছে, তাদের উচ্ছন্ন যাবার পাথেয় রেখে যাব।"

"কেন, লেখাপড়া শেখেনি তারা ?"

"ম্যাট্রিকের বেড়া পার হতে পারেনি।"

"আর ছেলে-পিলে নেই তোমার ?"

"তিনটি মেয়ে আছে। তিনটিই বিধবা, তার মধ্যে একটি পাগল।"

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। বাজপেয়ী-ই হঠাৎ আবার বলিল,—

"বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণে যাচ্ছি। ভরসা আছে তিনি ঠেলে ফেলে দেবেন না, দু'চারটে ভাল কাজ করেছি জীবনে।"

বলিলাম,—"তোমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই খুব বিচিত্র। কোন সাহিত্যিক জানতে পারলে হয়তো আমাদের সাহিত্যেও শার্লক হোমস্, পইরো বা ফাদার ব্রাউন দেখা যেত—"

"তাতে সাহিত্যের কি হবে জানি না, আমার যে-ধরনের অভিজ্ঞতা তা' অত্যন্ত সাদা-মাটা, চাঁছা-ছোলা, পরিষ্কার ব্যাপার। কোনও বুদ্ধিমান ডিটেক্‌টিভের দরকার হয় না তার জন্যে। ডিটেক্‌টিভ দরকার হতে পারে কে কি ভাবে ঘুস খাচ্ছে তাই ধরবার জন্যে, চোর ডাকাত খুনী ধরবার জন্যে নয়। আমাদের দেশের ডিটেক্‌টিভরা, ইংরেজ আমলে অন্তত, দেশের সচ্চরিত্র ভদ্রলোকেদেরই ফাঁসাবার চেষ্টা করত খালি। টেররিস্ট মুভ্‌মেণ্টের কথা ভেবে দেখ। আমি নিজের স্বপক্ষে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, বিপ্লবী দু'একটি ছেলেকে আমি হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি। সেইজন্যেই হয় তো বিশ্বেশ্বর আমাকে দয়া করতে পারেন—"

"বল না শুনি দু'একটা ঘটনা!"

ঠিক এই সময়ে ভিতর হইতে গৃহিণীর আহ্বান আসিল—

"খাবার দেওয়া হয়েছে, তোমরা খাবে এস!"

গল্পটা চাপা পড়িয়া গেল। সকালেই আমার কাজের ভীড়। গল্প শুনিবার অবসর নাই। বলিলাম,—

"তোমার গল্পটা আর শোনা হ'ল না। আজ থেকে যাও—"

"না ভাই, জিনিসপত্র সব পৌঁছে গেছে, স্টেশনেই পড়ে আছে হয়ত। গল্পটা লিখে পাঠিয়ে দেব, তবে যে ঘটনাটা বলতে যাচ্ছিলাম তাতে আমার কৃতিত্ব কিছু নেই। তবে গল্পটা তোমার মন্দ লাগবে না বোধ হয়। বীভৎস গল্প, তবে তার অন্তরালে কিছু পাবে হয়তো।"

বাজপেয়ী সেইদিনই চলিয়া গেল। দিন দশ-বারো পরে সত্যই সে নিম্নলিখিত গল্পটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল।

আমি যখন শেরপুরায় বদলি হইয়া আসিলাম তখন আমাকে প্রথম প্রথম একট

অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। একেবারে নূতন জায়গা, পরিচিত লোক তেমন কেহ নাই যে কাজকর্মের পর দুই দণ্ড গল্প করিয়া কাটাই। তখনও আমি বিবাহ করি নাই, মন্ত্রও লই নাই। অবসর পাইলে তাস খেলিতাম। কিন্তু শেরপুরায় তখন কোনও ক্লাব ছিল না। সাধারণতঃ দারোগার সঙ্গীর অভাব হয় না, অনেকে বরং দারোগার সহিত ভাবই করিতে চায়। কিন্তু ইহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে-জাতীয় লোক হয় তাহাদের সহিত অবসর-বিনোদন করিবার মতো প্রবৃত্তি আমার তখন ছিল না। আমি যথাসম্ভব ন্যায়-নিষ্ঠ ভাবেই কাজ করিবার চেষ্টা করিতাম এবং পারতপক্ষে এমন কোনও লোকের সহিত মিশিতাম না, যাহারা আমার নিষ্ঠাকে বিচলিত করিতে পারে। সুতরাং শেরপুরায় প্রথম কিছুদিন নিঃসঙ্গ জীবনই যাপন করিতে হইয়াছিল। হঠাৎ একদিন বিধাতা কৃপা করিলেন, বাল্যবন্ধু সুরনাথের সহিত বহুকাল পরে হঠাৎ পথে দেখা হইয়া গেল। সুরনাথ শুধু আমার বাল্যবন্ধুই নয়, আমার দূরসম্পর্কের ভগ্নীপতিও। বলা বাহুল্য হাতে স্বর্গ পাইলাম। শুনিলাম সুরনাথ শেরপুরা হইতে ক্রোশ দুই দূরে সস্তায় কিছু জমি কিনিয়াছে এবং সেই জমিতেই বসবাস করিতেছে। আমাকে সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। প্রতিশ্রুতি দিলাম—যাইব এবং সেইদিনই গেলাম। আমার ঘোড়া ছিল, বিশেষ কোন অসুবিধা হইল না। বৈকালে গিয়াছিলাম, তখনও দিনের আলো ছিল। দেখিলাম সুরনাথ যে-স্থানে বসবাস করিয়াছে সে-স্থানটি লোকালয়ের একেবারে বাহিরে। একটু বিস্মিত হইলাম। বীরভূম জেলায় তাহার বাড়ি ছিল, কিছু জমিদারীও ছিল, সে এরকম নির্বান্ধব পুরীতে আসিয়া বসবাস করিতে গেল কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"মীনুও এখানে আছে তো?"

মীনু আমার দূরসম্পর্কীয়া সেই ভগ্নীর নাম।

"না, সে ভাই অনেকদিন আগে মারা গেছে। সেই জন্যেই তো দেশে আর ভাল লাগল না। এখানে পালিয়ে এসেছি—"

"দেশের বিষয়-সম্পত্তি?"

"সব বিক্রি করে দিয়ে এখানেই বিঘে পঞ্চাশেক জমি কিনেছি—"

"ছেলে-পিলে হয়নি?"

"না—"

"একেবারে একা থাক এখানে ?"

"ঠিক একা নয়। ওই যে দূরে একটা বাড়ি দেখছ ওখানে আমার এক বন্ধু থাকে। সে-ও আমার সঙ্গেই জমি কিনেছিল। দু'জনে একসঙ্গে চাষবাস করি, বেশ আছি। ওরে ভজুয়া, চা নিয়ে আয়! চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে না কি ?"

"না—"

"আর বিয়ে করনি ?"

"না। ওসবে আর রুচি নেই।"

ভজুয়া একটু পরে চা লইয়া আসিল। ভজুয়াকে দেখিয়া অস্বস্তি বোধ করিলাম। কুচকুচে কালো রং, খুব লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। কিছু গোঁফ-দাড়িও আছে, কিন্তু সুবিন্যস্ত নয়, খাপ্‌চা-খাপ্‌চা। চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ভয়ঙ্কর। মনে হয় শ্বাপদের চক্ষু। ভজুয়া চা দিয়া চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"এ চাকর কোথায় পেলে ? এখানকারই লোক ?"

"না, বাইরের। মাসখানেক হ'ল এসেছে। কেন ?"

"অতি বদ চেহারা।"

"তা বটে। মাইনে নেয় না, পেট-ভাতাতেই কাজ করে, তাই রেখেছি। চেহারা খারাপ বটে কিন্তু খুব কাজের, জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কাজ করতে পারে। চেহারাটা অবশ্য খুবই খারাপ।"

ভজুয়া-প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। সুরনাথের বন্ধু কালীপ্রসাদ দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিলেন। লোকটি একচক্ষু। আলাপ করিয়া মনে হইল বেশ আমোদপ্রিয়। প্রকাশ পাইল তিনিও অবিবাহিত। আমারও তখন বিবাহ হয় নাই। হাসিয়া বলিলাম,—

"চতুর্থ আর একজন অবিবাহিত লোক জুটলে আমরা ব্যাচিলার্স কার্ড-ক্লাব করতে পারতাম—"

কালীপ্রসাদ বলিলেন,—

"আছেন একজন। আমাদের সঙ্গে তেমন আলাপ হয় নি এখনও। মাস দুই আগে তিনিও এখানে জমি কিনবেন ব'লে এসেছেন। সুরনাথ, মিস্টার বক্‌সীকে খবর পাঠাও না একটা, দারোগাবাবুর নাম শুনলে হয়তো চ'লে আসবেন! আমাদের সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপটাও হয়ে যাবে, কার্ড-ক্লাবটারও গোড়া-পত্তন হবে—"

"বেশ, ভজুয়াকে পাঠাচ্ছি।"

একটা চিঠি লইয়া ভজুয়া সাইকেল চড়িয়া চলিয়া গেল। আমরা গল্প করিতে লাগিলাম। গল্প কিন্তু জমিল না। কালীপ্রসাদবাবুর অদ্ভুত এক-চক্ষুটি গল্পের রসভঙ্গ করিতে লাগিল। শেষে না জিজ্ঞাসা করিয়া পারিলাম না।

"আপনার চোখটি গেল কি করে?"

"এক বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলাম।"

"বাঘিনী? শিকার করার শখ আছে নাকি?"

"ছিল এককালে।"

কালীপ্রসাদবাবুর চোখে অদ্ভুত একটা ভাব ক্ষণিকের জন্য ফুটিয়া উঠিল। দেখিলাম স্বরনাথও তাহার দিকে চাহিয়া একটা অদ্ভুত হাসি হাসিতেছে। আমি বলিলাম,—

"তাহলে তো আপনি গুণী লোক মশায়। বলুন, বলুন, শুনি আপনার শিকার-কাহিনী—"

কালীপ্রসাদবাবু হাসিয়া উত্তর দিলেন—

"সে অনেক লম্বা কাহিনী, আর একদিন শুনবেন। আজ আমার একটু কাজ আছে—"

কালীপ্রসাদবাবু উঠিয়া পড়িলেন। আমার মনে হইল গল্পের সুরটা যেন কাটিয়া গেল। কালীপ্রসাদবাবু চলিয়া যাইবার পর আর একটা ব্যাপারে একটু বিস্মিত হইলাম। বাড়ির ভিতরের দিক হইতে নারীকণ্ঠের একটা কলহাস্য ভাসিয়া আসিল। স্বরনাথ সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে চাহিল অর্থাৎ বুঝিবার চেষ্টা করিল হাসিটা আমি শুনিয়াছি কি না, শুনিয়া থাকিলে কি ভাবে তাহা গ্রহণ করিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"বাড়িতে কোনও মেয়েছেলে আছে না কি?—"

"তা আছে বই কি। চাকরানী আছে, চাকরদের বউ আছে। কেন তুমি অন্য কিছু ভাবছ না কি?"

"না, না!—"

স্বরনাথের চোখে-মুখে কেমন একটা হিংস্রভাব যেন ক্ষণিকের জন্য মূর্ত হইয়া মিলাইয়া গেল। স্বরনাথ আমার বাল্যবন্ধু, তাহার সহিত আত্মীয়তাও আছে, কিন্তু

সহসা অনুভব করিলাম তাহাকে আমি চিনি না। যাহাকে আমি চিনিতাম, সে অন্য লোক।

ভজুয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল বক্সীবাবুর মাথা ধরিয়াছে বলিয়া আসিতে পারিলেন না।

আমিও উঠিয়া পড়িলাম। আমার ঘোড়া ছিল। ঘোড়ায় উঠিতে যাইতেছি এমন সময় ভজুয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—

"হুজুর, আমি লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে আপনাকে মাঠটুকু পার করে' দিয়ে আসি—"

"কেন ?—"

"এ-মাঠে বড় বড় গোখরো সাপ আছে হুজুর। সেদিন একটা ঘোড়াকেই কামড়েছিল।"

সুরনাথও সে-কথার সমর্থন করিল। বলিলাম,—

"তবে চল—"

আমি অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলাম। ভজুয়া লাঠি ও লণ্ঠন লইয়া আমার আগে আগে চলিতে লাগিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

"তোমার দেশ কোথা ?"

"আজ্ঞে মানভূম, হুজুর। পুরুলে থেকে কোশ পাঁচেক হবে।"

"দেশ ছেড়ে এখানে এলে কেন ?"

"কলেরায় সব মরে গেল যে হুজুর। তাই যেদিকে দু'চোখ যায় বেরিয়ে এলাম—"

ভজুয়াকে বেশী দূর যাইতে হইল না। কারণ আমার হাবিলদার সাহেব সাইকেলে চড়িয়া আমার খোঁজে আসিতেছিলেন। থানায় একটা দাঙ্গার সংবাদ আসিয়াছিল। হাবিলদার সাহেব দেখিলাম ভজুয়াকে চেনেন। বলিলেন,

"কে ভজু না কি! আজ শহরে যাও নি ?—"

"না।"

ভজুয়া চলিয়া গেলে হাবিলদার সাহেব বলিলেন, ভজু প্রত্যহ গাঁজা কিনিবার জন্য আবগারির দোকানে যায়। বলিয়া একটু হাসিলেন।

"তাই নাকি! আপনি জানলেন কি করে' ?"

"আমিও ভাং কিনতে যাই যে। রোজই দেখা হয়।"

"ও—"

হাবিলদার সাহেব আর একটা কথাও বলিলেন।

"ভজু খুব গুণী লোক, হুজুর। অনেক রকম গাছ-গাছড়া চেনে, অনেক ভাল ওষুধও দিতে পারে। শুনলাম সুরনাথবাবু ওঁকে নিজের চিকিৎসার জন্যেই রেখেছেন।"

"সুরনাথবাবুর অসুখ আছে না কি কোনও? দেখে তো কিছু মনে হ'ল না।"

হাবিলদার সাহেব কয়েক সেকেণ্ড চুপ করিয়া থাকিয়া একটু নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—

"শুনেছি পুরোনো গনোরিয়া। এখানকার অনেক ডাক্তার কবিরাজ হাকিম ওঁর চিকিৎসা করেছেন, কিছু হয়নি। এখন ভজু ওকে ওষুধ দিচ্ছে—"

আমি এ-সব খবর শুনিয়া শুধু বিস্মিত নয়, একটু বিচলিতও হইলাম।

"আপনি এত-সব খবর জানলেন কি করে'?"

"আমি তো এখানে অনেকদিন আছি হুজুর। অনেকের অনেক খবর জানি। সুরনাথবাবুর সব্‌জি বাগানের মালীই আমাকে বলেছিল একদিন। সুরনাথবাবু আপনার কেউ হয় না কি—"

এ-সব খবর শোনার পর তাহার সহিত আত্মীয়তা আছে এ-কথা আর বলিতে পারিলাম না। বলিলাম,—

"ছেলেবেলায় এক সঙ্গে এক স্কুলে পড়তাম, সেদিন রাস্তায় হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল। হইলা।ল, তাই এসেছিলাম—"

সুরন হাবিলদার বলিলেন,—

শু "ওঁর ভারি বদনাম এখানে। ওঁর কানা দোস্তটিও ভাল নয়।"

উপরোক্ত ঘটনার পর আমি আর সুরনাথের কাছে যাই নাই, যাইবার উৎসাহ পাই নাই। একদিন কিন্তু যাইতে হইল। গভীর রাত্রে সুরনাথের একটি চাকর, ভজুয়া নয়, অন্য চাকর, আসিয়া আমাকে যে-সংবাদটি দিল তাহা ভয়ানক। বলিল, সুরনাথকে এক প্রকাণ্ড গোক্ষুর দংশন করিয়াছে। সুরনাথ অবিলম্বে আমাকে একজন ডাক্তার লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—

"সাপে কামড়েছে? সাপটাকে দেখেছিস?"

"সবাই দেখেছে হুজুর, প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ! বাবুর ঠোঁট মুখ সব নীল

হয়ে গেছে। অতি কষ্টে কথা বলতে পারছেন, অতি কষ্টে আপনার কথা বললেন—’

ডাক্তার মৈত্রকে লইয়া যতশীঘ্র সম্ভব অকুস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখিলাম সুরনাথ মারা গিয়াছে। তাহার মুখটা নীল, মনে হইতেছে কেহ যেন কালি মাখাইয়া দিয়াছে। পায়ের গোছে দুই তিন স্থানে দড়ি বাঁধা রহিয়াছে, শুনিলাম পায়ের পাতায় সাপটা কামড়াইয়াছিল। ক্ষতস্থানের উপর ভজুয়া কি একটা জংলি-গাছের পাতা বাটিয়া লাগাইয়া দিয়াছে। ডাক্তার মৈত্র পাতা-বাটাটা জল দিয়া পরিষ্কার করিয়া ক্ষত-চিহ্নটি দেখিলেন। দুইটি কালো কালো বিন্দু পাশাপাশি দেখা গেল। দুইটি বিন্দুর মধ্যে প্রায় আধ ইঞ্চি ব্যবধান! ডাক্তার মৈত্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া টর্চ ফেলিয়া বিন্দু দুইটিকে বারবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন,—

“খুব বড় সাপ মনে হচ্ছে। সাপটা কত বড় ছিল—?”

“প্রকাণ্ড সাপ হুজুর। পাঁচ ছ’হাত হবে—”

ভজুয়া বলিল, “আরও বড়।”

আমি ডাক্তার মৈত্রকে প্রশ্ন করিলাম—

“বড় সাপ বুঝলেন কি করে’?”

“দুটো দাঁতের মাঝখানে কত বড় ফাঁক দেখছেন না? আমি এত বড় ফাঁক আগে দেখিনি।”

ভজুয়া বলিল, “অত বড় সাপও, আজ্ঞা, আমরা দেখিনি কখনও। কি বল যদু?”

যদু নামক মালীটি সে-কথা স্বীকার করিল। আরও অনেকে সাপটি দেখিয়াছিল। সকলেই সমস্বরে বলিল সাপটি সত্যই প্রকাণ্ড বড়। ঘরের মধ্যে এবং বারান্দায় প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন লোক সমবেত হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—

“এতগুলো লোক সবই কি সুরনাথের চাকর?”

কে একজন উত্তর দিল,—

“কালীপ্রসাদবাবুর চাকরদেরও ভজুয়া ডেকে এনেছে।”

“কালীপ্রসাদবাবু কোথা?”

“তিনি আসেন নি তো দেখছি! ঘুমুচ্ছেন বোধ হয়।”

ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক বোধ হইল।

"ভজুয়া কালিপ্রসাদবাবুকে খবর দেয়নি ? ভজুয়া কোথা গেল ?—"

ভজুয়ার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ভিড়ের ভিতর হইতে একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল,—

"বাবুকে কি ডেকে আনব ?"

"তুমি কে ?"

"আমি তাঁর চাকর। তিনি ন'টার পর ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েন। ঘুম এসে গেলে ভজুয়া তাঁর ঘুম ভাঙাতে মানা করে' দিয়েছে, তাই তাঁকে আমরা কেউ ওঠাই নি—"

"ভজুয়া মানা করেছে !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এঁরা দু'জনই তো ভজুয়ার তৈরি কি ওষুধ রোজ খান। আমি ডেকে আনছি তাঁকে—"

লোকটি চলিয়া গেল। আমি যদু নামক মালীটির নিকট হইতে সন্ধ্যা হইতে কি কি ঘটিয়াছিল, কে কে আসিয়াছিল খবর লইতেছিলাম এমন সময় সেই লোকটি, যে কালীপ্রসাদবাবুকে ডাকিতে গিয়াছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে কালীপ্রসাদবাবুকে কে খুন করিয়া গিয়াছে।

আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া যাহা দেখিলাম তাহা ভয়াবহ। দেখিলাম— কালীপ্রসাদবাবুর দ্বিতীয় চক্ষুটি কে উপড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। সমস্ত বালিশ রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। আর একটা চমকপ্রদ ঘটনাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল। কালী-প্রসাদবাবুর ঘরের পাশেই আর একটা ছোট ঘর ছিল। সেই ঘরের ভিতর হইতে একটা খড় খড় শব্দ শোনা গেল। দুই ঘরের ভিতর ছোট একটা বন্ধ কপাট ছিল। কপাটটা খুলিতে তাহার ভিতর হইতে প্রকাণ্ড একটা নেউল বাহির হইয়া আসিল এবং নিমেষের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। সকলেই দেখিতে পাইল নেউলটার পায়ে এবং মুখে রক্ত মাখা। সে যেদিক দিয়া চলিয়া গেল লণ্ঠন লইয়া দেখিলাম রক্তাক্ত পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণের জন্যে আমরা সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। বলিলাম—

"ভজুয়াকে ডাক !"

ভজুয়ার কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সে অন্তর্ধান করিয়াছিল। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাহাকে আর পাওয়া গেল না। একজন বলিল,—

"সে হয়তো বক্‌সীবাবুকে খবর দিতে গেছে—"

"দেখ তো!—"

আমি এবং ডাক্তারবাবু বাড়িটির চারিদিক লণ্ঠন এবং টর্চ লইয়া যতটা পারিলাম দেখিলাম। অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। যে লোকটি বক্‌সীবাবুর বাড়ি গিয়াছিল সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল বক্‌সীবাবুর বাড়িতে ভজুয়া তো নাই-ই, বক্‌সীবাবু-ও নাই।

তখন ডাক্তারবাবুকে বলিলাম,—

"ব্যাপার ক্রমশ ঘোরতর হয়ে আসছে ডাক্তার মৈত্র। আমি তো সঙ্গে কোনও পুলিশ আনি নি। আপনি বাইক করে' থানায় চলে যান, হাবিলদার সাহেবকে জনকয়েক কনেস্টবল নিয়ে এখুনি চলে' আসতে বলুন! তারা যেন বন্দুকও আনে।"

ডাক্তার মৈত্র বলিলেন,—

"আমি যাচ্ছি, লাস দু'টোকে পোস্টমর্টেম করতে হবে। আমার বিশ্বাস এর ভিতর অনেক রহস্য আছে।"

পুলিশ এবং বন্দুকের নাম শুনিয়া অনেকেই সরিয়া পড়িল। আমি, সুরনাথের মালী যদু এবং আরও গোটা দুই লোক হাবিলদার সাহেবের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। এ-রকম অভিজ্ঞতা আমার আর কখনও হয় নাই। ফাঁকা মাঠের মাঝে অসংখ্য ঝিল্লী ডাকিতেছে, আকাশে নক্ষত্রের ঝাঁক, কাছে দূরে বড় বড় গাছ। বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম কে ইহাদের খুন করিল এবং কেন করিল। সুরনাথের মৃত্যু যে সর্পাঘাতে হয় নাই এবং কালীপ্রসাদের চক্ষুও যে নেউলে উপড়াইয়া লয় নাই এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সাপটাকে অনেকে দেখিয়াছে, নেউলটাকেও আমরা দেখিলাম, নেউলটার মুখে এবং পায়ে রক্তও ছিল। ডাক্তার মৈত্র বলিতেছেন সুরনাথের পায়ের ক্ষত-চিহ্নটি সন্দেহজনক, ক্ষত-বিন্দু দুইটির মধ্যে ফাঁক অনেক বেশী, কিন্তু সাপ যদি প্রকাণ্ড হয় তাহা হইলে......আমার চিন্তা-ধারা সহসা ব্যাহত হইল। একটা নারীকণ্ঠের কলহাস্যে চমকাইয়া উঠিলাম। মনে পড়িল প্রথম দিনও ওই হাসি শুনিয়াছিলাম। যদুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"হাসছে কে?"

"ছুক্‌রি বোধ হয়।"

"ছুক্‌রি কে ?"

যদু একটু চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর উত্তর দিল—

"ওকে বাবু কিছুদিন আগে রেখেছিল।"

"কোথা সে ?"

"ভিতরে আছে বোধ হয়।"

"ডেকে নিয়ে এস তো !"

যদু ভিতরে চলিয়া গেল, একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—

"কই ভিতরে দেখছি না, বাইরে কোথাও আছে বোধ হয় !"

"ডাক তাকে।"

"বাইরে বড় অন্ধকার বাবু। আমার ভয় করছে বেরুতে !"

যদুর দোষ ছিল না, আমার নিজেরই গা ছমছম করিতেছিল। যে লণ্ঠনটা জ্বলিতেছিল সেটারও শিখা ক্রমশ ম্লান হইয়া আসিতেছিল। নাড়িয়া দেখিলাম তেল নাই। শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম।

"আর তেল আছে ?"

"তেল আর নেই। তবে পেট্রোম্যাক্‌স আছে একটা। তাতে তেল থাকতে পারে। পিছন দিকের ঘরে আছে পেট্রোম্যাক্‌সটা—"

"পেট্রোম্যাক্‌সটাই জ্বাল। স্পিরিট আছে তো ?"

"দেখি—"

যদু লণ্ঠনটা লইয়া ভিতরে গেল এবং একটু পরেই আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—'সাপ, সাপ—'

ছুটিয়া গেলাম, দেখিলাম পিছনের ঘরে সত্যই একটা বিরাট গোক্ষুর ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যদু বলিল—

"সাপটা ওই ঝুড়ির মধ্যে ছিল। এ-রকম ঝুড়ি এখানে আগে দেখি নি। তাই মনে হ'ল এটা কোথা থেকে এল। যেই তুলে দেখতে গেছি—আর অমনি বাপরে বাপ ! উঃ খুব বেঁচে গেছি—"

যদু ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। আমি দেখিলাম ঝুড়িটা সাপুড়েদের ঝুড়ি। সাপটা ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার কাছে লোডেড্ রিভলভারটা ছিল, সাপটা পলাইতে পারিল না। এক গুলিতেই ভূশায়ী হইল। গুলিটা মাথায় লাগে

নাই, ঘাড়ের কাছে লাগিয়াছিল। আবার সেই হাসিটা শুনিতে পাইলাম। এবার অনেক দূরে। কি যে করিব মাথায় আসিল না। হাবিলদার সাহেব ও কনেস্টবলরা না আসা পর্যন্ত কিছুই করিবার উপায় ছিল না। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে তাহারা আসিল। তাহারা আসিবার পর চারিদিকটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। কিন্তু ভজুয়া বা ছুকরির সন্ধান পাইলাম না। বক্সীবাবুও অন্তর্ধান করিয়াছিলেন।

পাঁচ ছয়জন পুলিশকে পাহারায় রাখিয়া আমি অবশেষে ফিরিয়া গেলাম। পরদিন বোঝা গেল পুলিশরা অবশ্য জাগিয়া পাহারা দেয় নাই, কারণ সকালে পোস্টমর্টেম (শব-ব্যবচ্ছেদ) করিবার জন্য ডোমেরা যখন লাস লইতে আসিল, তখন দেখা গেল সুরনাথেরও চক্ষু দুইটি নাই, কেবল দুইটি রক্তাক্ত গহ্বর রহিয়াছে। শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া উভয়েরই পেট হইতে প্রচুর আফিং পাওয়া গেল। সিভিল সার্জন বলিলেন আফিংই উভয়ের মৃত্যুর কারণ। সাপটার শবও ব্যবচ্ছেদিত হইয়াছিল, এটা অবশ্য ডাক্তার মৈত্র আলাদা করিয়াছিলেন। দেখা গেল সাপটার বিষ দাঁত নাই, দুই একদিন পূর্বেই তাহা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে।

এ বিষয়ে সন্দেহ রহিল না যে বক্সীবাবু, ভজুয়া এবং ছুকরিই এই রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট। কয়েকটা পায়ের এবং হাতের ছাপ সংগ্রহ করিয়া আমরা 'হুলিয়া' করিয়া দিলাম, পুরস্কারও ঘোষণা করিলাম, কিন্তু তাহাদের আর নাগাল পাইলাম না। কেন যে তাহারা উভয়কে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারি নাই, কারণ সুরনাথ এবং কালীপ্রসাদের একটি জিনিসও চুরি যায় নাই।

বুঝিতে পারিলাম মাসখানেক পরে। একটি পত্র আসিয়া রহস্যোদ্ঘাটন করিল। পত্রটি এই—

দারোগাবাবু,

ইতিপূর্বে বহুবার আপনাদের ফাঁকি দিয়াছি, এবারও দিলাম। এ পত্র আপনাদের লিখিতাম না, কিন্তু পাছে আপনারা কতকগুলি নির্দোষ লোককে ধরিয়া সাজা দেন, তাই সত্য ঘটনাটা প্রকাশ করিতেছি। যাহাদের আমরা খুন করিয়াছি তাহারা উভয়েই চরিত্রহীন দুর্বৃত্ত ছিল। অকথ্য অসংযমের ফলে উভয়েরই সিফিলিস, গণোরিয়া তো হইয়াছিলই, উভয়ে অসমর্থও হইয়া পড়িয়াছিল। দৈহিক অপটুতা কিন্তু তাহাদের মানসিক কামনাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। স্ত্রী-সম্ভোগ করিবার

ক্ষমতা তাহাদের ছিল না, কিন্তু বাসনা লোপ পায় নাই। এ নষ্ট ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবার জন্য বহুপ্রকার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। অবশেষে তাহারা এক ভয়াবহ কাণ্ড করিয়া বসিল। জানি না কাহার নিকট হইতে তাহারা শুনিয়াছিল যে, কোনও জীবন্ত কুমারীর চক্ষু উপড়াইয়া যদি তাহা কাঁচা গিলিয়া খাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের যৌবন ফিরিয়া আসিবে। এই বিশ্বাসে একদিন রাস্তা হইতে একটি ছোট মেয়েকে তাহারা ভুলাইয়া লইয়া যায়। মেয়েটি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু বিধাতার এমনই চক্র যখন তাহারা একটি নির্জন পোড়ো বাড়িতে মেয়েটির চক্ষু উৎপাটন করিতেছিল, তখন মেয়েটির মাসি সেখানে আসিয়া পড়ে। মেয়েটির মাসি চুড়ি ফেরি করিত। চুড়ি ফেরি করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ওই পোড়ো বাড়ির ভিতরের দিকের বারান্দায় একটু হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য সে মাঝে মাঝে সেখানে আসিত। সেদিন আসিয়া সে দেখিল, ভিতরের দিকে একটা ঘরে বসিয়া দুইটা লোক মদ খাইতেছে, তাহাদের হাতে, কাপড়ে রক্তের দাগ। তখনও সে বুঝিতে পারে নাই যে তাহার বোনের মেয়েকেই তাহারা নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। সে নিঃশব্দে ঢুকিয়াছিল এবং উঠানে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তাহাদের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছিল। হঠাৎ লোক দুইটা তাহাকে দেখিতে পাইল এবং জানালা টপকাইয়া পলায়ন করিল। তখন মেয়েটি কৌতূহলী হইয়া ঘরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহা মর্মান্তিক। তাহার বোনঝি মুনিয়ার রক্তাক্ত চক্ষুহীন মৃতদেহটা পাশের ঘরেই পড়িয়া ছিল। সে চীৎকার করিল না। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সে ভাবিল চীৎকার করিয়া লোক জড় করিলে সে নিজেই হয়তো খুনের দায়ে জড়াইয়া পড়িবে। সে পুলিশেও গেল না। আমার সহিত তাহার এবং তাহার বোনের যোগাযোগ আছে পুলিশের এ সন্দেহ ছিল, তাই তাহারা পুলিশকে এড়াইয়া চলিত। সে সোজা আমার নিকটে আসিয়া সমস্ত ঘটনা বলিল। আমার সহিত তাহাদের সম্পর্কের কথাটা খুলিয়া না বলিলে আপনার মনে হয়তো নানারূপ সন্দেহ হইতে পারে, তাই কথাটা খুলিয়াই বলিতেছি। আমি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবী দলের একজন। যে সব পুলিশ অফিসার আমাদের জ্বালাতন করিত, কিংবা আমাদের দলের যে সব লোক অ্যাপ্রুভার হইয়া আমাদের ধরাইয়া দিত, তাহাদের হত্যা করাই ছিল আমার প্রধান কাজ। প্রফুল্ল চাকীকে যে সাব-ইনস্পেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জি পুলিশে ধরাইয়া দেয়, সেই নন্দলাল ব্যানার্জিকে

আমিই হত্যা করি। এ সব কাজ করিবার জন্য আমাদের অনেক রকম লোকের সহিত যোগাযোগ রাখিতে হইত। এই চুড়ি-ওয়ালী ভগ্নী দুইটি আমাকে অনেক খবর আনিয়া দিত। তাহারা আমাকে গুরুর মতো ভক্তি করিত, আমিও তাহাদের স্নেহ করিতাম। আমি গিয়া সেই হতভাগিনী বালিকার মৃতদেহটি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম, তাহার মা-ও আমার সঙ্গে গিয়াছিল। আমরাও অনেক খুন করিয়াছি, কিন্তু এরূপ বীভৎস ব্যাপার আমাদের-ও জীবনে ঘটে নাই। কন্যার এই শোচনীয় মৃত্যুতে তাহার মা কিন্তু এক বিন্দু চোখের জল ফেলে নাই। তাহার দৃষ্টি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়াছিল। এই দুই ভগ্নি 'জিপ্‌সি' জাতের মেয়ে, ইহাদের নীতি-জ্ঞান খুব বিশুদ্ধ নয়, তাছাড়া ইহারা ভয়ানক প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাহারা আমাকে বলিল ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে, আমি যেন তাহাদের সাহায্য করি।

সেইদিন হইতে ঐ দুইটি নর-রূপী পিশাচের আমি পিছু লইয়াছি। উহাদের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। উহাদের একদিনও চোখের আড়াল করি নাই। উহারা যখন শেরপুরে জমি কিনিয়া বসবাস আরম্ভ করিল, তখন আমিও উহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলাম এবং প্রচার করিলাম যে আমিও জমি কিনিয়া তাহাদের প্রতিবেশী হইব। কিছুদিন আলাপ করিয়া বুঝিলাম উহাদের কাম-প্রবৃত্তি এখনও প্রশমিত হয় নাই। যুবতী নারী দেখিলে এখনও উহারা লোলুপ হইয়া ওঠে এবং ছলে বলে কৌশলে তাহাকে নিজেদের আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করে। আমি উহাদের এই কামপ্রবৃত্তির সুযোগ লইলাম। যাহার কন্যাকে উহারা নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল, সে গিয়া উহাদের সহিত বসবাস করিতে রাজি হইল। জিপ্‌সি মেয়েদের মোহিনী শক্তি উহার ছিল, সুতরাং বেশী বেগ পাইতে হইল না। একদিন চুড়ি বিক্রয় করিবার ছলে সে কালীপ্রসাদবাবুর বাসায় গেল এবং আর ফিরিল না। সেখানেই রক্ষিতারূপে থাকিয়া গেল। ইহার দিন দশেক পরে একদিন দেখিলাম কালীপ্রসাদ-বাবু বাম চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন তিনি একটা জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন হঠাৎ একটা বাঘিনীর দেখা পান, বাঘিনীটা চোখে একটা থাবা মারিয়াছে। আমি মনে মনে হাসিলাম, বুঝিলাম বাঘিনীটি কে। আলিঙ্গনাবদ্ধ ছুক্‌রিরই নখরাঘাতে তাহার চক্ষুটি নষ্ট হইয়াছিল। আমি ছুক্‌রিকে সাবধান করিয়া দিলাম, প্রকাশ্যভাবে সে যেন আর কিছু না করে। কিন্তু ওই লোক দুইটা এমন কামান্ধ ছিল যে ওই ঘটনার পরও

তাহারা ছুকৃরিকে বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দেয় নাই। ছুকৃরির মুখ হইতেই আমি খবর পাই যে, উহারা উভয়েই পুরুষত্বহীন। তখনও আমি ঠিক করিতে পারি নাই, কি উপায়ে উহাদের হত্যা করিব। এমন সময় হঠাৎ এক পুরাতন বন্ধুর সহিত দেখা হইয়া গেল। কিছুদিন আমি সাপুড়ের ছদ্মবেশে সাপুড়েদের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ভজুয়া নামক যে লোকটিকে আপনারা দেখিয়াছিলেন সে আমার পুর্বপরিচিত একজন সাপুড়ে। তাহাকে পুর্বে আমি কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলাম। আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখিয়া সে পুলকিত হইল, আমার বাসাতেই আসিয়া আড্ডা গাড়িল এবং নিজের নানা দুঃখের বর্ণনা করিয়া অবশেষে কিছু অর্থ ভিক্ষা করিল। দেখিলাম তাহার নিকট একটি প্রকাণ্ড গোক্ষুর এবং একটি প্রকাণ্ড নেউল রহিয়াছে। নেউল ও সাপের খেলা দেখাইয়া সে অর্থোপার্জন করে। সাপটা দেখিয়া আমি ভয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু সে বলিল সাপের বিষদাঁত নাই, কয়েকদিন অন্তর অন্তর সে বিষদাঁত ভাঙিয়া দেয়। ভজুয়াকে কাজে লাগাইব স্থির করিলাম। সাপ ও নেউল দুইটি ঝুড়িতে আমার পিছন দিকের একটি ঘরে বন্দী রহিল। ভজুয়াকে তখন সমস্ত কাহিনী খুলিয়া বলিলাম। কেবল অর্থের লোভে নহে, এই বীভৎস কাহিনী শুনিয়া ওই পিশাচ দুইটিকে শাস্তি দিবার আগ্রহেও সে আমাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল। আমি তখন প্ল্যান ঠিক করিলাম। তাহাকে বলিলাম, 'প্রথমে উহাদের কাছে গিয়া বলিতে হইবে যে তুমি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির দেশী ঔষধ জান। ধাতুদৌর্বল্য, প্রমেহ প্রভৃতি ব্যাধির অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ তোমার নিকট আছে। ইহাও তোমাকে বলিতে হইবে যে, অর্থভাবে তুমি কষ্ট পাইতেছ, যে কোনও কাজ পাইলে পেটভাতাতেও তুমি করিতে প্রস্তুত আছ। খুব সম্ভব ইহা শুনিয়া উহারা তোমাকে বহাল করিবে। তাহার পর তোমাকে চিকিৎসা শুরু করিতে হইবে। প্রথম প্রথম কিছুদিন উহাদের মদনানন্দ মোদক খাওয়াও। কিন্তু শেষ দিন একটু বেশী পরিমাণে আফিং খাওয়াইতে হইবে। সেই দিন তোমার সাপটাও একজনের ঘরে ছাড়িয়া দিয়া লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে যে সর্পাঘাতে উহার মৃত্যু হইয়াছে। একটা ছুঁচ লইয়া উহার পায়ের পাতায় দুইটা ক্ষতচিহ্ন করিয়া দিলে কাহারও কোন সন্দেহ হইবে না। মেয়েটির মায়ের একান্ত ইচ্ছা উহাদের চোখও উপড়াইয়া লইতে হইবে, না লইলে প্রতিশোধ পুরা হইবে না। সুরনাথের ঘরে যখন সাপ লইয়া সকলে ব্যস্ত থাকিবে তখন অহিফেন-বিষে অজ্ঞান

কিংবা মৃত কালীপ্রসাদের চোখটা ছুক্‌রি অনায়াসে উপড়াইয়া ফেলিতে পারিবে। চোখ ওপড়ানো হইয়া গেলে তোমার নেউলটার মুখে এবং সামনের পায়ে রক্ত লাগাইয়া পাশের ঘরে সেটাকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে অনেক বোকা লোকের হয়তো ধারণা হইবে যে, নেউলটাই কালীপ্রসাদের চক্ষুটি নষ্ট করিয়াছে। ছুকরির ইচ্ছা সুরনাথের চোখ দুইটাও সে উপড়াইবে। যদি সুযোগ পাওয়া যায় তাহার সে ইচ্ছা পুর্ণ করিবার চেষ্টাও আমরা করিব।'

আশা করি ব্যাপারটা এইবার আপনার নিকট পরিষ্কার হইয়াছে। আর একটা কথা বলিয়া পত্র শেষ করি। এ-পত্রের হস্তাক্ষর আমার নয়। ছুক্‌রি, ভজুয়া এবং বক্‌সী এ নাম তিনটিও ছদ্মনাম। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই আমরা এই এই নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলাম। আপনাদের আইনের চক্ষে আমরা অপরাধী। একটা সান্ত্বনা শুধু আছে উপর-ওয়ালার আইনে হয়তো আমরা ছাড়া পাইব। ইতি—

বক্‌সীবাবু

এই চিঠি পাইবার মাসখানেক পরে আমি ট্রেনে করিয়া একটা এন্‌কোয়ারি করিতে যাইতেছিলাম। মাঠের মাঝখানে ট্রেনটা থামিয়া গেল, শুনিলাম একটা লোক কাটা পড়িয়াছে। ট্রেন হইতে সকলে নামিয়া পড়িলাম। নামিয়া শুনিলাম লাইনের মাঝখানে একটা কুকুরছানা আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই কুকুরছানাটাকে বাঁচাইবার জন্য একটা লোক ছুটিয়া আসে এবং কুকুরছানাটাকে দূরে ফেলিয়া দেয়, কিন্তু নিজে সে পড়িয়া যায়। ড্রাইভার সময় মতো গাড়ি থামাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা না হইলে কাটা পড়িত। ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া দেখিলাম, ভজুয়া এবং একটি জিপ্‌সি মেয়ে একটি বলিষ্ঠ যুবককে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। যুবকটির মাথা হইতে রক্ত পড়িতেছে, জ্ঞান নাই। রেলের ধারে মাঠের মাঝখানে একটি জিপ্‌সিদের তাঁবু দেখিলাম। তাঁবুর সম্মুখে একটি কুক্কুরী তাহার নধর শাবকটিকে স্তন্যপান করাইতেছে।

সেদিন আমি ভজুয়া, ছুকরী এবং বক্‌সীবাবুকে ধরিতে পারিতাম। কারণ ওই বলিষ্ঠ যুবকটিই যে বক্‌সীবাবু তাহাতে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কিছুই করিলাম না। ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া মুগ্ধ নেত্রে কেবল চাহিয়া রহিলাম। জীবনে যে দুই চারিটি সৎকার্য করিয়াছি এইটি মনে হয় তাহার মধ্যে অন্যতম।

হীরের টুকরো

অশীতিপর বৃদ্ধ বিমল ডাক্তারের কাছে সেদিন যে রোগীটি আসিয়া হাজির হইলেন, তিনিও খুব বৃদ্ধ। যে যুবকটি রোগীর সঙ্গে আসিয়াছিলেন তিনিই প্রথমে ডাক্তারবাবুর সহিত আলাপ করিলেন।

বলিলেন, "আমার ঠাকুরদাকে একবার দেখতে হবে ডাক্তারবাবু। আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি—"

"কি হয়েছে তাঁর ?"

"মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। অনেকদিন থেকেই ওঁর মাথা খারাপ। সম্প্রতি কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে, তাই আপনার কাছে এনেছি।"

"কোথা থেকে আসছেন আপনারা ?"

"কোলকাতা থেকে।"

"কোলকাতা থেকে ? সেখানে কত বড় বড় ডাক্তার আছেন, তাঁদের ছেড়ে আপনি পাড়াগাঁয়ে আমার কাছে এসেছেন, আশ্চর্য তো !"

যুবক একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ করিয়া রহিলেন। আসল কারণটা ব্যক্ত করিতে তাঁহার কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। ডাক্তারের গুণের জন্য নয়, 'বিমল' এই নামটার জন্যই যে তিনি ঠাকুরদাকে তাঁহার কাছে লইয়া আসিয়াছেন, একথা তিনি বলিতে পারিলেন না। অথচ যে ডাক্তারের নাম 'বিমল' নয় তাহার কাছে ঠাকুরদা কিছুতেই যাইতে চান না। প্রথমেই গিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার নামটি কি'। নাম বিমল না হইলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসেন। মানসিক ব্যাধিতে যশস্বী দুই একজন ডাক্তারের সহিত তিনি ষড়্‌যন্ত্রও করিয়াছিলেন, তাঁহারা মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের নাম 'বিমল,' রোগীর হিতার্থে তাঁহারা মিথ্যা-ভাষণ করিতে আপত্তি করেন নাই, কিন্তু কোন ফল হইল না। ঠাকুরদা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াই উঠিয়া আসিলেন, তাঁহাদের ঔষধ স্পর্শ পর্যন্ত করিলেন না। একজন জোর করিয়া একটা ইনজেকশন দিয়াছিলেন, তাহাতে খানিকক্ষণ ঘুম হইয়াছিল, আর কিছু হয় নাই। মুখ দিয়া কোনও ঔষধ ঠাকুরদাকে খাওয়ানো যায় না। তিনি বলেন, 'আমার কোনো অসুখ নেই, ওষুধ খাব কেন ? আসল বিমলের সঙ্গে দেখা

হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' অথচ তিনি সমস্ত রাত ঘুমান না। খাওয়া-দাওয়ারও ঠিক নাই, অনেক সাধ্যসাধনা করিলে সামান্য কিছু খান। নিজের মনেই কাঁদেন, হাসেন। সময়ের জ্ঞানও লোপ পাইয়াছে। সকালকে বলেন সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বলেন সকাল। তারিখ বার কিছুই মনে থাকে না। একজন ডাক্তার বলিয়াছিলেন কোনও বিমল ডাক্তারের সহিতই ইঁহার রোগের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, তাহার সহিত দেখা হইয়া গেলেই অসুখ সারিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাই কোনও বিমল ডাক্তারের খবর পাইলেই সেখানে ঠাকুরদাকে লইয়া যান। বিমল নাম শুনিলে ঠাকুরদাও আগ্রহ দেখান।

বিস্মিত বিমলবাবু প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় আপনার ঠাকুরদা ?"

"বাইরে গাড়িতে বসে আছেন।"

"নিয়ে আসুন তাঁকে। আচ্ছা, দাঁড়ান একটু। আপনার কাছ থেকে ওঁর হিস্ট্রিটা জেনে নি একটু, উনি হয়তো কিছু বলবেন না। আপনি চেয়ারটায় ভাল করে বসুন—"

যুবকটি উপবেশন করিয়া বলিলেন, "আমিও বিশেষ কিছু জানি না। ঠাকুরদা বরাবরই বিদেশে বিদেশে ঘুরতেন, আমি বোর্ডিংএ হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতাম।"

"আপনার বাবা কোথায় ?"

"আমি শিশু বয়সেই পিতৃমাতৃহীন। নিকট-আত্মীয় বিশেষ কেউ নেই। ঠাকুরদার কাছেই আমি সাত বছর পর্যন্ত ছিলাম। তারপর উনি আমাকে বোর্ডিংএ দিয়ে দেন।"

"বোর্ডিংএর খরচ আপনার ঠাকুরদাদাই দিতেন ?"

"হ্যাঁ। উনি ছাড়া আর তো কেউ নেই আমার।"

"কি করতেন উনি, চাকরি ?"

"না, উনি চিত্রকর। ছবি বিক্রির টাকা থেকেই আমাদের সংসার চলত। বছরখানেক থেকে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ছবি আঁকেন না আর।"

"এখন কি করে সংসার চলে ?"

"আমি রোজগার করি কিছু।"

"কি করেন ?"

"প্রফেসারি।"

যুবকটির কুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া বিমল ডাক্তারের হৃদয়ে শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইল। ছেলেটি বিদ্বান, অথচ বাহিরে তাহার কোনও প্রকাশ নাই।

"আপনার ঠাকুরদার পাগলামিটা কি ধরনের বলুন তো, কি করেন—"

"নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই। রাত্রে ঘুমোন না। আপন মনে বিড়বিড় করে কি বলেন সর্বদা—"

"কি বলেন, শুনেছেন কিছু কখনও ?"

"একটি কথাই বার বার বলেন। 'এ ভার আমি আর বইতে পারছি না—এ ভার আমি আর বইতে পারছি না'। বলতে বলতে কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন।"

ডাক্তারবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

"ওঁর পাগলামিতে আর কোনও বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছেন কি ?"

যুবকটি এইবার একটু মুশকিলে পড়িলেন। সত্য কথাটা বলিলে ডাক্তারবাবু মনে আঘাত পাইবেন কি ? অথচ না বলিলে রোগের সূত্রটা হয়তো তিনি ধরিতে পারিবেন না, অবশ্য উহাই যদি রোগের সূত্র হয়। একটু ইতস্তত করিয়া অবশেষে সব কথা খুলিয়া বলাটাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন।

"করেছি। মনে হয় উনি কোন বিমল ডাক্তারকে খুঁজছেন। ডাক্তারের নাম বিমল না হলে সেখানে যেতেই চান না। আপনার কাছে বিশেষ করে এসেছি সেইজন্যেই—"

"ও। আপনার ঠাকুরদার নামটি কি ?"

"নিরঞ্জন সেন।"

"আপনার নামটি ?"

"বিকাশ।"

"আচ্ছা, আপনার ঠাকুরদাকে নিয়ে আসুন এবার।"

বিকাশবাবু বাহির হইয়া গেলেন এবং একটু পরে বৃদ্ধ শিল্পী নিরঞ্জন সেনকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বিমলবাবু দেখিলেন নিরঞ্জন সেনের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। একমুখ পাকা গোঁফ দাড়ি, মস্তক কেশবিরল। যে কয়গাছি চুল আছে তাহাও পাকা, অবিন্যস্ত এবং তৈলহীন। মুখে জরার চিহ্ন। কপালে, চোখের কোণে

বলি-রেখা, গালেব মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখের দৃষ্টিই কেবল এখনও বেশ তীক্ষ্ণ আছে। অতীতের সাক্ষী কেবল ওই দৃষ্টিটুকু। বিমলবাবু নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে যৌবনের বন্ধু নিরঞ্জনকে তিনি চিনিতে পারিতেন না। নিরঞ্জনকে দেখিয়া মনে মনে তিনি একটু অপ্রতিভও হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ধারণা ছিল নিরঞ্জন মারা গিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিবার কোনও প্রমাণ সে এতদিন দেয় নাই। দিবার সুযোগও অবশ্য ছিল না। লখ্নৌ হইতে চলিয়া আসিবার সময় বিমল ডাক্তার কোনও ঠিকানা কাহারও কাছে রাখিয়া আসেন নাই। সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটা ঘটিবার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি লখ্নৌ হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পর অনেক ঘাটের জল খাইয়া অবশেষে এই পল্লীগ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছেন। পঞ্চাশটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এতদিন পরে নিরঞ্জন আসিয়া হাজির হইয়াছে কি মনে করিয়া! চেহারার অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে।

বিমল ডাক্তার নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। নিরঞ্জনও নির্নিমেষে বিমলকে দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি ঘাড় ফিরাইয়া বিকাশকে বলিলেন—"তুমি বাইরে গিয়ে বোসো। এঁর সঙ্গে আমার গোপনীয় কিছু কথা আছে—।"

বিকাশ ইহা প্রত্যাশাই করিতেছিলেন, প্রতিবারই ঠাকুরদা একথা বলেন। তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দুই

আরও কিছুক্ষণ দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া রহিলেন। নিরঞ্জনই কথা কহিলেন প্রথমে।

"বিমল আমাকে চিনতে পারছ?"

"পারবার কথা নয়, কিন্তু পেরেছি। ছিলে কোথায় এতদিন?"

"ছিলাম না কোথায় তাই বরং জিগ্যেস কর। আমি সারাজীবন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। লছমী বেঁচে আছে?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিমল ডাক্তার বলিলেন, "আছে।"

"তার যে ছবিটা এঁকেছিলাম সেটা কি আছে তোমার কাছে?"

"আছে।"

"একবার দেখাও তো—"

"সেটা ভিতরে টাঙানো আছে। ছবিটা দেখতে চাইছ কেন, আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"না। তোমার চেহারা এত বদলে গেছে যে তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না। ছবিটাই একমাত্র প্রমাণ যে তুমি সেই বিমল। বহু বিমল ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমি নিঃসন্দেহ হতে চাই যে তুমি সেই বিমল।"

"বেশ, একটু বোসো তাহলে।"

বিমল ডাক্তার উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ফিরিলেন প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। সঙ্গে একটি বালক ভৃত্য প্রকাণ্ড একখানা ছবি বহন করিয়া আনিল। একটি নর্তকী নাচিতেছে। অপূর্ব ছবি। নিরঞ্জন সেন বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার অতীত কীর্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমার আর সন্দেহ নেই। ছবিটা নিয়ে যেতে পার।"

বালক ভৃত্য ছবিটা লইয়া চলিয়া গেল।

নিরঞ্জন প্রশ্ন করিলেন—"লছমী কি আমার সঙ্গে দেখা করবে? তাকে শুধু একটা কথা বলতে চাই। কথাটা খুবই মর্মান্তিক, তবু তার জানা উচিত।"

"কি কথা?"

"তার ছেলে আর বেঁচে নেই। তাকে আমি বড় করে তুলেছিলাম, লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, বিয়ে দিয়েছিলাম, তার একটি ছেলেও হয়েছিল, কিন্তু বিধাতার এমনি অভিশাপ প্লেগে ছেলে বউ দু-জনেই মারা গেল, বেঁচে রইল শুধু শিশুটা। তাকেও আমি মানুষ করে তুলেছি। কিন্তু আমি আর বেশীদিন বাঁচব না, তার জিনিস তার হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। আমার আর একটা আতঙ্কও হয়েছে, আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে আমি অভিশপ্ত। লছমীকে পাই নি, লছমী নিজেই আমার কাছে থাকতে চায় নি। সে তোমাকে বিয়ে করেছিল তাই বোধ হয় এখনও বেঁচে আছে। আমার কাছে থাকলে মরে যেত। ছেলেটাকেও তোমরা যদি নিয়ে নিতে হয়ত সে বেঁচে থাকত—"

নিরঞ্জন সেন রুদ্ধবাক হয়ে ক্ষণকালের জন্য নীরব হইয়া গেলেন। তাঁহার চোখ হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর তিনি বিমল ডাক্তারের হাত

দুটি চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "বিকাশ তোমাদের কাছেই থাকুক। লছমীকে বল তুমি, তুমি বললেই সে রাজী হবে—"

"সেই বিকাশই কি তোমার সঙ্গে এসেছে?"

"হ্যাঁ। খুব ভাল ছেলে, হীরের টুকরো—"

"ও কি সব কথা জানে?"

"না। কিন্তু ওকে আমি বলব সব। তার আগে লছমীর মত চাই, তোমারও মত চাই।"

বিমল ডাক্তার মাথায় হাত বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যেমন চলছে চলুক না। ও সব ঘাঁটিয়ে আর লাভ কি—"

"না, আমি আর পারছি না। যার জিনিস তার কাছে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। ওর ঠাকুরমার কাছেই ও বেঁচে থাকবে, আমার কাছে থাকলে বাঁচবে না। আমি অভিশপ্ত, অভিশপ্ত, অভিশপ্ত—"

নিরঞ্জন সেন চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখ দুইটা যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। বিমল ডাক্তার ভয় পাইয়া গেলেন।

"বেশ, তাই হবে। বিকাশ আমাদের কাছেই থাকবে। কিন্তু লছমীকে এত বড় মর্মান্তিক খবরটা তো চট করে' দেওয়া যাবে না, সইয়ে সইয়ে বলতে হবে। সে আমি বলব এখন। যদিও ছেলের সঙ্গে ওর বহুকাল ছাড়াছাড়ি হয়েছে, তবু ছেলে তো, তার মৃত্যু-সংবাদটা হঠাৎ এভাবে দেওয়া ঠিক হবে না। আমাদের আর কোনও সন্তান হয় নি, ও হয়তো আশা করে' আছে যে ওর ছেলে একদিন ফিরে' আসবে—"

"তুমি বলবে তাকে? প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ?"

"দিচ্ছি।"

"কতদিনের মধ্যে বলবে?"

"এই ধর মাসখানেক।"

"মাসখানেক পরে তাহলে আমি বিকাশকে বলতে পারি?"

"বেশ, বোলো।"

নিরঞ্জন সেন সোৎসুক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত বিমল ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"লছমীর সঙ্গে একবার দেখা হয় না? সে দেখা করবে কি, একবার বলে' দেখ না।"

"বললে হয়তো দেখা করবে। কিন্তু এখন দেখা করাটা উচিত নয়। দেখা হ'লেই ছেলের কথা উঠবে—"

"তাকে একবার দেখতে খুবই ইচ্ছে করছে ভাই—"

"দূর থেকে দেখতে পার। এই জানলাটা খুলে দিচ্ছি, ভিতরের দিকে বারান্দায় বসে আছে সে। ভালোভাবেই দেখতে পাবে এখান থেকে—"

বিমল ডাক্তার পিছনের দিকের একটি জানালা খুলিয়া দিলেন। নিরঞ্জন দেখিলেন বারান্দায় একটি বৃদ্ধা বসিয়া বই পড়িতেছে। মাথার চুল সাদা, মুখে জরার চিহ্ন, চোখে চশমা।

"ওই লছমী!"

"হ্যাঁ।"

"আশ্চর্য বদলে গেছে।"

"তুমিও বদলেছ, আমিও বদলেছি।"

নিরঞ্জন সেন নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তিন

ঠিক একমাস পরে বিকাশ একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিলেন নিরঞ্জন সেন গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। টেবিলের উপর নিম্নলিখিত পত্রটি রহিয়াছে।

ভাই বিকাশ,

আমি চললাম। আমার কাজ শেষ হয়েছে, এই ব্যর্থ জীবন বহন করবার আর কোনো সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি না। যাবার আগে একটি কথা তোমাকে বলে' যেতে চাই। তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, অনেক কবিতা, অনেক উপন্যাস পড়েছ, তাই আশা করছি আমার প্রথম যৌবনের উন্মাদনাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে। ঘটনাটা সত্যিই গল্পের মতো। প্রথম যৌবনে লখ্‌নৌ শহরে আমি লছমী নামে একটি নর্তকীকে ভালোবেসেছিলাম। তার সঙ্গে একঘরে বাস করেছিলাম, তার গর্ভে

আমার একটি ছেলেও হয়েছিল। লছমীর সুন্দর ছবিও এঁকেছিলাম একটি। ভেবেছিলাম তাকে বিয়ে করে' সুখের সংসার গড়ে তুলব। কিন্তু তা আর হ'য়ে উঠল না। তার এক ডাক্তার প্রণয়ী জুটল। প্রণয় শেষে এমন গাঢ় হল যে লছমী অবশেষে আমাকে বলল—আমি তোমার সঙ্গে আর থাকতে চাই না। আমি ঠিক করেছি বিমলবাবুকে বিয়ে করব। বললাম—সে কি, তোমার ছেলে হয়েছে—! লছমী হেসে উত্তর দিলে, তোমার ছেলে তুমি রাখতে পার, আমি কিন্তু বিমলবাবুকেই বিয়ে করব। জিজ্ঞাসা করলাম, বিমলবাবু বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন? সে একটু হেসে বললে, পরশুদিন রেজিস্ট্রি করে' আমাদের বিয়ে হয়েও গেছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম, সত্যিই আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না। তার পরদিনই লছমী কাউকে কিছু না বলে নিজের ছেলেকে ফেলে রেখে আমাকে ছেড়ে চলে গেল বিমলের সঙ্গে। বিমল ডাক্তার ছোট একটি চিঠি লিখে গিয়েছিল—'স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তোমার আঁকা লছমীর ছবিটি নিয়ে যাচ্ছি। রাগ কোরো না, বন্ধু।' সত্যিই বিমল ডাক্তার আমার বন্ধুই ছিল। তার কাছে এ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নি। লছমীর উপর আমার কিন্তু রাগ হল না। মনে হল ওরা উর্বশীর জাত, কোথাও কোনো কারণেই বাঁধা পড়ে না কখনও। নিজের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে ছেলেটিকেই মানুষ করে তুলতে লাগলাম। সে বড় হ'ল, লেখাপড়া শিখল, তার বিয়ে দিলাম, ছেলেও হ'ল একটি। আবার পড়ল অভিশাপের বজ্র। প্লেগ এপিডেমিকে আমার ছেলে বউ মারা গেল, বেঁচে রইল কেবল তাদের শিশু সন্তানটি, মানে তুমি। তোমাকেও আবার মানুষ করে' তুলেছি, কি করে' তা সম্ভব হয়েছে, কি ভাবে টাকা রোজগার করে' তোমার পড়ার খরচ যুগিয়েছি তা তুমি জান না, তা তোমার জানবার দরকারও নেই। এইটুকু শুধু জেনে রাখ শুধু ছবি এঁকে তা হয় নি। এদেশে তা হয় না। এখন আমার ভয় পাছে আমার ছোঁয়াচ লেগে' তোমার আবার কিছু হয়। আমার জীবন অভিশপ্ত, আমার কাছে কেউ থাকবে না; তাই ঠিক করলাম লছমীকে খুঁজে বার করব। যদি বার করতে পারি তাকে সব কথা বলে' তার হাতে তোমাকে সমর্পণ করে' সরে' পড়ব। এতদিন সব দায়িত্ব আমি একাই বহন করেছি, এবার সেও করুক খানিকটা। এ দাবি করবার অধিকার আমার আছে। তাই বিমল ডাক্তারকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। সেদিন তার দেখা পেয়েছি। তাকে সব খুলে বলেছি। সে রাজী হয়েছে। এইবার তুমি তোমার ঠাকুমার কাছে

ফিরে যাও। বাস্, আমার কাজ শেষ হ'য়ে গেল। আমি চললাম! আশীর্বাদ করি জীবনে সুখী হও, যে আদর্শে তোমাকে মানুষ করবার চেষ্টা করেছি তা যেন তোমার জীবনকে মহিমান্বিত করে। ইতি

তোমার দাদু।

চার

দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

হিমালয়ের পথে একটি বৃদ্ধাকে স্কন্ধে লইয়া একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি পাহাড়ে উঠিতেছেন। সম্মুখে চড়াই, তাহার পরই একটি চটি। সময় মতো চটিতে পৌছিতে না পারিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। যদিও ঈষৎ শ্বাসকষ্ট হইতেছিল তবু সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিটি ক্ষণকালের নিমিত্তও শ্লথগতি হন নাই।

নাতি ঠাকুরমাকে কেদার-বদরী দর্শন করাইতে লইয়া চলিয়াছে। ডানডিতে লইয়া যাইবার মতো সঙ্গতি নাই, ঠাকুরমারও হাঁটিবার শক্তি নাই, অগত্যা তাই কাঁধে করিয়া লইতে হইয়াছে। যথাসময়ে তাহারা চটিতে পৌছিয়া গেল। পরদিন ভোরে উঠিয়া আবার যাত্রা শুরু হইবে। সামনে আর একটা নাকি চড়াই আছে। আহারাদির পর যে যেখানে স্থান পাইল শুইয়া পড়িল। বৃদ্ধা ও তাঁহার নাতিও একধারে শয়ন করিলেন।

গভীর রাত্রি। বাহিরে শনশন করিয়া হাওয়া বহিতেছে, চটির সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঘুমান নাই কেবল বৃদ্ধা। তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার নাতিকে ডাকিলেন।

"বিকাশ, ঘুমুচ্ছ না কি?"

"কি হয়েছে?"

বিকাশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

"কিছু হয় নি। তোমাকে শুধু একটা কথা বলতে চাই আজ। অনেকদিন থেকেই বলব ভাবছি, উনি বলতে মানা করেছিলেন বলেই এতদিন বলি নি। আজ উনি নেই, তোমার ঠাকুরদাও নেই, আমি কেদার-বদরী দর্শন করতে যাচ্ছি তোমার কাঁধে চড়ে, আমার মন কিন্তু বলছে কথাটা তোমাকে না বললে আমার তীর্থ দর্শনের পুণ্য হবে না—"

"কি কথা ?"

"আমি তোমার ঠাকুমা বলেই তো তুমি এত কষ্ট সহ্য করে' আমাকে কেদার-বদরী নিয়ে যাচ্ছ—"

"নিশ্চয়ই। এটা আমার কর্তব্য।"

"কিন্তু আমি তোমার ঠাকুমা নই।"

"তার মানে ?"

"আমি লছমী নই, আমার নাম দুর্গা। লছমী ওঁর কাছেও বেশীদিন থাকে নি, ছ-মাস পরেই পালিয়েছিল। তারপর উনি আমাকে বিয়ে করেন। তোমার ঠাকুরদা যখন ওঁর কাছে এসেছিলেন তখন সত্যি কথাটা উনি তাঁকে বলেন নি। ভেবেছিলেন মিথ্যা কথা বললে হয়তো উনি সান্ত্বনা পাবেন। হয়তো ওঁর পাগলামি সেরে যাবে। তারপর ঠাকুমা বলে' তুমি যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ালে, তখন আমার অন্ধকার ঘরে যেন আলো জ্বলে উঠল। তখন প্রাণ ধরে' আমি বলতে পারলাম না তুমি আমার কেউ নও। তারপর দেখতে দেখতে দশটা বছর কেটে গেল। উনিও চলে গেলেন, আমার ছেলে-মেয়ে হয় নি, তুমিই আমার আশ্রয়, নির্ভর, সব। আমাকে কাঁধে করে' তুমিই কেদার-বদরী নিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু কেবলই আমার মনে হচ্ছে সত্যি কথাটা তোমাকে বলা উচিত। সত্যি কথা শুনে তুমি আমাকে যদি এখানে ফেলে রেখেও চলে যাও তা-ও বরং আমি সহ্য করতে পারব, কিন্তু মিথ্যার বোঝা বুকে লুকিয়ে রেখে আমি কেদার-বদরী যেতে পারব না, গেলে পাপ হবে, পুণ্য হবে না।"

বিকাশ কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার গোড়ার কথা মনে পড়িল। ঠাকুমার অতীত জীবনকে ঘিরিয়া যে রূপকথালোক তিনি মনে মনে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহাও চুরমার হইয়া গেল। কিন্তু তিনি একটি কথা বলিলেন না।

"এ কথা শোনার পর আমাকে কাল নিয়ে যাবি তো ?"—বৃদ্ধা প্রশ্ন করিলেন।

"নিশ্চয়, তুমিই আমার ঠাকুমা। ঘুমিয়ে পড়, খুব ভোরে উঠতে হবে কাল। সামনেই চড়াই আছে—"

● তৃতীয় শতক ●

পাঁচ

বিকাশের সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। আলোর আভাস দেখা দিতেই তিনি বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উষার অরুণরাগে পূর্বাকাশ রঞ্জিত। মেঘে মেঘে হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে স্বপ্নলোক মূর্ত হইয়াছে; সহসা বিকাশের মনে হইল ওই তো আমার ঠাকুমা। তিনিও তো উষার মতো চঞ্চলা অবন্ধনা ছিলেন···।

তিনি স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"দাদু, দাদু, বিকাশ, কোথা গেলি দাদু—"

বৃদ্ধা ঘরের ভিতর হইতে আতঙ্কিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভয় হইয়াছিল বিকাশ বুঝি তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

"এই যে ঠাকুমা, যাচ্ছি, এবার ওঠ। বেরুতে হবে এক্ষুনি।"

একটু পরেই দেখা গেল বিকাশ বৃদ্ধাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া চড়াই ভাঙিতেছেন। আকাশে উষা নাই, চতুর্দিকে কেবল পাহাড়···।

সবিলা

জনৈক খবরের কাগজের রিপোর্টার তাসের আড্ডা থেকে বাড়ি ফিরবার পথে যে মেয়েটিকে কুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, সে-মেয়ে যে রাজকন্যা, তা বেচারা বুঝতে পারে নি। সুতরাং তার সঙ্গে প্রেম করতেও ইতস্তত করে নি। প্রেম যখন জমে উঠল, তখন হঠাৎ জানা গেল ওই কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটির আসল পরিচয়। এতে উক্ত সাংবাদিক যুবকটির মনের অবস্থা যা হ'ল তা বর্ণনীয় নয়, অনুমেয়। বিখ্যাত একটি বিদেশী চলচ্চিত্রে এর শিল্পায়িত অভিব্যক্তি অনেকেই আপনারা দেখেছেন।

সবিলার জীবনেও এই রকম একটি কাণ্ড ঘটেছিল। সবিলা সাংবাদিক নয়, সহিস। সিকিমের একপ্রান্তে তার বাড়ি। সিকিমের রাজার অশ্বশালার সে একজন পরিচারক মাত্র। কিন্তু তবু সে অসামান্য ব্যক্তি, ধর্মের জ্যোতিতে তার মনপ্রাণ পরিপুর্ণ। সে মুসলমান, তার আকাঙ্ক্ষা বাড়ির পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করাবে। আয় অল্প, কিন্তু তার থেকেই সে একটু একটু করে টাকা জমিয়েছে অনেক দিন ধরে'। জমিও সংগ্রহ হয়েছে একটু। চাঁদা সংগ্রহ করেছে কিছু-কিছু। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ মসজিদ নির্মাণ অল্প টাকায় হবে না, অনেক টাকা চাই। প্রায় দশ বৎসর ধরে' চেষ্টা করে' মসজিদের ভিত্তি পত্তন করতে পেরেছে সে। তার জন্যেই মালমসলা ইঁট সিমেণ্ট সংগ্রহ করতে জিব বেরিয়ে পড়েছে তার। ঋণ হ'য়ে গেছে কিছু। তবু সে হাল ছাড়ে নি। আবার একটু একটু করে টাকা জমাচ্ছিল, এমন সময় এই অভাবনীয় ঘটনাটি ঘটল। কোট-প্যাণ্ট-পরা একটি সাহেব এসে হাজির হলেন তার কাছে। খাঁটি সাহেব নয়, দেশী সাহেব। চমৎকার লোক কিন্তু। খাসা উর্দুতে বললেন, "আমি পায়ে হেঁটে এই অঞ্চলটা বেড়িয়ে দেখতে চাই, দশ-বারো দিনের মত থাকবার জায়গা কি পাওয়া যাবে কোথাও?"

"এখানে তো হোটেল বা সরাই নেই সাহেব। এ-অঞ্চলে আমরা দশ-বারো ঘর সহিস আছি কেবল। সবাই মুসলমান। আমার গরিবখানায় থাকতে হুজুরের যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আপনার খিদমত করে' আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।"

সাহেব বললেন, "ও, তুমি মুসলমান বুঝি? যাক নিশ্চিন্ত হলাম। তোমার

গরিবখানাই যে আমার মত মুশাফিরের পক্ষে দৌলতখানা ভাই। তুমি মুসলমান, কত বড় সংস্কৃতির বাহক তুমি—"

পর পর দু-তিনটে উর্দু বয়েত আওড়ালেন, কোরানের কথা বললেন। মুগ্ধ হ'য়ে গেল সবিলা।

সারাদিন ঘুরে বেড়াতেন সাহেব। সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসতেন, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন। সবিলার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল তাঁর। চাচা-সাহেব বলে ডাকতে লাগল তাঁকে তারা।

একদিন পাশের জমিতে মসজিদের অর্ধ-সমাপ্ত ভিত্তিটা চোখে পড়ল তাঁর।

"ওটা কী সবিলা? নূতন বাড়ি করছ?"

একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ল সবিলা।

"ওটা আমার পাগলামি হুজুর। বামন হ'য়ে চাঁদ ধরবার চেষ্টা—"

"কি ব্যাপার বল তো খুলে—"

কুণ্ঠিতমুখে চুপ করে' রইল সবিলা খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "হুজুর' আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা একটি মসজিদ তৈরি করব। অনেকে আমার কথা শুনে হাসে, ঠাট্টা করে, কিন্তু তবু আমি চেষ্টা করছি—"

সাহেব বললেন, "দেখ সবিলা, এতদিন তোমাকে আমি আমার মতই সাধারণ মানুষ মনে করতাম। এখন দেখছি তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়। তোমার মাথা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। এতদিন বুঝতে পারি নি, দেখতে পাই নি। তোমাকে আমি শ্রদ্ধাভরে সেলাম করছি। একটা কথা তুমিও বুঝতে পার নি সবিলা, তোমার মসজিদও তৈরি হ'য়ে গেছে, তার মিনারও আকাশ-স্পর্শ করেছে। স্থান পেয়েছে সূর্যতারার সভায়—"

সবিলা অভিভূত হ'য়ে শুনছিল; সাহেব থামতেই সে জিজ্ঞাসা করল, "আমার মসজিদ তৈরি হ'য়ে গেছে? এ কি বলছেন আপনি হুজুর—! কিছুই হয় নি, দেখতেই তো পাচ্ছেন—"

সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "হ'য়ে গেছে। যে-মুহূর্তে তুমি সঙ্কল্প করেছ সেই মুহূর্তেই তা হ'য়ে গেছে। তোমার মতো পুণ্যাত্মার সঙ্কল্প পূর্ণ হ'তে দেরি হয় না। ইঁট সিমেণ্ট চুন-সুরকি যোগাড় করতে হয়তো দেরি হচ্ছে, কিন্তু তা-ও হ'য়ে যাবে। টাকা কি করে' যোগাড় করছ তুমি?"

"নিজে কিছু কিছু জমাচ্ছি। চাঁদাও পেয়েছি কারো কারো কাছ থেকে। কিন্তু এখানে তো লোকজন বেশী নেই, যারা আছে তারাও গরিব—"

"বেশ, আমি তোমাকে কিছু চাঁদা দিচ্ছি।"

সাহেব নগদ দশ টাকা দিলেন তাকে। আর একটি ইংরেজীতে ঠিকানা-লেখা কার্ড দিয়ে বললেন, "তুমি যদি কখনও কলকাতায় যাও, এই ঠিকানায় আমার খোঁজ কোরো। আমি তোমাকে আরও চাঁদা যোগাড় করে' দেব!"

তার পরদিনই নেমে এলেন সাহেব পাহাড় থেকে।

দুই

তারপর তিন বৎসর কেটে গেছে।

কলকাতা শহরে প্রকাণ্ড একটি বাড়ির বাইরের ঘরে বহু রোগীর ভিড়ে সংকুচিত হয়ে বসে আছে সবিলা। প্রায় ঘণ্টা দুই বসে থাকতে হ'ল। সব রোগী দেখা শেষ করে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার সাহেব। সবিলা তখনও এক কোণে বসে ছিল। চোখাচোখি হ'ল দুজনে। হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ডাক্তার সাহেব। হাত বাড়িয়ে উর্দুতে বললেন, "আরে সবিলা সাহেব যে! কী খবর!..."

সবিলা কুণ্ঠিতভাবে বললে, "আপনি ওয়াদা করেছিলেন যে, আমার মসজিদের জন্যে কিছু চাঁদা যোগাড় করে দেবেন।"

"নিশ্চয় দেব। ভিতরে এস!"

সঙ্গে করে' নিয়ে গেলেন ভিতরে।

"একটু চা খাও, নাস্তা কর। তারপর আমি তোমাকে একটা চিঠি দিচ্ছি, সেই চিঠি নিয়ে তুমি চলে যাও। যাঁর নামে চিঠি দেব তিনি তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবেন।"

তিন

তার পরদিন আবার এল সবিলা।

ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "কি হল?"

"টাকা পেয়েছি।"

"কত টাকা?"

"প্রায় তিন হাজার টাকা।"

"ওতে তোমার মসজিদ হ'য়ে যাবে তো?"

"হ'য়ে যাবে। আদাব।"

এত টাকা পেয়েও সবিলা কিন্তু ততটা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে পারল না যতটা উচ্ছ্বসিত হওয়া উচিত ছিল।

সে আবিষ্কার করেছিল যে, ডাক্তার সাহেব মুসলমান নন, হিন্দু।

অপ্রতিভ মুখে আদাব করে' চলে গেল সে।

অতিদূর ভবিষ্যতে

যে গল্পটি লিখিতেছি তাহার পরিবেশ বর্তমান নহে, ভবিষ্যৎ। অনতিদূর ভবিষ্যৎ নহে, অতিদূর ভবিষ্যৎ। সে যুগে মানুষের প্রতিপত্তি নাই, জন্তুজানোয়ারদেরই বাড়বাড়ন্ত। বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। মানুষই একদা বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া জানোয়ারদের সভ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের সে চেষ্টা মর্মান্তিকরূপে সফল হইয়াছে। অর্থাৎ শিক্ষিত সভ্য জানোয়ারদের কবলে পড়িয়া বহু নরনারী প্রাণ হারাইয়াছেন। হস্তীরা যখন রাজা হইয়াছিল তখন তাহারা আইন করিয়াছিল যে মানুষ দেখিলেই তাহাকে শুঁড়ে জাপটাইয়া তুলিয়া আছাড় দিতে হইবে। সিংহব্যাঘ্রদের আমলে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়! বোলতা-ভীমরুলগণ সম্মিলিতভাবে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিল। সে সময় প্রতিটি মানুষের চেহারা এত বীভৎস হইয়াছিল যে চেনা যাইত না। যে যন্ত্রণা তাহারা ভোগ করিয়াছিল তাহা জনৈক মানব-কবি একটি কাব্যে বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কাব্য রাজদ্রোহসূচক বলিয়া ভস্মীভূত করা হয়, কবিকেও লক্ষ লক্ষ বোলতা এবং ভীমরুলের হুলাঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। এই ভাবে বারংবার আক্রান্ত হইয়া মানুষেরা ক্রমশ সংখ্যায় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে তাহারা জানোয়ারদের অধীনে থাকিয়া জানোয়ারদের নির্দেশ মানিয়া কোনক্রমে জীবন-যাপন করিতেছে।

যখনকার কথা লিখিতেছি তখন গর্দভ সম্প্রদায়ের রাজত্ব। ঘোড়ারা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। নির্বাচন-যুদ্ধ আসন্ন। কী হয় বলা যায় না।

সে যুগের জনৈক মানব-লেখক একটি ই-যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া ছিলেন। ই-যন্ত্রের অর্থ ইচ্ছাশক্তি-যন্ত্র। আণবিক যুগ অতীতের পর্যায়ে পড়িয়া গিয়াছে। মনোময় যুগ চলিতেছে। প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যে কোনও মানুষের ইচ্ছা ই-যন্ত্রযোগে অপরের মনে সঞ্চালিত হইয়া অঘটন ঘটাইতেছে। এমন কি যাহারা কুরূপ তাহারা সুরূপ হইতেছে, বামনগণ দৈত্যে পরিণত হইয়াছে। জন্তুজানোয়ারদের চেহারাও মনুষ্যাকৃতি লাভ করিয়াছে। ই-যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলেই ইচ্ছানুরূপ ফল ফলিতেছে। প্রবল ইচ্ছাশক্তিশালী মানব ব্যতীত অন্য

কাহারও দ্বারা কিন্তু এই যন্ত্রে সুফল ফলে না। তাই ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানবদের এখনও কিছু আধিপত্য আছে!

যে লেখকটি ই-যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া ছিলেন তাঁহার ইচ্ছাশক্তি খুব প্রবল। তিনি যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া দূরবাসিনী কোনও তরুণীর অনমনীয়তাকে নমনীয় করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন।

এমন সময় গর্দভ রাজ্যের প্রচার-সচিব আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

'ও মশাই, একটা মুশকিল হয়েছে। জানেন তো ঘোড়াদের প্রজাবৃদ্ধি হলেই আমরা ভোটে হেরে যাব। তাই আমরা সমস্ত পুরুষ ঘোড়াগুলিকে বন্দী করে রেখেছিলাম। খবর পেলাম কয়েকটি পুরুষ ঘোড়া বন্দীশালা থেকে পালিয়েছে। চর এসে খবর দিলে যে তারা কতকগুলি তরুণী ঘোটকীর সঙ্গে মিলিতও হয়েছে। শুনছি শ'দুই ঘোটকী গর্ভবতী। আপনি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করুন, যেন একটি ঘোটকীও সন্তান প্রসব করতে না পারে।'

'যে আজ্ঞে।'

তটস্থ লেখক উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যাহা সুদূর কল্পনারও অতীত ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। গর্দভ-রাজ্যে উক্ত লেখকটি প্রধানমন্ত্রীরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছাশক্তিবলে সমস্ত ঘোটকীগুলি নাকি ডিম্ব প্রসব করিয়াছিল, একটিও বাচ্চা হয় নাই।

উচিত-অনুচিত

যাহা চিরকাল ঘটে তাহাই ঘটিতেছিল।

মিত্তিরদের বাড়ির শফরী বসুদের বাড়ির ক্যাবলার সহিত এমন মাখামাখি আরম্ভ করিয়া দিল যে শহরসুদ্ধ সকলের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। সেকাল হইলে শফরীর পিতা কুঞ্জনাথকে এক ঘরে করিয়া ইহার প্রতিকার করা চলিত। কিন্তু কালের চাকা ঘুরিয়াছে, এখন ফুসফুস গুজগুজ করা ছাড়া অন্য কিছু করিবার উপায় নাই।

সকালে দেখা যায় শফরী ও অশোক (ক্যাবলার ভালো নাম) শহরের বাহিরে যে মাঠটা আছে সেখানে গিয়া সাইকেল চড়া প্র্যাকটিস করে। অশোক শেখায়, শফরী শেখে।

দুপুরে আহারাদির পর অশোক শফরীদের বাড়িতে যায়। সেখানে প্রায় বেলা পাঁচটা পর্যন্ত তাস খেলা চলে। শফরীর মা এবং বিধবা পিসীমাও খেলায় যোগদান করেন। পান ও দোক্তার শ্রাদ্ধ হয়। অশোক মাঝে মাঝে ম্যাজিক দেখায়, তাসের ম্যাজিক। দুপুরটা বেশ আনন্দে কাটে। শফরীর পিতা কুঞ্জনাথ মিত্র ক্যাবলার পিতা হরগোবিন্দ বসুর বাল্যবন্ধু। সুতরাং এ মেলামেশায় কেহই দোষের কিছু দেখেন না। শফরী ঘরের মেয়ে, ক্যাবলাও ঘরের ছেলে। উভয়েরই পিতামাতার ধারণা তাঁহাদের পুত্রকন্যা কুসুমের মতো নির্দোষ।

তাস খেলা শেষ করিয়া অশোক শফরীকে লইয়া সিনেমায় যায়। সন্ধ্যাবেলাটা প্রায় সিনেমাতেই কাটে। রাত্রে তাহারা কোথায় থাকে, কী করে তাহা কেহ জানে না। নেপথ্যে ফুসফুস গুজগুজ হইতে থাকে।

আমি তখন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম। আমাদের মহলেও অর্থাৎ উচ্চপদস্থ হাকিমমহলেও ইহা লইয়া সরস আলোচনা চলিত। কুঞ্জবাবু আমার আপিসে কাজ করিতেন আর হরগোবিন্দবাবু করিতেন আবগারি বিভাগে। একজন বিহারী অফিসার একদিন কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, আজকালকার মেয়েরা যেরূপ দ্রুতবেগে প্রগতির পথে ধাবিত হইতেছেন তাহাতে ভবিষ্যতে প্রাদেশিকতা জিনিসটা আপনিই উঠিয়া যাইবে।—বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

আমার খুব খারাপ লাগিল। কয়েকদিন পরে আমি আমার একজন সাব-ডেপুটিকে কথা-প্রসঙ্গে বলিলাম, "অশোকের সঙ্গে শফরীর বিয়ে তো আনায়াসে হতে পারে। ওরা পালটি ঘর। আপনি একটু ঘটকালি করুন না।"

"আচ্ছা, স্যর।"

দিন দশেক পরে নিত্যানন্দবাবু (সেই সাব-ডেপুটি) আসিয়া আমাকে খবর দিলেন।

বলিলেন, "বিয়ে হওয়া শক্ত। হরগোবিন্দবাবুকে আমি বলেছিলাম, তিনি বললেন, তাঁর ছেলের বিয়ে দেবার মালিক তিনি নন, তাঁর স্ত্রী। তাঁর স্ত্রী যদি মত করেন তিনি আপত্তি করবেন না। ওঁদের বাড়িতে আমাদের যাতায়াত আছে। আমার স্ত্রীকে বললুম হরগোবিন্দবাবুর স্ত্রীর কাছে কথাটা পাড়তে। আমার স্ত্রী কথাটা পেড়েছিল কাল। হরগোবিন্দবাবুর স্ত্রী কথাটা শুনে যেন আঁতকে উঠলেন। বললেন, 'ওই বেহায়া মেয়ের সঙ্গে আমি আমার অমন ছেলের বিয়ে দেব, বলছেন কী আপনি! কত ভালো বংশের সুন্দরী মেয়ে সাধাসাধি করছে! ওই কী ক্যাবলার যোগ্য মেয়ে'।"

কুঞ্জবাবুর অভিমতটা কী তাহাও আমি জানিয়াছিলাম। কুঞ্জবাবুর ধারণা তাঁহার মেয়ের যে রকম রূপ গুণ তাহাতে অনেক বড় ঘরে তাহার বিবাহ হইবে। সে নাচিতে জানে, গাহিতে জানে, লেখাপড়া জানে, অনেক কিছু জানে। তা ছাড়া উহারা দুইজনে ভাই-বোনের মতো মানুষ হইয়াছে, উহাদের বিবাহটা বড়ই অশোভন হইবে।

কিছুদিন পরে যাহা অনিবার্য তাহাই ঘটিল। শফরীকে লইয়া অশোক একদিন সরিয়া পড়িল। তাহার পর কী হইয়াছিল জানি না, কারণ আমিও বদলি হইয়া গেলাম।

দুই

তাহার পর পাঁচ বছর কাটিয়া গিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যায় কলিকাতার একটি নামজাদা প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া সিনেমা দেখিতেছি। হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম। এ কী! এ যে সেই শফরী আর

ক্যাবলা! তাহারাই নায়ক-নায়িকা। পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া চুম্বন করিতেছে। কী আর করিব, বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। তাহারা বেশ ভালো অভিনয়ই করিতেছে। বলা বাহুল্য, এখন তাহাদের শফরী আর অশোক নাম নাই। চিত্র-জগতে নতুন নামে তাহাদের পরিচয়। সত্যই বেশ ভালো অভিনয় করিতেছে! আমার পিছনে যাঁহারা বসিয়া ছিলেন তাঁহারাও দেখিলাম উচ্ছ্বসিত।

"উঃ, কী চমৎকার অ্যাক্‌টিং করছে।"

"গুণ আছে, তা না হলে অত টাকা দিয়েছে। দশ হাজার করে'। আরও কনট্রাক্ট পেয়েছ…"

পিছনের সীটে এই জাতীয় আলোচনা চলিতেছিল। শফরী আর ক্যাবলা যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে ইহাতে আনন্দিত হইলাম। মনে হইল, এই হওয়াই তো উচিত।

ইন্টারভাল হইল।

দেখিলাম পিছনের সীটে বসিয়া আছেন কুঞ্জনাথ, হরগোবিন্দ এবং আরও দুইটি প্রৌঢ়া মহিলা। সম্ভবত কুঞ্জনাথ এবং হরগোবিন্দের স্ত্রী। সকলেরই মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। কুঞ্জনাথ আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, নমস্কার করিলেন। আমিও প্রতি-নমস্কার করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

তিন

ইহার পর আরও পনেরো বৎসর কাটিয়াছে।

আমার কলিকাতার বাসায় একদিন সকালে শফরী আর ক্যাবলা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে একটি মেয়ে। চমৎকার মেয়েটি। যেমন রঙ তেমনি মুখ-চোখ।

শফরী প্রণাম করিয়া বলিল, "জ্যাঠামশাই, চিনতে পারেন আমাদের?"

ক্যাবলাও প্রণাম করিল। মেয়েটিও করিল।

"শুনলাম আপনি কোলকাতাতেই আছেন। চিনতে পেরেছেন আমাদের?"

"তোমরা তো বিখ্যাত লোক, না চেনবার কি আছে।"

"এ মেয়েটি কে?"

"আমাদেরই মেয়ে। রুমা।"

"বাঃ, খাসা মেয়েটি। পড়াশোনা করছে তো ?"

"এ বছর ম্যাট্রিক দেবে।"

"বাঃ..."

শফরী তাহার পর আসল কথাটি পাড়িল।

"আমরা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। ছোট বয়সেই মেয়েটির বিয়ে দিতে চাই, যা দিনকাল পড়েছে। আপনার ছেলেটি তো এবার ডাক্তারি পাশ করেছে। আপনি আমাদের পালটি ঘরও। নিন মা রুমাকে—"

বললাম, "আমার ছেলে এই সবে পাশ করেছে। আগে কিছু রোজকার করুক, সেট্‌ল্‌ড্‌ না হ'লে—"

শফরী বলিল, "যদি কিছু না মনে করেন তাহলে একটা কথা বলতে চাই। বলব ?"

"বল—"

"আমাদের ওই একটিমাত্র মেয়ে। ওকে এক লক্ষ টাকা দেব আমরা। আমাদের যে জামাই হবে তার যাতে কোনও আর্থিক অসুবিধা না হয় সে ব্যবস্থা আমরা করব।"

"আচ্ছা ভেবে দেখি—"

প্রণাম করিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

খবর লইয়া জানিলাম শফরী এবং ক্যাবলার তিন আইন অনুসারে বিবাহ হইয়াছিল। রুমা জারজ নয়। তবু কিন্তু এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারি নাই। কোথায় যেন একটু বাধিল।

দন্ত-কৌমুদী

যাহারা পতিতা, যাহারা নিজেদের দেহ বিক্রয় করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে, তাহাদের ঘৃণা করা উচিত—সুনীতিপরায়ণ সাধু ব্যক্তিদের ইহাই নির্দেশ। তাঁহারা আরও বলেন, তাহাদের সংস্রবও পরিহার্য। প্রথম উপদেশটি এতদিন পালন করিয়াছি, কিন্তু দ্বিতীয়টি পারি নাই। কারণ আমি ডাক্তার, রোগিণী আসিয়া উপস্থিত হইলে সে পতিতা কি সতী এ বিচার করা চলে না, তাহার চিকিৎসায় মন দিতে হয়, সুতরাং সংস্রব অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাই দ্বিতীয় উপদেশটি পালন করা সম্ভব হয় নাই। আজ দেখিতেছি, প্রথম উপদেশটির মর্যাদাও রক্ষা করিতে পারিলাম না। চাহনির উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করিতে হইল। সবাই তাহাকে চাউনি বলিয়া ডাকিত। বিহারীরা বলিত, নজরিয়া। আমি নামটাকে একটু শুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলাম। চাহনি নামজাদা পতিতা ছিল না, চিত্র-তারকা হইবার সুযোগ সে পায় নাই। তাহার ফী ছিল মাত্র এক টাকা। পথচারিণী ছিল সে।

সে আমার নিকট প্রথম যখন আসিয়াছিল তখন সে সিফিলিসে জর্জরিত। অনেকগুলি ইনজেকশন দিয়া তাহাকে ভালো করিলাম। আমার ফী দিতে কোনদিন সে কার্পণ্য করিত না, কেবল শেষের ফীটা সে দিতে পারে নাই, হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল, এখন হাতে পয়সা নেই ডাক্তারবাবু, পরে দিয়ে যাব। বিশ্বাস করুন আমাকে, নিশ্চয় দিয়ে যাব।

বছর খানেক পরে আবার আসিয়াছিল সে। আমার ফী আনে নাই, নতুন একটা সমস্যা সমাধান করিবার জন্য পরামর্শ চাহিতে আসিয়াছিল।

বলিল, আমার দাঁতগুলো দেখুন তো ডাক্তারবাবু। দেখিলাম, দাঁতগুলি মজবুত আছে, কিন্তু প্রত্যেকটিই কুচকুচে কালো। মিশি, গুল এবং পান-দোক্তাই কারণ। বলিলাম, দাঁত তো ভালোই আছে। রঙ অবশ্য কালো হ'য়ে গেছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি?

চাহনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

এ কালো রঙ উঠিয়ে দেওয়া যায়?

যায়, কিন্তু অনেক হাঙ্গামা। এখানে হবে না। কোলকাতা যেতে হবে। থাক না কালো রঙ, ক্ষতি কি?

চাহনি বলিল, আজকাল ঝকঝকে সাদা দাঁত সবাই চায়। আমার খদ্দের অনেক কমে গেছে।

বলিয়া মাথা হেঁট করিল। তাহার পর বলিল, কোলকাতাই চলে যাই তা হলে। রেশমীও এই কথা বলছিল। আপনিও যখন বলছেন তখন সেই ব্যবস্থাই করি।

যাইবার পুর্বে বলিয়া গেল, আপনার ফীয়ের কথা ভুলি নি, পাঠিয়ে দেব পরে। বড় টানাটানি চলছে আজকাল।

চলিয়া গেল।

তাহার পর আরও পাঁচ বছর কাটিয়াছে। চাহনির কোনও খবর আর পাই নাই। আজ সকালে একটি ঘাড়-ছাঁটা ছোকরা একটি চিঠি এবং একটি সীল-করা কৌটা আমার হাতে দিয়া গেল। বলিল, চাউনি এটা কোলকাতা থেকে আপনাকে পাঠিয়েছে।

কী আছে কৌটোতে?

তা তো জানি না।

ছোকরা চলিয়া গেল।

চিঠিটা খুলিয়া পড়িলাম। আঁকা-বাঁকা লেখা, অজস্র বানান ভুল। ভাষাতে ও গুরু-চণ্ডালী দোষ। সংশোধন করিয়া লিখিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

শ্রীচরণেষু—

শত সহস্র প্রণামান্তে নিবেদন,

ডাক্তারবাবু, ভগবানের কৃপায় আশা করি আপনি ভালো আছেন। আশা করি এ অভাগীর কথা আপনার মনে আছে। আপনার পরামর্শ অনুসারে আমি কলিকাতায় আসিয়া একজন বড় দাঁতের ডাক্তারকে আমার দাঁতগুলি দেখাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, সব দাঁতগুলি সোনা দিয়া বাঁধাইয়া লও। সবগুলি না পার, অন্তত সামনের কয়টি বাঁধাইয়া লও। দেখিতেও ভালো হইবে, দাঁতগুলি অনেকদিন টিকিবেও। ইহাতে ফলও হইয়াছিল। এখানেই নূতন করিয়া আবার ব্যবসা ফাঁদিয়াছিলাম। লোক মন্দ জুটিত না। কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমার অদৃষ্টই মন্দ।

আবার ব্যায়রামে পড়িলাম। এবার যক্ষ্মা। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, বাঁচিবার আশা কম। অনেক টাকা খরচ করিলে কিছুদিন বাঁচিতে পারি। সম্পূর্ণ আরোগ্য হইব না। আমার টাকা আর নাই, চিকিৎসায় এবং বাড়িভাড়ায় সর্বস্বান্ত হইয়াছি। আর বাঁচিব না। আপনার সহিত আর আমার দেখাও হইবে না। আপনার কিছু ফী বাকি ছিল, সে কথা আমি ভুলি নাই। আপনার ঋণ শোধ করিবার নয়, তবু ফী বাবদ কিছু পাঠাইতেছি। আমার কাছে নগদ টাকা নাই। আমার সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলিই আপনাকে একটি কৌটায় পুরিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। পাড়ায় একটি ছোকরা দাঁতের ডাক্তার আছে, সে-ই কোনো পয়সা না লইয়া দাঁতগুলি উপড়াইয়া দিয়াছে। ছেলেটি বড় ভাল।' রেশমীর ছেলে খোনতা এখানে আসিয়াছিল, তাহার হাতেই পাঠাইলাম। আপনি গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি

সেবিকা

চাহনি

আলোবাবু

সবাই তাঁকে আলুবাবু বলত, কিন্তু তাঁর আসল নাম আলো। চেহারা অবশ্য নামের উপযুক্ত নয়। গায়ের রং কুচকুচে কালো, মুখটি বেগুন-পোড়ার মতো, তার উপর কালো গোঁফ-দাড়ি, যুগ্ম-ভ্রূ, মাথায় ঘাড় পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল। গলায় তুলসীর মালা, সেটিও কালো হ'য়ে গেছে। পরনের থানখানি অবশ্য ধপধপে সাদা। গায়ের চাদরখানিও সাদা। আলুবাবু জামা গায়ে দিতেন না, জুতোও পরতেন না।

একদিন সকালে আমার বৈঠকখানায় ঢুকে নমস্কার করে' কাচুমাচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই দিনই প্রথম দেখলাম তাঁকে।

"কি চাই আপনার ?"

"অনুগ্রহ করে একটু সাহায্য করবেন আমকে ?"

সাহায্যপ্রার্থী অনেক আসে, অধিকাংশ লোকই টাকা চায়, ভাবলাম ইনিও বোধ হয় সেই দলের। মনে মনে একটু বিরক্ত হলাম, কিন্তু মুখ ফুটে বিরক্তি প্রকাশ করতে পারলাম না। বরং বললাম, "অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই করব। বলুন, কি করতে হবে—"

তাঁর বাঁ হাতে একটি ছোট থলি ছিল। তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে তিনি একটি ছোট পাখির ছানা বার করলেন।

"একটা ছোঁড়া এই পাখির ছানাটার পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি দু আনা পয়সা দিয়ে বাচ্চাটা নিয়ে নিয়েছি তার কাছ থেকে। মনে হচ্ছে এর পায়ে লেগেছে, পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিল কিনা, একট দেখবেন দয়া করে ? শুনেছি আপনি বড় ডাক্তার।"

দেখলাম পাখির ছানাটিকে। পায়ে সত্যিই লেগেছিল। টিঞ্চার আয়োডিন লাগিয়ে বেঁধে দিলাম।

"কি করবেন এটাকে নিয়ে, পুষবেন ?"

"না। ভালো হ'লে ছেড়ে' দেব। জীবন্ত কোনো জিনিস পোষবার সামর্থ্য নেই আমার। ইচ্ছে করে খুব, কিন্তু পয়সা নেই। সেই জন্যে বিয়েও করি নি।"

কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে একটু হেসে' চাইলেন আমার দিকে।

"ও। এর আগে তো দেখি নি আপনাকে, কোথা থাকেন ?"

"অবিনাশবাবুর বাড়িতে। দিন সাতেক হ'ল এসেছি।"

আর একবার কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে চাইলেন। অবিনাশবাবু এখানকার নামজাদা উকিল একজন।

"অবিনাশবাবুদের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে বুঝি ?"

"না, তেমন কিছু নয়। আমার এক দুর-সম্পর্কের ভাগ্নির বন্ধুর শ্বশুর উনি। আসলে লোক খুব ভালো। তাই দয়া করে' থাকতে দিয়েছেন"

আলোবাবু পাখির ছানাটি নিয়ে চলে' গেলেন।

দিন কয়েক পরে অবিনাশবাবুর বাড়ি যেতে হয়েছিল। সেখানে আলোবাবুর সঙ্গে আবার দেখা হ'য়ে গেল। দেখলাম তিনি একটি দিশি কুকুরের বাচ্চার পরিচর্যায় নিযুক্ত হ'য়ে আছেন। আমাকে দেখেই এক মুখ হেসে' বললেন, "বিনুবাবুর কুকুর এটি। কুকুর পোষায় শখ আছে কিন্তু সেবা করতে জানেন না। দুটো চোখে এতক্ষণ পিঁচুটি ভরতি ছিল, তুলো ভিজিয়ে পরিষ্কার করলুম। আর কুকুরকে সারাক্ষণ বেঁধে রাখলে কি চলে ? ওদের সঙ্গে খেলা করতে হয়—"

কুকুরটার দিকে চেয়ে তার মুখের সামনে টুসকি দিতে লাগলেন। ল্যাজ নেড়ে নেড়ে খেলা করতে লাগল কুকুরটা। বিনু অবিনাশের ছেলে, বয়স দশ বছর।

অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল একটু পরে।

বললাম, "আপনার এই আলোবাবু লোকটি তো অদ্ভুত ধরনের মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ অদ্ভুতই। স্নেহের কাঙাল বেচারা। গরীবও খুব। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি ?"

"হ্যাঁ, এক পাখি পেশেণ্ট নিয়ে গিয়েছিলেন আমার কাছে।"

"দেখবেন তো, যদি ওর চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন কোথাও। সেবা করতে বড় ভালোবাসে, বিশেষত সেবার পাত্র বা পাত্রী যদি অসহায় হয়—"

দিন কতক পরে সিভিল সার্জনের সঙ্গে দেখা হল। এক সঙ্গে কলেজে পড়েছিলুম। কথায় কথায় আলোবাবুর কথা উঠে পড়ল। সিভিল সার্জন বললে, "এখানকার

হাসপাতালে ওকে প্রবেশনার ড্রেসার করে ঢুকিয়ে নিতে পারি। তবে দশ টাকার বেশি এখন পাবে না। পরীক্ষায় পাশ করলে তখন মাইনে বাড়বে—"

আলোবাবু হাসপাতালের আউট-ডোরে রোগীদের ঘা ধোয়াতে লাগলেন। মাসখানেক পরেই কিন্তু চাকরিটি গেল তাঁর। একদিন দেখি আমার ল্যাবরেটরিতে এসে শুষ্ক মুখে বসে' আছেন।

"কি খবর—"

"আমাকে দূর করে' দিলে।"

"কেন ?"

"একটা লোকের পায়ের ঘা কিছুতেই সারছিল না। সে-ই আমাকে একটা ওষুধ দেখিয়ে দিয়ে বললে, ওই ওষুধটা দাও তাহলে সেরে যাবে। ওটা লাগিয়ে অনেকের নাকি সেরে গেছে। দিলুম ওষুধটা লাগিয়ে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চীৎকার শুরু করে' দিলে, সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার। ডাক্তারবাবু এলেন, তিনি তো চটেই লাল, বললেন, কার হুকুমে তুমি ঘায়ে কার্বলিক এসিড ঢেলে দিয়েছ। আমি আর কি বলব, চুপ করে' রইলাম। ডাক্তারবাবু আমাকে দূর করে দিলেন। আমি ওর ভালোর জন্যেই ওষুধটা দিয়েছিলাম আর ওর কথাতেই দিয়েছিলাম—"

আমিও চুপ করে রইলাম, কি আর বলব। সত্যিই অন্যায় কাজ করেছেন।

কিছুক্ষণ বসে থেকে আলোবাবু চলে' গেলেন।

কষ্ট হতে লাগল ভদ্রলোকের জন্য, কিন্তু কি করব ভেবে পেলাম না।

দিন কয়েক পরে অবিনাশবাবুর বাড়ি থেকেও বিদায় নিতে হ'ল আলোবাবুকে। শুনলাম অবিনাশবাবুর স্ত্রী দূর করে' দিয়েছেন তাঁকে। আলোবাবু যা করেছিলেন তা কোনও মা সহ্য করতে পারেন না। তিনি এক বগলে কুকুরের বাচ্চাটা এবং আর এক বগলে অবিনাশবাবুর শিশু-পুত্র তিনুকে নিয়ে একবার কুকুরটার মুখে আর সঙ্গে সঙ্গে তিনুর মুখে চুমু খাচ্ছিলেন।

অবশেষে আমিই আশ্রয় দিলাম আলোবাবুকে।

একদিন সন্ধ্যের পর এসে দেখলাম তিনি একটা সোলার হ্যাট বাজিয়ে গুনগুন করে গান গাইছেন।

"আপনি গান-বাজনা জানেন নাকি—"

কুণ্ঠিতমুখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

"এককালে ডুগি-তবলা বাজাতে পারতাম। দৈন্যের দায়ে সব বেচে দিতে হয়েছে। এখন হ্যাট বাজাই—"

বলা বাহুল্য, খুব কৌতুক অনুভব করলাম।

"হ্যাট পেলেন কোত্থেকে—"

"অনেক আগে স্যুটও পরতাম। সব গেছে, ওই হ্যাটটি আছে কেবল।"

"আলোবাবুর আরও পরিচয় পেলাম দিন কয়েক পরে। একদিন দেখি তিনি ছুটতে ছুটতে আসছেন।

"কি হ'ল, ছুটছেন কেন—"

"দশটা বেজে' গেছে, আমার ঘড়িতে দম দেওয়া হয় নি এখনও। রামবাবুর গাইটার বাচ্ছা হয়েছে শুনে দেখতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম তাঁর বৈঠকখানার ঘড়িতে টং টং করে দশটা বেজে গেল। তখুনি ছুটলুম, আমার ঘড়িতে ঠিক দশটার সময় দম দি। আমাদের যেমন খাবার, ঘড়ির তেমনি দম, বেচারীর খেতে দেরি হ'য়ে গেল আজকে—"

তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন নিজের ঘরে। আমি একটু অবাক হ'য়ে গেলাম। আলোবাবুর যে ঘড়ি আছে তা জানতাম না। তাঁর পিছু-পিছু এসে একটু আড়াল থেকে দেখতে লাগলাম। দেখলাম ঘরে ঢুকেই তিনি নিজের ভাঙা তোরঙ্গটা খুললেন। তার ভিতর থেকে বার করলেন একটি ছোট টিনের বাক্স। বাক্সের ভিতর থেকে একটা ন্যাকড়ার ছোট পুঁটুলি-মতন কি বার করলেন। ন্যাকড়াটি খুলতেই লালরঙের শালুর পুঁটলি বেড়িয়ে পড়ল। সেটি খুললেন। বেরুল রেশমী ন্যাকড়ার পুঁটুলি, সেটি খুলতেই বের হ'ল খানিকটা তুলো, তারপর ছোট্ট ঘড়িটি। তিন পুরু কাপড়-ঢাকা ঘড়িটিকে আঙুরের মতো রাখতেন তিনি সযত্নে। ঘড়িটি বার করে চাপটালি খেয়ে বসলেন, তারপর চোখ বুজে ধীরে ধীরে দম দিতে লাগলেন। মনে হ'ল যেন পুজো করছেন।

অবিনাশবাবুর কথাটা মনে পড়ল। স্নেহের কাঙাল বেচারা! জীবনে কিন্তু ভালবাসার সুযোগ পাচ্ছে না কোথাও। সব স্নেহ তাই উজাড় করে দিয়েছে বোধহয় ঘড়িটির উপর।

একদিন ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে' দেখি, আলোবাবু হ্যাট বাজিয়ে তারস্বরে গান

গাইছেন। তুটো লাইনই বার বার গাইছেন—

আমায় ওরা সইলো না কেউ
আমার কাছে রইলো না কেউ—

আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম অবাক হয়ে। এমন গলা ছেড়ে গান গাইতে শুনি নি কখনও তাঁকে। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থেমে গেলেন তিনি।

"আজ এত জোরে জোরে গান গাইছেন যে।"

"এমনি।"

তারপর আমার দিকে চেয়ে একটু কুণ্ঠিত হাসি হেসে' বললেন, "আমার ঘড়িটা চুরি হয়ে গেছে। ঠিক সময় হয়তো ভাল করে' দম দিতে পারবে না—"

টপ-টপ করে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা।

আলোবাবু এখন পাগলা গারদে আছেন।

সমাজের সঙ্গে নিজেকে তিনি খাপ খাওয়াতে পারলেন না কিছুতে।

ধনী-দরিদ্র

"নমস্কার মহেশবাবু, ভালো তো সব?"

দন্তপংক্তি বিকশিত করে ধীরেনবাবু নমস্কার করলেন।

সদ্য পাশকরা কলেজের ছোকরা জীবন কেরানীর ছেলে মহেশ দাসকে নমস্কার করা দূরে থাক, গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না আগে ধীরেনবাবু। ইদানীং কিন্তু আনছেন। মানে, আনতে হচ্ছে। ধীরেনবাবুর মনিব রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্করের একমাত্র কন্যা জয়শ্রীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে মহেশ দাসের। বিয়ে যাতে না হয় ধীরেনবাবু গোপনে গোপনে সে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। ধীরেনবাবুর ইচ্ছে ছিল অবনী সেনের সঙ্গে জয়শ্রীর বিয়ে হোক। অবনীও জমিদারের ছেলে, সুপুরুষ, জয়শ্রীর সঙ্গে ভাবও আছে। কিন্তু হ'ল না। হ'লে ধীরেন ভাদুড়ীর সুবিধা হত, অবনীকে তিনি প্রাইভেটে পড়িয়েছিলেন কিছু-দিন। তাঁর পসার-প্রতিপত্তি বাড়ত। এখন মহেশ দাসকে নমস্কার করতে হচ্ছে। ধীরেনবাবু আর একবার দন্তপংক্তি বিকশিত করলেন।

"মৃণালপুরে যাচ্ছেন না কি? জয়া মা তো সিমলা থেকে নেবে গেছেন, শুনলাম অবনীর কাছ থেকে।"

মহেশ দাসের ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হ'ল। জয়শ্রী সিমলা থেকে নেবে মৃণালপুরে গেছে এ কথা শোনা মাত্রই মহেশ সেখানে ছুটবে কেন বিনা আহ্বানে? ধীরেনবাবুর এই উক্তি তার আত্মসম্মানকে আঘাত করলে যেন। এ কথা ভাববার মানে!

"না, আমার এখন যাবার কোনো ঠিক নেই।"

"ও, আচ্ছা যদি যান আমাকে জানাবেন একটু আগে থাকতে, কিছু ডিম দিয়ে দেব সঙ্গে। আজ অবনীর সঙ্গে দিলাম কিছু, আপনার সঙ্গে আরও কিছু দিয়ে দেব। মৃণালপুরে ডিম পাওয়া যায় না কিনা!"

"অবনীবাবু গেছেন নাকি সেখানে?" প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়ল মহেশ দাসের মুখ থেকে।

"হ্যাঁ, বললে, জয়া মা-র চিঠি পেয়েছে কাল। তাকে স্টেশনে তুলে দিয়েই তো আসছি।"

ঘাড়টি কাত করে আর একবার হলদে দাঁতগুলি বার করলেন ধীরেনবাবু, তারপর মরাল-গতিতে মোড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লাম্বেসো হওয়ার পর থেকে ধীরেনবাবুর মরাল-গতি হয়েছে।

ঘাড় কাত করে' সাপ বিষ ঢালে, ধীরেনবাবুও বিষ ঢেলে' গেলেন।

অবনী সেন জয়শ্রীর চিঠি পেয়েছে, কিন্তু সে কোনও খবরই জানে না। তার চিঠি পেয়ে অবনী মৃণালপুরে চলে' গেল!

নিষ্ঠুর বিষটা মহেশ দাসের শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হতে লাগল ক্রমশঃ। খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে থেকে চলে' গেল সে অবশেষে কলেজের দিকে।

দুই

বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে মহেশ দাস। কিন্তু চমৎকার ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। মহেশের বাবা ছিলেন কলেজের কেরানী, অকালে হঠাৎ মারা গেছেন। মহেশ অধ্যাপক হয়েছে সেই কলেজে। মহেশের সুখ্যাতিতে সকলেই পঞ্চমুখ। যেমন বিদ্বান, তেমনি স্বভাব-চরিত্র, তেমনি স্বাস্থ্য। যদিও গরীব, কিন্তু বংশ বনিয়াদী। রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্কর অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন হাজির হলেন মহেশের মায়ের কাছে। অতি দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল কিছু। অত বড় একজন ধনীর আগমনে মহেশের মা একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। রায়বাহাদুর যা বললেন তা আরও বিস্ময়কর।

"একটি ভিক্ষা আছে আপনার কাছে।"

মহেশের মা মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে নীরব হ'য়ে রইলেন।

"আপনার মহেশের সঙ্গে জয়ার বিয়ে দিতে চাই। যদি অনুমতি করেন ব্যবস্থা করি। জয়া এবার আই-এ পাশ করল, এইবার বিয়ে দিতে হবে।"

রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্কর তাঁর সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের জন্য তাঁর দ্বারস্থ হবেন, এ মহেশের মায়ের কল্পনাতীত ছিল। প্রস্তাব শুনে তিনি খানিকক্ষণ নীরব হ'য়ে রইলেন, তারপর বললেন, "আপনার মেয়ের পাত্রের অভাব কি? আমরা গরীব—"

বাধা দিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, "অমন ছেলের মা আপনি, আপনি গরীব হতে যাবেন কোন্ দুঃখে—"

মহেশের মা আবার চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, "আচ্ছা, ছেলেকে জিগ্যেস্ করে' দেখি।"

মহেশও প্রথমটা রাজী হয় নি।

সে-ও বলেছিল, "মা, ওরা বড়লোক, আমরা গরীব।"

মহেশের মা হেসে' উত্তর দিয়েছিলেন, "বড়লোক হওয়া তো অপরাধ নয় বাবা। হ'লই বা বড়লোক। নির্মলবাবু লোক খুব ভালো। তা ছাড়া, অত বড় একটা মানী লোক নিজে বাড়িতে এসে অনুরোধ করলেন, মেয়েও শুনেছি খুব ভালো—"

মহেশ চুপ করে' রইল। তখন চুপ করে' রইল, কিন্তু রাজী হ'য়ে গেল শেষ পর্যন্ত। নির্মলশঙ্করবাবু নিজে আরও দু'বার এলেন, লোক পাঠালেন কয়েক বার। দরিদ্র মহেশের ক্ষুধিত অহঙ্কারটা তৃপ্ত হ'ল বোধ হয়, কিংবা হয়তো আরও কিছু···। রাজী হ'য়ে গেল সে শেষ পর্যন্ত।

সকলেই আশা করেছিল, নির্মলশঙ্করের বন্ধু এবং প্রতিবেশী জমিদার প্রবীর সেনের একমাত্র ছেলে অবনী সেনের সঙ্গেই জয়শ্রীর বিয়ে হ'বে। অবনীর সঙ্গে জয়শ্রীর খুব মেশামেশি দেখেই লোকে এ কথা ভেবেছিল, কিন্তু ভুল ভেবেছিল।

তারা রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্করকে চিনত না। তিনি জহুরী লোক। জমিদারের বিলাসী ছেলে অবনী সেনের তুলনায় বিদ্বান শুভ্রচরিত্র মহেশ যে কত ভালো তা বুঝতে তাঁর দেরি হয় নি।

···বিয়ের এই ইতিহাস।

মাত্র মাস ছয়েক আগে বিয়ে হয়েছে।

তিন

সমস্ত দিন নানা কাজে ব্যাপৃত হ'য়ে রইল মহেশ। তিনটে পর্যন্ত কলেজের ক্লাস ছিল, তার পর ইচ্ছে করেই সে গিয়ে যোগ দিলে ছেলেদের ডিবেটিং ক্লাবে। সেদিন 'ডিবেট' ছিল একটা, ছেলেদের সঙ্গে টেনিসও খেললে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারপর বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি ফিরে এসে পড়াশোনায় মগ্ন রাখবার চেষ্টা করলে নিজেকে, কিন্তু কিছুতেই মন বসল না। ধীরেনবাবুর কথাগুলো বার বার মনে পড়তে লাগল।

অবনী সেনের সঙ্গে জয়শ্রীর মাথামাখি সে-ও যে লক্ষ্য করে নি তা নয়। কিন্তু

গ্রাহ্য করে নি। সে ভেবেছিল, বড়লোকের মেয়ে বিশেষত আজকালকার লেখা-পড়া-জানা মেয়ে—তা ছাড়া, তার নিজেরও এ বিষয়ে যে খুব একটা আপত্তি ছিল তা-ও নয়। মিশলেই বা, ক্ষতি কি তাতে। হারেমের দিন এখন আর নেই। কিন্তু তার প্রতি জয়শ্রীর ব্যবহারটা একটু আড়ষ্ট গোছের হওয়াতে তার কেমন একটু খটকা লাগছিল। একদিনও সে প্রাণখুলে কথা কয় নি তার সঙ্গে, ভালো করে হাসে নি। সে নাকি ভালো গান গাইতে পারে। কিন্তু একদিনও গান গায় নি তার কাছে। সম্মানিত অতিথির প্রতি লোকে যেমন মুখোশ-পরা ভদ্র ব্যবহার করে, জয়শ্রীও তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করে চলেছে। সর্বদাই কেমন যেন আড়ষ্ট ভাব। শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে তার নিজের আচরণও তেমন স্বচ্ছন্দ নয়। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন লেপাফা-দুরস্ত কাণ্ড। মার্বেল পাথরের মেজে, দামী কার্পেট পাতা রয়েছে, পা দিতে সঙ্কোচ হয়। বহুমূল্য সোফা সেটি। বসতে সাহস হয় না। ঝকঝক তকতক করছে। যেদিকে দৃষ্টি ফেরাও কেবল ঐশ্বর্যের চাকচিক্য। মহেশ একদিনও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারে নি। বাড়ির ছেলে-মেয়ে, চাকর-চাকরানী, সোফার-সহিস সব ফিটফাট; মিনার্ভা কার, ওয়েলার ঘোড়া, মুলতানী গাই, অ্যালশেশিয়ান কুকুর—মহেশের কেমন যেন ভয়-ভয় করত সর্বদা। বিয়ের পর জামাই হিসেবে যখন সে গেল তখন তাকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো হৈ-হৈ উঠল না। নতুন-কেনা একটা দামী আসবাবের মতোই সে যেন বড়লোকের প্রাসাদে ঢুকল। দামী আসবাবের প্রতি যতটুকু মনোযোগ দেখানো সঙ্গত তার বেশী মনোযোগ যেন কেউ তার প্রতি দিলে না। সে-ও দাবি করতে পারলে না। যত্নের কোনও ত্রুটি হ'ল না অবশ্য। কিন্তু আয়োজনের আধিক্যটাই যেন আঘাত করতে লাগল তাকে। তার মনে হ'তে লাগল, কারও অন্তরে সে যেন প্রবেশ করতে পারছে না। অনাবশ্যক ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেওয়ালের মতো আড়াল করে' ফেলেছে সব কিছুকে।

…রাত্রে ঘুম এল না। কিছুতেই এল না। ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করতে লাগল সে। অবনী সেন? কী এমন আছে লোকটার মধ্যে। চেহারা ভালো, ভালো বাঁশীও বাজাতে পারে। তাতে কী! জয়শ্রী অবনীকে খবর দিয়েছে মৃণালপুরে যাবার জন্যে, অথচ তাকে কিছু লেখেনি, এর মানে

কী? সে যে সিমলা থেকে চলে' এসেছে এ খবরই তো জানে না সে! আশ্চর্য!

জয়শ্রীর চেহারাটা মনের উপর ফুটে উঠল। তার শেষ যে চেহারাটা সে দেখেছিল সেই চেহারাটা। অদ্ভুত রূপসী! ধবধবে ফরসা রঙ, টকটকে লাল একখানা শাড়ি পরেছিল। কুচকুচে কালো চোখে অদ্ভুত একটা শাণিত দৃষ্টি। লোভনীয়, ভয়ঙ্কর লোভনীয়।

মহেশ দাস শুয়ে শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। তারপর হঠাৎ ঠিক করলে—যাবে। বিনা নিমন্ত্রণেই যাবে, কাউকে কিছু না বলে লুকিয়ে যাবে। রাত্রিবেলা কোনও খবর না দিয়ে হঠাৎ গিয়ে হাজির হ'বে। দেখতে হ'বে অবনী সেনের সঙ্গে জয়শ্রীর প্রকৃত সম্পর্কটা কী। যেতেই হ'বে। ইতিপূর্বে সে মৃণালপুরে যায় নি কখনও। কিন্তু রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্করের বাড়ি খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। সে যাবে···যেতেই হবে।

চার

রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্করের বিরাট বাড়িটার সামনে মহেশ এসে যখন দাঁড়াল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। একটানা ডেকে চলেছে পাপিয়াটা—চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল। প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড হাতা। উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দেওয়ালের ধারে উৎকর্ণ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল মহেশ। বাঁশী বাজছে। বাঁশীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে গানও গাইছে কে যেন। জয়শ্রী কি? মহেশের একবার ইচ্ছে হ'ল ডাকে। কিন্তু না—সে ডাকবে না। গেটের সামনে এগিয়ে এল আস্তে আস্তে। বিরাট লোহার গেট। নিষ্ঠুর নিষেধের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে ঠেলে দেখলো একটু। ভিতর থেকে বন্ধ। না, সে ডাকবে না। বাঁশী বেজে চলেছে। সমস্ত অন্তর যেন গলে পড়ছে গানের সুরে সুরে।··· মহেশ ভুলে গেল যে সে একজন অধ্যাপক, ভুলে গেল যে সে এ বাড়ির জামাই। সে ঠিক করলে যে সে গেট টপকে লোহার পাইপ বেয়ে ছাতে উঠবে লুকিয়ে। আসল ব্যাপারটা কি দেখতেই হ'বে তাকে। গেটের লোহার গরাদেতে পা রেখে সে উঠতে লাগল।

পাঁচ

সকালে চায়ের আসরে সবাই জমে বসেছে। রেডিওতে বেহালায় ভৈরবী আলাপ করছে কে যেন। হঠাৎ মালীটা এসে বললে, "হুজুর, বাগানে একটা লাস পড়ে আছে। কোনো চোর-টোর হবে বোধ হয়। রাত্রে গেট টপকে ঢুকেছিল, কুকুরে মেরে ফেলেছে—"

জয়শ্রীর দূর-সম্পর্কের একজন মামা বসে ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন—"ইস, তাই নাকি? দু-দুটো অ্যালশেশিয়ান এমন ভাবে খুলে রাখিস তোরা। কুকুর তো নয় যেন বাঘ—"

অবনী সেন বললে—"পাহারা দেবার জন্যেই তো কুকুর। চলুন, দেখে আসা যাক। এখানকার দারোগা কে আজকাল? পুলিসে খবর দিতে হ'বে—মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি। চল জয়শ্রী, যাবে নাকি—"

"যাচ্ছি দাঁড়ান, ভৈরবীটা শেষ হোক—"

চম্পা

শ্রীমান কার্তিক শ্রীমতী চম্পার প্রেমে পড়িয়াছিল। চম্পা কিছুমাত্র আপত্তি করে নাই, বরং খুশীই হইয়াছিল। কারণ কার্তিক ধনবান তো বটেই, রূপবানও। মিলনের পথে সাধারণতঃ যে সব সামাজিক, আর্থিক বা আধ্যাত্মিক বাধা থাকে, এক্ষেত্রে তাহা ছিল না। চম্পা রূপোপজীবিনী। সরকারের খাতায় নাম লিখাইয়া আইনসঙ্গত উপায়ে সে ব্যবসা ফাঁদিয়াছিল। এরকম ঘটনা বিরল নহে। কিন্তু ইহাদের কেন্দ্র করিয়া একদিন একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাই এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

কার্তিকের প্রতিবেশী অমরবাবুর কলিকাতাস্থ বাসায় একদা প্রভাতে তাঁহার বাল্যবন্ধু যোগেনবাবু আসিয়া হাজির হইলেন। আসিয়া বলিলেন, "ভাই অমর, এসে তো পড়লুম, এবার তুমি সব ব্যবস্থা কর। তোমার পাঁচু স্যাকরাকে এখনই খবর দাও। আমাকে কালই সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরতে হ'বে। একদিন ছুটি পেয়েছি। বিয়েরও তো দেরি নেই আর। মাঝে মাত্র পনেরোটি দিন।"

অমরবাবু দক্ষিণ হস্তটি উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "সব হ'বে। ব্যস্ত হচ্ছ কেন। আগে হাতমুখ ধোও, কিছু খাও, জিরোও, তারপর সব ঠিক করে' দেব। আগে গিন্নিকে খবরটা দিয়ে আসি।" অমরবাবু অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। যোগেনবাবু কোটটি খুলিয়া জানালার ধারে যে পেরেকটি ছিল তাহাতে ঝুলাইয়া দিলেন। তাহার পর গেঞ্জি খুলিতে লাগিলেন।

অমরবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি একেবারে ভিতরেই এস। বাথরুমটা খালি আছে এখন, স্নানটা সেরে নাও। স্নান করবে তো?"

"স্নান করবো বইকি"

"তাহলে চলে' এস"

"আমি সন্ধ্যাহ্নিকও করব"

"সব ব্যবস্থা আছে, চলে' এস"

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

যোগেনবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিলেন। রাত্রে ট্রেনে একেবারে ঘুম হয় নাই। স্নানান্তে পূজা করিলেন। তিনি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করেন। পূজার পর চা-জলখাবারের পালা। তাহাতেও খানিকটা সময় গেল। বাল্যবন্ধু যোগেনের জন্য অমরবাবু নানাবিধ আয়োজন করিয়াছিলেন। আহারাদির পর বিবাহের কথা উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরেই অনিবার্যভাবে আর্থিক প্রসঙ্গ লইয়া দুই বন্ধুতে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

যোগেনবাবু বলিলেন, "ভাই ভদ্রাসনটুকু বাঁধা দিয়ে হাজার তিনেক টাকা যোগাড় করেছি। ওইতেই কুলিয়ে নিতে হ'বে সব—"

"কুলিয়ে যাবে। তবে জিনিসপত্তরগুলো ভালো হ'বে না। নগদ দিতে হ'বে না কি কিছু?"

"নগদ দেড়হাজার চেয়েছেন। সেটা বউমার গয়না বিক্রি করে' পাব।"

"বউমা তোমার কাছেই আছেন?"

"এখন আছেন। কিন্তু বিয়ের পর ভেবেছি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেব। আমার বাড়িতে দেখা-শোনা করবার কেউ নেই, দিনকালও ভালো নয়। গবুর মা যদি বেঁচে থাকত তাহলে ভাবনা ছিল না—"

হঠাৎ একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিল। বছর তিনেক আগে যোগেনবাবু তাঁহার একমাত্র পুত্র গোবর্ধনের বিবাহ দিয়াছিলেন। মাস ছয়েক পরেই গোবর্ধন মারা যায়। তাহার মাস ছয়েক পরেই গোবর্ধনের মা-ও। পুত্রশোক তিনি সহ্য করতে পারেন নাই।

অমরবাবু জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যোগেনবাবু কোঁচার খুঁট দিয়া উদ্গত অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন।

"গবুর বিয়েতে তুমি তো নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিলে। সব টাকাটা খরচ করে' ফেলেছে?"

"বাড়িটা দোতলা করলাম যে। গবুর জন্যেই দোতলা করাতে হয়েছিল। এখন সব শূন্য পড়ে আছে। যাক, ভাগ্যে বাড়িটা ছিল তাই সেটা বাঁধা দিয়ে বিয়ের টাকাটা যোগাড় হ'ল—"

"বাড়ি বাঁধা দিয়ে মোটে তিন হাজার টাকা পেলে?"

"তাই দিতে চায় না হে। গরজ যে আমার। এদিকে মেয়ের বয়স আঠারো

পেরিয়ে গেছে, সুপাত্র যখন পেয়েছি তখন আর দ্বিমত করলাম না। কিছুদিন পরে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডটা পাব, তাই দিয়ে উদ্ধার করব বাড়িটা। আর কার জন্যেই বা বাড়ি, মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে বাড়িতে কে থাকবে বল—"

"তা বটে—। পাত্রটি কি করে ?"

"এবার বি. এ. পাস করেছে। আগে বার দুই ফেল করেছিল। তবে বংশ ভালো। ঘরে খাওয়া-পরার সংস্থান আছে, দেশে বাড়ি আছে—"

"এই পাত্র নগদ পণ দেড় হাজার চাইছে ?"

"আর বল কেন ভাই। আমি আর দরদস্তুর করি নি, বুঝলে! মেয়ে পছন্দ হতেই ওরা যা বললে তাতেই রাজী হয়ে গেলাম। গত দু-বৎসর থেকে ক্রমাগত মেয়ে দেখাচ্ছি, কারও পছন্দই হয় না—ওর সামনের দাঁতগুলো উঁচু কি না—"

বলিয়াই যোগেনবাবু একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তিনিও গবুর জন্য অনেক মেয়ে দেখিয়াছিলেন, অনেককে প্রত্যাখ্যানও করিয়াছিলেন। একটি মেয়েকে তাঁহার খুব পছন্দ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বাবা নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন নাই। আর একটি মেয়ে······

"পাঁচু স্যাকরাকে ডাকতে পাঠাই তাহ'লে। ডাকবার দরকার কী, নিজেরাই যাই চল। ট্রামে পাঁচ মিনিট লাগবে।"

দুইজনেই বৈঠকখানায় বাহির হইয়া আসিলেন।

"এ কী, আমার কোটটা কোথা গেল। এইখানে টাঙিয়ে রেখেছিলাম যে—"

"কোন্‌খানে—"

"এই পেরেকে—"

"তাহলে ঠিক কেউ জানালা দিয়ে নিয়ে গেছে। ওখানে কোট রাখতে গেলে কেন—"

"ওই কোটের পকেটেই যে তিন হাজার টাকা আছে আমার।"

"অঁা, বল কী!—"

যোগেনবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

·

ব্যাপারটা পাড়ায় চাউর হইয়া গেল।

অমরবাবু নিজের এবং পাশের বাড়ির চাকরদের ডাকিয়া জেরা করিতে লাগিলেন,

পুলিসের ভয় দেখাইলেন। যদি খুঁজিয়া দিতে পারে বকশিশ দিবেন, এ কথাও বলিলেন। কিন্তু ফল হইল না।

অবশেষে একটা চাকর বলিল, "কার্তিকবাবুকে বলুন, তাঁর হাতে অনেক গুণ্ডা আছে, তিনি যদি চেষ্টা করেন হয়তো কোনও পাত্তা লাগাতে পারেন।"

কার্তিকের পিতা বিশ্বেশ্বরবাবুর সহিত আমরবাবুর হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু তিনি মারা গিয়াছেন। কার্তিকও তাঁহাকে চেনে, খাতিরও করে, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যে-সব কানাঘুষা বাজারে শোনা যাইতেছে, তাহাতে তাহার নিকট যাইতে অমরবাবুর প্রবৃত্তি হয় না। বন্ধুর খাতিরে তবু গেলেন। সমস্ত শুনিয়া কার্তিক খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "আমি চেষ্টা করে দেখছি, যদি কিছু করতে পারি। যদি কিছু করা সম্ভব হয় আমি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আপনার কাছে যাব। আর যদি না যাই তাহলে জানবেন কিছু করতে পারি নি।"

অমরবাবু চলিয়া আসিলেন।

কার্তিকও মোটরটি বাহির করিল এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই চম্পার বাড়িতে পৌঁছিয়া গেল।

চম্পা বিস্মিত হইল একটু। এ সময়ে কার্তিক সাধারণতঃ আসে না।

"আজ এমন অসময়ে যে"

"একটু দরকার আছে। একটা কথা শুনেছিলাম কিন্তু সে কথা তোমাকে জিগ্যেস করতে ভুলেই গিয়েছিলাম। এবার গুণ্ডারা তোমাকে নাকি 'রানী' করেছে?"

মুচকি হাসিয়া চম্পা বলিল, "হ্যাঁ করেছে—। আমি ত্রিশ ভোটে জিতেছি। ফুলী আমার সঙ্গে কনটেস্ট করেছিল, পারে নি।"

"ভোট নিয়ে ঠিক হয় নাকি এসব?"

"নিশ্চয়!"

"রানীর ক্ষমতা কী?"

"ঠিক রানীর মতোই ক্ষমতা। ওদের আমি যা করতে বলব তা ওরা তৎক্ষণাৎ নির্বিচারে করবে। কেন, দরকার আছে নাকি কিছু?"

"আছে—"

কার্তিক সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল।

"চোর পকেটমার এদের উপরও তোমার কর্তৃত্ব আছে না কি ?"

"আছে বই কী। এ বছরকার মতো কলকাতার আণ্ডার ওয়ার্লডের রানী আমি। বাংলা ভাষায় পাতালের রানী বলতে পার—"

"দেখ যদি ভদ্রলোককে সাহায্য করতে পার। বড়ই বিপন্ন হয়েছেন। ধার করে মেয়ের বিয়ের বাজার করবার জন্যে যে টাকা এনেছিলেন, তা সব ছিল ওই কোটের পকেটে—"

"দেখি—"

ইলেকট্রিক বেল টিপিতেই দৈত্যের মতো বিরাটকায় একটি লোক অভিবাদন করিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল।

"দেখ মুনিম, কৈলাস বসু স্ট্রীট থেকে একটি কোট চুরি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। কে সেখানে ডিউটিতে ছিল ?"

"সুখন"

"তাকে ডাক"

আধ ঘণ্টা পরে সুখন আসিয়া হাজির হইল। অতিশয় নিরীহ ভদ্র চেহারা। কে বলিবে লোকটা চোর।

"সুখন, আজ সকালে কৈলাস বসু স্ট্রীট থেকে কোট পেয়েছ কি একটা ?"

"হাঁ মাইজি। জানলার ধারে ঝুলছিল, গল্লি থেকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছি।"

"কোটটা ফেরত দিতে হবে।"

"সেটা তো গুদামে জমা হয়ে গেছে মা।"

চম্পা কার্তিকের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি কোটটা চেন কি ?"

"না—"

"সেই ভদ্রলোককে নিয়ে এস এখানে, আমি কোটটা এখানে আনিয়ে রাখছি।"

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে।

কার্তিক ও যোগেনবাবু চম্পার বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। সুসজ্জিত ঘর। মেজেতে দামী কার্পেট পাতা। চলিতে গেলে পা ডুবিয়া যায়। প্রত্যেকটি আসবাবই দামী। পরদা ঠেলিয়া চম্পা প্রবেশ করিল।

"এই কোটটা কি আপনার ?"

চম্পাকে দেখিয়া যোগেনবাবু একটু চমকাইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, "হ্যাঁ, এইটেই—"

"দেখুন এতে যা যা ছিল তা ঠিক আছে কি না।"

যোগেনবাবু দেখিলেন সবই ঠিক আছে। ইনার পকেটে নোটের তাড়াটা যেমন পিন করা ছিল তেমনি রহিয়াছে। একটা পকেটে বিড়ি দিয়াশলাই ছিল তাহাও আছে।

যোগেনবাবুর মনে হইল এ মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখিয়াছি। তাহার পর হঠাৎ মনে পড়িল।

"তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি এর আগে?"

"না, কোথাও দেখেন নি।"

"আচ্ছা, তোমার নামটি কি সাবিত্রী?"

"না, আমার নাম চম্পা।"

চম্পা আর দাঁড়াইল না, ভিতরে চলিয়া গেল।

যোগেনবাবুর কিন্তু ভুল হয় নাই। গবুর বিবাহের জন্য যখন তিনি একের পর এক পাত্রী দেখিতেছিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে এ মেয়েটিকেও দেখিয়াছিলেন। মেয়েটির রূপ দেখিয়া এবং তাহার 'সাবিত্রী' নাম শুনিয়া ইহাকে তাঁহার পছন্দও হইয়াছিল। কিন্তু ইহার বাবা নিতান্ত গরীব ছিল, পাঁচ হাজার টাকা পণ শুনিয়া পিছাইয়া যায়।

যোগেনবাবু হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

"চলুন, কোট তো পেয়ে গেলেন—"

আসিবার সময় আবার নরম কার্পেটে তাঁহার পা ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

রঘুবীর রাউত

জমিদারি-প্রথা তখনও অবলুপ্ত হয় নি। মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত রঘুবীর রাউতের দোর্দণ্ড প্রতাপে তখনও বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাচ্ছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমল তখন, ইংরেজের কড়া আইন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু রঘুবীর রাউত নিজের আইনে চলেন। সে আইনের সঙ্গে ইংরেজের আইনের গরমিল হ'লেও চিন্তিত হ'ন না তিনি। টাকার জোরে সব ঠিক হ'য়ে যায়। তা বলে তিনি অত্যাচারী ছিলেন না। বরং সুবিচার করবার জন্যেই তিনি প্রচলিত আইন অমান্য করতেন। তিনি ব্যাপারটার মর্মস্থলে একেবারে তীরের মত সোজা সবেগে পৌঁছে যেতেন। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

এক ছোকরা দারোগা এসে তাঁর জমিদারিতে উৎপাত করতে লাগল একবার। লোকের খাসিটা-পাঁঠাটা নিয়ে যায়, দাম দেয় না। ঘুষ খেয়ে আসল অপরাধীকে ছেড়ে দেয়, নিরপরাধ গরীবকে নিয়ে টানাটানি করে। রাউত মশায়ের গুপ্তচর (লোকে গোপনে তাকে মাহুত বলত) মুলুক দাস এসে খবরটি রাউত মশায়ের কর্ণগোচর করল। রাউত মশায় ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "সাবধান করে দাও ওকে। পুলিসের লোক, হুট করে ঘাঁটাতে চাই না; কিন্তু বেশী যদি বাড়াবাড়ি করে, শিক্ষা দিয়ে দেব।"

সপ্তাহ-খানেক পরে মুলুক দাস এসে বলল, "সাংঘাতিক লোক ব্যাটা। আমাদের হীরু গোয়ালার মেয়েটাকে নিয়ে টানাটানি করেছে রাত্রে। সবাই হৈ-হৈ করে উঠতেই বাইকে চড়ে পালাল। আজ সকালে আমি থানায় গিয়েছিলাম। আড়ালে ডেকে বললাম আপনার কথা। জবাবে কী বললে জানেন, বললে, 'আমি স্বয়ং কুইনের প্রতিনিধি, আর উনি একটা সামান্য জমিদার। যদি ইচ্ছে করি ছারপোকার মত পিষে মেরে ফেলতে পারি ওঁকে। মানা করে দেবেন, উনি যেন আমার ব্যাপারে হাত না দেন। আমি ওঁর প্রজাও নই, খাতকও নই।"

রাউত মশায় কিছু বললেন না। বাঁ হাতের আঙুলগুলি দিয়ে বাঁ দিকের গোঁফটায় তা দিতে লাগলেন খালি। বাঁ দিকের গোঁফটার উপর তাঁর কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব ছিল।

● তৃতীয় শতক ●

সাতদিন পরে রাউত মহাশয় বৈঠকখানায় বসে আছেন, দেখতে পেলেন দারোগাটা তাঁর গেটের সামনে দিয়ে বাইকে করে যাচ্ছে।

"রাবণ মিশির—"

"জী হুজুর!"

বলিষ্ঠ সিপাহী রাবণ মিশ্র সেলাম করে' দাঁড়াল।

"দারোগা সাহেব বাইকে করে যাচ্ছে, তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো। যদি আসতে না চায়, ধরে' নিয়ে এসো।"

"যো হুকুম।"

মিনিট দশেক পরে ক্রুদ্ধ দারোগাকে টানতে টানতে নিয়ে এল রাবণ মিশির।

"থামের সঙ্গে বেশ কস্‌কসিয়ে বাঁধো ওকে। আগে প্যাণ্ট কোট গেঞ্জি সব খুলে নাও, যদি চেঁচায়, মুখটাও বেঁধে ফেলো।"

রাবণ মিশির তাকে টানতে টানতে নির্জন পশ্চিম বারান্দায় নিয়ে গেল। একটু পরে এসে খবর দিল, দারোগাকে থামে বাঁধা হয়েছে। রাউত মশায় উঠে গিয়ে দেখলেন, উলঙ্গ আবদ্ধ দারোগা নির্বাক হ'য়ে রয়েছে বটে, কিন্তু তার চোখ দুটো দিয়ে আগুনের হলকা ফুটে বেরুচ্ছে।

রাউত বললেন, "আপনি মহারানীর প্রতিনিধি, আমি আমার প্রজাদের প্রতিনিধি। আপনি যেসব অন্যায় করেছেন তার শাস্তি দিচ্ছি। আজ আপনাকে চাবকে ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু ফের যদি এসব করেন তাহলে বাঘ কিংবা কুমির দিয়ে আপনাকে খাওয়াব। ও দুটো জানোয়ারই আমি পুষি, আশা করি জানা আছে সেটা আপনার। এই, বেত লাগাও—"

রাবণ মিশির একটা হাণ্টার বের করে এনে চাবকাতে লাগল দারাগাকে। রঘুবীর রাউত একটা মোড়ায় বসে বাঁ দিকের গোঁফটি চোমরাতে লাগলেন। একটু পরে দারোগা অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন রাউত মশায় হুকুম দিলেন, "ওকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে হীরু গোয়ালার বাড়ির পিছন দিকের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আয়। তারপর এই টেলিগ্রামটা ডাকঘরে নিয়ে যা। আমি টেলিগ্রাম লিখছি, ওটাকে ফেলে দিয়ে আয় আগে।"

টেলিগ্রাম করলেন পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে। লিখলেন, "এখানকার দারোগা

একটি গোয়ালার মেয়েকে বলাৎকার করছিল বলে গুরুতররূপে প্রহৃত হয়েছে। অবিলম্বে কিছু একটা ব্যবস্থা করুন।"

অনেক হাঙ্গামা হুজ্জত হ'ল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি গেল দারোগাটার। রঘুবীর রাউত ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পক্ষপাতী ছিলেন। যা করতেন নিজেই করতেন। আবেদন-নিবেদন বা আইনের ঘোরপ্যাঁচের ভিতর যেতে চাইতেন না। বলতেন, "আইন? ও আইন অনুসারে চললে দোষীকে সাজা দেওয়া যায় কখনও? হাতে-নাতে চোর ধরলেও মিথ্যে সাক্ষী তৈরি করতে হবে, তা না করলে চোর ছাড়া পেয়ে যাবে!" আদালতে তাঁর মামলা-মকদ্দমা হরদম লেগে থাকত। কিন্তু তিনি একবার ছাড়া কখনও ফরিয়াদী হন নি। বরাবর আসামী হয়েছেন। তিনি নিজের জমিদারিতে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, সুতরাং আইন ভঙ্গের অপরাধে আসামী হ'তে হ'ত তাঁকে।

যে-মকদ্দমায় তিনি ফরিয়াদী হয়েছিলেন তারই গল্প এবার বলব।

দুই

রঘুবীররা দুই ভাই ছিলেন, রঘুবীর আর সুমিত্রানন্দন। সুমিত্রানন্দন এবং তাঁর পত্নী বহুকাল আগে মারা গেছেন। তাঁদের একমাত্র সন্তান অযোধ্যাপ্রসাদ রঘুবীরের কাছে মানুষ হচ্ছিল। রঘুবীর অপুত্রক এবং বিপত্নীক। সুতরাং অযোধ্যা-প্রসাদ রাউতই বিশাল জমিদারির একমাত্র উত্তরাধিকারী। রঘুবীর অযোধ্যাপ্রসাদকে লেখাপড়া শেখান নি বিশেষ। স্কুল কলেজের শিক্ষার উপর তেমন আস্থা ছিল না তাঁর। তিনি তাকে মোটামুটি বাংলা, ইংরেজী এবং অঙ্ক শিখিয়েছিলেন। পালোয়ান রেখে কুস্তি করতে শিখিয়েছিলেন। গান বাজনা শেখাবার জন্যে ওস্তাদ রেখেছিলেন একজন। অযোধ্যাপ্রসাদ যখন সাবালক হ'ল তখন তাকে আলাদা বাড়িও করিয়ে দিলেন একটি। জমিদারির একটা মহালের ভারও দিয়ে দিলেন যাতে সে স্বাধীনভাবে থেকে জমিদারি পরিচালনা করবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্র মিত্রবদাচরেৎ—চাণক্যের এই উপদেশ রঘুবীর মানতেন। প্রাপ্তবয়স্ক অযোধ্যাপ্রসাদের কোনও কাজে বাধা দিলেন না তিনি।

ফল নিম্নলিখিত প্রকার হ'ল।

যে পালোয়ানেরা তাকে কুস্তি শেখাতে এসেছিল তারা অযোধ্যাপ্রসাদকে পরামর্শ দিলে যে, পুষ্টিকর খাবার প্রচুর পরিমাণে না খেলে কুস্তিতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, আখরোট, খুবানি খোয়া প্রচুর পরিমাণে খেতে হ'বে। এর সঙ্গে মাছ মাংস ডিম থাকলে আরও ভাল হয়। গামা, গোবর, কিক্কর প্রভৃতি বড় বড় ব্যায়ামবীরদের খাদ্য-তালিকা' আউড়ে তারা অযোধ্যাপ্রসাদকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলে যে, কুস্তি করতে হ'লে ভাল খাওয়া চাই।

অযোধ্যাপ্রসাদের অর্থাভাব ছিল না। বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি প্রচুর আনিয়ে ফেললে। মুশকিল হ'ল মাছ-মাংস নিয়ে। পাড়াগাঁয়ে প্রত্যহ ভালো মাছ-মাংস পাওয়া যায় না। অযোধ্যাপ্রসাদ প্রত্যহ কালীপুজার ব্যবস্থা করে' ফেললে। রোজ পাঁঠা কাটা হ'তে লাগল। তার মহালে বড় দীঘি ছিল একটা। সেখানে সে আর তাঁর পালোয়ানরা রোজ ছিপ ফেলে' বসতে শুরু করল। জেলেরা জাল নিয়ে নিয়ে ঘুরতে লাগল। অন্তত সের পাঁচেক মাছ রোজ চাই। কারণ সে একা তো নয়, গোটা পাঁচেক পালোয়ান আছে। মাছও জুটতে লাগল। পয়সা খরচ করলে সবই হয়।

গান-বাজনায় ওস্তাদ নুর মহম্মদও একটি পরামর্শ দিলেন তাকে। বললেন, সেতার যখন বাজে তখন একটি অদৃশ্য নর্তকী সেতারের ছন্দে ছন্দে নৃত্য করে। তার নূপুরের নিক্কণ হুজুর নিশ্চয়ই শুনেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে সতরঞ্চির উপর যদি আর একটি নর্তকী নাচে, তাহ'লেই জুড়ি ঠিক মেলে আর তাহলেই সেতারের মজাটা পুরো পাওয়া যায়। নুর মহম্মদ অযোধ্যাপ্রসাদের বাড়ির পাশেই একটি আলাদা বাড়িতে থাকতেন। বললেন, লখ্‌নৌ থেকে তার বিবির এক বোন এসেছে। সাবিত্রী দেবী নাম নিয়ে সে সিনেমায় নামতে চায়। কিন্তু হুজুর যদি মত দেন—।

বাঁ দিকের গোঁফ মোচড়াতে মোচড়াতে মুলুক দাসের কাছে খবর শুনছিলেন রাউত মশায়।

মুলুক দাস বলছিল, "বেলা নটা দশটার সময় ওঠে অযোধ্যা আজকাল। উঠে মুখ ধোয় ঘণ্টাখানেক ধরে'। তারপর চা খায়, তারপর বাদাম পেস্তার হালুয়া। যা চেহারা হয়েছে, চিনতে পারবেন না আপনি। এই টেবো-টেবো গাল, থলথলে ভুঁড়ি, গর্দানের উপরও চাপ-চাপ চর্বি। প্রকাণ্ড একটা গড়গড়া কিনেছে দেখলাম,

ঘণ্টাখানেক ধরে' তামাকই খায়। তারপর তেল মাখতে বসে। ওই পালোয়ানগুলো তেল মাখায় ওকে। বলে না কি মাসাজ করলে শরীরের উপকার হবে। প্রথমে সর্ষের তেল, পরে অলিভ অয়েল, তারপর মাথায় ফুলেল তেল। খেতে বসে ছুটো আড়াইটের সময়। মাছ মাংস রাবড়ি রোজ খায়। নানারকম তরিতরকারি খাবার জন্মে বাড়ির পিছনে বিঘে দুই জমিতে শাকসবজি লাগিয়েছে। হাঁস পুষছে। রোজ ডিম খায়। খেয়ে-দেয়ে শোয়া একটু। তারপর বিকেলে গিয়ে দীঘিতে মাছ ধরতে বসে। পালোয়ানগুলোও বসে। সন্ধ্যের পর থেকে আরম্ভ হয় গানের মজলিস। সাবিত্রী দেবী নাচেন। রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত গান-বাজনা চলে। আজকাল মদও চলছে শুনছি।"

"চুপ কর, বুঝেছি।"

থেমে গেল মুলুক দাস। তারপর আড়চোখে তাঁর দিকে একবার চেয়ে উঠে গেল। রাউত মশায় আরও খানিকক্ষণ গোঁফ চোমরালেন, তারপর তিনিও উঠে গেলেন।

তিন

এর পরই শুরু হ'ল মকদ্দমা।

রঘুবীর রাউত এক জাল দলিল বার করে' দাবি করলেন যে, মৃত্যুর পুর্বে স্থমিত্রানন্দন তাঁর অংশের সম্পত্তি তাঁকে (অর্থাৎ রঘুবীরকে) বিক্রি করে' গিয়েছিলেন। জমিদারিতে আইনত অযোধ্যাপ্রসাদের কিছুমাত্র অধিকার নেই। কিন্তু সে জোর করে' একটা মহাল দখল করে' বসে আছে এবং অপব্যয় করে' সম্পত্তি নষ্ট করেছে। আদালত থেকে তাঁকে তাঁর ন্যায্য অধিকার সাব্যস্ত করবার অনুমতি দেওয়া হোক।

দ্বিতীয় মকদ্দমা করল নর্তকী সাবিত্রী দেবী। তাকে টাকা দিয়ে হাত করলেন রাউত মশাই এবং তাকে দিয়েই এক মকদ্দমা রুজু করা গেল। সাবিত্রী দেবী আদালতে হলফ করে' বলে এল যে, অযোধ্যাপ্রসাদ তার উপর বলাৎকার করবার চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার, উকিল এবং আরও জনকয়েক প্রত্যক্ষদর্শী সমর্থন করলেন সাবিত্রী দেবীকে।

তৃতীয় মকদ্দমা করলে কয়েকটি প্রজা। তাদের নালিশ অযোধ্যাপ্রসাদ নাকি জোর করে' তাদের কাছে খাজনা আদায় করেছে। মারধোরও করেছে।

চতুর্থ মকদ্দমা করলে পিয়ারীলাল ঢনঢনিয়া। অযোধ্যাপ্রসাদ নাকি তাঁর মানহানি করেছে। এইভাবে নানা ছুঁতোয় দশটা মকদ্দমা লাগিয়ে দিলেন রাউত মশায় অযোধ্যাপ্রসাদের বিরুদ্ধে।

ঘুমন্ত লোকের মাথায় যদি বাড়ির ছাত ভেঙে পড়ে, তাহলে তার যা অবস্থা হয় অযোধ্যাপ্রসাদের তাই হ'ল।

সে প্রথমটা ভাবল যে, জ্যেঠামশাইয়ের মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। কিন্তু এ-ভুল ভাঙতে দেরি হ'ল না। মুলুক দাসই এ-ভুল ভাঙিয়ে দিলে। সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, রঘুবীর বলে পাঠালেন তিনি তার মুখদর্শন করতে অনিচ্ছুক।

অযোধ্যাপ্রসাদের শ্বশুর শাঁসালো ব্যক্তি ছিলেন। অবশেষে তাঁরই শরণাপন্ন হ'তে হ'ল তাকে। সে মকদ্দমা লড়তে লাগল।

বছর দুই কেটে গেছে।

কয়েকটা মকদ্দমা জিতেছে অযোধ্যাপ্রসাদ। কিন্তু আসল মকদ্দমাটা অর্থাৎ বিষয়ের মালিকানা-স্বত্ব নিয়ে যে মকদ্দমাটা হচ্ছিল সেটা শেষ হয় নি। লোআর কোর্টে হেরে গেছে অযোধ্যাপ্রসাদ, হাইকোর্টে আপিল করেছে।

মুলুক দাস রঘুবীর রাউতকে একটি খবর দিলে।

"অযোধ্যাপ্রসাদ দেখলাম খুব রোগা হয়ে গেছে। দেহের চর্বি বিলকুল ঝরে গেছে। মুখ শুকনো, চুল উস্ক-খুস্ক—"

রাউত গোঁফ চোমরাতে লাগলেন, কিছু বললেন না।

হাইকোর্টে রাউত হারলেন। কিন্তু তিনি ছাড়বার লোক নন, বিলেতে আপিল করলেন আবার। বিলেতের আপিলে জিতে গেলেন তিনি।

তারপর ডেকে পাঠালেন তিনি অযোধ্যাপ্রসাদকে। অযোধ্যাপ্রসাদ নতমস্তকে এসে দাঁড়াল।

"এই নাও—"

একটা খাম এগিয়ে দিলেন তার দিকে।

"কী এটা?"

"ডীড্ অব গিফ্‌ট্। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমায় দান করলাম।"

অযোধ্যাপ্রসাদ বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। একটু ইতস্তত করে' মাথা চুলকে তারপরে বলল, "তাহলে মকদ্দমা করবার দরকার কী ছিল।"

"তোমার বড্ড চর্বি হয়েছিল, সেটা একটু ঝরিয়ে দিলাম। বিষয় সম্পত্তি কী করে' রক্ষা করতে হয় তারও একটু ট্রেনিং হ'য়ে গেল তোমার। বিপদে না পড়লে তো শিক্ষা হয় না। তুমি যে-রাস্তায় চলেছিলে তাতে আমাদের পিতৃপুরুষের বিষয়সম্পত্তি ডুবে যেত। আমি কাল কাশী যাব, আর ফিরব না। কাল থেকে তোমাকেই স্টেটের ভার নিতে হ'বে। যাও—"

অযোধ্যাপ্রসাদ প্রণাম করে' চলে গেল।

কলার বিবর্তন

তখন সাহেবেরা এদেশে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছেন। সাধারণ লোকে সাহেবদেরই দেবতা বলিয়া মনে করিতেছে। যাহা কিছু ভালো তাহাই বিলাতী বিশেষণে ভূষিত হইতেছে। বিলাতী সভ্যতাই যে আমাদের দেশকে ত্রাণ করিবে এ বিশ্বাস শিক্ষিত সমাজেরও মনে শিকড় গাড়িয়াছে, অশিক্ষিত চাষাদের তো কথাই নাই। রেলগাড়ি দেখিয়াই তাহারা বুঝিয়াছে যে বিলাতী দেবতারা অসাধ্য সাধন করিবে।

হারাধন সুদূর পল্লীগ্রামে থাকিত। রেলগাড়ি চড়িবার জন্যই সে একদিন গ্রাম হইতে পদব্রজে বাহির হইয়া পড়িল। বলাবাহুল্য, সঙ্গে কিছু পয়সা-কড়িও লইল। সে জানিত বিনা পয়সায় কিছু হয় না। এ গোরুর গাড়ি নয় যে গাড়োয়ানকে অনুরোধ করিলে কিছুদূর চড়াইয়া লইয়া যাইবে। বিলাতী কলের গাড়ি, টিকিট কাটিয়া চড়িতে হয়। তাছাড়া শহরে যাইতেছে, কিছু ভালো বিলাতী জিনিস পাইলে কিনিয়া আনিবে। সুতরাং কিছু টাকা-পয়সাও সে সঙ্গে লইল।

অনেক দূর হাঁটিয়া বর্ধমান স্টেশনে সে আসিয়া প্রথম ট্রেনে চাপিল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়া গেল। অবাক্ কাণ্ড, মাত্র কয়েক ঘণ্টায় কলিকাতা। গোরুর গাড়িতে আসিলে কয়দিন লাগিত ঠিক কি!

কলিকাতার জনারণ্যে কিছুক্ষণ দিশাহারা হইয়া ঘুরিবার পর তাহার হুঁশ হইল যে পথ হারাইয়া গিয়াছে। বাড়ি ফেরা যাইবে না। ব্যাকুল হইয়া আরও কিছুক্ষণ ঘুরিল, কিন্তু তাহাতেও সুবিধা হইল না। অবশেষে হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল বেচারা।

"কি রে কাঁদছিস কেন, কে তুই—"

"আমি হারাধন। পথ হারিয়ে ফেলেছি—"

"কোথা যাবি—"

"হাওড়া"

"চল, আমিও হাওড়া যাব। গাছ কটা বেচে ফেলি। আয় আমার সঙ্গে"

একটি গলির ভিতর দিয়া হারাধন একটা তরকারির বাজারে আসিয়া হাজির হইল। যে লোকটি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল সত্যই তাহার কয়েকটি

গাছ ছিল একটা ঝুড়িতে। হারাধন যদিও চাষা তবু ওগুলা কি গাছ তাহা চিনিতে পারিল না।

জিজ্ঞাসা করিল, "কলাগাছের মতো পাতা, ওগুলো কি গাছ?"

হারাধন যে কি জাতীয় খাজা তাহা কলিকাতাবাসী শ্যামচাঁদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। সে মুচকি হাসিয়া উত্তর দিল, "কলাগাছই। বিলিতি কলা—"

"বিলিতি কলা! আমিই তাহলে কিনে নিই। কত দাম—"

"পাঁচটি আছে, পাঁচ টাকা পড়বে—"

"কিছু কম হবে না?"

হারাধন গোটা দশেক টাকা লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিল। ওই টাকা কয়টা জমাইতে তাহার এক বৎসর লাগিয়াছিল। তখন পাঁচ টাকায় একটা ছোটখাটো গোরু পাওয়া যাইত। পাঁচটা কলার চারা পাঁচ টাকা দিয়া কিনিবে কি না হারাধন একটু ইতস্তত করিতে লাগিল।

"নিবি তো নিয়ে নে। আমিও ঝাড়া-হাত-পা হয়ে যাই, তোকে হাওড়ায় পৌঁছে দি। এরকম জিনিস সহজে কোথাও পাবি না। আদত বিলিতি কলা—"

হারাধন চারাগুলি কিনিয়া ফেলিল।

"খুব ভালো গোবরের সাঁর দিতে হবে"

"তা আমি খুব পারব"

বাড়ি ফিরিয়া খুব যত্ন করিয়াই সে বিলাতী কলার চারাগুলি পুঁতিল।

দুই

মাস ছয় কাটিয়াছে। গাছগুলি বড় হইয়াছে। কিন্তু কলা একটিও হয় নাই। মোচার মতো হয়, কিন্তু তাহা হইতে কলার কাঁদি বাহির হয় না, ফুল হইয়া যায়। কোনোটা লাল ফুল, কোনোটা হলদে। হারাধন আবার ভাল করিয়া গোবর দিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। ক্রমাগত ফুল হইতে লাগিল। কলা কই?

চটিয়া-মটিয়া আবার একদিন সে কলিকাতার উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। এবার আর তাহার রাস্তা ভুল হইল না। সোজা সে সেই তরকারির বাজারে

হাজির হইল আবার। সন্দেহ ছিল শ্যামচাঁদের দেখা পাইবে কি না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে শ্যামচাঁদ ছিল। অন্য ফুলের চারা বেচিতেছিল সে।

"এই যে! আচ্ছা, সেবার তুমি যে আমাকে পাঁচ টাকায় পাঁচটা বিলিতি কলার গাছ বেচলে, কিন্তু এক কাঁদি কলাও তো নামল না!"

শ্যামচাঁদ খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকাইয়া রহিল, তাহার পর মনে পড়িল তাহার।

"কিছুই হয় নি?"

"খালি ফুল হচ্ছে। নানা রঙের ফুল—"

"তাই তো হবে। বিলিতি কলা যে—"

"কি রকম—"

"ওতে খাবার কলা হয় না। দেখবার কলা হয়"

"কিন্তু দিব্যি করে বলছি একটি কলাও দেখি নি"

"কিন্তু এখনি নিজের মুখে বললে ফুল হচ্ছে"

"তা হচ্ছে তো—"

"ওই ফুলই কলা। সাহেবরা বলে আর্ট, বাংলায় ওকেও কলা বলে"

"কি রকম"

"ওই রকম। যাও, মেলা বক্‌বক্ করে আমার সময় নষ্ট কোরো না। বিলিতি কলাগাছে মর্তমান কলা ফলবে কি করে। কি আপদ।"

হারাধন খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বহুকাল পরে সাহেব-বাড়ির এক মালী তাহাকে আর একটু জ্ঞানদান করিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ওর বিলিতি নাম ক্যানা—"

তিন

বিখ্যাত পুষ্পবিক্রেতা নগেন্দ্রনাথ এণ্ড কোং-এর নাম আপনারা নিশ্চয় শুনিয়াছেন। ক্যানা ফুল বিক্রয় করিয়াই তিনি মাসে হাজার টাকা রোজগার করেন। তাঁহার ক্যানা না কি ভারতবর্ষের বাহিরেও যায়। হারাধন ছিলেন নগেন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ।

নগেন্দ্রনাথ আর একটি জিনিসও করিয়াছেন। এক রকম এসেন্স বাহির করিয়াছেন যাহার গন্ধ ঠিক কলার মতো। জিনিসটা ঘোলের শরবতে খুব চলে।

চার

নগেন্দ্রনাথের পুত্র স্মরজিৎ নূতন পথ ধরিয়াছে।

সে একজন অতি-আধুনিক কবি। বাজারে বেশ নাম হইয়াছে।

শ্রীনাথ সেনের 'তুমি'

শ্রীনাথ সেন কবি ছিলেন বললেই যথেষ্ট বলা হয় না, তিনি একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁর কথা কেউ জানে না, জানবেও না, কারণ তিনি তাঁর একটি লেখাও ছাপান নি। তাঁর কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া তাঁর পরিচয়ও কেউ জানে না। তিনি নির্জন বনে ফুটে নির্জনেই ঝরে গেলেন। নির্জন বনেও দুচারটি পুষ্পরসিক অলি আসে, সেই ভাবেই তাঁরও দুচারজন সমঝদার বন্ধু জুটেছিল। যাঁরা ইংরেজী ভাষা জানেন না, তাঁদের পক্ষে তাঁর কবিতার রস-গ্রহণ কর সম্ভব হবে না। কারণ অধিকাংশ কবিতাই তিনি লিখেছিলেন ইংরেজীতে। সংস্কৃতেও দুচারটে লিখেছিলেন, কিন্তু তার সংখ্যা খুব অল্প।

তাঁর ইংরেজী কবিতার দুচারটে অনুবাদ নীচে দিচ্ছি, মূলের সঙ্গে অবশ্য অনুবাদের আকাশ-পাতাল তফাত, তবু দিচ্ছি, কারণ তাহলে লোকটাকে বোঝা সহজ হবে। একটা কবিতায় লিখেছেন—"তুমি এসেছ, কারণ তোমাকে আসতে হয়েছে। ওগো ফুল, আমার শাখা শোভিত হয়েছে তোমার আগমনে স্বীকার করছি, কিন্তু এ-ও আমি বলব, তুমি এসেছ কারণ তোমাকে আসতে হয়েছে। রাত্রির পর দিন যেমন আসে, অমাবস্যার পর দেখা দেয় যেমন শিশুচাঁদ পুর্ণিমার সম্ভাবনা নিয়ে, তেমনি তুমি এসেছ। তোমাকে আসতে হয়েছে। আমার জীবনে তোমার আগমন অবশ্যম্ভাবী ছিল, তাই এসেছ। তোমাকে অভ্যর্থনা করি তবু।" আর একটা কবিতায় বলছেন—"আমি তোমাকে বাজাই নি, তুমি নিজেই বেজেছ। আমার স্থূল অঙ্গুলি স্পর্শে ও-সুর বাজত না। আমার স্থূল অঙ্গুলি তবু বার বার তোমাকে বাজাতে চেষ্টা করেছে, বাধা দিয়েছে তোমার স্বতোৎসারিত সুর-লীলায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি প্রতিষ্ঠিত করেছ নিজের মহিমা। তোমার স্বর্গীয় সুরসাধনা উপভোগ করেছে অসংখ্য নক্ষত্র নিশীথ সভায় বসে, আমিও করেছি। কিন্তু আমি দিনেও তোমার গান শুনেছি। ভিড়েও শুনেছি, একাও শুনেছি। তাই বার বার অনুভব করেছি আমি তোমাকে বাজাই নি, তুমি নিজেই বেজেছ…"

আর একটি কবিতায় বলেছেন, "রক্তের সমুদ্র থেকে প্রতি প্রভাতে তোমার জন্ম হয়, উর্বশীর মতো নয়, মৃত্যুর মতো। জীবনের ছদ্মবেশে আলোকের ছলনায় সমস্ত

দিন ভোলাও তুমি আমাকে, আমিও ভুলি, কারণ আমি ভুলতে চাই। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে আবার রক্তের সমুদ্র থইথই করে পশ্চিম দিগন্তে, আকাশের নীলের সঙ্গে, রাত্রির কালোর সঙ্গে মেশে রক্ত-সমুদ্রের তরঙ্গ-নর্তন। তাতে ঝাঁপ দাও তুমি। তোমার মেখলার মুক্তারা ছড়িয়ে পড়ে নক্ষত্রের মতো…"

চতুর্থ যে কবিতাটির অনুবাদ দিচ্ছি সেটি আমিও ভালো বুঝি নি। কিন্তু আমার মনে হয়, এরই মধ্যে তাঁর মৃত্যু-রহস্যটা লুকিয়ে আছে।

"অন্ত সরে' সরে' যাচ্ছে আদির কাছ থেকে। কে যেন তাকে সরিয়ে দিচ্ছে জোর করে', হয়তো সময়ের স্রোত-বেগে অসহায়ের মতো ভেসে' চলেছে। কিন্তু চিরকাল যাবে না, স্রোতের বিরুদ্ধে শুরু হবে তার অভিযান! আদির কাছে ফিরে আসবে অন্ত, রক্তাক্ত কলেবরে, স্রোতের বিরুদ্ধে, সময়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে। তখন অন্ত হবে অনন্ত, আদি হবে অনাদি। প্রলয়ের কালরাত্রে অন্তিম আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবে তারা। তুমি তখন হাসবে…"

এই তুমির উল্লেখ তাঁর প্রতিটি কবিতায় আছে। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র মতো ইনি কল্প-লোক-বাসিনী নন। ইনি যে সশরীরে মর্ত্যে ছিলেন তার প্রমাণ অন্তত একবার পাওয়া গিয়েছিল। একদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সে কথা বলবার আগে শ্রীনাথ সেনের পারিবারিক পটভূমিকাটি আঁকা প্রয়োজন।

দুই

শ্রীনাথ সেন ছিলেন জমিদারের একমাত্র ছেলে। জমিদার হরিনাথ সেনের পরিচয় তাঁর জমিদারির লোকেরা সকলেই জানত। তাঁর সম্বন্ধে এই কথাটি বললেই যথেষ্ট হবে যে, তাঁর বাড়িতে প্রতিদিন চার-পাঁচশো লোকের পাতা পড়ত। গরীব-দুঃখী, আত্মীয়-স্বজন, চাকর-বাকর, চাকরদেরও আত্মীয়, গরীব প্রতিবেশী সবাই খেত সেখানে। তাছাড়া অতিথিশালা তো ছিলই। তাঁর বাড়ির হাতাতেই পাঠশালা ছিল একটা, বিনা বেতনে বহু ছাত্র সেখানে পড়ত। এই সবই হরিনাথ সেনের বিলাস ছিল। মদে বা মেয়েমানুষে একটি পয়সা নষ্ট করেন নি তিনি। আশ্চর্যের বিষয়, এইজন্য তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নাকি তাঁর বিরোধ বেধেছিল। তাঁর স্ত্রী সর্বাঙ্গসুন্দরীর বাপের বাড়ির চাল-চলন ছিল অন্য রকম। বাল্যকাল থেকেই মাইফেল দেখে

অভ্যস্ত তিনি, ওস্তাদ-বাইজীর আড্ডা ছিল সে বাড়িতে। ঘরকুনো সাধু স্বামী পছন্দ হয় নি তাঁর। তিনি অধিকাংশ সময়েই বাপের বাড়িতে থাকতেন। শ্রীনাথ সেনের জন্ম মামার বাড়িতেই হয়েছিল, বাল্যকালটাও কেটেছিল সেখানে। সম্ভবত মায়ের জেদেই তাঁকে বিলেত পাঠানো হয়েছিল। সেকালে বড়লোকদের ওই এক কায়দা ছিল। শ্রীঅরবিন্দ, জওহরলাল, রবীন্দ্রনাথ সকলেই বিলেতে লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিলেন। শ্রীনাথ সেনও গিয়েছিলেন। তিনি বিখ্যাত হন নি, কারণ তিনি বিখ্যাত হতে চান নি। চাইলে, হতেন। তিনি যখন বিষয়ের উত্তরাধিকারী হলেন, তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন তিনি। সমস্ত জমিদারিটি বিক্রি করে' দিয়ে কোলকাতায় এসে ভাড়া-বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। জমিদারি-প্রথার যে উচ্ছেদ হবে এ তিনি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সর্বাঙ্গ-সুন্দরীর মৃত্যু স্বামীর আগেই হয়েছিল।

শ্রীনাথ সেন তাঁর স্ত্রী ললিতা ও একমাত্র পুত্র আদিনাথকে নিয়ে আহিরীটোলায় ছোট একটি বাড়িতে থাকতেন। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়, যদিও তিনি মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন না। একটা ঘরে একা একা চুপচাপ থাকতে ভালবাসতেন। পরে জেনেছি, সেখানে বসে কবিতা লিখতেন। দিনরাত ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকতেন, অনেক সময় বোঝাও যেত না যে তিনি বাড়িতে আছেন কি নেই। তাঁর স্ত্রীও বুঝতে পারতেন না। তিনি যে ঘরে থাকতেন সে ঘরে আর একটি দরজা ছিল বাইরের দিকে। সেই দরজা দিয়ে আমরা মাঝে মাঝে যেতাম তাঁর কাছে। তিনিও মাঝে মাঝে ওই দরজা দিয়েই বেরিয়ে যেতেন। কোথায় যেতেন কেউ জানে না।

আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর খাস বেয়ারা হরলালের মাধ্যমে। হরলালকে তিনি ফরমাশ করেছিলেন একজন ভাল লিখিয়ে যোগাড় করবার জন্যে। তাঁর ফরমাশ—হাতের লেখা শুধু মুক্তোর মতো হলেই হবে না, তা শিল্প হওয়া চাই। অর্থাৎ তিনি একজন উঁচুদরের ক্যালিওগ্রাফার খুঁজছিলেন। আমার জানা-শোনা একটি লোক ছিল—সুরেন পাল। তাকে নিয়ে গেলাম একদিন। তিনি বললেন, আমার এই কবিতাগুলি খুব দামী কাগজে ভালো করে' লিখতে হবে। সুরেন পালের কাজ দেখে পছন্দ হ'ল তাঁর। কবিতা পিছু একশ টাকা করে দিতেন। আট-দশ লাইনের একটি কবিতা লিখতে প্রায় মাসখানেক লাগত। কী রঙে লেখা

হবে তাই ঠিক করতেই কেটে যেত কয়েক দিন। নানা রকম রং এনে নিজেই মিশিয়ে মিশিয়ে দেখতেন, তারপর স্থরেনকে বলে দিতেন সেটা। এই সূত্রেই তাঁর কবিতা পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। ছাপাবার কথা বলেছিলাম তাঁকে একবার। তিনি বলেছিলেন—ছাপাব? বলেন কি? প্রিয়াকে বাজারে বার করে না কি কেউ! কবিতা আমার অসূর্যম্পশ্যা প্রেয়সী।

নিজের বউকে কিন্তু তিনি খুন করেছিলেন। কেন করেছিলেন তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু স্থরেন যা বলে তাই সত্যি বলে মনে হয়। স্থরেনকে দিয়ে তিনি প্রায় একশটি কবিতা লেখান। লিখে সেটিকে ভালো মখমল দিয়ে বাঁধান। তাঁর স্ত্রী ললিতা দেবী নাকি তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন একদিন। দশ বারোটা কবিতা ছাড়া, বাকি কবিতাগুলো সব পুড়ে যায়। দু-একটা আধ-পোড়া কবিতা আমি নিজেও দেখেছি। উপরে যেগুলির অনুবাদ দিলাম সেগুলির মধ্যে দুটি আধ-পোড়া কাগজ থেকেই উদ্ধার করেছি। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ পুলিসও ঠিক করতে পারে নি। তাদের মতে ললিতা দেবী আত্মহত্যা করেই মারা গিয়েছিলেন, কারণ তাঁকে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। সমস্ত কাপড়ে জামায় স্পিরিট লাগিয়ে আগুন ধরানো হয়েছিল। স্পিরিট তিনি স্বহস্তে দিয়েছিলেন, না শ্রীনাথ সেন ঢেলে দিয়েছিলেন তা সঠিক জানা যায় নি।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছেলেকে তিনি বিলেত পাঠিয়ে দেন। আহিরীটোলার বাসায় তিনি একাই থাকতেন। আমরা মাঝে মাঝে যেতাম অবশ্য। কিন্তু গিয়ে স্বস্তি পেতাম না। তিনি খুব কম কথা বলতেন। প্রায়ই প্রস্তরমূর্তিবৎ বসে' থাকতেন। হঠাৎ এক একদিন বলতেন, কবিতা শুনবেন? লিখেছি একটা। কবিতা শোনবার জন্যেই যেতাম আমরা। আগ্রহ প্রকাশ করলে কোনো কোনো দিন শোনাতেন, কোনো দিন বা বলতেন, আজ থাক, মেজাজটা ভালো নেই।

একটা গুজব কিন্তু চাউর হচ্ছিল ক্রমশ তাঁর সম্বন্ধে। তিনি নাকি গভীর রাত্রে কোথা যান। পায়ে হেঁটে যান। পাড়ার গাঙ্গুলী খুড়ো বললেন, "মেয়েমানুষ রেখেছে—।" মিত্তির মশাই নাকের দুটি ছ্যাঁদাই নশ্যিতে বোঝাই করে' বললেন, "রেখেছিস, বেশ করেছিস। পয়সা আছে গুড় খাচ্ছিস, তবে অত ঢাক-ঢাক কেন! মরদকা বাচ্চা, যা করবি চুটিয়ে কর—"

এই ধরনের নানা আলোচনা হতে লাগল তাঁর সম্বন্ধে। কিন্তু তিনি কোথায় যান

তা কেউ আবিষ্কার করতে পারে নি। দু-একজন তাঁর পিছু নিয়েছিল, কিন্তু সুবিধে করতে পারে নি। তারা বলে, তিনি হয় গড়ের মাঠে, না হয় গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মেয়েমানুষ দেখে নি তারা।

বছর কয়েক পরে তাঁর ছেলে ফিরে এল ব্যারিস্টার হ'য়ে। তার ফিরে আসার দিন সাতেক পরেই শ্রীনাথ সেনের মৃত্যু হয়। শোচনীয় মৃত্যু। গড়ের মাঠেই একদল গোরার সঙ্গে লড়তে লড়তে মারা যান তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল তাঁর ব্যাঙ্কে একটি কপর্দকও আর নেই। তিনি গোরাদের সঙ্গে কেন লড়েছিলেন, কি করে তাঁর ব্যাঙ্কের অত টাকা নিঃশেষ হয়ে গেল, এসবেরও কোনও সঠিক কারণ নির্ণয় করতে পারি নি আমরা।

মিত্তির মশাই বললেন, "মেম রেখেছিল বোধ হয়, তাই গোরাদের আক্রোশ হয়েছিল। আর টাকাকড়ি সব ওই মাগীর গর্ভেই গেছে—এ তো সোজা হিসেব।"

লোহার সিন্দুকে একটি চিঠি ছিল, ছেলে আদিনাথের নামে। ছোট্ট চিঠি।

বাবা আদিনাথ,

ইচ্ছে করেই তোমার জন্যে ব্যাঙ্কে কিছু রেখে গেলাম না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, পিতৃপুরুষের জমানো টাকা নিয়ে যারা জীবন শুরু করে তারা প্রায়ই অমানুষ হয়। জীবনপথে বেশি টাকা থাকাটা নিরাপদ নয়। আশা করি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। সে শিক্ষা তোমাকে দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আশীর্বাদ জেনো। ইতি, তোমার বাবা।

টাকা-কড়ির অভাব, সুতরাং শ্রাদ্ধের আয়োজন খুব সামান্যভাবেই করা হয়েছিল। আদিনাথ শ্রাদ্ধের কাজ আরম্ভ করতে যাবে, এমন সময় প্রকাণ্ড একটা মোটর গাড়ি এসে দাঁড়াল, আর তার পিছু-পিছু একখানা ট্যাক্সি।

মোটর থেকে কালো-বোরখা-পরা একটি মহিলা নেবে এলেন। ধপধপে সাদা পা দুখানি ছাড়া তাঁর অঙ্গের আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, "আদিনাথ কোথা—"

আদিনাথ এগিয়ে গেল।

মহিলা তখন বোরখার ভিতর থেকে একটি দলিল বার করলেন। এ দলিলটি নাও তুমি—"

"কিসের দলিল— ?

"দানপত্র। তোমার বাবা আমাকে দুটি বাড়ি করিয়ে দিয়েছিলেন, একটি গড়ের মাঠের কাছে, আর একটি গঙ্গার ধারে। সে দুটি তোমাকেই আমি দিয়ে যাচ্ছি। আর এটাও রাখ—"

মোটর ড্রাইভার একটি বাক্স নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল।

"তোমার বাবা আমাকে যে গয়না আর নগদ টাকা দিয়েছিলেন, তা এই বাক্সে আছে। এগুলোও তুমি নাও। আমার মোটরখানাও তুমি ব্যবহার কোরো।"

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম সবাই।

আদিনাথ বললে, আপনি কে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ?"

"আমি ওঁর কবিতার তুমি। এই আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।"

এই বলেই উনি চলে' যেতে উদ্যত হলেন।

আদিনাথ একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, "আপনি যাচ্ছেন কোথা—"

"তীর্থে"

যে ট্যাক্সিটা মোটরের পিছু-পিছু এসেছিল সেইটেতে চড়ে চলে' গেলেন তিনি।

● তৃতীয় শতক ●

ভগবানের দয়া

দীননাথ মল্লিক দীনের নাথ হইতে পারেন নাই, সারাজীবন নিজেই তিনি অত্যন্ত দীন ছিলেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পুর্বে তিনি নাথ হইয়াছিলেন ভূতিবালার, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দৈন্য ঘোচে নাই, স্বয়ং লক্ষ্মীর আর এক নাম ভূতি হওয়া সত্ত্বেও ঘোচে নাই। আপিসের চাকরিতে যে গ্রেডে বাহাল হইয়াছিলেন, তদনুসারেই মাহিনা বাড়িয়াছিল, কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হয় নাই। এক হিসাবে অবশ্য ভূতিবালা তাঁহার অনেক আর্থিক সুবিধা করিয়াছিলেন, তাঁহার একটিও সন্তান হয় নাই। দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে হইলে দীননাথ অকূলপাথারে পড়িতেন। তথাপি এই ব্যপদেশে তাঁহাকে কিছু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। সামর্থ্যহীন দরিদ্রেরও সন্তান আকাঙ্ক্ষা থাকে, দীননাথ এবং ভূতিবালারও ছিল। তাই ডাক্তারদের দ্বারে দ্বারে কিছুদিন তাঁহারা ঘুরিয়াছিলেন। প্রায় শতখানেক টাকা খরচ হইয়া যাইবার পর তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, সন্তান হইবার আশা নাই। একটি মেনি বিড়াল পুষিয়া ভূতিবালা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইলেন। মেনিটি মরিয়া গেলে একটি টিয়া পুষিলেন। টিয়া মরিয়া গেলে ময়না। তাহার পর খরগোস। এইভাবেই তাঁহাদের সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবন কাটিয়াছে। বাকি জীবনটাও হয়তো কাটিয়া যাইত, কিন্তু মুশকিল হইল যখন ভূতিবালার দক্ষিণ অঙ্গটি পড়িয়া গেল। ষাট বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত হইলে তাহা আর সারে না। মৃত্যুই তখন একমাত্র ত্রাণকর্তা। মৃত্যু কিন্তু ভূতিবালাকে ত্রাণ করিল না। ভূতিবালা তো বিপদে পড়িলেনই, কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা শতগুণ বিপদে পড়িলেন দীননাথ। দীননাথের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। (সঠিক হিসাব আটষট্টি বৎসর দুই মাস ছয় দিন), আপনার জন বলিতে কেহ নাই। ওই ভূতিবালাই তাঁহার প্রিয়া শিষ্যা সচিব সব, উপরন্তু রাঁধুনী, চাকরানী, ধোপানীও। ভূতিবালার পক্ষাঘাত হওয়াতে দীননাথই পঙ্গু হইয়া পড়িলেন বেশী। কিন্তু ভগবান আছেন, তিনি দয়া করিলেন। কিছুদিন পুর্বে সুধাংশু বোসের সহিত আলাপ হইয়াছিল। সেই ছোকরাই এই বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করিল। সুধাংশু বোস সদ্য-বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার। চমৎকার ছেলে। এম. আর. সি. পি. এবং এফ. আর. সি. এস. দুইটা ডিগ্রিই অর্জন করিয়াছে। লোক হিসাবেও মহানুভব।

কোনো ফি না লইয়া সে ভূতিবালার চিকিৎসার ভার লইল, কিছু কিছু ঔষধপত্রও নিজের পকেট হইতে কিনিয়া দিল। ইহাতে দীননাথ কৃতার্থ তো হইলেনই, একটু লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়াও পড়িলেন। লজ্জিত হইলেন দারিদ্র্যের জন্য এবং অপ্রতিভ হইলেন আজকালকার ছোকরাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ ছিলেন বলিয়া। চিকিৎসা-রূপী ঝামেলা অনেকটা মিটিল বটে, কিন্তু ঝামেলা জিনিসটা সহজে মিটিবার নহে, অন্যান্য নানা রূপ ধারণ করিয়া তাহা দীননাথকে বিব্রত করিতে লাগিল। ভূতিবালার সেবা করে কে, প্রস্তুত করে কে, তাঁহার নিজের জন্যই বা রান্না করে কে। এইসব জটিল সমস্যার সমাধান সহজ হইত যদি দীননাথ অর্থবান হইতেন। দীননাথ পেন্সন পান মাত্র পঁচানব্বুই টাকা। বাড়ি ভাড়া দিতে হয় পঁচিশ টাকা। বাকি সত্তর টাকায় কোনোক্রমে দুজনের গ্রাসাচ্ছাদন চলে। ভূতিবালা অসুস্থ হইয়া পড়াতে তাঁহার জন্য খরচ কিছু বাড়িয়াছে। সুধাংশু ডাক্তার নানারকম ফুড এবং ভিটামিনের ব্যবস্থা করিয়াছে। গরম জলের সেক দিবার জন্য হটওয়াটার ব্যাগ কিনিতে হইয়াছে, বেডপ্যান, ইউরিনালও কিনিতে হইয়াছে। সবই ওই সত্তর টাকার মধ্যে। ইহার উপর চাকর বা রাঁধুনি রাখা সম্ভব নয়।

আবার ভগবান দয়া করিলেন। সুধাংশু ডাক্তারই আবার একদিন দীননাথের দীনতার অন্ধকারে সত্যসত্যই সুধাংশুর মতো উদিত হইল।

"এই লোকটাকে নিয়ে এলাম। এ আপনার এখানে পেটভাতায় থাকবে। রাঁধতেও জানে। রাত্রে আপনার বারান্দায় শুয়েও থাকবে। রাখুন একে।"

একটি কুচকুচে কালো যুবক দীননাথকে নমস্কার করিল। দীননাথ ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একে পেলেন কোথা?" আমার চেম্বারে ভিক্ষে চাইতে এসেছিল। বলছে পশ্চিমে ওর বাড়িঘর ছিল, দেনার দায়ে বিকিয়ে গেছে। লেখাপড়াও শেখে নি বিশেষ, আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই। কোলকাতায় রোজগার করবার জন্যে এসেছে, কিন্তু কাজ পাচ্ছে না, তাই ভিক্ষে করে' দিন চালাচ্ছে। আমি আপনার কথা বলাতে রাজী হল। আপনারও তো লোক দরকার একজন—"

"হ্যাঁ, খুব দরকার"

"একেই রাখুন তাহলে আপাতত"

কিন্তু খরচ বৃদ্ধি হইল, কিন্তু উপায় কি।

রাধিকারমণ দীননাথের বাড়িতে রহিয়া গেল।

কিছুদিন পরেই দীননাথ অনুভব করিলেন (মানে, আন্দাজ করিলেন) যে পূর্বজন্মে তিনি নিশ্চয়ই যৎসামান্য কিছু পুণ্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাই রাধিকারমণের মতো সর্বগুণান্বিত ভৃত্যটি তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। রান্না করে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘরদুয়ার পরিষ্কার করে, বাজার করে। ইহার উপর ভূতিবালার সেবা করিতেও তাহার আপত্তি নাই। কিন্তু ভূতিবালা তাহা করিতে দেন না। পরপুরুষ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিবে ইহা তিনি চান না। দীননাথকেই সব করিতে হয়। কিন্তু এই কর্মটি দীননাথের পক্ষে ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। ভূতিবালা স্থূলাঙ্গিনী, দীননাথ শীর্ণকায়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভূতিবালাকে নাড়াচাড়া করিবার শক্তি দীননাথের ছিল না। প্রত্যহ বিছানা বদলানো, গা মুছাইয়া দেওয়া, পিঠে স্পিরিট-পাউডার দেওয়া, বেডপ্যান দেওয়া-নেওয়া এ সব কর্ম দুই-একদিন করা যায়, রোজ করা সম্ভবপর নহে। দীননাথের খুবই কষ্ট হইতেছিল, ভূতিবালাও তাহা অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু উপায় কি। অসহায়ভাবে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, পূর্বজন্মে কত পাপই যে করিয়াছি তাই এজন্মে স্বামীকে দিয়া নরক ঘাঁটাইতেছি। ভগবান আমাকে শাস্তি তো অনেক দিলে, এবার চরণে স্থান দাও। ভগবান কিন্তু এ অনুরোধটি রক্ষা করিলেন না। ভূতিবালার মৃত্যু হইল না। দীননাথ নরকভোগ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে অবশ্য ভগবান দয়া করিলেন। কিন্তু একটু অন্যভাবে। ভূতিবালার মৃত্যু হইল না, বিস্মৃতি অপনোদিত হইল। অনেকদিন পরে চামেলীকে তাঁহার মনে পড়িল।

চামেলী তাঁহার দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নী। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। তাহার তিনকুলে কেহ নাই। থাকে তাহার পিসামশায়ের কাছে জব্বলপুরে। তাহাকে লিখিলে সে হয়তো আসিতে পারে। টানিয়া টানিয়া কথাগুলি তিনি দীননাথকে বলিলেন। প্রস্তাবটি ভালো, তবু দীননাথকে মাথা চুলকাইতে হইল, সংসারে আর একটি লোক বৃদ্ধি হওয়ার মানেই খরচ বৃদ্ধি। এখনই তো রাধিকারমণ থাকাতে খরচ বেশ বাড়িয়াছে। চামেলী আসিলে সত্তর টাকায় কুলাইবে কি ? ইহার উত্তরে ভূতিবালা যাহা বলিলেন তাহা কিন্তু খুবই আশ্বাসজনক। খবরটা দীননাথ জানিতেন না, চামেলীর কথাই জানিতেন না তিনি। চামেলীর পিতা নাকি পুলিসের সি. আই. ডি. ছিলেন। অগ্নিযুগে বোমারুদের ধরাইয়া দিতেন। অবশেষে একজন বোমারুর গুলিতেই তিনি নিহত হন। সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সেজন্য চামেলীর মা এবং

চামেলীর জন্য মাসিক দেড়শত টাকা করিয়া ভাতা দিতেন। চামেলীর মা মারা যাইবার পর ভাতা কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও চামেলী প্রতি মাসে কিছু করিয়া পায়। কত পায় তাহা ভূতিবালা সঠিক জানেন না, কিন্তু তাহাতে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন যে চলিয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই, বিবাহ হইলে বিবাহের খরচস্বরূপ কিছু টাকাও নাকি গভর্নমেণ্ট দিবে। চামেলীর মা মারা যাওয়ার পর বাধ্য হইয়া চামেলীকে পিসামশায়ের নিকট যাইতে হইয়াছে, কারণ দেশে তাহার অভিভাবকত্ব করিবার মতো নিকট-আত্মীয় কেহ ছিল না। ভূতিবালার বিশ্বাস চামেলীকে খবর দিলে সে আসিবে। তাহার ঠিকানা তিনি জানিতেন। সম্পর্কটা খুবই দূর, তাই দীননাথ প্রথমটা ইতস্তত করিতেছিলেন, কিন্তু শেষে মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। বেশ গুছাইয়া একটি পত্র চামেলীকে, আর একটি তাহার পিসামশায়কে লিখিয়া দিলেন। ভগবান আবার দয়া করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই পিসামশায়ের উত্তর পাওয়া গেল। সংক্ষিপ্ত উত্তর। লিখিয়াছেন, চামেলীকে লইয়া শীঘ্রই যাইতেছি, সাক্ষাতে সমস্ত কথা হইবে। দিন সাতেকের মধ্যে তিনি চামেলীসহ আসিয়া পৌঁছিয়া গেলেন। সাক্ষাতে যাহা বলিবেন লিখিয়াছিলেন তাহা গোপনে দীননাথকেই বলিলেন।

"মহাবিপদে পড়েছিলাম মেয়েটাকে নিয়ে মশাই। পাড়ার চার পাঁচটা ষণ্ডা ছোঁড়া দিনরাত আমার বাড়ির চারিদিকে চক্কোর মারে। সিটি দেয়, রাত্রে টর্চ ফেলে, চিঠি লেখে। আর মেয়েটাও একটু ফরওআর্ড গোছের, বুঝলেন। কি করব, দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এমন সময় আপনার চিঠিটি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এক ঢিলে দুই পাখি মল। আপনার উপকারও হল, ওকে ওখান থেকে সরানোও হল।"

পিসামশায়ের মুখেই তিনি শুনিলেন চামেলী গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে প্রতিমাসে পঁচাত্তর টাকা করিয়া ভাতা পায়। বিবাহ হইলে এক হাজার টাকা দিতেও গভর্নমেণ্ট প্রতিশ্রুত আছেন, তবে এখন স্বদেশী গভর্নমেণ্ট হইয়াছে, দিবে কিনা কে জানে। পিসামশায়ের মতে ও-মেয়ের বিবাহ হইবে না, ষাঁড়াইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ষাঁড়ের মতো মোটা ও বলিষ্ঠ হইয়াছে।

পিসামশায় পরদিনই চলিয়া গেলেন।

দীননাথ এবং ভূতিবালা লক্ষ্য করিলেন চামেলী মেয়েটি হাস্যমুখী, একটু সাজগোজ করিতে ভালবাসে, আর খুব নেটিপেটি। খাটিতেও পারে খুব। গায়ে

জোরও আছে। অবলীলাক্রমে সে ভূতিবালার সেবার সমস্ত ভার লইল। দীননাথের মনে হইল সবই ভগবানের দয়া। সব শুনিয়া সুধাংশু ডাক্তারও খুশী হইল।

কিন্তু আর একটি সমস্যা দেখা দিল দুই মাস পরে।

তিন

ভূতিবালার মনেই দেখা দিল প্রথমে। পক্ষাঘাত হওয়াতে তাঁহার দেহটাই অসমর্থ হইয়া শয্যায় পড়িয়াছিল, মন মোটেই নিষ্ক্রিয় হয় নাই। মাস দুই পরে স্বামী দীননাথের জন্য তাঁহার একটু চিন্তা হইল। চামেলী সম্পর্কে দীননাথের কোনও অশোভন আচরণ অবশ্য তিনি দেখেন নাই—দেখিবেনই বা কিরূপে, তিনি তো শয্যাগত—কিন্তু ভূতিবালা অনুভব করিতে লাগিলেন যে চামেলীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা যেন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ঘনিষ্ঠতা তো হইবেই, দুটি মাত্র ঘর, দুটি ঘরের মধ্যে যে দরজা আছে তাহাতে কপাট নাই, তাছাড়া শালী সম্পর্ক, ঘি ও আগুন···ভূতিবালার আশঙ্কা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবারও উপায় নাই। ভূতিবালা শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন কি করা যায়। চামেলী তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, দীননাথ তো অপরিহার্যই। ভূতিবালা চিন্তা করিয়া কোনো কূল-কিনারা পাইতেছিলেন না, হঠাৎ কিন্তু একদিন তিনি মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। দীননাথ তাঁহার ঘরেই মেঝেতে বিছানা পাতিয়া শুইতেন। হঠাৎ একদিন মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল, লক্ষ্য করিলেন দীননাথ বিছানায় নাই। দুই একবার ডাকিয়াও উত্তর পাইলেন না। চামেলী পাশের ঘরে থাকে, তাহারও সাড়া পাইলেন না। একটু পরে দীননাথ চামেলীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

"এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে গো?"

"পায়খানায়। তোমার ঘুম ভেঙে যাবে বলে এ দরজাটা আর খুলি নি, চামেলীর ঘর দিয়েই গিয়েছিলাম।"

"চামেলী কোথা?"

"ঘুমুচ্ছে।"

"একটু ডেকে দাও তো। মাথার বালিশটা সরে গেছে।"

"আমিই ঠিক করে দিচ্ছি। ও বেচারী সমস্ত দিন খাটে তো, মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে।"

চামেলীর প্রতি এই দরদটুকু ভূতিবালার একেবারে ভালো লাগিল না। ঈর্ষার জ্বালা যদি পক্ষাঘাতের অব্যর্থ ঔষধ হইত তাহা হইলে ভূতিবালা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিতেন। তিনি সেদিন আর কিছু বলিলেন না। পরদিন চামেলী যখন রাস্তার কল হইতে জল আনিতে গেল, তখন তিনি প্রস্তাবটি করিলেন।

"দেখ, আমি একটা কথা ভাবছি। চামেলী সোমত্ত মেয়ে, ওর সঙ্গে তোমার এমনভাবে মেলা-মেশা করাটা লোকত ধর্মত খুবই খারাপ দেখাচ্ছে। অথচ অন্ত উপায়ও তো নেই। তাই আমি বলছি, ওকে তুমি বিয়েই করে ফেল—"

দীননাথ আকাশ হইতে পড়িলেন।

"বলছ কি তুমি!"

"ঠিকই বলছি। ভগবানের দয়ায় বলতে নেই তোমার শরীরটি এখনও সুস্থ আছে। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে তাল রাখতে পারলুম না, আমি এখন তোমার গলগ্রহ। আর আমাকে সেবা করবার জন্তেই চামেলীকে এনেছি, ওকে ছাড়া আমাদের চলবেও না, তাই বলছি বিয়ে কর ওকে, পালটি ঘরও আছে, তোমার দিক থেকেও ভালো হবে, আমার দিক থেকেও হবে। এরকম বিয়ে তো কত হয়। ভেবে দেখো কথাটা—"

দীননাথ ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে গিয়া কিন্তু তিনি অনুভব করিলেন যে, ব্যাপারটাকে প্রণিধান বা পর্যালোচনা করিতে হইলে সুধাংশু ডাক্তারের প্রাজ্ঞতার সাহায্য লইতে হইবে। ছোকরার বয়স কম, কিন্তু বুদ্ধি প্রখর। তাছাড়া হিতৈষীও। তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছু করা চলিবে না।

সব শুনিয়া সুধাংশু বলিল, "আপনার স্ত্রী ঠিকই বলেছেন। এ অবস্থায় বিয়ে করাই উচিত, আর করলে ক্ষতিই বা কি। আর কিছু না হোক, কেলেঙ্কারির ভয় থাকবে না। সত্যি আপনার নামে আপনার পাড়ার লোকেরা ফুসফুস গুজগুজ আরম্ভ করেছে, কানে এসেছে আমার। বিয়েই করে ফেলুন। জড়ই মেরে দিন ব্যাপারটার।"

"কিন্তু এই বয়সে বিয়ে করে যদি আবার ছেলেপিলে হয়ে যায় তাহলেই তো

মুশকিল! যদিও অবশ্য আগে জনকয়েক ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, আমার ছেলেপিলে হবে না। কিন্তু যদি হয়ে যায়—"

"তাহলে এক কাজ করুন। আসুন, আপনার ভাসেক্টমি করে দি।"

"সে আবার কি!"

"সামান্য একটা অপারেশন। ওটা করে দিলে ছেলেপিলে হওয়ার ভয় আর একদম থাকবে না। আর ব্যাপারটা কাউকে বলবেন না, চামেলীর কানে যেন না যায়। শুনলে হয়তো সে-ই আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে না।"

"না, না আমি কাউকেই বলব না। বেশী সিরিয়াস অপারেশন নয় তো?"

"আরে না না, সে কিছুই নয়। চামেলী কি আপনাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে?"

"না, তাকে জিগ্যেস করা হয়নি এখনও।"

"জিগ্যেস করুন। যদি রাজী হয় খুব ভালো হবে আপনার পক্ষে। আপনার স্ত্রী যে এত বুদ্ধিমতী তা জানতাম না।"

"ওর দেহটাই মোটা, বুদ্ধি খুব সূক্ষ্ম। এতদিন দেখছি তো—"

ভূতিবালাই কথাটা চামেলীর কাছে পাড়িলেন। সে হাঁ বা না কিছুই বলিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল কেবল। ভূতিবালা এবং দীননাথ উভয়েই বুঝিলেন সম্মতি আছে। দিনকয়েক পরে সুধাংশু তাঁহার অপারেশনটুকুও করিয়া দিল। দীননাথ বাড়িতে রটাইলেন যে, কুঁচকির কাছে একটা ফোড়া হইয়াছিল, সুধাংশু ডাক্তার সেটা অপারেশন করিয়া দিয়াছে। দিন সাতেক শুইয়া রহিলেন, তাহার পর সব ঠিক হইয়া গেল। তাহার পর পাঁজি দেখা হইল, মাসখানেক পরে বিবাহের শুভ দিনও একটা পাওয়া গেল। কিন্তু গোল বাঁধিয়া গেল হঠাৎ একটা। হিন্দু কোড বিল পাস হইয়া গেল। আইন হইল এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা চলিবে না। করিতে হইলে আদালতের সহায়তা লইয়া প্রথম বিবাহ-বন্ধনটি বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। দীননাথ ইহাতে রাজী হইলেন না। বিবাহ-বিচ্ছেদ করিবার সঙ্গত কারণ অবশ্য দীননাথের ছিল, আদালত হয়তো তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিতেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না। বরং এমন একটা ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে, ভূতিবালা ও সুধাংশু জোর করিয়া তাঁহার স্কন্ধে চামেলীকে চাপাইবার

চেষ্টায় ছিল, আইনটা পাস হওয়াতে তিনি রক্ষা পাইলেন। বলিলেন, সবই ভগবানের দয়া।

চার

মাস ছয়েক পরে ভূতিবালা স্বর্গারোহণ করিলেন।

বিবাহের বাধা অপসারিত হইল, তবু কিন্তু দীননাথ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মাস দুই কাটিল। তারপর হঠাৎ চামেলী একদিন তাঁহাকে বলিল, "এবার বিয়েটা হয়ে যাক, আর দেরি করা উচিত নয়।"

"কেন"—বিস্মিত দীননাথ প্রশ্ন করিলেন।

উত্তরে যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময় সীমা ছাড়াইয়া গেল। চামেলী সন্তান-সম্ভবা!

ছুটিয়া চলিয়া গেলেন তিনি সুধাংশু ডাক্তারের কাছে। সমস্ত শুনিয়া ডাক্তার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিল, "তাহলে সম্ভবতঃ আমি অপারেশনটা ঠিক করে করতে পারি নি।"

"কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমি হলপ করে বলছি—"

"চুপ করুন। ভাবতে দিন আমাকে।"

দীননাথ থামিয়া গেলেন। সুধাংশু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গুম হইয়া রহিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে দীননাথ আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "আর একটা বিপদও হয়েছে।"

"আবার কি।"

"রাধিকারমণও কাল থেকে সরেছে।"

সুধাংশুর ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল।

"এখন কি করি বলুন।"

"বিয়েই করে ফেলুন চামেলীকে। ও ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

বিবাহ হইয়া গেল। যথাসময়ে চামেলী একটি কুচকুচে কালো পুত্রসন্তান প্রসব করিল। সুধাংশু তাহার নাম রাখিয়া দিল—কোকিল কুমার।

পাঁচ

আরো পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

চামেলীরও মৃত্যু হইয়াছে। সুধাংশু ডাক্তারও একটা বড় চাকরি পাইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। দীননাথের বয়স প্রায় পঁচানব্বই। কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চোখে দেখিতে পান না, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। কোকিলকুমার এখন পঁচিশ বৎসরের যুবক। সে লেখাপড়ায় বরাবরই ভালো ছিল, এখন ভালো চাকরি করিতেছে। সে-ই এখন স্থবির দীননাথের একমাত্র অবলম্বন। দীননাথ ভাবেন, সবই ভগবানের দয়া।

পৌরাণিক-আধুনিক

শুনে আমি বললাম, "ওকে হাসপাতালেই নিয়ে যান—"

"কেন, আপনি পারবেন না ?"

পাঠকমশাই সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"পারব। কিন্তু হাসপাতালেই এ-সব করা ভাল। আজকাল যিনি লেডি ডাক্তার এসেছেন তাঁর খুব হাত-যশ।"

চুপ করে রইলেন পাঠকমশায় কয়েক মুহূর্ত।

তারপর মুচকি হেসে বললেন, "একটি গল্প শুনবেন ?"

"কী গল্প—"

পৌরাণিক গল্প। যদি শোনেন তো বলি—"

যদিও খুব বিরক্ত লাগছিল, তবু প্রবীণ পাঠকমশায়কে বলতে পারলাম না যে শুনব না।

"বলুন।"

"পুরাকালে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিবাহ করবার কিছুদিন পরে তিনি অনুভব করলেন যে, তিনি পথ-ভ্রষ্ট হয়েছেন, ব্রহ্ম থেকে ক্রমশঃ সরে যাচ্ছেন, মায়াতে জড়িয়ে পড়ছেন, অবিলম্বে সাবধান না হ'লে অকূল পাথারে ডুবতে হ'বে। অবিলম্বেই সাবধান হলেন তিনি। বাড়ি থেকে অন্তর্ধান করলেন একদিন। হিমালয়ে গিয়ে শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। বহুদিন তপস্যা করবার পর ভগবান তাঁর সামনে আবির্ভূত হ'য়ে বললেন, 'বৎস, তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি—বর দিচ্ছি। যে-কোনো লোককে তুমি অমর করে' দিতে পারবে। এবার বাড়ি যাও।' ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরে এলেন। এসে দেখলেন তাঁর পত্নী বৃদ্ধা হয়েছেন এবং একটি সুদর্শন যুবক তাঁর পরিচর্যা করছে। পত্নী বললেন, 'এটি আমাদের পুত্র। তুমি চলে যাওয়ার কিছুদিন পরেই এ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। একে অবলম্বন করেই আমি এতকাল তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। পুত্রটি কর্তব্যপরায়ণ এবং বিদ্বান হয়েছে, ওর চরিত্রও নির্মল। কিন্তু সেদিন ভৃগু মুনি ওর হস্তরেখা বিচার করে বললেন যে, আর এক বছর মাত্র ওর পরমায়ু আছে। শুনে থেকে আমি বড় বিমর্ষ হয়ে আছি। এর কি কোনও উপায় নেই ?'

তপস্বী উত্তর দিলেন, 'তুমি চিন্তা কোরো না, ওকে আমি অমর করে' দিতে পারি। সে-শক্তি আমি অর্জন করেছি।'

বৃদ্ধা এতটা প্রত্যাশা করেনি।

'ও তাই না কি। তাহ'লে ওকে অমরই করে' দাও।'

তপস্বী ক্ষণকাল চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'আমি এখনই করে' দিতে পারি, কিন্তু আমি করলে সেটা ভাল দেখাবে না, কারণ ও আমার ছেলে। আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করছি। তিনিই এসে করে' দিন।

স্মরণ করবামাত্র বিষ্ণু এলেন।

সব শুনে বললেন, 'তা এর জন্যে আমাকে ডাকলে কেন। তুমি তো নিজেই ওকে অমর করে' দিতে পার।'

তপস্বী বললেন, 'তা পারি। কিন্তু আপনি করে' দিলে আরও ভাল হয়। আপনি স্বয়ং বিষ্ণু—'

বিষ্ণু বললেন, 'আরও ভালর কথা যদি তুললে তাহলে ব্রহ্মার কাছে চল। পিতামহ যদি একে অমর করে' দেন তাহলে আর কারও কিছু বলবার থাকবে না।'

'বেশ চলুন।'

তপস্বী, বিষ্ণু এবং সেই যুবক তখন ব্রহ্মার কাছে গিয়ে হাজির হলেন। ব্রহ্মা সব শুনে বললেন, 'এর জন্যে আমার কাছে আসা কেন। তোমাদের মধ্যে যে-কোনও একজনই তো একে অমর করে' দিতে পারতে।'

"কিন্তু আপনি করে' দিলে দেখতে শুনতে সব দিক দিয়েই ভাল হয়।'

'দেখতে শুনতে ভাল হয় যদি মহেশ্বর করে' দেন। চল তাঁর কাছেই যাই।'

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, তপস্বী আর সেই যুবক মহেশ্বরের কাছে গেলেন।

সব শুনে মহেশ্বর বললেন, এর জন্যে এতদূর এলে? তোমাদের তিনজনের মধ্যে যে-কেউ একজন তো করে' দিতে পারতে।'

'ব্রহ্মা বললেন, 'কিন্তু আপনি করে' দিলে কাজটা একেবারে পাকা হয়।'

'পাকা হয় ভাগ্যবিধাতা যদি নিজের খতিয়ানে ওকে অমর বলে লিখে নেন। বেশ, চল, ভাগ্যবিধাতার কাছেই চল, পাকাই করে' ফেলা যাক ব্যাপারটাকে—'

পাঁচজনে ভাগ্যবিধাতার দপ্তরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। একটি প্রকাণ্ড পাথরে-তৈরী সিংহদ্বারের ভিতর দিয়ে সে-দপ্তরে ঢুকতে হয়। সিংহদ্বারে ঢুকছেন এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সিংহদ্বারের উপর থেকে প্রকাণ্ড একটা পাথর খসে পড়ল যুবকটির মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হ'ল তার। হাহাকার করে উঠলেন তপস্বী।

ভাগ্যবিধাতা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, 'মুনিবর, এখন হাহাকার করে' কী হবে। ওর মৃত্যুর জন্যে আপনিই দায়ী।'

'আমি ?'

'হ্যাঁ আপনি। আপনি ওকে অনায়াসেই অমর করে' দিতে পারতেন কিন্তু তা না করে' আপনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে নিয়ে আমার কাছে এলেন। এই দেখুন আমার খাতায় লেখা রয়েছে, ওই যুবক যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর তার বাবাকে নিয়ে আমার সিংহদ্বারের ভিতর ঢুকবে তখনি সিংহদ্বারের একটি পাথর ওর মাথায় পড়ে ওর মৃত্যু হবে। এই অসম্ভব যোগাযোগ আপনিই করেছেন—।'

গল্পটি বলে পাঠকমশায় বললেন, "উষার প্রথম যখন ব্যথা ধরল তখন গেলাম নার্স আভার কাছে। সে বললে, "আমি পারি, কিন্তু আমার চেয়ে ভাল হবে শশীবাবু ডাক্তার যদি ভার নেন। শশীবাবুর কাছে গেলাম, তিনি আপনার কাছে আসতে বললেন। আপনি এখন বলছেন হাসপাতালের লেডি ডাক্তারের কাছে যেতে—"

আমি হেসে বললাম, "উষার ভালর জন্যেই বলছি। পরীক্ষা করে দেখলাম ছেলেটা ঠিক সোজাভাবে নেই, ট্রান্সভার্স প্রেজেনটেশন। এ সব হাসপাতালেই ভাল হয়। তা ছাড়া উষার শরীরে রক্তও কম, পা দুটো ফোলা। হয়ত ব্লাড দেওয়ার দরকার হবে, হাসপাতালেই নিয়ে যান ওকে—"

পাঠকমশায় হাসপাতালেই নিয়ে গেলেন ওকে।

হাসপাতালে উষা মারা গেল।

মাস দুই পরে ঠিক এই রকম একটা কেস আমার হাতে এল।

মফস্বলের এক জমিদারের পুত্রবধূ। আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

আমি বললাম, 'প্রসব করিয়ে দেব, কিন্তু হাজার টাকা চাই।"

রাজী হলেন তাঁরা।

নির্বিঘ্নে প্রসব হ'য়ে গেল। প্রসূতি সন্তান উভয়কেই সুস্থ অবস্থায় রেখে, ফী নিয়ে চলে' এলাম। কিছুদূর এসেছি, এমন সময় গাড়ির টায়ার গেল ফেটে। ড্রাইভার টায়ার মেরামত করতে লাগল, আমি নেমে পায়চারি করতে লাগলাম মাঠে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ চমকে উঠলাম। আমার কানের কাছে কে যেন বলে' উঠল, "আমাকে তাহ'লে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন কেন কাকাবাবু, আমার বাবা আপনাকে অত ফিস্ দিতে পারবেন না বলে—"

দ্রুতপদে ফিরে এলাম মোটরের কাছে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় আমরা রয়েছি বল তো? অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না কিছু।"

"আজ্ঞে, এটা শ্মশান।"

ভাবতে লাগলাম, কথাগুলি কে বললে ঊষা না আমার বিবেক?

নবজীবন-স্রোত

শ্রীযুক্ত রামবৃছ সিং শ্রীযুক্ত কমলকুমার মিত্রের প্রতিবেশী, পাশাপাশি বাড়িতে বাস করেন। পরিচয় বেশী দিনের নয়, কারণ উভয়েই অল্প কিছুদিন পূর্বে চাকরি ব্যপদেশে এই শহরে আসিয়াছেন এবং দৈবাৎ পাশাপাশি দুইটি বাড়িতে ভাড়াটে-রূপে আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথম প্রথম কিছুদিন উভয়ে উভয়ের পরিচয় লওয়াও প্রয়োজন মনে করেন নাই। সুযোগও ছিল না। দুইজন দুই বিভিন্ন আপিসে চাকরি করেন। একজন পোস্ট-অফিসে, একজন রেলে। নিজের নিজের আপিস আর সংসার লইয়াই দুইজনকে ব্যস্ত থাকিতে হয়, প্রতিবেশীর সংবাদ লইবার মত অবসর মেলে না। ছুটির দিনেও না। ছেলেদের মধ্যে কিন্তু এতটা ঔদাসীন্য দেখা গেল না। কমলকুমারের দশ বছরের ছেলে অমলকুমার রামবৃছের বারো বছরের ছেলে ছবিলালের সহিত আলাপ করিয়া ফেলিল। তাহাদের আলাপ করিবার সুযোগও ছিল। একই স্কুলে একই ক্লাসে ভর্তি হইয়াছিল তাহারা।

অমলকুমার একদিন তাহার মাকে বলিল, "মা, জান ছবিলাল আমাদের সঙ্গে পড়ে, সে সেভ্ন্ বলতে পারে না, বলে—সেভুন।"

কমলকুমার আয়নার সম্মুখে নানা মুখভঙ্গি করিয়া দাড়ি কামাইতেছিলেন, তিনি প্রশ্ন করিলেন, "ছবিলাল কে?"

"পাশের বাড়িতে থাকে। ওর বাবার নামটাও অদ্ভুত। রামবৃছ—"

অমল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কমলকুমার বলিলেন, "ও, বুঝেছি। রামবৃছ সিং আমাদের পাশের বাড়িতে আছে না কি?"

"হ্যাঁ—"

গৃহিণীর দিকে তাকাইয়া কমলকুমার বলিলেন, "ওঁর জায়গায় আমাদের বিশ্বেশ্বরবাবুর আসবার কথা ছিল। তিনি ওর চেয়ে সিনিয়র লোক, কিন্তু তিনি তো বিহারী নন, কোনো মিনিস্টারের সঙ্গে তাঁর কোন আত্মীয়তাও নেই—"

কমলকুমার বাঁকা হাসি হাসিয়া গাল চাঁছিতে লাগিলেন।

একটি নাতি-সুচরিত্রা ঠিকা দাই বারান্দা ঝাড়ু দিতেছিল। সে বাংলা বোঝে,

রামবৃছবাবুর বাড়িতেও কাজ করে। সে যথাসময়ে উক্ত কথোপকথনটি রামবৃছবাবুর পরিবারে নিবেদন করিল। রামবৃছবাবু সংবাদটি শুনিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার চিত্ত অমৃত-নিষিক্ত হইল না। তিনি গোঁফে চাড়া দিয়া একটি উদগার তুলিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, শালা বাঙালিয়া—!

কমলকুমারের বাড়িতে সরবরাহ করিবার মতো একটি সংবাদও একদিন উক্ত ঠিকা দাই সংগ্রহ করিয়া আনিল।

কমলকুমারের গৃহিণী সহসা একদিন সকালে হাতে আকাশের চাঁদ পাইয়াছিলেন। একজন ফেরিওয়ালা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া কিছু চিংড়িমাছ এবং নোনা ইলিশ তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছিল। তিনি মহা-সমারোহে সেগুলি রন্ধন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রন্ধনকালে সম্ভবতঃ রান্নাঘরের জানালাটি খোলা ছিল, চিংড়িমাছ এবং নোনা ইলিশের গন্ধ বায়ু-বাহিত হইয়া রামবৃছ সিংয়ের অন্তঃপুরকে আমোদিত করিয়া তুলিল। রামবৃছ তখন রহরকা দাল ও নিমকি সহযোগে মোটা আটার রোটি চর্বণে ব্যাপৃত ছিলেন। গন্ধ পাইয়া তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত হইল।

দাইকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ঘর মে কোই জানবর মরল বা?"

দাই মুচকি হাসিয়া আড়ঘোমটা টানিয়া নিবেদন করিল যে, না, কোনও জানোয়ার মরে নাই, পাশের বাড়ির বাঙালিন 'বহু' মৎস্য রন্ধন করিতেছেন।

রামবৃছ নাকে কাপড় দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে, ছি ছি ছি! ই বাংগালি লোগ আদমি নেই খে, গিধ্ বা।" অর্থাৎ বাঙালীরা মানুষ নয় শকুনি, মরা জানোয়ার খায়।

ঠিকা দাইটি কমলকুমারের পত্নীর নিকট এই খবরটিও যথাসময়ে মুচকি হাসিয়া নিবেদন করিল।

আপিস হইতে ফিরিয়া কমলকুমারও সংবাদ শুনিলেন। একটু উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন, "ও বেটা ছাতুখোর মাছের মর্ম কি বুঝবে!"

এ খবরটিও রামবৃছের অবিদিত রহিল না। উভয় পক্ষেই উত্তাপ বাড়িতে লাগিল। তাহা হু-হু করিয়া বাড়িয়া গেল যখন রামবৃছ একদিন শুনিলেন যে, একজন সিনিয়র বাঙালীকে ডিঙাইয়া তাঁহাকে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে—এ খবরটি বঙ্গদেশ হইতে প্রকাশিত কোনও ইংরেজী পত্রিকায় কে. কে. নামক কোন পত্রলেখক প্রমাণসহ বাহির করিয়া দিয়াছেন। রামবৃছ আগুন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা

হইল, কে. কে. কমলকুমার ছাড়া আর কেহ নন তিনি নিজের ইয়ারমহলে বাঙালীদের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শ্রাদ্ধের আয়োজন কমলকুমারও করিলেন। তাঁহার পুত্র অমলকুমার অতিশয় কম নম্বর পাইয়া কোনোক্রমে ক্লাস-প্রমোশন পাইয়াছিল এবং বাড়িতে আসিয়া বলিয়াছিল যে, শিক্ষকেরা সব হিন্দী ভাষায় পড়ান, সে কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহা ছাড়া তাঁহারা পার্শিয়ালিটি করিয়া বেহারী ছেলেদের বেশী নম্বর দেন। কমলকুমার ইহা শুনিয়া যে সব ভাষা ব্যবহার করিলেন তাহা রীতিমত সাহিত্যিক ভাষা। গানই বাঁধিয়া ফেলিলেন একটা। 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানের প্যারডি।

বেহার আমার মাসীমা আমার
ধাইমা আমার আমার দেশ
কাহে গে মাইয়া এইসা হালৎ
কাহে গে তোরা এইসা বেশ!
একদা যাহার ভোজপুরিয়া
হেলায় দাঙ্গা করিল মাৎ
আজিও যাহার রাজমিস্ত্রি
জেনানি লইয়া পিটিছে ছাৎ
ময়লা ঘাড়ে পানি-পাঁড়ে
খাকি কোর্তা মুরেঠা সাজ
তাদেরই বংশে এ কি প্রহ্লাদ
কলম পিষিছে আপিসে আজ!

—এইভাবে সমস্ত গানটারই প্যারডি লিখিয়া ফেলিলেন।

রামবৃছ সিংয়ের বাড়ির সামনের নর্দমায় একদিন জল আটকাইয়া গেল। দেখা গেল মাছের আঁশ ও নাড়িভুঁড়ি আসিয়া জলনিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়াছে।

রামবৃছ দন্ত কড়মড় করিয়া বলিলেন, "শালা মছলিখোর!"

দোলের দিনে রামবৃছের পরিবারবর্গ কাদায় রঙে কিম্ভূতকিমাকার হইয়া অশ্রাব্য ভাষায় 'হোলি' গাহিতে লাগিল।

● তৃতীয় শতক ●

কমলকুমার কানে আঙুল দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ব্যাটা বেহারী ভূত!"

এই ভাবেই কিছুদিন চলিল। হয়তো বরাবরই চলিত; কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সব ওলটপালট হইয়া গেল।

রামবৃছ সিং একদিন লক্ষ্য করিলেন যে, কমলকুমারের বাড়ির সম্মুখস্থ ময়দানে একটি সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে। সামিয়ানীর নীচে টেবিল-চেয়ারও অনেক আনা হইল। ফুলের মালাও অনেক আসিল। সন্ধ্যার সময় শহরের অনেক বাঙালী যুবক আসিয়া সমবেত হইলেন। কৌতূহলী রামবৃছ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কেন?"

সে উত্তর দিল, "বাংলা ভাষার বিখ্যাত সাহিত্যিক 'নবজীবন'-এর নাম শুনেছেন?"

"খুব।—"

"তাঁর আজ জন্মদিন। তাঁকে আমরা সংবর্ধনা জানাব বলে এই আয়োজন করেছি।"

"নবজীবন কি এখানে এসেছেন?"

"আরে তিনি তো আপনার বাড়ির পাশেই থাকেন। তাঁর আসল নাম কমলকুমার ঘোষ। এখানকার এ. এস. এম.।"

রামবৃছের আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না, মুখটা একটু ফাঁক হইয়া গেল কেবল।

সংবর্ধনা-সভা শেষ হইয়া গিয়াছে। শেষ যুবকটির সহিত কথাবার্তা কহিয়া কমলকুমার যখন বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, তখন রামবৃছ আসিয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "শুনিয়ে—"

কমলকুমার ঘাড় ফিরাইতেই রামবৃছ করজোড়ে বলিলেন, "পহলেই ম্যয় মাফি মাংতা হুঁ। মুঝে মালুম নহি থা যে আপহি 'নবজীবন' হঁায়। ম্যয় আপকা ভকত হুঁ।

কমলকুমারও হাতজোড় করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রামবৃছ বলিলেন যে, তিনি যদিও বাংলা বলিতে পারেন না, কিন্তু বাংলা বুঝিতে পারেন। 'নবজীবন'-লিখিত অনেক গল্প তিনি অনুবাদ করিয়া প্রকাশও করিয়াছেন। কমলকুমার

বলিলেন, "তাই নাকি? 'স্রোত' নাম দিয়ে আর একজন লেখকও আমার গল্পের চমৎকার অনুবাদ করেছেন দেখেছি"

রামবৃছ হাতজোড় করিয়া স্মিতমুখে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ম্যয় স্রোত হুঁ।"

উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন।

উর্মির পছন্দ

চার বছরের উর্মি তার দাদুর সঙ্গে গিয়েছিল গঙ্গার ধারে বেড়াতে। শীতকালের গঙ্গা, বালুর চর বেরিয়ে পড়েছে চারদিকে, আর সেই চরের মাঝে মাঝে ঝিরঝির করে বইছে জলের ধারা। স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়ে তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। চিকমিক করছে বালি।

"ওগুলো কি দাদু"

"বক—"

"চারটেই বক? অত সাদা কেন"

"ফরসা জামা কাপড় পরেছে"

"অমন গলা বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে কেন আস্তে আস্তে"

"তোমার সঙ্গে ভাব করতে চাইছে বোধ হয়"

"কেন"

"তোমাকে বিয়ে করতে চায়"

উর্মি ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল বকগুলোর দিকে।

"চারটেকেই আমি বিয়ে করব?"

"করলে ক্ষতি কি। দ্রৌপদী তো পাঁচজনকে বিয়ে করেছিল—"

"দৌপদী কে?"

র-ফলা বেরোয় না উর্মির মুখে।

"সে গল্প আর একদিন বলব তোমাকে"

"এখন বল না"

"আগে ঠিক কর বকদের বিয়ে করবে কি না"

উর্মি ঘাড় বেঁকিয়ে ভাবলে খানিকক্ষণ। তারপর বললে—"করব না। বড্ড লম্বা গলা ওদের, ঠুকরে দেবে না?"

"ঠিক বলেছ, কথাটা ভাবি নি তো"

খঞ্জনও চরছিল কয়েকটা জলের ধারে। দু'তিন রকম খঞ্জন, কারও হলদে বুক, কারও সাদা মুখ, কালো পিঠ, কারও ছাই রং, ল্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে মনের আনন্দে

চরে বেড়াচ্ছিল সবাই। একটা খঞ্জন লাফ দিয়ে উঠতেই ঊর্মি দেখতে পেলে সেটাকে।

"দেখ দেখ দাদু আর একটা পাখি। একটা নয়, অনেকগুলো। কি রকম লাফালাফি করছে। ল্যাজও দোলাচ্ছে। দেখতে পেয়েছ ?"

"আমি অনেকক্ষণ আগেই দেখেছি। ওরা এদেশের পাখি নয়, বিদেশ থেকে এসেছে। অনেক দূর থেকে মাঠ, বন, পাহাড়, নদী পার হ'য়ে"

"অনে—ক দূর থেকে ?"

"হ্যাঁ"

"কেন এসেছে"

"তোমাকে বিয়ে করবে বলে"

"আমাকে"

"তাই তো মনে হচ্ছে। কেমন সেজে এসেছে দেখছ না ?"

"ওরা তো পাখি। পাখিকে বিয়ে করলে মা-বাবা বকবে না ?"

"বকবে কেন"

"তাহলে পাখির খাঁচায় হাত দিলে মা বকে কেন"

"টিয়া পাখি যে কামড়ে দেয়"

"ও। খঞ্জন কামড়ায় না বুঝি"

"না। কি সুন্দর দেখছ না ? কেমন খুর-খুর করে বেড়াচ্ছে—"

"বড্ড ছটফটে কিন্তু। কি রকম লাফালাফি করছে দেখেছ ?"

"খঞ্জন তাহলে তোমার পছন্দ নয়"

"নাঃ"

"ওই দুটোকে পছন্দ হয় ?"

"কোন দুটোকে ? ওই যে খঞ্জনদের ওপাশে চরে বেড়াচ্ছে ?"

"কি পাখি ওরা ?"

"বাটান। ছোট বাটান, গলায় কেমন সুন্দর কালো কণ্ঠি দেখেছ—"

"কোথায় থাকে ওরা"

"ওরাও বিদেশে থাকে। এখানে বেড়াতে এসেছে"

"কেন"

"তোমাকে বিয়ে করবে বলে"

সব্বাই আমাকে বিয়ে করবে বলে এসেছে ?"

"তুমি পছন্দ করলেই করবে"

"আমার কাউকে পছন্দ নয়"

"তাহলেই তো মুশকিল। মনুষ্য বর পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে। পাখিই একটা পছন্দ করতে হবে"

"কি পাখি"

"চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ যেটা তোমার পছন্দ হয়"

ঊর্মি চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

"ওগুলো কি দাদু"

এক ঝাঁক সোয়ালো উড়ছিল জলের উপর। সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছিল তাদের কৃষ্ণ-নীল পিঠের রং। থামছিল না এক মুহূর্ত। জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল ক্রমাগত।

"ওগুলো সোয়ালো। বাংলা নাম আবাবিল"

"ওরাও কি বিয়ে করবে বলে এসেছে ?"

"তাইত মনে হচ্ছে"

ওদের আমি বিয়ে করব না। বিচ্ছিরি নাম। তাছাড়া একটুও বসছে না, খালি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, গল্প করব কখন ? আচ্ছা দাদু ওরা আমাদের মতো কথা বলতে পারে তো—!"

"শেখালে পারবে। টিয়াটি কেমন কথা বলে শুনেছ তো।"

"চমৎকার কথা বলে টিয়াটা। কিন্তু বড্ড কামড়ায় যে। বাঃ, ওই পাখিটা তো চমৎকার, কি ওটা—"

গাছের ডালে একটা শালিক বসে ছিল, ঘাড় নেড়ে নেড়ে ডাকছিল যেন ঊর্মিকে।

"ওটা শালিক—! ঘাড় নেড়ে নেড়ে তোমাকে ডাকছে—চল ওর কাছেই যাওয়া যাক—"

গাছটার দিকে এগিয়ে যেতেই 'পিড়িং' শব্দ করে উড়ে গেল শালিকটা।

তারপর দাদুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ঘুরল ঊর্মি। দাদু তাকে আরও পাখি, গাছপালা, আকাশের মেঘ, সবুজ গমের ক্ষেত দেখালেন। ঊর্মি কিন্তু বেশ একটু অন্যমনস্ক। যে

গাছটায় শালিক পাখিটা বসে ছিল সেই গাছটার দিকে ফিরে ফিরে চাইছে কেবল।

দাতু ডাকলেন—"উর্মি—"

উর্মি মুচকি হেসে বললে "পিড়িং—"

ওকি—"

"আমি শালিক পাখি হয়েছি। শালিককেই বিয়ে করব। ওর ঠোঁটটা বেশ সুন্দর হলদে, নয়? ঠিক আমার ফ্রকের মতো।"

তুদিন আগে উর্মিকে হলদে রঙের ফ্রক কিনে দেওয়া হয়েছিল।

"বেশ, তাহলে শালিকের কাছেই লোক পাঠাই গে চল—! রাজী হয় তবে তো?"

উর্মিকে নিয়ে গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরে এলেন দাতু।

ফ্রেমে বাঁধানো কার্ডবোর্ড

আমি হিরণ সেনের কাছে প্রথমে চিকিৎসক হিসাবেই গিয়েছিলাম। আমাকে যিনি ডাকতে গিয়েছিলেন তিনি তাঁর প্রতিবেশী, আত্মীয় নন। পরে জেনেছিলাম তাঁর আত্মীয় কেউ নেই, থাকলেও খবর নেন না। প্রতিবেশী সমরবাবুই তাঁর দেখাশোনা করেন। চাকর-বাকর অবশ্য আছে।

সমরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—"উনি বিয়ে-থা করেন নি?"

"না। যে ধরনের লোক সাধারণতঃ বিয়ে-থা করে' সংসার পাতে, উনি সে ধরনের লোক নন।"

"ও—"

সমরবাবু গোড়াতেই আমাকে বলেছিলেন ওঁর কি হয়েছে। কোমরের নীচে থেকে সমস্ত অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে, আমাদের ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলে ট্রান্সভার্স মায়েলাইটিস্। সাধারণতঃ সিফিলিস এর কারণ। সমরবাবু যা বললেন তা শুনে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে।

সমরবাবু রোগীর কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "ইনিই হিরণবাবু, এঁরই চিকিৎসা করতে হবে আপনাকে।"

আমি তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলাম।

সিফিলিস বলেই সন্দেহ হ'ল।

বললাম, "রক্তটা একবার পরীক্ষা করানো দরকার।"

হিরণবাবু বলে উঠলেন, "একবার কেন, দশবার পরীক্ষা করা হয়েছে। সমর ওই ড্রয়ার থেকে রিপোর্টগুলো বার করে দাও তো ভাই"—

দেখলাম। প্রত্যেকটি রিপোর্টেই এক বার্তা, রক্তে কোনো দোষ নেই। একটু আশ্চর্য হলাম।

হিরণবাবু বললেন, "আপনিও যদি রক্ত পরীক্ষা করতে চান করুন। আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনারা যে পদ্ধতিতে চলছেন তাতে আমার অসুখ সারবে না। কোলকাতার সব বড় ডাক্তারকেই দেখিয়েছি আমি, ওষুধ,

ইনজেকশন, ইলেকট্রিক চিকিৎসা সব রকম হয়েছে, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন কিছু হয় নি—"

সমরবাবু বললেন, "আচ্ছা, আপনারা তাহলে গল্প করুন, আমি ঘুরে আসছি একটু পরে। একটু কাজ আছে আমার। আপনার ট্রেনের এখন ঘণ্টা দুই দেরি। আমি ঠিক সময়ে এসে আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দেব।"

সমরবাবু চলে গেলেন।

হিরণবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কি বুঝছেন আপনি—"

যা বুঝেছিলাম তা অকপটভাবে প্রকাশ করতে কুণ্ঠা হচ্ছিল। চুপ করে' রইলাম।

"চুপ করে' রইলেন যে—"

"আপনার এ অসুখ সারবে না—"

দুজনেই চুপ করে' গেলাম এর পর!

মিনিটখানেক পরে হিরণবাবু বললেন, "আমি কিন্তু আশা ছাড়িনি এখনও।"

কোনও রোগীই আশা ছাড়ে না। শঙ্করাচার্যের মোহ-মুদ্গর মনে পড়ল—তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডং। চুপ করে' রইলাম।

হিরণবাবু আবার বললেন, "না, আশা ছাড়ি নি আমি। আপনি যদি ডাক্তারি না করে অন্য একটা উপায় অবলম্বন করেন তাহলে হয়তো সেরে যেতে পারি আমি। শুনেছি আপনি স্বামী বিবেকানন্দের একজন ভক্ত।"

"তাঁর অসংখ্য ভক্তের মধ্যে আমিও একজন। কে বললে আপনাকে একথা—?"

"আপনারই একজন রোগী। শরৎবাবুকে মনে পড়ে আপনার? শরৎ মিত্তির? আপনি তাঁর হাঁপানির চিকিৎসা করেছিলেন, তাঁর মুখেই শুনেছি আপনার কথা।"

"মনে পড়েছে।"

মনে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। প্রায়ই হ'ত মাঝে মাঝে।

"কিন্তু তার সঙ্গে আপনার অসুখের সম্পর্ক কি?"

"আপনি আমার হ'য়ে স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করুন, তাহলেই আমার বিশ্বাস অসুখ সেরে যাবে।"

"আপনিই করুন না।"

"আমি সর্বদাই করছি। কিন্তু আমার প্রার্থনায় কাজ হচ্ছে না, হবেও না।"

"প্রার্থনায় ফল হবে এই যদি আপনার বিশ্বাস, তাহলে কোনও ভালো সাধুকে দিয়েই প্রার্থনা করান। আমি অতি সামান্য লোক—"

"আমি সে চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু কেউ রাজী হন নি। তারপর শরৎবাবুর মুখে আপনার কথা শুনলাম। তাই আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। চিকিৎসার জন্যে ডাকাই নি আপনাকে। তবে আপনি যদি ইচ্ছে করেন, চিকিৎসাও করতে পারেন। কিন্তু আমার অনুরোধ, একান্ত অনুরোধ, প্রার্থনা করুন আমার জন্যে, যদি ভালো হই ওতেই হ'ব। দয়া করুন আমার উপর—"

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন হিরণবাবু। বলা বাহুল্য খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন, এ বিশ্বাস যদি আপনার সত্যিই থাকে তাহ'লে যা হয়েছে সেটাকে হাসি মুখে মেনে নিন।"

চোখের জল মুছে হিরণবাবু বললেন, "সেটা আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ স্বামীজী আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমি ডাকলে তিনি আর ফিরবেন না, আপনাদের মতো সচ্চরিত্র সত্যবাদী লোক যদি অনুরোধ করেন তাহলে হয় তো ফিরতে পারেন। আপনি চেষ্টা করুন আমার জন্যে—"

কথাগুলো কেমন যেন এলোমেলো মনে হচ্ছিল।

"কোন্ স্বামীজীর কথা বলছেন?"

"স্বামী বিবেকানন্দ।"

"তিনি ফিরবেন কি করে। তিনি তো অনেকদিন আগে মারা গেছেন—"

হিরণ সেন ঘাড় হেঁট করে বসে রইলেন কয়েক মিনিট। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বললেন—"সমস্ত ঘটনা খুলে বলি তাহলে আপনাকে। শুধু একটা অনুরোধ, আমাকে পাগল মনে করবেন না। বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে অবশ্য, কিন্তু যা বলছি তার একবর্ণ ও মিথ্যা নয়—"

হিরণবাবু আবার চুপ করে' গেলেন। আবার মাথা হেঁট করলেন।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

"বলুন, কি বলবেন—"

মাথা তুলে হিরণবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বলছি। দেখুন, ছাত্রজীবন থেকেই

স্বামী বিবেকানন্দের খুব ভক্ত ছিলাম। বিয়ে-থা করি নি। যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য পালন করেই চলতাম। না, কথাটা একটু ভুল হ'ল। হয় তো আপনার একটা ভুল ধারণা হ'য়ে যাবে যে, স্বামীজীকে ভক্তি করতাম বলেই বুঝি বিয়ে-থা করি নি। স্বামীজীকে ভক্তি করতাম খুবই, কিন্তু বিয়ে করি নি অন্য কারণে। যে মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছিল তাকে আমি পাই নি। সহজ সামাজিক উপায়ে পাওয়ার উপায়ও ছিল না। সে ছিল ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমি কায়স্থ। শেফালীরও অনেক দিন বিয়ে হয় নি, কারণ তার মায়ের সঙ্গতি ছিল না বিয়ে দেবার। নিতান্ত গরীব বিধবা ছিলেন তিনি। আমি অনেকবার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হন নি। এইভাবেই চলছিল, আমি দূর থেকে তাকে দেখেই সন্তুষ্ট ছিলাম। একদিন হঠাৎ শুনলাম শেফালীর বিয়ে হচ্ছে এক ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে। শুনেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে' গেল। শেফালীর সঙ্গে বিয়ে হবে ওই বুড়োর! ঠিক করলাম প্রাণ থাকতে তা হ'তে দেব না। টাকার অভাব ছিল না আমার। কোলকাতা থেকে গুণ্ডা আনালাম। বিয়ের রাত্রে ঠিক বিয়ে হ'বার আগেই লুট করে' নিয়ে এলাম শেফালীকে। নিয়ে এসে এই ঘরেই আটক করলাম তাকে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে বিয়ে করবে তুমি?'

শেফালী দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, 'কিছুতেই না। কায়স্থের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিয়ে হয় না। আমাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিন।'

আমার তখন রোখ চড়ে' গেছে, সংযমের প্রাচীরেও ফাটল দেখা দিয়েছে! বললাম, 'কিছুতেই ছাড়ব না। তুমি হয় তো জানো না আসুরিক বিবাহও আমাদের শাস্ত্র অনুসারে সিদ্ধ। আসুরিক মতেই তোমাকে বিবাহ করব আমি। পৃথিবীতে কোনও শক্তি নেই যে আমাকে বাধা দিতে পারে'—এই বলে ঝাপটে ধরলাম তাকে।

সে প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল। তাকে বাঁচাতে পারে ত্রিসীমানায় এমন লোক সত্যিই সেদিন কেউ ছিল না। যারা ছিল তারা আমারই বেতনভোগী গুণ্ডা। এরপর কি হ'ল জানেন? ঝনঝন করে' একটা শব্দ হ'ল। ঘরের দেওয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের যে ছবিটা টাঙানো ছিল দেখি তার কাচটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আর স্বয়ং স্বামীজী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। রাগে থরথর করে' কাঁপছেন।

বজ্র নির্ঘোষে বললেন, 'পাষণ্ড, এখুনি ছেড়ে দাও ওকে।'

আমার কোমরে একটা লাথি মারলেন, আমি পড়ে গেলাম ; সেই থেকেই কোমর ভেঙে পড়ে আছি—"

হিরণ সেন থামলেন।

"তারপর ?"

তারপর শেফালীর দিকে ফিরে স্বামীজী বললেন, 'এসো মা তুমি আমার সঙ্গে এস।'

"শেফালীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। আর ফেরেন নি। ওই দেখুন ফ্রেম খালি—"

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। এইবার দেখলাম, দেওয়ালে প্রকাণ্ড একটা ফ্রেমে-বাঁধানো কার্ড-বোর্ড ঝুলছে। ভিতরে ছবি নেই।

নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম ফ্রেমটার দিকে।

"শেফালীর কি হ'ল ?"

"সে-ও আর ফেরে নি। অনেকে বলে সে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আমি জানি স্বামীজী তাকে নিয়ে গেছেন।"

হিরণবাবু হু হু করে' কাঁদতে লাগলেন।

আমি নির্বাক হ'য়ে বসে রইলাম।

হিরণবাবুর ডাক্তারি চিকিৎসা আমি করি নি। তবে তাঁর জন্য রোজ প্রার্থনা করতাম। সেদিন খবর পেলাম তিনি মারা গেছেন।

চম্পা মিশির

"জিৎ গিয়া হুজুর।"

সোৎসাহে রমজানের ছেলে সলিম এসে খবরটা দিল। তারপর সেলাম করে' চলে গেল।

মনে পড়ল চম্পা মিশিরকে। এখনও আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি, সোজা হ'য়ে বসে' আছেন টমটমের উপর ঘোড়ার রাশ ধরে', আর যার টমটম সে পিছনের দিকে বসে' আছে স-সঙ্কোচে। বেশ লম্বা লোক ছিলেন, কিন্তু চওড়া নয়, সরু লিকলিকে চেহারা। অসুস্থ নয়, ওই রকমই গড়ন। গোঁফ ছিল, দাড়ি ছিল না। গোঁফ সরু, ভাল করে লক্ষ্য না করলে বোঝাই যেত না। গায়ের রঙের সঙ্গে প্রায় বেমালুম মিশে থাকত। গায়ের রঙ কালো ছিল না। গোধূম বর্ণ। গোঁফও তাই। ছোট ছোট চোখের তারাও কটা ছিল। মেরজাই পরতেন, মাথায় থাকত মৈথিলী পাগড়ি, কাপড় আঁট-সাঁট করে পরা, পায়ে দেশী নাগরা জুতো সর্বণ মুচির তৈরী, অন্য মুচির জুতো পছন্দ হ'ত না তাঁর। তাঁর এসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার অনেক আগেই তাঁকে দেখেছিলাম আমি। রোজই দেখতাম। বস্তুতঃ না দেখে উপায় ছিল না। আমার ল্যাবরেটরির সামনে দিয়ে যে রাজপথ চলে গেছে তার উপর টমটম হাঁকিয়ে রোজ যেতেন তিনি। এতেও তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণতঃ যার টমটম সে-ই হাঁকায়, আরোহী পাশে বা পিছনে বসে' থাকে। আরোহী চম্পা মিশির কিন্তু নিজেই টমটম হাঁকাতেন, যার টমটম সে পাশে বা পিছনে বসে' থাকত। এ খবরটাও আমি পরে জেনেছি।

যেদিন উনি আমার দোকানের সামনে টমটম থেকে পড়ে গিয়ে একটু আঘাত পেলেন, সেই দিনই ডাক্তার হিসেবে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হ'ল। আঘাত সামান্যই, পায়ের গোছটা একটু ছড়ে গিয়েছিল। পায়ে একটু টিঞ্চার আইয়োডিন লাগিয়ে দিলাম। এর পর চম্পা মিশির যা করলেন তাতে আমি নিঃসন্দেহ হলুম, ওর পায়ের হাড়ে কিছু লাগে নি। উনি লাফিয়ে নেবে গেলেন আমার ল্যাবরেটরির বারান্দা থেকে, সঙ্গের লোকটাকে হুকুম করলেন, ঘোড়াটাকে ধর ভাল করে', মুখটা শক্ত করে' ধরে' থাক। সে ধরতেই আগা-পাশ-তলা চাবকালেন

ঘোড়াটাকে। ঘোড়াটা চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে পিছু হটছিল বলেই পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেজন্যে শাস্তি দিলেন তাকে। তখনও আমি বুঝতে পারি নি যে, মিশিরজি টমটমের মালিক নন, আরোহী মাত্র। ঘোড়াটাকে পিটিয়ে মিশিরজি আবার আমার ল্যাবরেটরিতে এসে বসলেন এবং ভাঙলেন কথাটা। মৈথিলীমিশ্রিত হিন্দীতেই কথা বলতেন তিনি। আমি ভাবার্থটা অনুবাদ করে' দিচ্ছি। বললেন, এমন বোকা এ দেশের লোক ডাক্তারবাবু, পয়সা দিয়ে ওই ঘোড়া কিনেছে। ও যতটা এগোয়, তার চেয়ে পিছোয় বেশী। এ টমটমে কোন্ সোয়ারি চড়বে বলুন? আমাকেই এখন ঠিক করতে হ'বে, কদিন লাগবে কে জানে?

পরে আরও অনেক ঘটনা থেকে জেনেছি, বাজে ঘোড়াকে ঠিক করাতেই ওঁর আনন্দ। ইংরেজীতে যাকে বলে রঙ হর্স (wrong horse) তাকে ব্যাক করেও উনি আনন্দ পেয়েছেন জীবনে। ওঁর বাড়ি গঙ্গার ওপারে মফস্বলে, অনেক জমি-জায়গা আছে, খাওয়া-পরার ভাবনা ছিল না। কিন্তু শহরে উনি প্রত্যহ আসতেন স্টীমারে পেরিয়ে। বাড়ি থেকে স্টীমারঘাটে আসতেও প্রায় মাইলখানেক হাঁটতে হ'ত ওঁকে। কিন্তু তাতে আনন্দই পেতেন উনি, বলতেন, এইভাবে হাঁটার ফলে শরীর বেশ ভাল থাকে। স্টীমারঘাটে নেবেই একটা টমটম ভাড়া করতেন সমস্ত দিনের জন্য। যে টমটমের ঘোড়া খারাপ সেইটেই পছন্দ করতেন তিনি। তা বলে' তাকে যে কম ভাড়া দিতেন তা নয়, বরং বেশীই দিতেন। আর টমটমটা নিজেই হাঁকাতেন। সেই খারাপ ঘোড়া যতদিন না ঠিক হ'ত ততদিন সেই টমটমকেই বাহাল করে' রাখতেন। এই সব কারণে মিশিরজিকে আরোহীরূপে পাবার জন্য সব টমটমওলাই ব্যগ্র হ'ত। দু-একজন ঠকাতও। অর্থাৎ টমটমের ঘোড়া খারাপ না হ'লেও তাঁকে আরোহীরূপে পাবার জন্যে মিথ্যে করে' বলত যে, তার ঘোড়া খারাপ। কিন্তু মিশিরজির কাছে এসব চালাকি চলত না, ঘোড়ার রাশ থাকত তাঁর হাতে। একদিন আমার ল্যাবরেটরির সামনে টমটম থামিয়ে নেবে এসে বললেন, ডাক্তারবাবু, একটা রুগী নিয়ে এসেছি, দেখুন তো শালার যদি কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন, আরে, ইধার আ—

টমটমওলা ছোঁড়াটা মুচকি হেসে নেবে এল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে এর?

মিশিরজি তার মুখের দিকে চিন্তিত মুখে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর

বললেন, শালা ঝুঠ্‌ঠা ছে। অর্থাৎ শালা মিথ্যাবাদী। টমটমের ঘোড়া ভাল কিন্তু খারাপ বলে' চালিয়েছে তাঁর কাছে। হেসে বললাম, এর তো কোনও দাবাই নেই আমার কাছে—

চম্পা মিশির তখন ছোঁড়ার একটা কান টেনে বললেন, তা হলে পুরানা দাবাই দিয়ে দি একটু। অমন তেজী ভাল ঘোড়া, বলে কি না খারাপ—

তারপর তাকে একটা সিকি দিয়ে বললেন, দু আনার ছাতু তুই খা, আর দু আনার ঘোড়াটাকে খাওয়া। পেট ভরা থাকলে মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা বেরুবে না।

সিকিটা নিয়ে সানন্দে বেরিয়ে গেল ছোঁড়া, মিশিরজি আমার দিকে চেয়ে বাঁ চোখটা একটু কুঁচকে গেলেন তার পিছু-পিছু।

মিশিরজি শহরে এসে ব্যস্ত থাকতেন সমস্ত দিন। আদালতেই বেশির ভাগ সময় কাটত তাঁর। রোজই তাঁর একটা-না-একটা মকদ্দমা থাকত। তাঁর নিজের মকদ্দমা নয়, পরের মকদ্দমা। যে পক্ষ দুর্বল সেই পক্ষের মকদ্দমার তদ্বির করতেন উনি। তার জন্য উকিল ব্যবস্থা করতেন, সাক্ষী যোগাড় করতেন, নিজেও পরামর্শ দিতেন। শহরে তাঁর একটা ছোট বাসা ছিল, সেই বাসায় আশ্রয় দিতেন তাদের। একজন ভাল উকিলের মুখে শুনেছি, মিশিরজি মকদ্দমা বুঝতেনও ভাল। মোটামুটি আইনের জ্ঞান ছিল, তা ছাড়া বিপক্ষকে জেরা করবার এমন সব ঘাঁত-ঘোঁত বলে দিতে পারতেন যে, অনেক বুদ্ধিমান উকিলেরও তাক লেগে যেত। সুতরাং মকদ্দমাতেও মিশিরজিকে স্বপক্ষে টানবার জন্য চেষ্টা করত অনেকে। এ বিষয়ে খুব সুনাম ছিল তাঁর। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ সব করে' তাঁর কি লাভ হয়? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, সময় কাটে। কিন্তু তিনি কখনও সবলের পক্ষ অবলম্বন করেন নি। যার কেস কম-জোর, যার অর্থাভাব, যে পুলিসের বিষ-দৃষ্টিতে পড়ে' নাজেহাল হচ্ছে, চম্পা মিশির সর্বদা তার পক্ষে। উকিলরাও, বিশেষ করে নূতন উকিলরা, খুব সমীহ করত তাঁকে। সাধারণতঃ যে সব উকিলের মক্কেল জুটত না তাঁদেরই নিযুক্ত করতেন তিনি। দরকার হ'লে কোনও নামজাদা উকিলের পরামর্শ যে না নিতেন তা নয়, কিন্তু মকদ্দমার সম্পূর্ণ ভার থাকত নূতন উকিলটির উপর। পরে যাঁরা নামজাদা উকিল হয়েছিলেন তাঁরাও প্রথম জীবনে মিশিরজির সাহায্য পেয়েছিলেন, সুতরাং সে মহলেও মিশিরজির খুব খাতির ছিল। একবার এক উকিল কমিশন দিতে চেয়েছিলেন, তাঁকে। মিশিরজি জিব কেটে উত্তর

দিয়েছিলেন, আরে রাম রাম ওকিল সাহেব, আমি ব্রাহ্মণ, বেনিয়া নই। এ আমার পেশা নয়, খেলা।

আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে আমাকেও অনেক রোগী পাঠিয়েছেন তিনি মফস্বল থেকে। মফস্বলের নিরীহ রোগীদের কাছে আমার সম্বন্ধে এমন সব অত্যুক্তি করতেন যা শুনে আমি লজ্জিত হতাম। আমি নাকি খুন পরীক্ষা করে তড়াক্‌সে (চট করে) সমস্ত রোগ নির্ণয় করে' ফেলতে পারি। মাঝে মাঝে অপ্রস্তুতও হ'তে হ'ত। একবার তাঁর প্রেরিত এক রোগী এসে বলল যে, তার রক্ত পরীক্ষা করে' বলে দিতে হ'বে তার শ্বশুরের রক্তে কোনো দোষ আছে কি না! বললাম, আমি তা পারব না। কিন্তু লোকটা না-ছোড়। বলল, মিশিরজি যখন বলে' দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই আপনি পারবেন। ফী যা লাগে আমি দেব, কাজটা করে' দিন। বললাম, তোমার শ্বশুরকেই পাঠিয়ে দাও। সে বলল, তিনি থাকলে তো নিয়েই আসতাম। কিন্তু তাঁর নামে সম্প্রতি হুলিয়া বেরিয়েছে বলে তিনি কোথায় যে আত্মগোপন করে' আছেন তা কেউ জানে না। বললাম, তা হলে আমি পারব না।

পরদিন চম্পা মিশিরকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হ'ল সে।

চম্পা মিশির এসেই আমাকে আদেশের ভঙ্গিতে বললেন, খুন লে লিজিয়ে ডাক্‌টার সাহেব।

আমি পুনরায় অক্ষমতা জ্ঞাপন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু চম্পা মিশির হাত তুলে ঈষৎ অধীরভাবে যা বললেন তার ভাবার্থ—আমি এ বিষয়ে পরে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, আপনি রক্তটা তো আগে নিয়ে নিন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভাসারম্যান টেস্টের জন্য নিলাম খানিকটা রক্ত।

মিশিরজি লোকটার দিকে ফিরে বললেন, ফিস্ রাখ্‌খো। লোকটি একটি একশ' টাকার নোট আমার সামনে রাখল। আমি আবার বলতে যাচ্ছিলাম যে, এক-শ' টাকা এর ফী নয়। মিশিরজি আবার হাত তুলে বারণ করলেন আমাকে। আদেশের ভঙ্গিতে আবার বললেন, উঠা লিয়া যায়। তুলে নিলাম নোটটা।

মিশিরজি তখন সেই লোকটার দিকে ফিরে বললেন, অব তুম্ যাও।

চলে গেল সে।

তখন আমি মিশিরজিকে বললাম, আপনি যা বলছেন তা তো করা অসম্ভব। ওর রক্ত দেখে ওর শ্বশুরের—

মিশিরজি বললেন, আপনি ওরই রক্তে দোষ আছে কি না দেখুন। কিন্তু রিপোর্ট দেবেন পি. সিং—এই নামে। ওর নাম প্রয়াগ সিং, ওর শ্বশুরের নাম প্রাণেশ্বর সিং।

আমি বললাম. এ রকম চাতুরীর অর্থ কি!

মিশিরজি তখন যা বললেন তার ভাবার্থ হচ্ছে, এ লোকটির ছেলে হ'য়ে হ'য়ে মরে' যাচ্ছে। সিভিল সার্জন বলেছেন—হয় এর রক্তে, না হয় এর স্ত্রীর রক্তে, কিংবা উভয়েরই রক্তে সিফিলিসের বিষ আছে। কিন্তু এরা দুজনেই হলফ করে' ঘোষণা করেছে যে এদের চরিত্র স্ফটিকের মতো নির্মল। ওর স্ত্রী তো রক্ত পরীক্ষাই করাতে চায় না। যদি কিছু বেরিয়ে পড়ে, ভয়ানক কলঙ্ক রটে যাবে একটা। মানী বংশ ওদের। সব দিক বাঁচাতে হ'বে। তখন আমার মাথায় এই বুদ্ধিটা খেলে গেল। পলাতক খুনী শ্বশুরের ঘাড়ে দোষটা চাপালে সব দিক্ রক্ষে হয়। এ ছোকরার রক্তে দোষ পাবেন আপনি। কারণ ও বাইরে সাধু সেজে থাকে, কিন্তু আমি জানি, ও ডুবকি মেরে জল খায়। আপনি রিপোর্ট দেবেন পি. সিং—এই নামে।

বললাম, কিন্তু একশো টাকা তো আমার ফী নয়।

তা-ও জানি আমি। এটা ওর জরমানা ঝুট বলেছে বলে'।

রক্তে দোষ ছিল। চিকিৎসার পর ছেলেও হয়েছিল ওদের। ছেলের অন্নপ্রাশনে আমি নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম। গরদের জোড় দিয়ে প্রণাম করেছিল আমাকে প্রয়াগ সিং।

মিশিরজি সম্বন্ধে নানা ঘটনা মনে পড়ছে।

আর একটা ঘটনা বলি। একবার আমার বাড়িতে এসেছিলেন। চা দিতে গেলাম, বললেন চা খান না।

শরবত আনিয়ে দেব?

তা দিতে পারেন।

শরবত যখন এল তখন বললেন, আপনি খাবেন না?

আমার তো চিনি খাওয়ার উপায় নেই। ডায়াবিটিস আছে—

শরবতটি শেষ করে' মুখ মুছে বললেন, ইয়ে বাৎ? চিনি সে আপকো ঝগড়া হ্যয়, আচ্ছা, বিনা চিনিসেই আপকো শরবৎ পিলাউঙ্গা—

তার পরদিন এক ঝুড়ি বড় বড় লেবু নিয়ে এসে হাজির হলেন। বললেন, এর

নাম হচ্ছে শরবতিয়া লেবু। দুটো লেবুর রস গেলে এক গ্লাস জলে দিয়ে দিন, এক গ্লাস শরবত হয়ে যাবে, চিনি দিতে হবে না। দেখলাম সত্যিই তাই। অবশ্য এত মিষ্টি লেবুও ডায়াবিটিস রোগীর পক্ষে অচল, কিন্তু সে কথা তাঁকে বলি নি। পরে তিনি শরবতিয়া লেবুর গাছও একটা দিয়েছিলেন আমাকে। আমার হাতার এক ধারে এখনও আছে বোধ হয় সেটা।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আমাকে ডেকেছিলেন একবার।

আমাকে দেখেই হেসে বললেন, চিকিৎসার জন্যে নয়, শেষ দেখা করবার জন্যে ডেকেছি। এবার আর মকদ্দমায় জেতবার আশা নেই। মহাকালের শমন এসেছে, যেতেই হ'বে। ডাক্তারের সার্টিফিকেটে কাজ হ'বে না—

তারপর একটু থেমে বললেন, যাওয়ার আগে আপনাকে একটা অনুরোধ করে' যাচ্ছি, যদি পারেন কিছু ব্যবস্থা করে' দেবেন। এখানে রমজান বলে একটা গরিব লোক আছে। ভেড়া আছে তার একটা। ভেড়াটা আগে খুব ভাল লড়ত। রমজান ওকে লড়িয়ে রোজগার করত কিছু। কিন্তু গত দু বাজিতে হেরে' গেছে ভেড়াটা। রমজান বলছে, ও দানা হজম করতে পাচ্ছে না, তাই কম-জোর হয়ে গেছে। এখানে কাছেপিঠে তো ভাল পশুচিকিৎসক নেই। আপনি কি ব্যবস্থা করতে পারবেন কিছু? লোকটা গরিব, ওই ভেড়ালড়িয়েই রোজগার করত—

বললাম, আচ্ছা দেখব চেষ্টা করে'।

দু' দিন পরে খবর পেলাম মিশিরজি মারা গেছেন।

মানুষেরই ওষুধ দিয়েছিলাম ভেড়াটাকে। বাজি জিতেছে যখন, উপকার হয়েছে নিশ্চয়ই।

মনে হচ্ছে, চম্পা মিশিরের মতো লোকেরা কোথায় গেল, যারা কেবল দুর্বল মানুষদেরই সাহায্য করত, বাঙালী বিহারী হিন্দু মুসলমান—এসব ভেদ ছিল না যাদের কাছে···?

বাড়ি ফিরে দেখলাম, শরবতিয়া লেবুর গাছটা শুকিয়ে যাচ্ছে। তার চারদিক খুঁড়িয়ে, সার দিয়ে, জল দেওয়ালাম ভাল করে'। গাছটাকে বাঁচাতেই হবে।

ত্রি-ফলা

সুরেন্দ্রনাথ একটি খাতা খুলিয়া পড়িতেছিলেন ঃ

শুকরির সঙ্গে দেখা হ'ল মাছের বাজারে। কোলে একটি ফুটফুটে মেয়ে, ওরই মেয়ে। আমাকে দেখে একটু সলজ্জ হাসি হেসে একপাশে সরে দাঁড়াল। আমি ওর মেয়েটির গাল টিপে আদর করলুম একটু। শুকরি যেন কৃতার্থ হ'য়ে গেল। আমার মনে হ'ল, যাক শুকরির মুখে আবার হাসি ফুটছে তাহ'লে।

শুকরি মেথরের মেয়ে। আমি যখন প্রথম এসে ল্যাবরেটরি খুলি তখন ওর ঠাকুরদা মুনিকে আমি বহাল করেছিলাম। তখন শুকরির বাপ সিতাবীই ছেলেমানুষ। সতেরো-আঠারো বছর বয়স, বিয়ে হয়নি তখনও। মুনি মদ খেত খুব, গাঁজাও। ছোট ছোট চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল হ'য়ে থাকত সর্বদা। কিন্তু কখনও বেচাল হয়নি, কখনও বেয়াদপি করেনি। মদ গাঁজা খেত বটে, কিন্তু খাওয়াটা যে অন্যায় এ বোধটা তার ছিল। সর্বদাই যেন একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে থাকত। একদিন মুনির বউ রঙীন-কাপড় পরা ঘোমটা-দেওয়া একটি মেয়েকে নিয়ে এল আমার বাড়িতে। বললে, সিতাবীর বিয়ে দিয়েছি হুজুর, দেখুন কনিয়া কেমন হয়েছে। গোড় লাগ—। নববধূ আমাকে আমার স্ত্রীকে প্রণাম করে বখশিশ নিয়ে চলে গেল। বেশ বউটি। সত্যিই রূপসী। অমন রূপ ভদ্রঘরেও সচরাচর দেখা যায় না। কতদিন আগেকার কথা, অথচ মনে হচ্ছে যেন সেদিন। সিতাবীর বিয়ে হওয়ার কিছুদিন পরেই মুনি মারা গেল। তার কিছুদিন পরে মুনির বউও। সিতাবী তখন বহাল হ'ল তার বাপের জায়গায়। আমার চোখের সামনেই ওই শুকরির জন্ম হয়েছে। আমার ল্যাবরেটারির বারান্দাতে ও হামাগুড়ি দিয়েছে, তারপর বড় হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ। তারপর বিয়ে হ'ল ওর একদিন। কলকাতার এক মেথর এসে বিয়ে করে' নিয়ে গেল ওকে। মাঝে মাঝে খবর পেতাম ও সুখে আছে। কলকাতার মেথররা ধর্মঘট করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছে, ওদের পাকা ঘর-বাড়ি। এর কিছুদিন পরে সিতাবীর বউ মারা গেল যক্ষ্মায়, সিতাবী আবার

বিয়ে করল। বেশী মাইনের লোভে আমার চাকরি ছেড়ে মিউনিসিপ্যালিটিতে ঢুকল। ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়।

প্রায় বছর তিনেক পরে একদিন সকালে দেখি শুকরি আমার বাড়ির উঠোনের একধারে বসে আছে। মুখে হাসি নেই, চুল উস্ক-খুস্ক। পরনের কাপড়টা রঙীন বটে কিন্তু ছেঁড়া।

"কিরে কবে এলি ?"

শুকরি মাথা নীচু করল।

"কবে এলি তুই, তোর ছেলে হয়েছে শুনেছি, ছেলে কই—"

শুকরি মাথাটা আরও নীচু করলে। দেখলাম কাঁদছে।

"কি হ'ল তোর ? বল না, কি হয়েছে—"

অনেক জেরার পর জানা গেল শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে সে।

স্বামী পাগল। ছেলেটাকে কেড়ে রেখে দিয়েছে ওরা।

আমার গিন্নী কিছু খেতে দিলেন ওকে। বাড়িতে কিছু বাসি মাংস আর রুটি ছিল। শুকরি বসে বসে সেগুলি খেলে। খাবার পরও বসে রইল।

"কিরে, আরও খাবি ?"

শুকরি মাথা নেড়ে জানালে খাবে। পারতপক্ষে কথা বলতে চায় না, কারণ তোতলা।

আরও দুখানা রুটি খেলে। তবু নড়ে না। খানিকক্ষণ পরে আসল মনোভাবটি ব্যক্ত করলে।

"কা-কা-পড়া দে একঠো—"

একটা শাড়ি দিলেন গিন্নী, পুরোনো রঙীন শাড়ি। তবু উঠতে চায় না। আরও আট আনা পয়সা নিয়ে তবে উঠল।

...দিন দশেক পরে দেখলাম শুকরি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। একেবারে অন্য রকম চেহারা। রঙীন শাড়িটি বেশ কায়দা করে পরেছে, যৌবনশ্রী ফুটে উঠেছে শাড়িটির ভাঁজে ভাঁজে। মাথায় তেল দিয়ে পরিষ্কার করে চুল আঁচড়েছে, সিঁদুর পরেছে, হাতে পরেছে কাঁচের বাহারে চুড়ি একগোছা! চোখে মুখে হাসি ঝলমল করছে।

তারপর ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা।

মাস দুই পরে খবর পেলাম—(আমার মেথরটাই খবর দিলে)—শুকরি ডোমনের সঙ্গে ফেঁসে গেছে, তার বাড়িতে গিয়েই আছে নাকি।

ডোমন আর একটি মেথর, বিবাহিত।

এরও মাসখানেক পরে আবার একদিন দেখি শুকরি মাথা নীচু করে' বসে আছে এসে আমাদের উঠোনে, গিন্নী যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করছেন তাকে। কাঁদছে সে। শুনলুম ডোমনের প্রথম বউ শুকরিকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। শুকরি তার বাবার কাছে ফিরে এসেছিল, কিন্তু তার বাবাও দূর করে দিয়েছে তাকে, কারণ সে অন্তঃসত্ত্বা। তাকে ঘরে স্থান দিলে সমাজে একঘরে হ'তে হ'বে। সুতরাং অকূল পাথারে পড়েছে শুকরি।

গিন্নী আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি এর ব্যবস্থা কর একটা। তা না হলে ও মুখপুড়ী আমাদের বাড়িতেই আড্ডা গাড়বে এসে।

মেথরদের উপর কিঞ্চিৎ প্রভাব ছিল আমার, কারণ মিউনিসিপ্যালিটির হেলথ অফিসার ডাক্তার সেন আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর সহায়তায় সিতাবী, ডোমন এবং আরও জনকয়েক প্রবীণ মেথরকে ডেকে পাঠালাম। ছোটখাটো একটা সভা হ'ল আমার বৈঠকখানায়। সেই সভায় স্থির হ'ল যে শুকরির বেচালের জন্তে সিতাবীকে পঁচিশ টাকা আর ডোমনকে পঁচিশ টাকা জরিমানা দিতে হ'বে। এ টাকায় ভোজ হ'বে একটা। শুকরি সকলের সামনে কান মলে নাক মলে বলবে যে এমন কাজ সে আর কখনও করবে না। এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ডোমন শুকরিকে বিয়ে করবে। ডোমনের প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে শুকরি যদি মানিয়ে না চলতে পারে, তাহলে ওর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে হ'বে সিতাবীকে। ডাক্তার সেন বললেন শুকরিকে মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরি করে' দেবেন একটা। সুতরাং তাই হ'ল। শুকরি পঞ্চায়েতের সামনে নাক-কান মলে প্রতিজ্ঞা করল যে সে আর বিপথে যাবে না।

আজ আবার মাছের বাজারে দেখলুম শুকরির মুখে আবার হাসি ফুটেছে।

কোলের মেয়েটা বোধ হয় ডোমনের মেয়ে। হঠাৎ আর একটা ঘাড়-ছাঁটা মেথর ছোঁড়া শুকরির পাশে এসে দাঁড়াল। তার হাতে একটা ইলিশ মাছ। ডোমন নয়, আর একজন। আমাকে সেলাম করে চলে গেল তারা। বুঝলাম হারামজাদি আবার একটা জুটিয়েছে কাকে, আবার ফ্যাসাদ বাধাবে।

● তৃতীয় শতক ●

মনে হ'ল এদের নীতি-কথা বলে' সংশোধন করা শক্ত। তার চেয়ে জন্ম-শাসন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলে হয়তো সমাজের উপকার হয়—

এই পর্যন্ত পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার ঠাকুরদার ডায়েরিটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিলেন।

বন্ধু বিকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুকরি কিন্তু ঠাকুরদার উপদেশ শোনে নি। চোদ্দটা ছেলেমেয়ে হয়েছিল তার। তুমি যে কিষুণের কাছে ইলেকশনে হেরে গেছ সে ওই শুকরিরই ছেলে—"

"তাই নাকি"

"হ্যাঁ, আমরা ভদ্রলোকেরা জন্মশাসন করে' সংখ্যায় কমে যাচ্ছি, আর ওরা কিছু না করে' সংখ্যায় হু হু করে' বেড়ে যাচ্ছে। সংখ্যাধিক্যই যখন যোগ্যতার মাপকাঠি আজকাল তখন আমাদের পরাজয় অনিবার্য"

জগদীশ হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু যাই বল ভাই এ-যুগে জন্মশাসন না করলে চলা অসম্ভব। আমি অন্তত মরে' যেতুম।"

সুরেন্দ্রনাথের বড়ছেলে বিনয় বাড়ির ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল।

"বাবা শিগগির এস, পিসিমা ডাকছে"

সুরেন্দ্রনাথ ভিতরে চলিয়া গেলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিলেন জগদীশ-পত্নী শ্রীমতী সবলা দেবী।

সাজে-পোশাকে ভাবে-ভঙ্গিতে অতি-আধুনিক।

স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য, তুমি এখানে বসে' আড্ডা দিচ্ছ! তুমি বাড়িতে না থাকলে আমি মিটিংয়ে যাব কি করে'—"

"ওহো, একেবারে ভুলে গেছি। চল"

নমস্কারাদি বিনিময়ের পর স্বামীকে লইয়া শ্রীমতী সবলা চলিয়া গেলেন।

বিকাশের দিকে চাহিয়া অবনী বলিলেন—"জন্মশাসন করলে কি হয় তার দু' রকম নমুনা পাওয়া গেল আজ! বিকাশ ইলেক্‌শনে হারল, জগদীশ সুখে আছে—"

"কেন তৃতীয় নমুনাও তো দেখলে, ওই সবলা দেবী। বছর বছর ছেলে হ'লে ও মিটিং করে বেড়াতে পারত কি?"

"জন্মশাসন তাহলে ত্রি-ফলা, তিন রকম ফলের সম্ভাবনা আছে ওতে—"

বিকাশ বলিলেন, "শুকরি মেয়েটিকে কিন্তু ভারি ভাল লাগল। সুরেনের ঠাকুরদা বেড়ে লিখতে পারতেন তো—"

সুরেন্দ্রনাথ হন্তদন্ত হইয়া অন্দরমহল হইতে ফিরিলেন।

"অবনী, গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার দিতে পারবে—"

"তা পারব। হঠাৎ টাকার কি দরকার পড়ল—"

"আমার বউয়ের কাল থেকে ব্যথা ধরেছে। ডাক্তার ডাকতে হ'বে—"

"ও—"

অবনী বড়লোকের ছেলে। অবিবাহিত। পকেটে সর্বদা টাকা থাকে। অবিলম্বে পঞ্চাশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

"আমি ডাক্তারের কাছে চললুম—। তোমরা বস। চা করতে বলেছি"—সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন।

অবনী একটি সিগারেট ধরাইয়া রিং করিতে করিতে বলিলেন, "দেখ জন্মশাসন না করলে যা হয় তাও দেখছি ত্রি-ফলা। ধর্ম, অর্থ, কাম। আমাদের সুরেনের কথাই ধর। খাঁটি ধার্মিকলোক, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। বারোটি সন্তান যখন, কাম ওর চরিতার্থ হয়েছে। অর্থটা যদিও এখন মাইনাসের দিকে চলছে, কিন্তু ওর আটটা ছেলে যদি মানুষ হয়, চারটেও যদি হয়, তাহলে অর্থও হবে—"

চাকর চা লইয়া প্রবেশ করাতে আলোচনা আর বেশী দূর গড়াইল না।

অতি-ছোট গল্প

দীপ-শিখা নিষ্কম্পভাবে জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল যেন অধীরভাবে কার প্রতীক্ষা করছে। তার আকুল আগ্রহই যেন অচঞ্চল করেছিল তাকে। একটু পরেই ধীরে ধীরে সে কাঁপতে লাগল। এসেছে, হাওয়া এসেছে। কাঁপুনি বেড়ে' গেল তার। মনে হতে লাগল হাওয়ার বাহুপাশে আত্মহারা হ'য়ে পড়েছে সে বুঝি।

দীপ-শিখা। ছেড়ে দাও, ও কি করছ ?

হাওয়া। আমাকে ছেড়ে কি থাকতে পারবে তুমি ? বিজ্ঞানীরা কি বলেছেন জানো ?

দীপ-শিখা। কি ?

হাওয়া। আমার মধ্যে না কি অক্সিজেন-নামে একরকম গ্যাস আছে। সেই গ্যাসই না কি মূর্ত করেছে তোমাকে শিখা-রূপে। আমি না থাকলে, তুমিও থাকতে না।

দীপ-শিখা। ইস্—। কি করছ তুমি—

হাওয়ার বেগ বাড়ল। দীপ-শিখা কাঁপতে লাগল অসহায় ভাবে।

ঘরের আর এক কোণে।

"ছিঃ, কি করছ—"

"কি ভণ্ড তুমি! এই জন্যেই তো জেগে আছ!"

"ছাড়, ছাড়। ঘরে আলো রয়েছে, বড্ড লজ্জা করছে আমার—"

"আলোটা নিবিয়ে দাও তাহলে।"

একটি নিটোল সুন্দর মুখ এগিয়ে এল দীপ-শিখার কাছে।

একটি ফুৎকারে নিবে গেল দীপ-শিখা।

"বড্ড জোর হাওয়া আসছে। জানলাটা বন্ধ করে' দি ?"

"দাও—"

দড়াম্ করে বন্ধ হ'য়ে গেল জানলাটা।

নাক

কথিত আছে নাকের জোরেই ক্লিওপেট্রা নাকি বড় বড় বীরদের ঘায়েল করিয়াছিলেন। স্বক্ষেত্রে স্বনামধন্য বীর পাঁচুগোপাল আইচ মহাশয়ও নাকের জন্যই ঘায়েল হইলেন।

শ্রীপাঁচুগোপাল আইচ একটি আপিসের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। "রাখিলে রাখিতে পার মাখিলে কে করে মানা"—এ কথা তাঁহার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তাঁহার আপিসে সকলেই তাঁহার ভয়ে তটস্থ। কেবল এক গণেশপ্রসাদ আইচ ছাড়া। আইচ-পদবী দেখিয়াই ছোকরাকে পাঁচুগোপালবাবু বাহাল করেন। আইচদের সম্বন্ধে তাঁহার কিছু দুর্বলতা আছে। ইণ্টারভিউ করিবার সময়ও ছোকরাকে তাঁহার ভালো লাগিয়াছিল। বাটারফ্লাই ছাঁটের গোঁফটা যদিও তেমন পছন্দ হয় নাই, কিন্তু তাহার কথাবার্তা, চটপটে চাল-চলন, চমৎকার হাতের লেখা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নামটিও ভালো, গণেশপ্রসাদ আইচ। কিন্তু ক্রমশ তাঁহার মুগ্ধভাবটা কাটিয়া যাইতেছে। ছোকরার ডাক-নাম না কি পিংপং! একদিন লক্ষ্য করিলেন আপিসে ঢিলা পায়জামা চুড়িদার পাঞ্জাবি এবং লখনৌ-শহর-জাত শুঁড়-ওলা নাগরা পরিধান করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, এটা আপিস। তোমার বৈঠকখানাও নয়, শশুরবাড়িও নয়। হয় সাহেবী পোশাক প'রে এসো, তা না পার ভদ্র বাঙালী হ'লেও চলবে। তার মানে, কাপড়ের ওপর গলাবন্ধ কোট বা ভদ্র কামিজ বা পাঞ্জাবি। ফুটানি করবার জায়গা এটা নয়।"

পিংপং বলিল, "এ সম্বন্ধে কি কোনও আইন আছে?"

শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন পাঁচুগোপালবাবু। তাঁহাকে আইন দেখাইতে আসিয়াছে!

বলিলেন, "এ আপিসে আমার কথাই আইন। যা বললাম, তাই কোরো। নইলে চাকরি থাকবে না"

"এ তো আশ্চর্য কাণ্ড দেখছি"

ছোকরা গজগজ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ইহার দিন সাতেক পরে পাঁচুবাবু একদিন সিনেমা দেখিতে গিয়াছেন, হঠাৎ

নজরে পড়িল তাঁহার· ঠিক সামনের সীটেই পিংপং বসিয়া আছে। সিগারেট খাইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া জলন্ত-সিগারেট-সুদ্ধ হাতটা তুলিয়া অভিবাদন করিল, কিন্তু সিগারেটটা ফেলিয়া দিল না। তাঁহার নাকের উপর ধোঁয়া ছাড়িয়া একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল। পাঁচুগোপাল গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সন্দেহ রহিল না যে ছোকরা যথার্থই আইচ-কুল-কুলাঙ্গার ;

পরদিন আপিসে গিয়াই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

"দেখ, তোমাকে টেম্পোরারি হ্যাণ্ড হিসেবে নিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার কাজ-কর্ম চাল-চলন কিছুই আমার পছন্দ নয়, তুমি অন্যত্র কাজের চেষ্টা দেখো, আমরা তোমাকে পার্মানেণ্ট করব না।"

পিংপং স্থিরদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর পকেট হইতে একটি সুবাসিত রঙীন রুমাল বাহির করিয়া কপাল ও মুখটা মুছিয়া ফেলিল। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "অনেক ধন্যবাদ—"

নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। পাঁচুগোপাল গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। ইহার দিন তিনেক পরে পিংপং যাহা করিল তাহা আরও বিস্ময়জনক। আপিসে আসিয়া বলিল, "আমি আর একটি চাকরির যোগাড় করেছি। সেটা এ চাকরির চেয়ে ভালো। মাইনে প্রায় দেড়গুণ, কাজ অর্ধেক। সাহেবী ফার্ম। তবে আপনি রেকমেণ্ড না করলে সে চাকরি হবে না। আমি দরখাস্তটা লিখে এনেছি, আপনি রেকমেণ্ড করে দিন—"

ছোকরার স্পর্ধা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন পাঁচুগোপাল।

"সরি, আমি রেকমেণ্ড করতে পারব না"

ভ্রূযুগল কপালে উৎক্ষিপ্ত করিয়া পিংপং বলিল, "সে কি !"—

"না, আমি মিছে কথা লিখতে পারব না"

পিংপং গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার পরদিন আপিসেও আসিল না। পাঁচুগোপাল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু দিন তিনেক পরেই আবার তাঁহাকে নিশ্বাসটি টানিয়া লইতে হইল। তিন দিন পরে লম্বা খামে তাঁহার নামে একটি পত্র আসিল। খামটি খুলিয়া দেখিলেন, পিংপং সেদিন যে দরখাস্তটি রেকমেণ্ড করাইবার জন্য আনিয়াছিল সেইটি রহিয়াছে, আর রহিয়াছে মেয়েলী-হাতের লেখা একখানি চিঠি।

ভাই পাঁচু,

আমাকে আশা করি এতদিনে সম্পূর্ণ ভুলে গেছ। ভোলাটাই স্বাভাবিক, যদি ভুলে থাক, তোমাকে দোষ দেব না। আমাকে অনেকেই ভুলেছে। তোমার হাত ধরেই আমি সর্বপ্রথম অকূলে ভেসেছিলাম, তুমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে' গেছ, কিন্তু আমি আর কূলে উঠতে পারি নি। অনেকে আবার এসে আমার হাত ধরেছে, আবার ছেড়ে দিয়ে চলেও গেছে। এমনিই হয়। পুরুষ মানুষরা পদ্মপত্রের মতো, তাদের গায়ে বা মনে জল দাঁড়ায় না, এমন কি চোখের জলও নয়। তুমি এখন মানী পদস্থ ব্যক্তি হয়েছ, আমার সঙ্গে তোমার যে কি সম্পর্ক ছিল তা সবাই ভুলে গেছে, এমন কি তুমিও ভুলে গেছ। কি সব বাজে কথা লিখলুম, আসল যে কথাটা বলবার জন্যে এই চিঠি লিখছি সেইটেই আগে বলি। পিংপং আমার ছেলে। ওর বাবা কে তা আমি হলফ করে' বলতে পারব না, কিন্তু আমার ধারণা তুমিই ওর বাবা, তাই ওর আইচ পদবী দিয়েছি। তাই তোমার আপিসে ও কাজ পেয়েছে শুনে খুব খুশী হয়েছিলাম। এখন শুনছি ওকে নাকি তোমার তেমন ভালো লাগে নি, তাই ওকে নোটিশ দিয়েছ। আর একটা আপিসে ও চাকরি যোগাড় করেছে কিন্তু তুমি সুপারিশ না করলে সে চাকরি ওর হবে না। দরখাস্তটি এই সঙ্গে পাঠালুম, দয়া করে একটু সুপারিশ করে দিও। ওই আমার একমাত্র সন্তান, একমাত্র ভরসা। ও যদি রোজগার করতে না পারে আমাকে উপবাস করতে হ'বে। কারণ আমি এখন অসমর্থ, আর রোজগার করতে পারি না। আমার আন্তরিক ভালবাসা নিও। আর দয়া করে' একটু সুপারিশ করে' দিও লক্ষ্মীটি। ইতি—

তোমারই সুশী।

নীচে ঠিকানা দেওয়া ছিল। হাড়কাটা গলির ঠিকানা।

পত্রটি পাঠ করিয়া পাঁচুগোপাল নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখের সামনে হইতে ত্রিশ বৎসরের যবনিকা সরিয়া গেল। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—দ্বিতলের একটি জানালায় ষোড়শী সুশীলা দাঁড়াইয়া আছে। পানের মতো মুখখানি, তাহার উপর বাঁশীর মতো নাকটি। প্রথমে নাকটাই তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল, নাক দেখিয়াই তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মনে পড়িল—ওই-নাক, সই-নাক, মৈনাক, কই-নাক প্রভৃতি মিল মিলাইয়া দীর্ঘ একটি কবিতাও তিনি লিখিয়াছিলেন। সব মনে

পড়িল। দরখাস্তটির দিকে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর জোর কলমে সুপারিশ করিয়া দিলেন।

দিন দুই পরে সন্ধ্যার পর পাঁচুগোপাল হাড়কাটা গলিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া সুশীলার বাড়িটা বাহির করিলেন। একটি স্থবিরা চাকরানী বাহির হইয়া আসিল।

"সুশীলা কি এইখানে থাকে—"

"হ্যাঁ"

"পিংপং বাড়িতে আছে—"

"না, তিনি বেরিয়ে গেছেন। রাত বারোটার আগে ফিরবেন না"

"সুশীলাকে বল পাঁচুগোপালবাবু এসেছেন—"

চাকরানী একটু পরেই আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেল। পাঁচুগোপালবাবু দেখিলেন একটি অবগুণ্ঠনবতী প্রৌঢ়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে।

তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন।

"এ কি সুশীলা, ঘোমটা কেন—! ঘোমটা খোল"

সুশীলা ক্ষণকাল নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ঘোমটাটা সরাইয়া দিল পাঁচুগোপালবাবু আঁতকাইয়া উঠিলেন। সে নাক নাই, নাকের জায়গায় প্রকাণ্ড একটা গর্ত!

বিশ্বাস মশাই

আমরা আগ্রার তাজমহল দেখব বলেই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু আগ্রার বন্ধুবান্ধবেরা বললেন, "এতদূর যখন এসেছেন তখন হরিদ্বারটাও দেখে যান।" আমাদের তত ইচ্ছে ছিল না। কারণ, প্রথমত, টাকা কমে গিয়েছিল; দ্বিতীয়ত, অত বড় পরিবার এবং লটবহর নিয়ে ঘোরা-ফেরা করবার আর উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। আমাদের দলে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা সবই ছিল, আর প্রত্যেকের বিবিধ রকম বায়নাক্কা। কেউ ঝাল পছন্দ করে, কেউ করে না; কারও বাথরুম না হ'লে স্নানের সুবিধা হয় না; বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা স্লেচ্ছাচার পছন্দ করেন না; ছোঁয়াছুঁয়ি হ'য়ে গেলে মেজাজ বিগড়ে যায় তাঁদের; দু-তিনটে ছেলে অসুখে পড়ে গেল। আর টাকা তো জলের মতো খরচ হচ্ছিল। তাই ভাবছিলাম, এখন ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু আগ্রার বন্ধুরা একেবারে না-ছোড়। টাকা কমে' গিয়েছে শুনে তাঁরা কিছু টাকা ধার দিতেও উদ্যত হলেন। তাঁদের বললাম, "হরিদ্বারে কাউকে তো চিনি না। এখানে আপনারা ছিলেন—কোনো অসুবিধা হয়নি।"

একজন বন্ধু বললেন, "হরিদ্বারেও হবে না, সেখানে বিশ্বাস মশাই আছেন—"

"বিশ্বাস মশাই কে?"

"গেলেই বুঝতে পারবেন।"

যদিও প্রত্যেকটি লোক অসুবিধা ভোগ করছিল, তবু হরিদ্বারের নামে উৎসাহিত হ'য়ে উঠল সবাই। বিশেষ করে' বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। শেষটা বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করে' যাওয়াই স্থির করলাম। হুজুকে-বাঙালী আর কাকে বলে!

দুই

হরিদ্বারে পৌঁছলাম ভোরে। তখনও অন্ধকার ভাল করে' কাটে নি।' জানালা দিয়ে খুব আশাভরে মুখ বাড়ালাম, ভাবলাম কোনও অপরূপ দৃশ্য বুঝি চোখে পড়বে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ড টেনে নিতে হ'ল। বৃষ্টি পড়ছে, কনকনে শীত। প্যাসেঞ্জার, কুলি

ভিজে ভিজেই ছুটোছুটি করছে প্যাচপেচে প্ল্যাটফর্মে। দমে' গেলাম বেশ। মালপত্র আর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আমাকেও নামতে হবে এর মধ্যে। বিদেশে কুলিরাই বন্ধু। তাদেরই সাহায্যে নেমে পড়লাম অবশেষে। নেমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলাম। কোথায় যেতে হবে, কোথায় আশ্রয় মিলবে, কিছু জানা ছিল না। অবিলম্বে কয়েকটা পাণ্ডা এসে ঘিরে ধরল এবং কোথায় বাড়ি, পিতার নাম কী, পিতামহের নাম কী, কোনও পাণ্ডা ঠিক করা আছে কি না, প্রভৃতি প্রশ্ন করে' অস্থির করে' তুলল সকলকে। কি করব দিশাহারা হ'য়ে ভাবছিলাম, এমন সময়ে বিশ্বাস মশাইয়ের কথা মনে পড়ল। একটা কুলিকেই জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, বিশ্বাস মশাই কোথা থাকেন জান?"

"ওই তো বিশ্বাসবাবু। এ বিশ্বাসবাবু, এ বিশ্বাসবাবু, ইধর আইয়ে—"

কুলির ডাকে যিনি এসে দাঁড়ালেন, তাঁর চেহারা দেখে তো চক্ষুঃস্থির হয়ে গেল। এরই ভরসায় আমরা এসেছি! এ যে ভিখারী একটা! পরনে আধময়লা জামাকাপড়, পায়ে শতছিন্ন ময়লা কেডস। মাথার চুলগুলো লম্বা লম্বা এবং অবিন্যস্ত, গোঁফ-দাড়িও আছে, তাও কেমন যেন খাপছাড়া গোছের, বেশ ঘনসন্নিবদ্ধ নয়, এখানে চারটি ওখানে চারটি ছড়ান-ছড়ান। রংটি কুচকুচে কালো। হাত দুটি জোড় করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। চোখ দুটি ছোট ছোট কিন্তু অপরূপ। যে বিনয়, ভদ্রতা এবং স্নিগ্ধতা ঝরে' পড়ছিল সে-চোখের দৃষ্টি থেকে, তা আজকাল দুর্লভ। অথচ ভদ্রলোকের বেশবাস এমন কুৎসিত কেন। অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

"আমাকে ডাকছিলেন?"

নমস্কার করে' বললাম, "আগ্রার মতিবাবু আপনার খোঁজ করতে বলে' দিয়েছিলেন। আমরা এখানে নতুন এলাম তো, কিছুই জানি না, কাউকে চিনিও না—"

"তা বেশ চলুন, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব—"

তারপর কুলির দিকে ফিরে বললেন, "কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার ওখানে নিয়ে চল—"

বিশ্বাস মশাইয়ের পিছু-পিছু আমরা সার বেঁধে চলতে লাগলাম।

বিশ্বাস মশাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলেন। না নিলে ওর জন্যে আর একটা কুলি করতে হত। কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার আস্তানায় যখন পৌঁছলাম, তখন কুলিরা পয়সা চাইতে লাগল। সাধারণতঃ কুলিরা যা করে বিদেশী

দেখে, খুব বেশী চাইতে লাগল। আমার কাছে দশ টাকার নোট ছিল, খুচরো পয়সা ছিল না, তাই বেশ একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

বিশ্বাস মশাই বললেন, "নোটটা আমাকে দিন—"

অচেনা লোককে নোটটা দিতে একটু দ্বিধা হচ্ছিল প্রথমে, কিন্তু গত্যন্তর ছিল না বলে' দিলাম। বিশ্বাস মশাই কুলিদের দিয়ে জিনিসগুলি যথাস্থানে রাখিয়ে বিছানাপত্র পাতিয়ে আমাদের খালি কুজো দুটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কুলিরাও তাঁর পিছু-পিছু গেল। তারপর যা ঘটল তাতে অবাক্ হয়ে গেলাম। কুলিদের গোলমালে ব্যাপারটা এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি। গঙ্গার কলকলধ্বনি শোনা গেল। নদী যে কলকলধ্বনি করে এ-কথা কেতাবেই পড়েছিলাম, কানে শুনি নি কখনও। কুম্ভকর্ণের বাড়িটা ঠিক গঙ্গার উপরই, তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, যেন একটি তন্বী কিশোরী খিলখিল করে' হাসতে হাসতে ছুটে চলেছে। গঙ্গার এমন রূপ আর কখনও দেখি নি। খুব কম চওড়া, নীলাভ জল, অত্যন্ত স্বচ্ছ, নীচের বালি পর্যন্ত দেখা যায়। আর বড় বড় মাছ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলাম। হঠাৎ হরিদ্বারের মহিমা যেন চোখে পড়ল, গম্ভীর বিরাট কিছু নয়, সজীব, সতেজ চিরনবীন।

"খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কোথা করবেন আপনারা—"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বিশ্বাস মশাই ফিরে' এসেছেন। নোটটি ভাঙিয়েছেন তিনি, কুলিপিছু দু-আনার বেশী দেন নি, কিছু টাকার খুচরো করে' এনেছেন, এমন কি চার-আনার আধলা পর্যন্ত সংগ্রহ করেছেন। বললেন, "অনেক ভিকিরীকে দিতে হবে কি না।" পাই পয়সা হিসেব দিলেন, তারপর বললেন, "খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি করবেন বলুন—"

"কি ব্যবস্থা আছে এখানে?"

"দোকান থেকে কিনে খেতে পারেন। লুচি তরকারি পাওয়া যেতে পারে, ভাতও পাবেন একটা হোটেলে। কিন্তু ও-সব কি আপনারা খেতে পারবেন? দামও নেবে, তৃপ্তিও পাবেন না।"

আমার স্ত্রী বললেন, "এখানে রান্না করার ব্যবস্থা হয় না? আমাদের স্টোভ আছে—"

"হ্যাঁ মা, খুব হয়। আমি একটা তোলা উনুনেরও ব্যবস্থা করে' দিতে পারি—"

"তাই হোক তাহলে। খিচুড়ি আর কিছু ভাজাভুজি করা যাক, বৃষ্টিও নেবেছে, জমবে ভাল।"

সকলে এই ব্যবস্থাতেই রাজী হ'য়ে গেল।

আমার শালী প্রশ্ন করলেন, "মুগ ডাল পাওয়া যাবে ?"

"যেতে পারে। তবে এখানে অড়র বুটই বেশী চলে। আমি চেষ্টা করে' দেখব।"

মুগের ডাল এখানে পাওয়া যায় না বলে' বিশ্বাস মশাই কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়লেন। এটা যেন তাঁরই অপরাধ।

"মুগ না পাওয়া গেলে মশুরি আনবেন। থাড়ি মশুরি হলেই ভাল হয়—"

"চেষ্টা করব। খুবই চেষ্টা করব।"

"তরকারি কি পাওয়া যায় এখানে ?"

"আলু, নেনুয়া, ঝিঙে। পেঁয়াজও পাওয়া যাবে।"

"পটল ?"

আবার কুণ্ঠিত হলেন বিশ্বাস মশাই।

"না, পটল এখানে পাওয়া যাবে না।"

"বেগুন ?"

আরও কুণ্ঠিত হলেন।

"না, বেগুনও নয়।"

হাত কচলাতে লাগলেন ভদ্রলোক।

"লঙ্কা পাওয়া যাবে নিশ্চয় ?" আমার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন।

"তা যাবে, তা যাবে।"

উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল তাঁর মুখ।

ফোঁস করে' উঠলেন আমার বোনটি।

"লঙ্কা পেয়ে আর কাজ নেই। বৌদি খিচুড়িটি ঝালে পুড়িয়ে দেবে তাহ'লে।"

"তোকে আমি সাবু করে' দেব, তাই খাস।"

কিন্তু-কিন্তু মুখ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বাস মশাই।

আমি তাঁকে গোটা পাঁচেক টাকা দিয়ে বললাম, "যা পান কিনে আনুন। আমি ততক্ষণ স্টোভ জেলে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিই।"

দুটো ঘর নিয়েছিলাম আমরা। একটা ঘরে বাবা মা ছিলেন।

মা বেরিয়ে এসে বললেন, "আমার বাবা একটু গঙ্গাজল চাই।"

বিশ্বাস মশাই কখন যে কুঁজো দুটি ভরে এনেছিলেন টের পাই নি। বললেন, "দু কুঁজো জল আমি এনে রেখে দিয়েছি ও-ঘরে।"

"ও কুঁজো বাবা শতেক জাতে ছুঁয়েছে। একটু শুদ্ধভাবে যদি—"

"আচ্ছা আনব মা। নতুন কলসী কিনে ভরে' আনি তাহলে—"

বিশ্বাস মশাই চলে' গেলেন।

আমি স্টোভ জেলে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিলাম।

গিন্নী ছোট ছেলের কপালে হাত দিয়ে বললেন, "এর তো বেশ জ্বর হয়েছে দেখছি—"

মন্তব্য করলাম, "আগ্রাতেই তো ওর জ্বর হয়েছিল। লাফিয়ে তো চলে' এলে।"

"আমি লাফিয়ে এলাম, না তুমি লাফিয়ে এলে? পরের ঘাড়ে দোষ চাপান তোমার কেমন একটা স্বভাব— "

দাম্পত্য কলহের উপক্রম হল।

ছোট ছেলেই থামিয়ে দিলে সেটা।

"না বাবা, আমার কিচ্ছু হয়নি। র‍্যাপার মুড়ে শুয়েছিলাম কিনা তাই কপালটা গরম হয়েছে—"

"খুব হয়েছে, শুয়ে থাক এখন "

মায়ের ধমক খেয়ে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল।

একটু পরেই বিশ্বাস মশাই বাজার থেকে ফিরলেন জিনিসপত্র নিয়ে। দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছেন ভদ্রলোক। আমার শালীর দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, "খাড়ি মুগুরিই পেয়েছি মা। বেশ ভাল ডাল।"

তাঁর পিছনে দেখলাম পাণ্ডাদের একটা ছোঁড়া নতুন কলসীতে করে গঙ্গাজলও নিয়ে এসেছে মায়ের জন্যে। বিশ্বাস মশাই আমার কাছে এসে কানে কানে বললেন, "আমিই নিয়ে আসতুম গঙ্গাজলটা, কিন্তু আমি তো ব্রাহ্মণ নই। কর্তা-মা যদি আপত্তি করেন, তাই ওকেই বললাম নিয়ে আসতে। গোটা চারেক পয়সা দিলেই চলবে।"

বিশ্বাস মশাই বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর সপসপে ভিজে কাপড়ের কোঁচাটা নিঙড়ে জল বার করতে লাগলেন। কামিজের সামনের দিকটাও নিঙড়ে ফেললেন।

চা হয়ে গিয়েছিল।

বললাম, "চা খান বিশ্বাস মশাই।"

"দেবেন? বেশ দিন—"

একটা গ্লাসে চা দিলাম। তিনি একধারে সসংকোচে বসে চা খেলেন।

গিন্নী বাজারের জিনিস দেখে বললেন, "গুঁড়ো হলুদ আর লঙ্কা এনেছেন, কিন্তু ও তো ধুলোয় ভরতি, ওতে খিচুড়ির রং তো ভাল হবে না—"

বিশ্বাস মশাই একটু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়লেন।

"হ্যাঁ, সেকথা আমারও মনে হয়েছিল। আচ্ছা, দেখছি—"

পাণ্ডার সেই ছেলেটি তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, বিশ্বাস মশাই তার কানে কানে কী বললেন, তারপর তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই দেখলাম তিনি ছোট একটি শিল-নোড়া, কিছু গোটা হলুদ আর শুকনো লঙ্কা নিয়ে এসেছেন।

আমার শালী বললেন, "ওরে বাবা, ওসব এখন বাটবে কে?"

"আমি বেটে দিচ্ছি, কতক্ষণ আর লাগবে—"

বিশ্বাস মশাই এক কোণে বসে বাটনা বাটতে লেগে গেলেন।

বাটনা বেটে তোলা উনুনটা নিয়ে এলেন তিনি। বাজারে যাওয়ার সময়েই সেটাতে আঁচ দিয়ে গিয়েছিলেন। গিন্নী খুশী হলেন খুব। বেশ গনগনে আঁচ উঠেছে।

শালী বললেন, "আমি আলু-ছেঁচকি করব। উষা, তুই ভাই আলুগুলো কুটে ফেল—। ও হরি বঁটিই যে নেই—"

"এনে দিচ্ছি—"

বিশ্বাস মশাই পাণ্ডাদের কাছ থেকে বঁটি যোগাড় করে আনলেন।

আলু কোটা হ'লে আবিষ্কৃত হ'ল ছেঁচকি হওয়ার পথে আর একটি অন্তরায় বিদ্যমান। পাঁচ-ফোড়ন নেই। বিশ্বাস মশাই আবার ছুটলেন।

তারপর স্নান করার পালা। গঙ্গার স্রোত এত বেশি যে, সেখানে নেবে দাঁড়ান পর্যন্ত যায় না। একটা শিকল আছে সেইটে ধরে কোনরকমে একটা কি দুটো ডুব দেওয়া যায়। বিশ্বাস মশাই সবাইকে একে একে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে আনলেন।

তারপর দল-বেঁধে সবাইকে নিয়ে মন্দির, হর কি পৈরি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়ে আনলেন।

এসব সেরে বেশ ক্ষিধে পেয়ে গেল সকলের। তখনও কিন্তু রান্না চড়ে নি। ঠিক হ'ল কিছু গরম লুচি-তরকারি খেয়ে নেওয়া যাক জলখাবার হিসেবে। বিশ্বাস মশাই আবার গেলেন সে-সব ভাজিয়ে আনতে। তাঁকে পই-পই করে বলে দেওয়া হ'ল, তিনি যেন নিজের সামনে ভাজিয়ে আনেন সব।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আনব বই কি। নিজের সামনে ভাজিয়ে আনব।"

বৃষ্টির বেগটা কমেছিল কিন্তু টিপ-টিপ করে' করে' পড়ছিল তবু। বিশ্বাস মশাই বেশ ভিজেই ফিরলেন।

বললাম, "বিশ্বাস মশাই, আপনি কাপড়টা জামাটা ছেড়ে ফেলুন না।"

বিশ্বাস মশাই নির্বিকার। খাবারের ঝুড়িটা খুলতে লাগলেন। বললেন, "খাঁটি ঘিয়ে ভাজিয়ে এনেছি। আচারও বেশি করে এনেছি একটু—"

"এনেছেন বেশ করেছেন। কাপড়-জামাটা ছাড়ুন—"

বিশ্বাস মশাই হেসে বললেন, "ও একেবারে রাত্রে শোবার সময় ছাড়ব। শুকনো জামা-কাপড় পরলে আবার এখুনি তো ভিজে যাবে।"

বুঝলাম, এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। কারণ পরমুহূর্তেই বাবা বললেন, তাঁর নস্যি ফুরিয়ে গিয়েছে, এখানে পাওয়া সম্ভব কি?

তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন বিশ্বাস মশাই।

"হ্যাঁ, সম্ভব বই কি। র-মাদ্রাজী, পরিমল দু-রকমই পাওয়া যাবে। কোন্‌টা আনব বলুন—"

বাবা র-মাদ্রাজী আনতে বললেন। র-মাদ্রাজী নস্যি এনে বিশ্বাস মশাই পা-টি মুড়ে যেই বসেছেন, অমনি আমার গিন্নী বললেন, "ছায়া, চিরুনিটা যে তোর হাতে দিলুম আগ্রা হোটেলে—"

ছায়া আমার শালী। সে ভ্রূকুঞ্চিত করে' বললে, "আমার হাতে কখন দিলে আবার। দিয়ে থাকলে ওই অ্যাটাচিতেই রেখেছি—"

"কই এতে তো নেই!"

বাক্স, সুটকেস, তোরঙ্গ সব খোঁজা হ'ল। চিরুনি নেই।

সুতরাং বিশ্বাস মশাই আবার ছুটলেন চিরুনি কিনতে, স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে

ছুটলেন। আমি তাঁকে কয়েকটা কুইনিন ট্যাবলেট আনতে দিলাম আমার ছোট ছেলেটার জ্বর যদি বেড়ে যায়, বিপদে পড়ে যাব এই বিদেশে। সমস্ত এনে দিলেন বিশ্বাস মশাই।

খিচুড়ি আর আলুর ছেঁচকি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস মশাইকেও আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছিলাম। খাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বিশ্বাস মশাই বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন। ভাল ঘি আছে আমার একটু, নিয়ে আসি—।" দৌড়ে চলে গেলেন এবং ভালো গাওয়া ঘি নিয়ে এলেন একটা শিশি করে'। বললেন, কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি দিয়ে গিয়েছেন এটা তাঁকে। বেশ তৃপ্তি সহকারে খাওয়া গেল।

খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা সবাই। বিশ্বাস মশাই বসে রইলেন একধারে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

"আপনিও যান না, একটু বিশ্রাম করে নিন।"

বিশ্বাস মশাই সসঙ্কোচে বললেন, "আপনাদের যদি কোনও দরকার হয়—"

"না, আর কিছু দরকার হবে না। আপনি একটু বিশ্রাম করে' নিন গিয়ে। বিকেলে এসে আমাদের সঙ্গে চা খাবেন।"

চলে গেলেন বিশ্বাস মশাই।

বিকেলে এলেন একটি লোক সঙ্গে করে। বললেন, "আপনারা কি হৃষীকেষ, লছমনঝোলা যাবেন। যদি যান, তাহলে বাসে করেই যাওয়া ভাল। ইনি আমার চেনা বাসওলা। একটা ছোট বাস যদি রিজার্ভ করে নেন, ইনি সস্তায় করে দেবেন—"

বললাম, "যেতে তো খুবই লোভ হয়। কিন্তু আমাদের ব্যাপার তো দেখছেন, এখানে আপনি ছিলেন তাই সামলে দিলেন, কিন্তু সেখানে—"

"যদি বলেন সেখানেও আমি যাব।"

খবরটি পাওয়ামাত্র চনমন করে উঠলো সবাই।

বাবা বললেন, "এতদূর এসে যদি না দেখে ফিরে যাই তাহলে আমাদের আর দেখা হবে না। তোমরা হয়ত আবার আসতে পার কিন্তু আমরা আর পারব না।"

এ-যুক্তি অকাট্য। একটা কুইনিনের বড়ি খেয়ে ছেলেটার জ্বরও কমে গিয়েছিল। সুতরাং যাওয়াই স্থির হ'ল।

হৃষীকেশ-লছমনঝোলার বর্ণনা করে সময় নষ্ট করব না, কারণ তা বর্ণনা করা যাবে না। হৃষীকেশ-লছমনঝোলায় বিশ্বাস মশাই যা করেছিলেন তা-ও প্রায় অবর্ণনীয়। আমি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম বলে আমার পা পর্যন্ত টিপে দিয়েছিলেন তিনি। হৃষীকেশের সরাইখানায় বিশ্বাস মশাইকে একটু নির্জনে পেয়েছিলাম রাত্রিবেলা।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার দেশ কোথা বিশ্বাস মশাই। বাংলা দেশে নিশ্চয় ?"

"হ্যাঁ, বাংলা দেশে বই কি। তবে সে-দেশ ছেলেবেলায় ছেড়ে এসেছি।"

"কোথা বাড়ি ছিল আপনার ?"

"তা আর না-ই শুনলেন। আমি সামান্য লোক—"

কাঁচুমাচু হয়ে থেমে গেলেন বিশ্বাস মশাই।

"না, না, বলুন শুনি।"

"আমার পরিচয় দেবার মত নয়। আমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি নি, লেখাপড়া পর্যন্ত শিখি নি, ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।"

সসঙ্কোচে থেমে গেলেন।

"বাংলা দেশের কথা মনে আছে আপনার ?"

"খুব বেশি নেই। তবে একটি ছবি মনে আছে। ছোট একটি পুকুর, পুকুরের পাড়ে তালগাছ, নারকেল গাছ। পুকুরের জল কুচকুচে কালো, সবুজ পানায় ঢাকা, ঘাটে একটি বউ কলসী ভাসিয়ে চান কচ্ছে, টুকটুকে লাল গামছা তার হাতে। হৃষীকেশ হরিদ্বারের গঙ্গার চেয়েও ও-ছবি আমার বেশি ভাল লাগে—"

"আপনি তো কবি-লোক দেখছি—"

কুণ্ঠিত হাসি হেসে বিশ্বাস মশাই বললেন, "আমি সামান্য লোক। তবে আমার দাদা একজন নামজাদা লোক ছিলেন, তাঁর কথা বলতেও লজ্জা করে আমার। আমি তাঁর ভাই হওয়ার উপযুক্ত নই।"

"কে আপনার দাদা বলুন তো—"

"কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস। আমি দাদার নামের মর্যাদা রাখতে পারি নি।"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

"আপনি কি করেন এখানে—"কোথা থাকেন"

"এই যাত্রীদের, বিশেষ করে বাঙালী যাত্রীদের, সেবা করি। এ ছাড়া আর কি

করবার যোগ্যতা আছে বলুন—বাসা বলে তো আমার কিছু নেই। ট্রেনগুলো অ্যাটেণ্ড করি, যদি কোনো যাত্রী আসে। প্ল্যাটফর্মেই থাকি অধিকাংশ সময়। আর তা না হলে ওই কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার বাড়ির বারান্দায়। যাত্রীদের সেবা করাই কাজ তো—"

পাশের ঘরে আমার ছোট ছেলেটার গলার আওয়াজ পেয়ে উঠে পড়লেন বিশ্বাস মশাই।

"খোকন উঠেছে, ওর জন্যে দুধ যোগাড় করেছি একটু, গরম করে খাইয়ে আসি—"

তাড়াতাড়ি উঠে চলে' গেলেন।

ফেরবার সময় হরিদ্বারে বিশ্বাস মশাই এলেন আমাদের ট্রেনে তুলে দেবার জন্য। অনেক রাত হয়েছিল। নিজের হাতে তিনি আমাদের বিছানাপত্র পেতে দিলেন, জিনিসগুলি গুছিয়ে দিলেন। কুঁজোতে জল ভরে' দিলেন, রাত্রের খাবার আলাদা করে' বেঁধে দিলেন, তারপর প্ল্যাটফর্মে নেমে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন অন্যদিক চেয়ে। মনে হল, তিনি যেন অতি প্রিয় পরিজনদের বিদায় দিতে এসেছেন।

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল, গার্ড সাহেব বাঁশি বাজালেন।

হঠাৎ আমার কি মনে হ'ল, হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে ডাকলাম—

"বিশ্বাস মশাই, শুনুন—"

বিশ্বাস মশাই এগিয়ে এলেন।

"এইটে রেখে দিন, সামান্য কিছু—"

একখানা দশ টাকার নোট বার করে' তাঁর হাতে দিলাম।

"অ্যাঁ, এ কি, আপনি আমাকে টাকা দিলেন, টাকা দিলেন!"

ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে।

দেখলাম, বিশ্বাস মশাই নোটটি হাতে করে' অসহায়ভাবে চেয়ে রয়েছেন আমাদের গাড়ির দিকে। তাঁর মুখ বিবর্ণ, হাতটা কাঁপছে।

পুত্র

নূতন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মফস্বলে টুর করতে বেরিয়েছেন। এই প্রথম বেরিয়েছেন তিনি। প্রতিভাবান বাঙালী যুবক, অল্প কিছুদিন আগেই বিলেত থেকে আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সসম্মানে। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে স্টেশনে এসেছেন প্রবীণ অবাঙালী সাব-ডিভিশনাল অফিসার, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস (ইনি খাঁটি সাহেব), থানার দারোগা, কয়েকজন কনস্টেবল। আর এসেছেন জিতেন্দ্রনাথ বসু, সাব-ডিভিশনাল অফিসারের কেরানী একজন। স্টেশনের বাইরে তিনখানি মোটরকার দাঁড়িয়ে আছে। একটি এস. ডি. ও. সাহেবের, একটি এস. পি.-র। তৃতীয় কারটি স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী যুগলরাম মাড়োয়ারীর। এই তৃতীয় কারটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কারণ এটি পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত। সাধারণতঃ বিয়ের সময় বরের গাড়ি যেভাবে সাজানো হয়, এটি সেইভাবে সাজানো। এ গাড়িটি চেয়ে এনেছেন কেরানী জিতেন্দ্রনাথ বসু।

…ট্রেন একটু লেট আসছে। উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছেন সবাই। ছোট শহরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আগমনও একটা হৃৎস্পন্দনকর ঘটনা। স্টেশন মাস্টার, টিকিট কালেক্টার পর্যন্ত একটু যেন সন্ত্রস্ত ও বিচলিত। তখন ইংরেজের আমল, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরাই তখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বৃটিশ শাসনের প্রতিভূ ও প্রতীক। লাল-পাগড়ি পুলিস, দারোগা, এস. পি., এস. ডি. ও. এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যে প্ল্যাটফর্মে সমবেত যাত্রীরা পর্যন্ত সহজে নিশ্বাস নিতে পারছেন না। প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে আধময়লা-জামা-কাপড়-পরা জিতেনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন সসঙ্কোচে। তাঁর মনিব সাব-ডিভিশনাল অফিসারের সামনে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করতে পারছেন না তিনি। কিন্তু তাঁর নাচতে ইচ্ছে করছে।

ঢং ঢং ঢং ঢং—ঘণ্টা পড়ল। ট্রেন আসছে।

দেখতে দেখতে এসে পড়ল ট্রেন। এস. ডি. ও., এস. পি. এগিয়ে গেলেন প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে। জিতেনবাবুও দৌড়ে গেলেন, কিন্তু খুব কাছাকাছি যেতে পারলেন না। মনিবের সঙ্গে সম্মানসূচক দূরত্ব রক্ষা করে' একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলেন।

গাড়ি থেকে নাবলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। কচিমুখ, নেহাত ছেলেমানুষ। প্রতিভার দীপ্তি কিন্তু বিচ্ছুরিত হচ্ছে চোখ মুখ থেকে।

নেবেই এস. ডি. ও. এবং এস. পি.র সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড করলেন। এগিয়ে আসতে লাগলেন তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে। কিছু দূর এসেই জিতেনবাবুকে পেলেন তিনি। এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন তাঁকে। অবাক্ হ'য়ে গেল সবাই।

এস. ডি. ও.-র দিকে ফিরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, "ইনি আমার বাবা—।" এস. ডি. ও. এই ধরনের একটা কানাঘুষো শুনেছিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করেন নি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কথা শুনে নমস্কার করলেন জিতেনবাবুকে। কিন্তু নিজের অধীনস্থ কেরানীর কাছে সর্বসমক্ষে মাথা নোয়াতে হ'ল বলে' ক্ষুব্ধও হলেন একটু।

খাঁটি সাহেব এস. পি. বাঙালী-মহলে-প্রচারিত এ খবরটা। জানতেনই না। বেশ অবাক্ হলেন। কিন্তু টুপিটা ঈষৎ তুলে শিষ্টাচার সম্মত অভিবাদন জানাতে কসুর করলেন না।

জিতেনবাবু বললেন, "আমি গাড়ি এনেছি—"

"ও—"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গে।

"জাস্ট এ মিনিট সার—"

এস. পি. তাঁকে ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে গেলেন একপাশে। এস. ডি. ও. সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

এস. পি. বললেন, "আপনি আমার ওখানে চলুন। এখানে ভালো ডাক বাংলো নেই। আমার বাংলোতেই সব ব্যবস্থা করেছি আপনার। ডিনার ইজ ওয়েটিং—" এস. ডি. ও. বললেন, "এক্সকিউজ মি, আর একটা কথাও বিবেচনা করবার আছে। মিস্টার বোস আমার আপিসের একজন ক্লার্ক। একজন সাব-অর্ডিনেট ক্লার্কের বাড়িতে আপনার ওঠাটা অফিসিয়াল দৃষ্টিতে একটু অশোভন হবে না কি? জানেনই তো আজকাল যিনি কমিশনার, অফিসিয়াল ফর্মের দিকে তাঁর খুব কড়া নজর।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ক্ষণকাল চুপ করে' রইলেন। তারপর বাবাকে গিয়ে বললেন

সে-কথা। জিতেনবাবু বললেন, "ও তাই না কি। তাহলে যাও তুমি ওঁদের সঙ্গেই। কমিশনার সাহেব সত্যিই খুব কড়া লোক। হয়তো—না থাক, ওদের সঙ্গেই যাও তুমি।"

এস. পি. সাহেবের গাড়িতে চড়ে' চলে' গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।

তাঁর পিছু পিছু এস. ডি. ও. সাহেবও গেলেন।

পুষ্পে পত্রে সজ্জিত যুগল মারোয়াড়ীর গাড়িটা দাঁড়িয়ে রইল।

জিতেনবাবু ড্রাইভারকে গিয়ে বললেন, "একটা জরুরি দরকারে ওকে পুলিস সাহেবের সঙ্গে চলে' যেতে হ'ল। তোমার গাড়ির আর দরকার হ'ল না। তুমি যাও—"

যুগলবাবুর গাড়ি চলে' গেল।

জিতেনবাবু চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর হেঁটে হেঁটেই নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন তিনি।

অতিশয় ছোট বাড়ি তাঁর, গলির গলি তস্য গলির মধ্যে। তবু এই বাড়িটিকেই যথাসাধ্য সাজিয়েছিলেন তিনি। চুনকাম করিয়েছিলেন। বাড়ির সামনেটা দেবদারু পাতা আর রঙীন কাগজের শিকল দিয়ে অলঙ্কৃত করেছিলেন; একটা লাল শালুর উপর সাদা অক্ষরে 'স্বাগত' লিখেও টাঙিয়ে দিয়েছিলেন বারান্দার সামনে। দুচারজন অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন এই উপলক্ষে।

জিতেনবাবু যখন ফিরে এলেন তখনও তাঁর নিমন্ত্রিত বন্ধুরা বসে' ছিলেন।

"সুকু আসতে পারলে না। একটা জরুরি দরকারে পুলিস সাহেব টেনে নিয়ে গেল তাকে"

"তাই না কি—"

হতাশ হলেন দু-একজন, কেউ কেউ অবাক্ হলেন, মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করলেন দু-একজন। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে' গেলেন একে একে।

সবাই চলে' যাবার পর জিতেনবাবু চুপ করে' বসে' রইলেন বারান্দার উপর খানিকক্ষণ। তিনি বিপত্নীক। ওই সুকুমারই তাঁর একমাত্র সন্তান। বড় আশা করেছিলেন সে এসে তার কাছেই উঠবে। কিন্তু এল না।

দুই

গভীর রাত্রি, থমথম করছে চতুর্দিকে। জিতেনবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন।

"বাবা—বাবা—"

দুয়ারে কড়া সশব্দে নড়ে উঠল।

তড়াক করে' উঠে বসলেন জিতেনবাবু।

এতরাত্রে কপাটে ধাক্কা দিচ্ছে কে! তাড়াতাড়ি গিয়ে কপাটটা খুলে দিলেন।

"এ কি, সুকু—!"

"আমি এইখানেই চলে এলাম। কমিশনার সায়েব যা-ই মনে করুক, আমি তোমার কাছেই থাকব—"

জড়িয়ে ধরলেন তাকে জিতেনবাবু। কেঁদে ফেললেন।

"এতরাত্রে কি করে' এলি তুই—"

"হেঁটেই চলে এলাম।"

রূপ-রূপান্তর

কোলকাতা থেকে মনিহারী যাচ্ছি। সাহেবগঞ্জে গাড়ি বদলাতে হবে। সাহেব-গঞ্জে ঘাট-গাড়ি পাওয়া যায়, সেই গাড়িতে চড়ে' যেতে হবে সকরিগলি ঘাট। সেখান থেকে স্টীমারে চড়ে' যেতে হবে মনিহারী ঘাটে। মনিহারী ঘাট থেকে মনিহারী যাওয়ার গাড়ি পাওয়া যাবে।

সাহেবগঞ্জে নেবে দেখলাম ঘাট-গাড়ি তখনও প্ল্যাটফর্মে আসে নি। কুলি বললে গাড়ি 'সাইডিং'য়ে লাগানো আছে। সেখানে গিয়েই চড়া ভালো, কারণ সবাই সেইখানে গিয়েই চড়ছে। গাড়ি প্ল্যাটফর্মে আসবার আগেই ভরতি হ'য়ে যাবে। সে আমাকেও সাইডিংয়ে গিয়েই চড়বার পরামর্শ দিলে। গিয়ে দেখলাম থার্ড ক্লাস প্রায় ভরতি হ'য়ে গেছে। একটি মাত্র ইণ্টার ক্লাস (তখন ইণ্টার ক্লাস উঠে যায় নি) আর তার ভিতরে দাড়িওলা ভীষণ-দর্শন লোক বসে' আছেন একজন। দ্বিতীয় আর কোনও লোক নেই। কপাট খুলে ঢুকতে গেলাম, কপাট খোলে না।

বললাম, "কপাটটা খুলুন মশাই।"

"আমি তো কপাট লাগাই নি, আমি জানলা গলে ঢুকেছি, আপনিও পারেন তো ঢুকুন।"

মহামুশকিলে পড়ে গেলাম। প্ল্যাটফর্ম নেই, অত নীচু থেকে জানলা গলে ঢোকা অসম্ভব মনে হ'ল আমার পক্ষে। কুলিটা বললে, "আপনি বাবু আপনার এই ট্রাঙ্ক আর বিছানার উপর দাঁড়িয়ে ওই হাতলটা ধরে' ঝুলে পড়ুন। আমি পিছন থেকে আপনাকে ঠেলে দিচ্ছি, ঠিক উঠে যাবেন—"

তাই করেই উঠলাম। কনুয়ের কাছটা একটু ছড়ে গেল। আমি যখন ছিঁচড়ে জানালা গলে উঠছিলাম তখন ওই দাড়িওলা ভদ্রলোক এতটুকু সাহায্য করেন নি, আমাকে যদি একটু ধরতেন কনুইটা হয়তো জখম হত না। একটি বেঞ্চে নিজের জায়গাটা দখল করে' বসে তাঁর দিকে চাইলাম একবার। দেখলাম তাঁর চক্ষু দুটি অগ্নি বর্ষণ করছে। মনে হ'ল এ রকম পাজি লোক আর দেখি নি। সমস্ত কামরাটা একলাই দখল করে' থাকতে চায়।

একটু পরেই আর একদল যাত্রী এসে হানা দিলে আবার। আমাকে যে কুলিটা

তুলে দিয়ে গেছে দেখলাম সে-ই এসেছে আবার এদের মাল-পত্র নিয়ে। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাঁর সঙ্গে একটি অবগুণ্ঠনবতী নারী, সঙ্গে গুটি তিনেক ছোট ছেলে। একটি ছ-সাত বছরের, একটি বছর চারেকের, আর ছোটটি বছর দুয়েকের বেশী হবে না। এদের পক্ষে জানালা গলে ঢোকা একেবারে অসম্ভব। কুলিটা আমার দিকে চেয়ে বললে, "আপনি বাবু ছেলে দুটোকে তুলে নিন। তারপর আমি ভিতরে ঢুকে এঁদের টেনে তুলছি—"

দাড়িওলা ভদ্রলোক এতক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে দেখছিলেন এদের দিকে। হঠাৎ স্বগতোক্তি করলেন—"যত ভাবি একা থাকব ততই জড়িয়ে পড়ি। পাপ পাপ, পূর্ব জন্মের পাপ সব!"

উঠে এলেন এবং দরজার ফাঁকে যে ছোট ইঁটের টুকরোটি গুঁজে রেখেছিলেন সেটি খুলে নিজের পকেটে রেখে দিলেন। কপাট খুলে গেল। সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলাটি আর ছেলেগুলি উঠে পড়ল গাড়িতে।

ভদ্রলোক এদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করলেন তা আমার আর দেখবার অবসর হ'ল না। কারণ সঙ্গে সঙ্গে আমার এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল।

"মনিহারী যাচ্ছিস বুঝি—"

"হ্যাঁ—"

"আমার গাড়িতে আয়। তোর সঙ্গে কথা আছে একটু। কেস যোগাড় করেছি তোর জন্যে দুটো—"

আমি ইন্‌সিওরেন্সে দালালি করি তখন। কেসের কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।

"জায়গা আছে তোর গাড়িতে?"

"আছে।"

সেই কুলিটাকে দিয়েই জিনিসপত্র বইয়ে আবার অন্য একটা কামরায় হাজির হলাম গিয়ে।

সকরিগলি ঘাটে গিয়ে আর দাড়িওলা ভদ্রলোকের খোঁজ পাই নি। প্যাসেঞ্জারের ভিড়ে কে যে কোথায় চলে গেছে ঠিক নেই।

স্টীমারে উঠে তাঁকে দেখতে পেলাম। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দেখলাম তিনি গঙ্গায় স্নান করছেন, আর ওই তিনটি ছেলেকে স্নান করাচ্ছেন। সকরিগলিতে

স্টীমার খানিকক্ষণ থামে, স্নান করে নেওয়ার সময় পাওয়া যায়। দেখলাম দাড়িওলা ভদ্রলোক খুব স্নেহভরে স্নান করাচ্ছেন ছেলেগুলিকে। গামছা দিয়ে ঘষে ঘষে গায়ের ময়লা তুলছেন, মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন, চোখের কোণ পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। ছেলেগুলো আপত্তি করছে, কিন্তু তিনি শুনবেন না। দেখে বেশ অবাক্ লাগল। এই লোকই কিছুক্ষণ আগে ওদের ট্রেনে উঠতে দিচ্ছিল না!

...স্টীমারে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হ'ল।

জিজ্ঞাসা করলাম—"ওই ভদ্রলোক কি আপনার কোনো আত্মীয় হন?"

"না। এই একটু আগেই ওঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল ঘাট-ট্রেনে। উনি হিন্দু, আমি মুসলমান। একথা অবশ্য বলি নি ওঁকে। ভদ্রলোকের মাথায় একটু ছিট আছে—"

এই বলে' মুচকি হাসলেন।

"ও"

আর কিছু বললাম না।

ওপারে গিয়ে মনিহারীর ট্রেনে চড়বার সময় দেখলাম দাড়িওলা ভদ্রলোক সেই ছোট ছেলেটিকে দুহাতে বুকের কাছে তুলে আদর করছেন আর সে মুঠো করে' তার দাড়ি চেপে ধরেছে।

"আরে দেবেনবাবু যে কোথা চলেছেন—"

"দিনাজপুর যাব"

দেখলাম মনিহারী ঘাটের একজন টিকিট কালেক্টারের সঙ্গে দাড়িওলা ভদ্রলোকের কথা হচ্ছে। টিকিট কালেক্টারটি আমারও চেনা। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, "বাড়ি যাচ্ছেন না কি—"

"হ্যাঁ—"

আমি একটি কামরায় গিয়ে উঠে বসলাম। একটু পরে সেই টিকিট কালেক্টার ভদ্রলোকও এলেন আমার কামরায়। একথা-সেকথার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি ওই দাড়িওলা ভদ্রলোককে চেনেন না কি!"

"হ্যাঁ, খুব চিনি। পূর্ববঙ্গে আমাদেরই গ্রামে বাড়ি ওর। খুব নামী পরিবারের ছেলে—"

তারপর একটু থেমে বললেন, "গত রায়টে ওঁর সর্বনাশ হয়ে গেছে!"

"কি রকম—"

"ঘর-বাড়ি তো সব গেছেই, পুড়িয়ে দিয়েছে সব। ওঁর স্ত্রী ছেলে মেয়েগুলোকে পর্যন্ত মেরে ফেলেছে। কেউ নেই—"

নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম।

বিনোদ ডাক্তার

বরাবরই ধারণা ছিল বিনোদ ডাক্তার খুব উঁচুদরের লোক। চিকিৎসক হিসাবে এ অঞ্চলে ওর জোড়া নেই, তাছাড়া লোক চমৎকার। গরীবের মা-বাপ। বর্ধমানের কাছে এক পাড়াগাঁয়ে ওর বাড়ি। বছর চারেক আগে এখানে এসেছিল প্র্যাকটিস করতে, এসেই বেশ জমিয়ে ফেলেছে। শহরের মাঝখানে জমি কিনে বাড়ি করতে শুরু করছে। রূপে গুণে সমান। বেশ সুপুরুষ চেহারা। ইয়া লম্বা, ইয়া বুকের ছাতি। মাথার সামনের দিকটা সামান্য একটু টাক আছে অবশ্য, কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি, বরং গাম্ভীর্য যেন বেড়েছে একটু। আমি যখনই খবর পেলাম যে বিনোদ আমাদের পালটি ঘর তখন থেকেই ওর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বাড়ল। বোনটির এখনও বিয়ে দিতে পারি নি। লোকের কাছে বলে' বেড়াই বটে কুড়ি, কিন্তু ওর আসল বয়স পঁচিশ। আর বেশী দেরি করলে, চুলে হয়তো পাক ধরে' যাবে। কিন্তু বিয়ের বাজারের যা অবস্থা। তার ওপর বোনটি আমার একটু কালো। চোখ মুখের ছাঁদ খারাপ নয়, লেখাপড়াও শিখিয়েছি, কিন্তু এ পোড়া-দেশে রূপ আর রুপিয়ার যোগাযোগ না ঘটাতে পারলে মেয়ের বিয়ে হয় না। এক জায়গায় প্রায় লেগে গিয়েছিল, কিন্তু কুষ্ঠি বাদ সাধল। ভৌম-দোষ বেরিয়ে গেল। কিন্তু বিনোদ ডাক্তারকে দেখে আমার মনে আশার সঞ্চার হ'ল। শুনলাম বিয়ে হয় নি, মা-বাবা নেই কোনও বখেড়াবাজ অভিভাবক নেই। কৌশলে আলাপ প্রসঙ্গে জানতে পারলাম বিনোদের বয়স পঁয়ত্রিশ। বেশ মানাবে।

সুতরাং লক্ষ্য স্থির রেখে আধুনিক যুগের কায়দা অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছিলাম। মেয়েদের সময়ে বিয়ে না দিলে নানা রকম ব্যাধি জোটে শরীরে। বুক ধড়ফড়, মাথা ঘোরা, ফিট। আমার বোন অমিতারও লেগে থাকত একটা-না-একটা। আমি এতদিন হোমিওপ্যাথী ওষুধই দিতাম, নিজেরই বাক্স ছিল একটা। কিন্তু একদিন মনে হ'ল এই সূত্রে বিনোদ ডাক্তারের সঙ্গে অমিতার যদি পরিচয়টা করিয়ে দিতে পারি, আর বিনোদ যদি টোপটা গিলে ফেলে তাহলে আমার কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে।

বুক ধড়ফড় করছিল একদিন অমিতার। বিনোদ ডাক্তারকে ডেকে আনলুম। অনেকক্ষণ ধরে খুব ভালো করে পরীক্ষা করলে সে। তারপর প্রেসক্রপশন লিখে দিলে। ফি দিতে গেলুম, বললে, "আগে ভালো হোক তারপর ফি নেব।" শুনলাম মধ্যবিত্ত বা গরীব বাঙ্গালীদের কাছ থেকে সে ফি নেয় না। ওষুধে ফ'ল হল খুব। নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালাম একদিন। তারপর থেকে প্রায়ই আসত যেত। ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল ক্রমশঃ। আমার সঙ্গে তো বটেই, অমিতার সঙ্গেও। তারপর একদিন কপাল ঠুকে বিয়ের প্রস্তাবটা করে ফেললুম। শুনে সে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। মনে হ'ল মুখটা যেন বিবর্ণ হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্য। তারপর হেসে বলল "না, আমি বিয়ে করব না।"

"কেন!"

"বাধা আছে"

বলেই এমন গম্ভীর হ'য়ে গেল যে আমি আর বলতে সাহস করলাম না যে বাধাটা অতিক্রম্য কি না। এরপর থেকে সে আমাদের বাড়িতে আসাও বন্ধ করে' দিল। ভারি বেকুব হয়ে গেলাম। কি করতে কি হয়ে গেল।

তারপর সসঙ্কোচে গেলাম তার বাড়িতে একদিন। উদ্দেশ্য পুনরায় তাকে নিমন্ত্রণ করে' ভাব-সাব করা। গিয়ে দেখি একটি অচেনা লোক বসে' আছে আর তার সঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হচ্ছে।

"আপনাকে যেতেই হবে ডাক্তারবাবু"

"কোলকাতায় কত বড় বড় ডাক্তার আছেন, সেখানে আমার যাবার তো কোনও দরকার নেই।

"কিন্তু তিনি আপনাকে ছাড়া অরে কারুকে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন না। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। জরও হয় রোজ। কিন্তু তিনি অন্য কোনো ডাক্তারকে কাছে ঘেঁষতে দেবেন না।"

"এর মানে কি—"

"সে আপনি গেলে হয়তো বুঝতে পারবেন। আমি তো জানি না। আমি চাকর মাত্র—"

"আচ্ছা ঠিকানাটা রেখে যান। আজ না পারি কাল যাব।" ভদ্রলোক ঠিকানাটা লিখে দিলেন একখানা কাগজে। আমিও দেখলাম ঠিকানাটা।

দিন সাতেক বিনোদ ডাক্তার আর ফিরলই না।

যখন ফিরল তখন একটি মেয়ে সঙ্গে করে!

শুধু তাই নয়, মেয়েটির সঙ্গে বাস করতে লাগল!

তাজ্জব বনে গেলাম আমি। গেল রুগী দেখতে, ফিরল একটা মেয়ে সঙ্গে করে'। তারপর শুনলুম মেয়েটাকে নিয়ে ধরমপুর স্যানাটোরিয়মে যাচ্ছে। কোথা থেকে ভাগিয়ে নিয়ে এল এই ঘাটের মড়াটাকে? কিন্তু সামনাসামনি একথা বলা যায় না। দিন কয়েক পরে নিজেরই একটা কাজে কোলকাতা যেতে হ'য়েছিল। সেই ঠিকানাটা মনে হ'ল। গেলাম সেখানে। দেখলাম প্রকাণ্ড বাড়ি, গেটে দারোয়ান রয়েছে। ভিতরে খবর পাঠালাম যে বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে চাই। দারোয়ান আমাকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। দেখলাম দিব্যকান্তি একটি ভদ্রলোক বসে' আছেন। ধপধপে ফরসা রং, চোখ ছু'টি টকটকে লাল।

"কি চান—"

"আমি বিনোদ ডাক্তারের খবর নিতে এসেছি"

"কি খবর—"

"আমার বোনের সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম, কিন্তু—"

"কিন্তু তিনি বিয়ে করেন নি, এই তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"করলে আমি হাতে স্বর্গ পেতাম। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।"

আমি বসতেই ভদ্রলোক ভিতরে চলে' গেলেন। একটু পরে একটা চাকর কিছু খাবার আর চা দিয়ে গেল। ভদ্রলোকের দেখা আর পেলাম না। কিন্তু আসল খবরটা যোগাড় করতে বিলম্ব হল না আমার। চা জলখাবার খেয়ে পাড়াতেই আশেপাশে খোঁজ করলাম। যা শুনলাম তাতে অবাক্ হয়ে গেলাম। বিনোদ ডাক্তার বিবাহিত। তাঁর স্ত্রীকে এই ধনীর ছুলালটি সম্মোহিত করে' ভাগিয়ে এনেছিলেন। দিনকতক পর স্ত্রীটির হল যক্ষ্মা। এত বড় পাপের ফল ফলবে না? এই খবর পেয়ে বিনোদ ডাক্তার এল। এসে নিয়ে গেছে—।

তারপর কি হয়েছে পাড়ার লোকেরা জানে না।

ফেরবার সময় একখানা খবরের কাগজ কিনেছিলাম। তাতে চোখে পড়ল

একজন লোক তার বিশ্বাসঘাতিনী অসতী স্ত্রীকে গুলি করে' মেরে নিজে গিয়ে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

কতরকম মানুষই যে আছে এই পৃথিবীতে !

স্মৃতির খেলা

সব শক্তির মতই স্মৃতি-শক্তি ব্যাপারটাও একটু গোলমেলে। কখন যে কি খেলা খেলেন বলা শক্ত। কখনও কৃপা করেন, কখনও করেন না। সেদিন আমার ভাগ্যে দুরকমই হ'ল এবং দুবারই নাকাল হতে হ'ল আমাকে।

ফার্স্টক্লাসে বার্থ রিজার্ভ করে' যাচ্ছি। গাড়িতে উঠে দেখলাম আর কোনও যাত্রী নেই। নটা বেজে গেছে, সুতরাং গাড়িটি ভিতর থেকে 'লক্' করে' শুয়ে পড়ার কোনো বাধা ছিল না। প্যাণ্টটি খুলে হুকে ঝুলিয়ে দিলাম, তারপর লুঙ্গিটি পরে' শুয়ে পড়লাম। কিন্তু 'লক্' করতে ভুলে গেলাম। ফল যা হ'ল তা মর্মান্তিক। গভীর রাত্রে দড়াম্ করে' একটা শব্দ হ'ল, ধড়মড় করে' উঠে বসলাম। আলো জ্বেলে দেখি সামনের বেঞ্চে আড়ময়লা কামিজ-পরা এক ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হ'য়ে বসে রয়েছেন আর গাড়ির মেজেতে একটা হাঁড়ি ভেঙে চুরমার হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে। তার থেকে কালো চটচটে একটা পদার্থ কামরার চারদিকে ছড়িয়ে ছিটকে পড়েছে।

"কে আপনি মশাই, এ কি কাণ্ড!"

হাত কচলাতে কচলাতে ভদ্রলোক বললেন, "আলকাতরার হাঁড়িটা ওই টেবিলটার উপর রেখেছিলাম, কিন্তু ট্রেনটা এমন ঘচাং করে থামল যে হাঁড়িটা পড়ে গেল—"

আলকাতরা! ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম আমার ঝোলানো-প্যাণ্টের পা দুটোতে লেগেছে, বেঞ্চির নীচে স্যুটকেসটা ছিল তাতে লেগেছে আর জুতো-জোড়া তো মাখামাখি হ'য়ে গেছে একেবারে। আপাদমস্তক রাগে জ্বলে উঠল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গার্ডকে ডাকলাম। দেখলাম ট্রেন একটা বড় স্টেশনেই দাঁড়িয়েছে।

গার্ডসাহেব এসে সব দেখে শুনে বললেন, "আচ্ছা আমি একটা মেথর পাঠিয়ে দিচ্ছি, যতটা পারে পরিষ্কার করে' দিক—"

গার্ডসাহেব চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টিকিট কালেকটার এলেন। দেখা গেল ভদ্রলোকের টিকিট থার্ডক্লাসের।

টিকিট কালেকটার তাঁকে জিগ্যেস করলেন—"কোথা যাবেন আপনি"

"এখানেই নামব"

টিকিট কালেকটার তখন পকেট থেকে ছোট বই বার করলেন একটি। বইটি দেখে বললেন, "আপনাকে দশটাকা সাড়ে পনর আনা এক্সেস্ ফেয়ার দিতে হবে"

"আমার কাছে তো একটি পয়সা নেই। আমি অন্ধকারে বুঝতে পারি নি এটা কোন্ ক্লাস। আমাদের স্টেশনে ট্রেনও এক মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না। সামনে যে গাড়ি পেয়েছি তাতেই উঠে পড়েছি"

টিকিট কালেকটার বললেন, "ওসব কথা জেনে আমার লাভ নেই। এক্সেস্ ফেয়ার আপনাকে দিতেই হবে। আপনি শুধু যে বিনা টিকিটে এসেছেন তা নয়, রাতদুপুরে একজন ফার্স্টক্লাস প্যাসেঞ্জারকে বিব্রত করে' তাঁর গুরুতর ক্ষতি করেছেন। আসুন আমার সঙ্গে"

টিকিট কালেকটারের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক চলে গেলেন। দেখা গেল, আলকাতরার হাঁড়িটি ছাড়া তাঁর আর কিছু ছিল না।

তারপর মেথর এল জল আর ঝাড়ু নিয়ে।

সে সব দেখে শুনে একটি সদুপদেশ দিলে আমাকে।

"পাশের কামরাটাও একদম খালি আছে বাবু। আপনি সেখানেই চলে যান। এ আলকাতরা সাফ করা এখন মুশকিল। কেরোসিন তেল না হ'লে উঠবে না। আমি আপনার জিনিসপত্রগুলো একটু মুছে-টুছে দিচ্ছি"

"ট্রেন কতক্ষণ থামবে এখানে ?"

"বহুতক্ষণ থামবে হুজুর। অনেক মাল আছে। তাছাড়া আর একটা ট্রেনের সঙ্গে ক্রসিং হবে এখানে। আধঘণ্টা দাঁড়াবে এখানে। ইনজিনও বদলি হবে"

মেথরটাই একটা কুলি ডেকে এনে পাশের কামরায় সব ব্যবস্থা করে' দিলে আমার। বকশিশ দিলাম তাকে।

পাশের কামরায় যখন গুছিয়ে গিয়ে বসলাম তখন আমার স্মরণ-শক্তি দ্বিতীয় খেলাটি খেললেন।

অনেক দিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল।

তখন আমি কলেজে পড়ি। ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি। হাওড়া স্টেশনে থার্ডক্লাস কামরায় বসে আছি। যদিও সেদিন ভিড় খুব, তবু ভাল জায়গাই পেয়েছিলাম ভাগ্যক্রমে। জানালার ধারে বসেছিলাম মুখ বাড়িয়ে।

"কিরে ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছিস নাকি—"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম প্রশ্নকর্তা সাহেবি-পোশাক-পরা মুখে-পাইপ একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলাম। বাবার বন্ধু একজন। রেলের বড় অফিসার। প্রশ্ন করে আমার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি।

"থার্ডক্লাসের টিকিট বুঝি তোর। খুব ভিড় আজকে। ওহে রায়, শোন—"

একটি টিকিট কালেকটার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

"এই ট্রেনে তুমিই কি সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত যাচ্ছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

তারপর আমাকে দেখিয়ে বললেন, "এ আমার বাল্যবন্ধুর ছেলে। ভিড়ে কষ্ট পাচ্ছে, ওকে ফার্স্টক্লাসে বসিয়ে নিয়ে যাও"

"যে আজ্ঞে। আসুন আপনি"

আমি থার্ডক্লাস থেকে নেমে পিতৃবন্ধুকে প্রণাম করলাম, তারপর রায়মশায়ের অনুসরণ করে একটি ফার্স্টক্লাসে গিয়ে চড়লাম।

একেবারে ফাঁকা গাড়ি।

বাবার বন্ধু আবার এলেন আমার কাছে।

"ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে যা। রায় তোকে সাহেবগঞ্জে উঠিয়ে দেবে"

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসে আছি। ট্রেন ছাড়ে-ছাড়ে, প্রথম ঘণ্টা হয়ে গেছে, এমন সময় ছুটতে ছুটতে কানুদা এসে হাজির। হাতে একটা হাঁড়ি।

"ও, তুই যাচ্ছিস এই ট্রেনে, যাক বাঁচলাম। এই গুড়ের নাগরীটা মামাকে দিয়ে দিস তুই। গেতু আজ যাবে বলেছিল, তার হাতে দিয়েই এটা পাঠাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে দেখছি আসে নি, এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আজকালকার ছোকরারা।"

কানুদা কামরায় উঠে গুড়ের নাগরীটি বেঞ্চির নীচে ঢুকিয়ে রেখে দিলেন।

"কোণের দিকে ঠেসিয়ে রেখে দিলাম, খুব সাবধানে নিয়ে যাস—"

গার্ডের হুইসল বাজল, কানুদা লাফিয়ে নেবে গেলেন। আমি শুয়ে পড়লাম লম্বা হয়ে এবং খানিকক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল গভীর রাত্রে, এক মেমসাহেবের চিৎকারে। উঠে দেখি একটি স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমার কামরার সামনে ভিড় জমে গেছে একটা।

জিগ্যেস করলাম ব্যাপার কি। শুনলাম মেমসাহেব নাকি আমার কামরায় ঢোকবার জন্য দরজা খুলে একটি পা ঢুকিয়েছিলেন, কিন্তু সে পা-টি আর তুলতে পারেন নি। তাঁর জুতো কামরার মেজেতে একেবারে সেঁটে গিয়েছিল। তিনি পা-টি কোনরকমে বার করে নিয়েছেন, কিন্তু জুতোটি উদ্ধার করতে পারেন নি। তাঁর চিৎকারে চেঁচামেচিতে স্টেশন মাস্টার, গার্ড, টিকিট কালেকটার সবাই এসে জুটে গেছেন। গাড়ির আলো জেলে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। কানুদার সেই গুড়ের নাগরী কামরাময় গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়িয়েছে আর সমস্ত মেজেটা চট্‌চটে গুড়ে ভরতি হয়ে গেছে।

স্টেশন মাস্টার জিগ্যেস করলেন, "এ নাগরী কি আপনার?"

"না। আমি কিছু জানি না।"

স্টেশন মাস্টার তখন নিজেই হেঁট হয়ে মেমসাহেবের জুতোটিকে গুড়ের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। তারপর গদগদ বিনীত কণ্ঠে মেমসাহেবকে বললেন, "আই অ্যাম রিয়েলি সরি, ম্যাডাম। এ গাড়িতে আপনার বসা চলবে না, পিছনের দিকে আর একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরা আছে, সেইখানে চলুন"

সাহেব মেমসাহেবকে নিয়ে স্টেশন মাস্টার, গার্ড সবাই চলে গেলেন।

তখন সেই টিকিট কালেকটারটি আমার কাছে দাঁড়ালেন এসে।

তাঁকে আমি নিম্নকণ্ঠে জিগ্যেস করলাম, "আমি কি নেবে যাব?"

"না, না, নাববেন কেন, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন। ওরাই কি টিকিট কিনে যাচ্ছে নাকি। ওরা প্ল্যানটার সায়েব, প্রায়ই যাতায়াত করে। এক নাগরী গুড় নষ্ট হ'ল, এইটেই যা দুঃখের। আপনার সঙ্গে যে গুড় ছিল তা তো জানতাম না—"

বললাম তাঁকে সব কথা।

"ও। তাই বুঝি। আচ্ছা আমি মেথর ডেকে গাড়িটাকে ধুইয়ে দিচ্ছি। তা না হ'লে আপনার অসুবিধে হ'বে—"

মেথর এসে কামরাটি পরিষ্কার করে' দিয়ে গেল। আমি নির্বিঘ্নে যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম।

উক্ত গল্পটি মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হ'তে লাগল সেই সহৃদয় টিকিট

কালেকটারটি না থাকলে এ ভদ্রলোকের আজ যে দুর্দশা হয়েছে, আমারও সেই দশা হত। না হয় ভদ্রলোক ভুল করে' ফার্স্ট ক্লাসে চড়েই পড়েছেন, তা ব'লে হাজতে যেতে হবে তাঁকে! তাঁর অসহায় মুখচ্ছবিটা চোখের উপর ভাসতে লাগল। খচখচ করতে লাগল মনটা। পকেটে সদ্য-প্রাপ্ত ফি দু'শ টাকা ছিল। ভাবলাম আমিই না হয় দিয়ে দি ভদ্রলোকের ভাড়াটা। কতদিকে কতই তো বাজে খরচ হয়—আমার স্মৃতিশক্তি অতীতের সেই ঘটনাটিকে বেশ উজ্জ্বল করে' ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন আমার মানসপটে।

নেবে পড়লাম।

স্টেশন মাস্টারের কামরার কাছে এসে শুনতে পেলাম সেই টিকিট কালেকটার ভদ্রলোক তারস্বরে বলছেন, "মাপ করবেন মশাই, আমি ছাড়তে পারব না। চাকরি করি, চাকরির আইন মেনে আমাকে চলতেই হ'বে। হয় ভাড়া দিয়ে দিন, না হয় লক্-আপে থাকুন"

"শুনুন—"

হাতছানি দিয়ে ডাকলাম আমি ভদ্রলোককে।

"কি বলছেন"

"ছেড়ে দিন ভদ্রলোককে"

"মাপ করবেন, তা আমি পারব না"

"আমি ওঁর ভাড়াটা দিয়ে দিচ্ছি"

"আপনি দেবেন কেন, ওরকম লোককে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়"

"এমন সময় স্টেশন মাস্টার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

"আবার কি হ'ল। ঝামেলা মিটিয়ে ফেল না বাপু তাড়াতাড়ি"

"এই ভদ্রলোক ওঁর হ'য়ে ভাড়াটা দিয়ে দিতে চাইছেন"

"কে—"

আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়েই কিন্তু স্টেশন মাস্টারের মুখের চেহারা বদলে গেল। তাঁর স্মরণ-শক্তি কৃপা করলেন তাঁকে। উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এসে তিনি আমার পায়ের ধুলো নিলেন।

"ডাক্তারবাবু যে, আপনি কোথা থেকে—"

"একটা রোগী দেখে ফিরছি। এই লোকটিকে ছেড়ে দিন, এঁর ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি—"

"আরে ভাড়া দিতে যাবেন কেন। আপনি ছেড়ে দিতে বলছেন, তাই যথেষ্ট—"

মাস্টার মশাই যখন আমাদের স্টেশনে ছিলেন তখন তাঁর ছেলের টাইফয়েডের চিকিৎসা করেছিলাম আমি।

"শনটু কেমন আছে আজকাল—"

"ইয়া মোটা হয়েছে। এখন দেখলে চিনতেই পারবেন না"

রসময়ের অভিজ্ঞতা

বৃদ্ধ রসময় রক্ষিত একটু উত্তেজনাভরেই আমার ক্লিনিকে এসে সেদিন বললেন, "মাপ করবেন ডাক্তারবাবু, সেদিন তর্কের মুখে আপনাদের বিজ্ঞানকে বুজরুকি বলে ফেলেছিলাম। আজ আমার ভুলে ভেঙ্গেছে, আমি আমার কথা প্রত্যাহার করতে এসেছি। আর একটা কথাও আপনাকে জানাতে এসেছি যা আপনিও হয়তো জানেন না, কিংবা হয়তো জানেন, কারণ আপনারা ডাক্তাররা সর্বজ্ঞ।"

"বলুন, কি কথা"

"উঃ, খুব বেঁচে গেছি ডাক্তারবাবু। আর একটু হ'লে গিন্নির নোয়া সিঁদুর ঘুচে গিয়েছিল আর কি—"

রক্ষিতমশায় খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন নিজেকে।

"আপনি হাজারিবাগ গিয়েছিলেন না ?"

"হ্যাঁ। সেইখানেই তো ওই কাণ্ড। আমার মেয়েটা মানা করেছিল, বাবা জঙ্গলের ভিতর বেড়াতে যাবেন না, ওখানে বাঘ আছে শুনেছি। কিন্তু আপনারা ঘড়ি ধরে রোজ একঘণ্টা বেড়াতে বলেছেন, আর হাজারিবাগের সিনারিও চমৎকার। হাঁটতে ভালই লাগত বেশ। কিন্তু একদিন ফ্যাসাদে পড়ে' গেলাম ডাক্তারবাবু।"

"আপনি ইনস্যুলিন নিচ্ছেন আজকাল ?"

"আপনারা তো বলেই খালাস, কিন্তু অত পয়সা কোথায় আমার ! ওই জন্যেই না সেদিন আপনাদের বিজ্ঞানকে একহাত নিলুম, কিন্তু এবার আমি মশাই অপদস্থ হয়েছি। ইনস্যুলিন নিই নি বটে, কিন্তু ওই বিজ্ঞানের জোরেই বেঁচে গেছি সেদিন।"

"কি রকম"

"আপনার হুকুম-মতো সন্ধ্যা বেলা বেরিয়েছি সেদিন। মেয়েটা সেদিনও মানা করলে, বাবা বেশীদূর যেও না, সন্ধ্যের আগেই ফিরে এস। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই মুগ্ধ হয়ে গেলাম ! রবি ঠাকুরের গানের লাইনটা গুনগুন করতে লাগল মনের ভিতর—ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে। পলাশে আর কৃষ্ণচূড়ায় চারিদিক লালে লাল। সূর্যাস্ত হচ্ছে, আকাশের মেঘে মেঘে আগুন লেগেছে। 'বউ কথা

কও' পাখিও একটা ডাকতে লাগল থেকে থেকে। আর ওই পাখিটাই টেনে নিয়ে গেল আমাকে বনের মধ্যে। পাখিটাকে কখনও দেখি নি। ভাবলুম যদি দেখতে পাই। ঢুকে পড়লুম জঙ্গলে। জঙ্গলে ঢুকে আবার মুগ্ধ। সেখানে যে কত রকমের ফুল, কত রকমের গাছ, কত রকমের পাতা, কত রকমের লতা, তার ইয়ত্তা নেই। 'বউ কথা কও' পাখিটা যেন আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে লাগল। কখনও মনে হচ্ছে বাঁ দিক থেকে ডাকছে, কখনও ডান দিক থেকে, কখনও বা সামনে থেকে, কখনও আবার পিছন থেকে। আমি এদিক ওদিক চাইতে চাইতে এগিয়ে চলেছি, হুঁশ নেই। অদ্ভুত নির্জনতা চারিদিকে, একটা অদ্ভুত গন্ধও পেতে লাগলাম। কাছেপিঠে বোধ হয় মহুয়া গাছ ছিল। মনে হ'ল নেশা হয়েছে। নেশার ঘোরে আচ্ছন্নের মতো এগিয়ে যেতে লাগলাম। মনে হ'ল 'বউ কথা কও' পাখিটা যেন সুরের ইঙ্গিতে স্বপ্নলোকের পথ দেখাচ্ছে আমাকে। ভাবতে লাগলাম পাখিটা দেখতে কি রকম? নীল কি? ওই কি মেটারলিঙ্কের ব্লু বার্ড? কতক্ষণ চলেছিলাম মনে নেই, সন্ধ্যার অন্ধকার যে গাঢ়তর হ'য়ে আসছিল সেদিকেও খেয়াল ছিল না, হঠাৎ কিন্তু বজ্রপাত হ'ল। চমকে উঠলাম, সামনে দেখি দুটো বাঘ! একটা প্রকাণ্ড বড়, থলথল করছে চর্বি আর একটা রোগা গোছের। সম্ভবত আমি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখি বড় বাঘটা আমার মুখের কাছে মুখ এনে হ্যা হ্যা করে শুঁকছে। ভাবলাম এইবার মস্তকটি কড়মড়িয়ে চর্বণ করবে। কিন্তু মশাই করলে না! কি করলে জানেন?"

"কি?"

"সেই রোগা বাঘটার দিকে চেয়ে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে, এর নিশ্বাসে বেজায় অ্যাসিটোনের গন্ধ ছাড়ছে যে হে। তার মানে রক্তে খুব বেশী চিনি আছে। একে খাব?"

রোগা বাঘটা তখন ঘুরে ঘুরে আমাকে দেখলে, সে-ও মুখটা শুঁকলে বার কয়েক।

তারপর বললে, "না খাবেন না। আপনার শুগার কত এখন?"

"পাঁচ পারসেণ্ট।"

"না খাবেন না। আমারও খাওয়া চলবে না, আমারও তিন পারসেণ্ট আছে আজ। এতো মানুষ নয়, মোরব্বা দেখছি। চলুন—"

"আমাকে খেলে না মশাই। হেলে-দুলে চলে' গেল দুজনেই! তা হলেই দেখুন, বিজ্ঞানের কল্যাণেই বেঁচে গেলাম সেদিন। আর একটা কথাও মনে হ'ল। বঙ্গ-বিহার পুনর্মিলনের প্রস্তাবে বেশ ফল হয়েছে, তা না হ'লে বিহারের বাঘ অমন পরিষ্কার বাংলা বললে কি করে', তার মানে ওরাও বাই-লিঙ্গুয়াল হ'য়ে গেছে আর কি—"

কি আর বলব! হাসিমুখে রসময় রক্ষিতের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

ফাণ্ড

"ওঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন ?"

"হ্যাঁ এলুম।"

"কত নিলেন উনি"

"পাঁচ হাজার। দৈনিক হাজার টাকাই তো কথা হয়েছিল। পাঁচদিন ছিলেন।"

"আমাকে যদি বলতেন কিছু সস্তায় করিয়ে দিতে পারতুম।"

"আপনার সঙ্গে আলাপ আছে না কি ?"

"আছে।"

"কি সূত্রে—"

"সেটা আর না-ই শুনলেন।"

গদাধরবাবু মুচকি হাসলেন। তা দেখে ভুরু কুঁচকে গেল ভোম্বল দাসের। পুনরায় প্রশ্ন করলেন গদাধর।

"কেমন হ'ল ? আমি তো ছিলুম না।"

"অবর্ণনীয়।"

"খুব নাচলে গাইলে—?"

"খুব। মাৎ করে' দিলে একেবারে।"

"তা তো দেবেই। কখানা গান গাইলে—"

"পাঁচদিনে তা কম করে' খান কুড়ি হ'বে।"

"খুব গেয়েছে। আর নাচ ?"

"সকালে, বিকেলে। তার মানে পাঁচদিনে দশবার। তা কথক, ভারতনাট্যম্, মণিপুরী, জাভা, এমন কি পোয়ে পর্যন্ত। টাকা উশুল করে' নিয়েছি আমরা। দশ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি করেছি—"

হঠাৎ ভোম্বল দাস উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন।

"বুঝলেন গদাধরবাবু, মন ভরে গেছে, কানায় কানায় ভরে গেছে, উপচে পড়ছে। ধন্য হয়ে গেছি।"

"কোথা রেখেছিলেন ওকে ? নিজের বাড়িতে ?"

"আরে বাপস সে সামর্থ্য কি আছে আমার? ছিলেন উনি যোগেনবাবুর বাগান-বাড়িতে। তবে ফাই-ফরমাশ খাটবার জন্যে আমি হামে-হাল মোতায়েন থাকতুম সেখানে। এ রকম সৌভাগ্য ক'জনের হয় বলুন।"

গদাধর ভ্রূকুঞ্চিত করলেন আবার। একটু মৃদু হাসিও ফুটল তাঁর অধরে।

বললেন, "তা বটে—"

"আমার এত বেশী আনন্দ হয়েছে কেন জানেন? পয়সার বদলে উনি যা দিয়েছেন তা সকলে আমরা সমানভাবে ভোগ করেছি। কিন্তু আমাকে একটু ফাও দিয়েছেন—"

"কি রকম?"

"যখন গাড়িতে তুলে দিয়ে বললুম, এখন তাহ'লে আসি দেবি। তখন কি মিষ্টি করেই যে হাসলেন আমার দিকে চেয়ে। ও হাসি আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় সম্পদ হ'য়ে থাকবে চিরকাল—"

গদাধর আবার একটু হেসে বললেন, "চলুন, যাওয়া যাক। আপনি হেঁটে বাড়ি যাবেন না, চলুন আপনাকে আমি নাবিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।"

যোগেন পণ্ডিত

হরিপুরের লোয়ার-প্রাইমারি স্কুলের যোগেন পণ্ডিত বড়ই মর্মাহত হলেন বৃদ্ধ বয়সে। নূতন যুগের নূতন চাল-চলনের সঙ্গে কিছুতেই তিনি মানিয়ে চলতে পারলেন না। এখনও তিনি ছেলেদের পড়া মুখস্থ করতে বলেন, না পারলে শাস্তি দেন। কানমলা, চড়, চাপড়, বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া, কান ধরে হাঁটু-গেড়ে-বসানো এসব তো আছেই, বেতও মারেন। ত্যাঁদড় ছেলেদের মারের চোটে আধমরাও করে' ফেলেন।

এসব ছাড়া আর একটা কাজও করেন তিনি। বরাবরই করে এসেছেন। পাঠশালায় এসে ঘণ্টা-দুই ঘুমোন।

প্রায় ক্রোশখানেক দূরে থাকেন তিনি এক সোনার বেনের বাড়িতে। সেখানে অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগরণ করে' তাঁকে হিসাবপত্র লিখতে হয়। এর বিনিময়ে সেখানে তিনি থাকতে পান এবং সিধা পান। নিজের রান্না নিজেই করে' নেন। অত্যন্ত রাশভারী লোক। সকলেই ভয় করে' তাঁকে। ছাত্ররা আড়ালে বলে মহিষ-পণ্ডিত। যেমন কালো রং, তেমনি বলিষ্ঠ। চোখ দু'টিও লাল। কেউ ঘাঁটাতে সাহস করে না সহসা।

এক ক্রোশ হেঁটে প্রত্যহ বেলা বারোটা-আন্দাজ যখন তিনি পাঠশালায় হাজির হন, তখন তাঁর দুই পা হাঁটু পর্যন্ত ধূলি-ধূসরিত। জুতো বা ছাতার বালাই নেই। হাতে একটি ছোট পুঁটুলি থাকে। পুঁটুলির ভিতর একখানি গামছা, কয়েকটি বই, চশমাটি এবং মসলার একটি ছোট কৌটো ছাড়া আর বড় কিছু থাকে না। স্কুলে এসেই তিনি আদেশ করেন—ওরে, জল আন। পাশের পুকুর থেকে ছাত্ররা জল বয়ে এনে দেয়। যোগেন পণ্ডিত পদপ্রক্ষালন করেন। পুঁটুলি থেকে গামছা বের করে' পা দুটি ভালো করে' মোছেন। তারপর ছাত্রদের সাহায্যে ধরাধরি করে' বেঞ্চিগুলি জোড়া দিয়ে নেন। তারপর মসলার কৌটো থেকে একটা লবঙ্গ বা এলাচের দানা মুখে ফেলে দিয়ে পুঁটুলিটি সযত্নে বেঁধে ফেলেন আবার। তারপর ছাত্রদের সম্বোধন করে' বলেন—যাও, এইবার তোমরা পড়া মুখস্থ করো গিয়ে। ঘুম থেকে উঠে পড়া নেবো। একটি ভুল যেন না হয় কারো। হ'লে আর আস্ত রাখবো না।

ছাত্ররা বেরিয়ে যায়। পুঁটুলিটি মাথায় দিয়ে যোগেন পণ্ডিত জোড়া-দেওয়া বেঞ্চির উপর শুয়ে পড়েন।

পাঠশালার সামনে প্রকাণ্ড বটগাছ আছে একটি। তারই তলায় বসে' ছাত্ররা পড়াশোনা করে। ঘণ্টা-দুই পরে পণ্ডিতমশায়ের নিদ্রাভঙ্গ হয়। ছাত্রদের দিয়ে আবার বালতি করে' জল আনিয়ে তিনি চোখ-মুখ-নাক-কান ধুয়ে ফেলেন—বিশেষ করে' নাক আর কান। তাঁর নাক আর কান দুই-ই বেশ বড়। শুধু বড় নয়, লোমও আছে বেশ।

হাত-মুখ মুছে, বটগাছের একটি ডাল ভেঙে নিয়ে যোগেন পণ্ডিত পড়াতে বসেন তারপর। পড়ানো শেষ করে' যখন ওঠেন তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, ডালটি ফেটে চৌচির হ'য়ে গেছে।

এমনি প্রত্যহ।······

কিন্তু একটি ছেলে ফেল হয়নি আজ পর্যন্ত যোগেন পণ্ডিতের স্কুল থেকে। প্রতি বছরই বৃত্তি পায়। বেচালও হয়নি একটি ছেলে। কারণ, শুধু স্কুলে নয়, স্কুলের বাইরেও তাঁর প্রতাপ কম ছিল না। কারণ, কোনও ছেলে শাসন সত্ত্বেও উপর্যুপরি পড়া না পারলে কিংবা স্বভাব না বদলালে, যোগেন পণ্ডিত তার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেন, তার মা বাপকে পর্যন্ত বকেন। ছেলে খারাপ হ'বে কি? তাঁর স্কুলের প্রত্যেকটি ছেলেকে শায়েস্তা না-করা পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই।

তিনি ছেলেদের মারতেন বটে, কিন্তু ভালোও বাসতেন। কতই-বা মাইনে পান, কিন্তু তার থেকেই তিনি ভালো ছেলেদের পুরস্কার দিতেন, গরীব-ছেলেদের বই কিনে দিতেন। কারও অসুখ হ'লে, বার-বার গিয়ে খোঁজ নিতেন তার বাড়িতে। দরকার হ'লে সেবা করতেন।

সংসারে তাঁর নিজের বলতে কেউ নেই। প্রথম-জীবনে বিয়ে করেছিলেন, বাঁকুড়ায়। সেইখানেই একটা স্কুলে পণ্ডিতিও করতেন। কিন্তু পত্নী-বিয়োগ হ'লো। আর সেখানে থাকতে পারলেন না। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে এখানে চলে এলেন। এখানে পঁচিশ বছর কেটে গেছে। এখানকার স্কুলের ছেলেরাই তাঁর সব। তাদের উপর নিজের অধিকারও তাই তিনি অপ্রতিহত রাখতে চান।

কিন্তু, যুগ বদলেছে। তাঁর সাবেক-চাল আর সহ্য করতে পারছে না লোকে।

এতদিন মুখ ফুটে সাহস করে' কেউ কিছু বলতে পারছিল না, কিন্তু নূতন দারোগাবাবুর ডেঁপো ছেলেটিকে যোগেন পণ্ডিত যেদিন গো-বেড়েন করলেন, সেইদিন থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলতে লাগলো। ছ'ফুট লম্বা বলিষ্ঠ যোগেন পণ্ডিতের এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে, দারোগাবাবুও সামনাসামনি তাঁকে কিছু বলতে সাহস করলেন না। কিন্তু তিনি ছাড়লেন না। পণ্ডিতের সমস্ত দুষ্কৃতির বর্ণনা দিয়ে গ্রামের সমস্ত লোককে দিয়ে সই করিয়ে এক লম্বা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন তিনি শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে। যোগেন পণ্ডিত ঘুণাক্ষরেও কিছুই জানতে পারলেন না।

কিছুদিন পরে, দরখাস্তকারীদের মুখপাত্র দারোগাবাবুকে কর্তৃপক্ষ জানালেন যে, তদন্ত করার জন্যে জেলার ইন্‌স্‌পেক্‌টর শীঘ্রই যাবেন। হৃষ্ট হ'লেন দারোগাবাবু।

নির্দিষ্ট দিনে ইন্‌স্‌পেক্‌টার ভূতনাথ ভৌমিক এসে হাজির হ'লেন এবং দারোগাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন স্কুলে। যোগেন পণ্ডিত তখন তাঁর প্রাত্যহিক দিবা-নিদ্রা শেষ করে' আরক্ত নয়নে পড়াচ্ছেন ছেলেদের। স্কুলে গিয়েই কিন্তু ভূতনাথ ভৌমিক এমন অপ্রত্যাশিত একটা কাণ্ড করে' বসলেন যে, দারোগাবাবুর চক্ষুস্থির হ'য়ে গেল। অত বড় জাঁদরেল একটা লোক, যোগেন পণ্ডিতকে দেখবামাত্র কেঁচোটি হ'য়ে গেল যেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে' একপাশে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলো কাচুমাচু হ'য়ে। দারোগাবাবু জানতেন না যে, ভূতনাথ ভৌমিক যোগেন পণ্ডিতের প্রাক্তন ছাত্র একজন। তিনি যখন বাঁকুড়ায় ছিলেন তখন বালক ভূতনাথকে পড়িয়েছিলেন। যোগেন পণ্ডিতও কম আশ্চর্য হননি। একবার দেখেই তিনি ভূতনাথকে চিনতে পেরেছিলেন।

"আরে, ভূতো না কি। তুই এখানে হঠাৎ কি করে' এলি!"

"আমি আজকাল স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টার হয়েছি, পণ্ডিত মশায়।"

"তাই না কি! বেশ, বেশ। তা এখানে কেন? ও, ইস্কুল ভিজিট করতে এসেছিস বুঝি?"

যোগেন পণ্ডিতের হাসি আকর্ণ-বিস্তৃত হ'য়ে গেল। চোখ থেকে উপছে পড়তে লাগলো, গর্ব আর স্নেহ।

লজ্জিত ভূতনাথ ভৌমিক বললেন, "না, এমনি একটু দরকারে এসেছি। কয়েকটি কথা আছে আপনার সঙ্গে!"

"কি কথা?"

"স্কুলের ছুটি হয়ে যাক, তারপরে বলবো'খন।"

"ইস্কুলের ছুটি দিয়ে দিলেই তো হ'লো। ওরে, তোরা সব বাড়ি যা আজ। ইন্‌স্‌পেক্‌টারের অনারে ছুটি দিয়ে দিলাম তোদের। এ আমার ছাত্র জানিস? প্রণাম কর সব।"

প্রণাম করে' স্কুলের ছেলেরা বাড়ি চলে' গেল সব।

গতিক মন্দ বুঝে দারোগাবাবুও সরে' পড়লেন। যোগেন পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে একটি বাক্যালাপও করলেন না।

"তারপর, তোর খবর কি সব বল্। বিবাহ করেছিস্? ছেলে-পিলে ক'টি?"

"দুটি ছেলে।"

"বেশ, বেশ।"

নানা কথার পর অনেক ইতস্ততঃ করে' অবশেষে আসল কথাটি ভূতনাথ ভাঙলেন। দরখাস্তটিও দেখালেন। দেখিয়ে বললেন, "আমি যখন এসেছি তখন কোনও খারাপ রিপোর্ট দেবো না। কিন্তু—"

যোগেন পণ্ডিতের দিকে চেয়ে থেমে গেলেন ভূতনাথ ভৌমিক।

যোগেন পণ্ডিত স্তব্ধ হয়ে দরখাস্তখানা দেখছিলেন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি যেন। যাদের ছেলেদের জন্যে এতকাল ধরে' প্রাণপাত করেছেন তিনি, তারা তাঁর বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেছে! প্রত্যেকটি সই তাঁর পরিচিত। এদের মধ্যে অনেকে তাঁর ছাত্রও।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে যোগেন পণ্ডিত বললেন, "আমি আর এখানে থাকবো না ভূতনাথ! কালই এখান থেকে চলে যাবো।"

"কোথায়?"

"যেদিকে দু'চোখ যায়।"

ভূতনাথ যোগেন পণ্ডিতকে চিনতেন। বুঝলেন তাঁর কথার নড়চড় হবে না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে তিনি বললেন, "একটা কথা বলতে সাহস হচ্ছে না পণ্ডিত-মশায়, যদি অভয় দেন, বলি।"

"কি, বল্।"

"আপনি এখান থেকে চলে যাওয়াই যদি ঠিক করে' থাকেন, তাহলে আমার

বাড়িতে চলুন না, আমি আপনাকে মাথায় করে' রাখবো। আমার ছেলে দুটির ভার আপনি নিন, তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত হই। টুরে-টুরে ঘুরে বেড়াতে হয় আমাকে—"

একটু চুপ করে থেকে যোগেন পণ্ডিত বললেন, "বেশ, তাই হবে!"

তার পরদিন খুব ভোরে হরিপুর ছেড়ে চলে যাবার আগে যোগেন পণ্ডিত গ্রামের সীমান্তে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলেন গ্রামটার দিকে।

তারপর চলে গেলেন।

জন বুল

জন বুল থাকতেন বিলেতে আর বিপিন মল্লিকের বাড়ি ছিল বাঙলা দেশে। একজনের লণ্ডনে আর একজনের কোলকাতায়। তবু দু'জনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল এবং সূত্রটা ছিল পাটের। পাটের কারবারী ছিলেন দু'জনেই। বিপিন মল্লিক এখান থেকে পাট কিনে চালান দিতেন এবং জন বুল সেখানে সেটা বেচতেন। লাখ লাখ টাকার কারবার চলতো। দু'জনের কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।

হঠাৎ একদিন জন বুলের খেয়াল হলো, বাঙলা দেশটা বেড়িয়ে আসা যাক। তাঁর কাছে বাঙলা দেশ মানে অবশ্য কোলকাতা শহর। চিঠি লিখলেন বিপিন মল্লিককে—মাই ডিয়ার মিস্টার মল্লিক, আমি···তারিখে কোলকাতা পৌঁছুচ্ছি,···নামক স্টীমারে। একটা ভালো হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা কোরো এবং অসুবিধা না হয় স্টীমার-ঘাটে এসো। ব্যবসাটা আরও বাড়ানো সম্ভব কি না সেটাও দেখবো। তোমাদের শহরটাও ·দেখবো। যা যা ব্যবস্থা করা দরকার তা কোরো। তুমি তো আমাকে চেনো না, আমাদের আপিসের মিস্টার ষ্টিফেনকে সঙ্গে করে' এনো, তাহলে আর কোনও অসুবিধা হবে না। মিস্টার ষ্টিফেনকেও আমি চিঠি লিখলাম। তোমার যদি কোনও অসুবিধা হয় তাহ'লে আসবার দরকার নেই। মিস্টার ষ্টিফেনের সহায়তায় আমিই তোমাকে খুঁজে বার করবো। আশা করি ভালো আছ। আমার শুভেচ্ছা নাও। ইতি—

ভবদীয়

জন বুল।

নির্দিষ্ট দিনে জন বুল এসে পড়লেন। বিপিন মল্লিক এবং মিস্টার ষ্টিফেন ষ্টীমার-ঘাটে ছিলেন। বিপিন মল্লিকের মনে মনে যথেষ্ট ভয় ছিল—কি জানি কি রকম লোক হবে! খাঁটি বিলিতী সাহেব, তাছাড়া অত বড় লোক! বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঠনঠনের কালীতলায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে' প্রণাম করে' মাকে অনেক কাকুতি-মিনতি জানিয়ে এসেছিলেন তিনি। জন বুলের সঙ্গে আলাপ হয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। চমৎকার লোক! বেশ হাসি-খুশি, একটু দেমাক নেই, কথা বেশ স্পষ্ট, বুঝতে কষ্ট হয় না একটুও। এইটেই তো ভয় ছিল মল্লিক মশায়ের সব চেয়ে বেশি—বিলিতী সায়েব

হাঁউ-হাঁউ করে' কি বলবে, বোঝাই যাবে না হয়তো! জন বুলের কথা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি। সমস্ত বোঝা যাচ্ছে।

স্টীমার থেকে নেমে জন বুল ট্যাক্সিতে উঠলেন। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। অসংখ্য লোক, সবাই কর্মব্যস্ত, ঘর্মাক্ত-কলেবর।

—খুব পরিশ্রমী তো এখানকার লোক দেখছি, কতক্ষণ কাজ করে?

মল্লিক বললেন,—দিবারাত্রিই খেটে চলেছে।

—তাই নাকি? বাঃ!

মুগ্ধ নয়নে দেখতে দেখতে চললেন জন বুল। মনে হতে লাগলো, খুব ভুল একটা ধারণা ছিল তাঁর। ট্যাক্সি ছুটে চলেছে।

জন বুল আবার হঠাৎ জিগ্যেস করলেন,—কি খায় এরা?

—ডাল ভাত তরকারি। তাও পেট ভরে' পায় না সব সময়ে—আবার উত্তর দিলেন মল্লিক একটু হেসে।

—আই সি! ছোট্ট একটু শিস দিয়ে চুপ করে' গেলেন জন বুল। তারপর ষ্টিফেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি একটা জিগ্যেস করলেন চুপি-চুপি।

—ও নো, মোটেই না। মাথা নেড়ে ষ্টিফেন বললেন। মল্লিক ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না ঠিক। চুপ করে রইলেন।

হোটেলে পৌঁছে জন বুল বললেন,—অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার মল্লিক। আমি এখন খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করবো একটু। তারপর যাবো আপিসে। আপিসের কাজকর্ম সেরে বেলা পাঁচটা নাগাদ বেড়াতে বেরুবো। মিস্টার ষ্টিফেনের আজ কোথায় যেন একটা পার্টি আছে। বিকেলে তিনি যেতে পারবেন না আমার সঙ্গে। আপনি আসতে পারবেন কি?

—হাঁ, খুব পারবো।

—অনেক ধন্যবাদ।

ঠিক পাঁচটার সময় একটা ট্যাক্সিতে চড়ে' জন বুল এবং বিপিন মল্লিক শহর পরিদর্শন করতে বেরুলেন। মনুমেণ্ট, চৌরঙ্গী, লাটসাহেবের বাড়ি, মিউজিয়ম প্রভৃতি নানা জিনিস দেখতে দেখতে অবশেষে ধর্মতলায় পৌঁছুলেন তাঁরা এসে। জন বুল হঠাৎ প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা, কিছুদূর অন্তর অন্তর ওই যে আলো দিয়ে আয়না

দিয়ে সাজানো ছোট ছোট দোকান রয়েছে—কি ওগুলো? দোকানদার দেখছি কোথাও পুরুষ, কোথাও স্ত্রীলোক, কোথাও বালক।

মল্লিক বললেন, ওগুলো পানের দোকান।

—পান! সে আবার কি? মিষ্টান্ন কোনও রকম? সবাই তো কিনে কিনে খাচ্ছে দেখছি।

—না, মিষ্টান্ন নয়, তবে খেতে চমৎকার। আপনি খাবেন?

—বেশ তো।

একটা ভালো পানের দোকানের কাছে ট্যাক্সি থামিয়ে মল্লিক নেমে গেলেন।

—একটা ভালো পান দাও তো, বেশ মসলা-টসলা দিয়ে দিও, সাহেব খাবে।

বেশী দাম দিয়ে রুপোর তবক দেওয়া দু'খিলি পান জন বুলকে এনে দিলেন মল্লিক।

—দুটোই খেয়ে ফেলবো? একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন সাহেব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুটোই খেয়ে ফেলুন। সোৎসাহে বললেন বিপিন মল্লিক।

জন বুল দু'খিলি পানই মুখে পুরে চিবুতে লাগলেন। ট্যাক্সি চলতে শুরু করলো আবার। একটু পরেই সাহেবের সাদা কস বেয়ে পানের ধারা গড়াতে লাগলো। সাহেব রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। মুছে রুমালের দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন তিনি।—এ কি, রক্ত না কি—মল্লিক, একি কাণ্ড!

—ও কিছু নয়, পানের পিক। আপনি চিবিয়ে যান।

জন বুল চিবুতে লাগলেন। কিন্তু একটু পরেই কি রকম যেন হতে লাগলো তাঁর। মাথাটা বনবন করে' ঘুরছে, বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে, দম বন্ধ হ'য়ে আসছে যেন। সর্বনাশ, এ কি হলো!

—মল্লিক, আমি খুব অসুস্থ বোধ করছি। হোটেলে ফিরে চলো। ওয়াক্ ওয়াক্।

বমি করে ফেললেন জন বুল। দামী স্যুটে পানের ছোপ লেগে গেলো চারদিকে। কস বেয়ে পানের লাল রং ঝরছে—চোখ কপালে উঠেছে। ভয় পেয়ে গেলো মল্লিক।

—হোটেলে চলো শিগ্‌গির।

হু-হু করে ট্যাক্সিখানা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো। ভীত মল্লিক জন বুলকে আস্তে আস্তে ধরে' ধরে' নামালেন ট্যাক্সি থেকে। তারপর কোনক্রমে লিফ্‌টের সাহায্যে নিয়ে গেলেন তাঁকে ঘরে।

দোতলায় সাহেবের জন্য আলাদা একটা ঘর ঠিক করাই ছিল। সাহেব ঘরে ঢুকে

ধপাস করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। তারপর বিহ্বল দৃষ্টিতে মল্লিকের দিকে চেয়ে বললেন,—একজন ডাক্তার ডাকো মল্লিক! আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না।

রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন মল্লিক মশাই। হলো কি! পানে দোক্তা-টোক্তা ছিল না কি? সত্যিই যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে তো সর্বনাশ! পুলিস-কেসে পড়তে হবে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে ছুটলেন তিনি।

ডাক্তার নিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে ফিরলেন। এসে দেখেন, জন বুল মদ খাচ্ছেন। হুইস্কির বোতলের ছিপি খোলবারও তর সয় নি তাঁর। বোতলের মুখটা ঠুকে ভেঙেছেন। আধ বোতল শেষ করে ফেলেছেন।

মল্লিককে দেখে তাঁর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো।

—এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। আর কোনও ভয় নেই।

ডাক্তারবাবু তবু তাঁকে পরীক্ষা করলেন। তিনিও বললেন—না, আর কোনও ভয়ের কারণ নেই। ফী নিয়ে চলে গেলেন তিনি।

তিনি চলে যাবার পর জন বুল বললেন,—একটা সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেলো। আমি এসে থেকেই ভাবছিলাম।

—কি?

—ভাবছিলাম, তোমরা এত খাটো কিসের জোরে। স্টিফেন বললে, আমাদের মতো যখন তখন মদ খাওয়া নিয়ম নয় তোমাদের। আমি ভাবছিলাম, কিসের জোরে খাটছো তাহলে! এখন দেখছি—ও বাবা—আমার মতো পাঁড় মাতালও যা খেয়ে ঘায়েল হয়ে পড়ে, তা অনবরত চিবুচ্ছ তোমরা! গড্!

জন বুল আর এক চুমুক নির্জলা হুইস্কি খেয়ে স্মিত মুখে মল্লিকের মুখের দিকে চাইলেন।

সুরবালা

তখন মেডিকেল কলেজে পড়ি। আমি আমার এক সহপাঠির বাসায় থাকিতাম। বাসাটি একটি গলির মধ্যে। খুব ছোট বাসা। একটি খোলা ছাদ ছিল। সেই ছাদে বসিয়াই আমরা পড়াশোনা করিতাম। আমাদের বাসার ঠিক পাশেই একটা খোলার ঘর ছিল। আমরা যখন আসিয়াছিলাম তখন ঘরটা ছিল খালি, কিন্তু কিছুদিন পরেই এক ভাড়াটে আসিয়া জুটিল এবং আমরা বিপদে পড়িয়া গেলাম। প্রথম দিন তেমন কোনও গোলমাল হইল না, গোলমাল শুরু হইল দ্বিতীয় দিন হইতে। আমরা সন্ধ্যার সময় পড়িতে বসিয়াছি, হঠাৎ সেই খোলার ঘরে চীৎকার চেঁচামেচি শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, একটি স্ত্রীলোককে কে যেন মারিতেছে। আলিসার উপর ঝুঁকিয়া ব্যাপারটা কি অনুমান করিবার চেষ্টা করিলাম, কিছুই বুঝা গেল না। চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ কোনও জবাব দিল না। নীচে নামিয়া গেলাম এবং গিয়া দেখিলাম, সামনের কপাট ভিতর হইতে বন্ধ। অনেকক্ষণ কড়া নাড়িবার পর একটি প্রৌঢ়-গোছের লোক বাহির হইয়া আসিলেন।

—"ব্যাপার কি মশাই? এত হাল্লা কিসের?"

—"ও কিছু নয়, আমার ভাই বিপিন তার বউকে ঠ্যাঙাচ্ছে।"

—"ঠ্যাঙাচ্ছে! কেন?"

—"মদ খেয়ে, আবার কেন। রোজই এই কাণ্ড করে বোম্বেটেটা।"

—"আপনারা কিছু বলেন না?"

—"বলি বই-কি। এখনি একটা থাপ্পড় দিয়ে এলুম, থেমে যাবে এখুনি, বউমা ঘরে খিল দিয়েছেন।"

কি আর বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর চলিয়া আসিলাম। সেদিন আর পড়ায় মন বসিল না।

তাহার পরদিনও ঠিক ওই কাণ্ড। তাহার পরদিনও। মহা মুশকিলে পড়িয়া গেলাম আমরা। সামনেই পরীক্ষা। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় যদি এমন করিয়া পড়া নষ্ট হয় তাহা হইলে তো ফেল হইয়া যাইব। তাছাড়া একটা মাতালের হাতে

প্রত্যহ এমনভাবে একটি স্ত্রীলোক নির্যাতিত হইতেছে, ইহা সহ্য করাও তো শক্ত। কিন্তু, কি যে করা যায় তাহা আমাদের মাথায় আসিল না।

একদিন আমরা সকালে হাসপাতালে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছি, এমন সময় সেই বিপিনের সহিতই দেখা হইয়া গেল। রোগা পাতলা চেহারা, রাস্তায় দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছে। মনে হইল, উহাকে গিয়া একটু বুঝাইয়া বলি, স্ত্রীকে প্রত্যহ এমনভাবে নির্যাতন করাটা কি ভাল? বুঝাইয়া বলিলে হয়তো লোকটা সুপথে ফিরিবে। আগাইয়া গেলাম এবং যতদূর ভদ্রভাবে ব্যাপারটা বলা সম্ভব বলিলাম। বিপিন ঘাড় বাঁকাইয়া আমাদের সমস্ত কথা শুনিল। তাহার পর বলিল, "আমার স্ত্রীকে আমি মারি তাতে আপনাদের কি?"

ইহার উত্তরে তাহার গালে ঠাস্ করিয়া একটি চড় মারা ছাড়া আর কিছু করা যায় না, কিন্তু তাহা করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমরা গলি হইতে বাহির হইয়া বড়-রাস্তায় গিয়া ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলাম, কি করিয়া লোকটাকে শায়েস্তা করা যায়। আমার বন্ধু শশাঙ্ক বলিল যে বিপিনকে একদিন রাস্তায় ধরিয়া মার দেওয়াই উচিত, আমারও তাহাই ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু পাড়ায় প্রতিবেশীর সহিত ছোটলোকের মতো মারামারি করাটা অশোভন হইবে ভাবিয়া পিছাইয়া যাইতেছিলাম।

—"সেলাম হুজুর!"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, দীর্ঘকায় একটি লোক আগাইয়া আসিতেছে। কাছে আসিতে চিনিতে পারিলাম। কলকাতার গুণ্ডা একজন। ছোরা মারামারি করিয়া মেডিকেল কলেজে গিয়াছিল। উহার বাম বাহুর উপর ছোরার আঘাত বেশ জোরে লাগাতে কিছুদিন হাসপাতালে ছিল। সেই সময় আমি উহার ঘা ড্রেস করিতাম। মাস-দুই পূর্বে হাসপাতাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

—"তোমার হাত বেশ ভাল হয়ে গেছে তো?"

—"হাঁ, হুজুর!"

তাহার পর ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, সে আমাদের জন্য একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া দিবে কি? তাহার এক দোস্তের ট্যাক্সি মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। আমরা হুকুম করিলেই সে আমাদের কলেজে পৌঁছাইয়া দিবে।

আমি বলিলাম, "না, তার দরকার নেই, তার চেয়ে তুমি যদি একটি কাজ করে' দিতে পারো আমাদের খুব উপকার হয়।

—"ফরমাইয়ে!"

বিপিনের সব কথা তাকে বলিলাম।

শশাঙ্ক বলিল, "লোকটার জ্বালায় আমাদের পড়াশোনা বন্ধ হ'য়ে গেছে। ওকে যদি শিক্ষা দিয়ে দিতে পারো, ভারি ভাল হয়।"

"য়হ্ কৌন বড়ী বাত হ্যায়। চলিয়ে।"

আমরা তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। বিপিন তখনও রাস্তায় দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছিল। দূর হইতে আমরা বিপিনকে চিনাইয়া দিলাম।

গুণ্ডাটা একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর গোঁফে তা দিয়া বলিল, "ঠিক হ্যায়।"

সেদিন সন্ধ্যার সময়ও বিপিনের স্ত্রীর আর্তনাদ আমাদের পাড়াকে সচকিত করিয়া তুলিল। আমরা ভাবিলাম, গুণ্ডাটা তাহা হইলে বোধ হয় কিছুই করিতে পারে নাই। তাহার পরদিন কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙিল। বুঝিলাম, নিশ্চয় কিছু করিয়াছে সে। কারণ, খোলার বাড়ি একেবারে চুপচাপ, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নাই। সমস্ত রাত কাহারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। পরদিন আমরা সকালে যখন কলেজে যাইবার জন্য বাহির হইতেছি, দেখিলাম, বিপিন রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের দেখিয়া মিটমিট করিয়া চাহিতে লাগিল। কিছু বলিল না। হাসপাতালে গিয়া দেখি, সেই গুণ্ডা কলেজ-গেটের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের জন্যই সে অপেক্ষা করিতেছিল। আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পাশের বাড়িতে কাল কোনও গোলমাল হইয়াছিল কি না?

আমরা সানন্দে উত্তর দিলাম—"না, একেবারে গোলমাল হয়নি। কি করলে বল তো?"

—"পকড়কে পিটা!"

সে যাহা বলিল তাহা এই:

আমরা বিপিনকে চিনাইয়া দিবার পর সে সমস্ত দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিল, বিপিন সমস্ত দিন কোথায়-কোথায় যায়, কি-কি করে। দেখিল, বিপিন একটা সদাগরি

আপিসে চাকরি করে। দশটার সময় আপিসে যায়। আপিস হইতে তাহাকে বড়বাজারে একটা গোলায় গিয়া মাল ওজন করাইতে হয়। তিনটা নাগাদ সে সেখান হইতে ফিরিয়া আসে। বাড়ি ফেরে পাঁচটার পর। পরদিন গুণ্ডাটা তাহার বাড়ি ফিরিবার পথে ওত পাতিয়া বসিয়া রহিল। কাছাকাছি আসিতেই তাহাকে গিয়া বলিল—'তোমার বড়সাহেব তোমার সহিত কথা বলিতে চান, এসো।' বিপিন বলিল, 'কোথায় বড়সাহেব ?' গুণ্ডাটা উত্তর দিল, 'ওই যে ট্যাক্সিতে বসিয়া আছেন।' একটু দূরে তাহার দোস্তের সিডানবডি ট্যাক্সিখানা দাঁড়াইয়া ছিল, সেইটা দেখাইয়া দিল। দ্বিতীয় কথা না বলিয়া বিপিন সেদিকে আগাইয়া গেল। গাড়ির ভিতর তাহার আর-এক দোস্ত বসিয়াছিল।

বিপিন কাছাকাছি আসিতেই সে চাপা-গলায় ইংরেজীতে বলিল, 'কাম্ ইন।' বিনা দ্বিধায় বিপিন গাড়ির ভিতরে ঢুকিতেই তাহার দ্বিতীয় দোস্ত তাহাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পর তাহাকে লইয়া ট্যাক্সি হাঁকাইয়া তাহারা চলিয়া গেল তিন নম্বর ব্রিজে। সেখানে গিয়া বেশ করিয়া চাব্‌কাইল তাহাকে। তাহার পর বলিয়া দিল যে, ফের যদি সে মদ খাইয়া আসিয়া বাড়িতে হাল্লা করে, তাহাকে খুন করিয়া ফেলিবে।

আমরা খুব আনন্দিত হইলাম। আমাদের উপকার করিতে পারিয়াছে জানিয়া গুণ্ডাটাও খুব খুশী হইল এবং সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

উপরোক্ত ঘটনার পর প্রায় মাস-দুই কাটিয়া গিয়াছে। পাশের বাড়ি হইতে একদিনও আর কান্নাকাটি শোনা যায় নাই। আমরা মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিলাম—যাক্ লোকটা বোধ হয় মারের ভয়ে ঠিক হইয়া গেল। বিপিনের দাদা নবীনের সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। একদিন রাস্তায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিপিনবাবু আজকাল মদ-টদ খাওয়া ছেড়েছেন মনে হচ্ছে।" নবীনবাবু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"ছাড়েনি, তবে কমিয়েছে।"

—"কই, একদিনও তো আর গোলমাল শুনিনি ?"

—"শোনেন নি, কারণ বউমা আর চেঁচামেচি করেন না। পরশুই তো এমন নির্দয় মেরেছে যে, আমি গিয়ে না পড়লে মেরেই ফেলতো বোধ হয়।"

—"এত মার খেয়েও উনি চুপ করে থাকেন ?"

—"তাই তো থাকছেন ইদানীং।"

কি যে বলিব ভাবিয়া পাইলাম না।

—"আচ্ছা, উনি মদ খেয়ে স্ত্রীকে মারেন কেন, বলুন তো?"

—"তখন ভূত চাপে ঘাড়ে একটা। নেশা ছুটে গেলে স্ত্রীর পায়ে ধরে' কাঁদেও আবার। ওকি একটা মানুষ মশাই? জানোয়ার। আচ্ছা, চলি।"

নবীনবাবু পাশের গলিটায় ঢুকিয়া গেলেন। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। সমস্ত ব্যাপারটারই রং বদলাইয়া গেল যেন। বিপিনের স্ত্রী সুরবালাকে মাঝে-মাঝে ছাত হইতে দেখিয়াছি। রোগা পাতলা চেহারা। আধময়লা একটা কাপড় পরিয়া, মাথায় আধঘোমটা টানিয়া সারাদিন ঘরের কাজ করিয়া বেড়ায়। বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘর মোছে, রান্না করে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত জায়ের সেবাও করে সে-ই। ঘরের ভিতর হইতে 'সুরবালা', 'সুরবালা' বলিয়া তিনি প্রায়ই ডাকাডাকি করেন শুনিতে পাই।

মার খাইয়া কাঁদে না। অবাক্ কাণ্ড!

কিছুদিন পরে আবার একদিন সুরবালার কান্না শুনিতে পাইলাম। তখন কলিকাতায় হিন্দু-মোস্লেম দাঙ্গা লাগিয়াছে। সেকালের দাঙ্গা আজকালকার মতো এমন ভয়াবহ হইত না। আমরা স্টেথোস্কোপ ঝুলাইয়া রাস্তায় যাতায়াত করিতাম, আমাদের কেহ কিছু বলিত না। সেদিনও আমরা ছাতে বসিয়া পড়াশোনা করিতেছিলাম। তখন রাত্রি প্রায় দশটা হইবে। অনেকদিন পরে সুরবালার কান্না শুনিয়া উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম। আলিসায় ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি!" নবীনবাবু ঘরের ভিতর হইতে উঠোনে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—"একবার নীচে নেমে আসুন তো!"

তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলাম। মনে হইল, আজ বোধ হয় প্রহারের মাত্রা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তাই সুরবালা কাঁদিতেছে। ডাক্তারি সাহায্য প্রয়োজন বলিয়াই নবীনবাবু আমাদের বোধ হয় ডাকিতেছেন। নামিয়া গিয়া কিন্তু যাহা শুনিলাম, তাহা একেবারে অন্যরকম।

নবীনবাবু বলিলেন, "মহা মুশকিলে পড়েছি মশাই। বিপিন দিন-পাঁচেক আগে বড়বাজারের সেই গোলায় গিয়ে মাল ওজন করাচ্ছিলো। ওজন-দাঁড়ির লোহার ভারী পাল্লাটা ছিঁড়ে গিয়ে তার পায়ে পড়ে' পায়ের একটা হাড় ভেঙ্গে গেছে। সেইখান থেকেই তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভরতি করে

দিয়েছে তাকে তার আপিসের লোক। আমিও গিয়ে দেখে এসেছি তাকে। কিন্তু বাড়িতে আমি আর খবরটি ভাঙিনি। ভাঙলেই বৌমা দেখতে যেতে চাইবেন। চারদিকে এখন দাঙ্গা হচ্ছে, তাছাড়া রোজ রোজ গাড়ি ভাড়া করে' যাওয়া-আসা কি সোজা খরচ মশাই? ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিলাম তাই। বাড়িতে এসে বলেছিলাম, আপিসের কাজে বিপিন বাইরে গেছে, ফিরতে দেরি হবে কিছু। মাঝে-মাঝে ওকে মাল কিনতে বাইরে যেতেও হয়। এদিকে হয়েছে কি, বৌমার ভাই সুরেন আজ বর্ধমান থেকে এসেছে। সে এসে সোজা বিপিনের আপিসে গেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে শুনেছে, বিপিন হাসপাতালে। হাসপাতালে গিয়ে সে পাঁচটার পর বিপিনের সঙ্গে দেখা করেছে। তারপর হাসপাতাল থেকে সোজা এসেছে এখানে। আমি বাড়িতে থাকলে টিপে দিতুম তাকেও। কিন্তু আমি বাড়িতে ছিলাম না। বৌমার কাছে কথাটি ফাঁস করে' ফেলেছে সুরেন। বউমা কেঁদে-কেটে অনর্থ করছেন। বলছেন, তাকে নিশ্চয় মুসলমান গুণ্ডায় ছুরি মেরেছে, আমরা আসল ব্যাপারটা লুকোচ্ছি তার কাছ থেকে। বলছেন, এখনই আমাকে নিয়ে চলুন একবার, আমি শুধু একটিবার দেখবো তাকে। এই রাত্তিরে এখন কি করি বলুন তো, এখন কি হাসপাতালে ঢুকতে দেবে?"

আমরা দুইজনেই তখন মেডিক্যাল ওআর্ডে ছিলাম। সার্জিকাল ওআর্ডের খবর রাখিতাম না। তাই বিপিনবাবুর কোনও খবরই পাই নাই।

শশাঙ্ক উদ্দীপ্ত-চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "চল্ না, আমরা সঙ্গে করে' নিয়ে যাই। আমরা গেলে চুপচাপ দেখাটা করিয়ে দিতে পারবো, উনি যদি কোনও গোলমাল না করেন।" আমিও রাজী হইয়া গেলাম। নবীনবাবু একটু আমতা-আমতা করিতেছিলেন, কিন্তু আমরা দুইজন দায়িত্ব লওয়াতে শেষটা তাঁহাকেও মত দিতে হইল।

একটা গাড়ি ডাকিয়া সুরেন ও সুরবালাকে লইয়া শশাঙ্ক ও আমি রাত্রি দ্বিপ্রহরে বাহির হইয়া পড়িলাম। সুরবালা সমস্ত পথটা মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেল। আমরা তাঁহাকে বারম্বার বুঝাইয়া বলিলাম যে ওআর্ডের ভিতর ঢুকিয়া তিনি যেন কান্নাকাটি না করেন। গোলমাল করিলে বিপদ হইবে।

হাসপাতালে গিয়া দেখিলাম; নার্স এবং ও. ডি. (অফিসার অন ডিউটি) দুইজনেই আমাদের পরিচিত। সব কথা খুলিয়া বলাতে আমাদের খাতিরে তাঁহারা সুরবালাকে

ওআর্ডে ঢুকিবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু বারবার করিয়া বলিয়া দিলেন, যেন কোনও গোলমাল না হয়। আমরাও সুরবালাকে বারবার সে-কথা বলিয়া দিলাম। কিন্তু সুরবালা ওআর্ডে ঢুকিয়া কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া তাহার স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেক কষ্টে তাহাকে সেদিন হাসপাতাল হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারিয়াছিলাম। সুরবালার অশোভন আচরণের জন্য সেদিন ও.ডি.-র নিকট আমরা বকুনি খাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু কেন জানি না, সুরবালার উপর সেদিন আমাদের রাগ হয় নাই। আজও তাহার সেই অশ্রুসজল মুখটা মনে আঁকা আছে।

বছর-দশেক পরে। আমি তখন মফস্বলের এক হাসপাতালে ডাক্তার। মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে সমস্ত দেশ তখন আলোড়িত। অসহযোগী সত্যাগ্রহীদের মাথায় পুলিসের লাঠি ক্রমাগত পড়িতেছে এবং আমরা ক্রমাগত কাটা ঘায়ে টিঙ্কার আইয়োডিন লাগাইয়া ফাটা-মাথা ব্যাণ্ডেজ করিয়া চলিয়াছি।

একদিন একদল আহত সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিস হাসপাতালে লইয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে দেখি, বিপিন! পরনে ময়লা খদ্দর। মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে।

—"আরে, আপনি এখানে কি করে' এলেন?"

—"মদের দোকানে পিকেটিং করছিলাম।"

—"আপনি মদের দোকানে পিকেটিং করছিলেন?"

—"হ্যাঁ।"

তাহার অকম্পিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিলাম, বিপিন বদলাইয়া গিয়াছে। বন্দীর দলকে লইয়া পুলিস চলিয়া গেল। তাহার পরদিন আর একদল আসিল। তাহাদের মধ্যে ছিল সুরবালা। পুলিসের মার খাইয়া সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।

নতুন সিংহ

"এবার পুজো কবে ঠাকুমা ?"

সাত-বছরের খোকন এসে জিজ্ঞেস করল তার ঠাকুমাকে। ঠাকুমা চোখে চশমা দিয়ে সেলাই করছিলেন কি যেন একটা। সেলাই থেকে চোখ না তুলেই জবাব দিলেন—

"এবার পুজো হবে না।"

"হবে না ? কেন !"

"মা দুর্গা আসবেন না।"

"আসবেন না ? কেন !"

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না খোকন! পুজোর সময় কত জামা কাপড় হবে, থিয়েটার হবে পাড়ায়—মা দুর্গা আসবেন না, তা' কি হতে পারে কখনও।

"মা দুর্গা আসবেন না ? বল কি তুমি ঠাকুমা।"

"কিসে চড়ে আসবেন তিনি ?"

"কেন, সিংহে চড়ে !"

"মাংসর যা দাম আজকাল, সিংহ খাবে কি ? মা দুর্গার অত পয়সা নেই।"

"আমরা চাঁদা দেব সবাই তো"

"কত চাঁদা দিতে পারিস্ তোরা ! মা দুর্গার সিংহ কি যে-সে সিংহ, অনেক মাংস চাই তার"

"কত ?"

"অনেক। মা দুর্গা হলেন শক্তি, তাঁকে ব'য়ে আনে যে সিংহ সে কি যে-সে সিংহ ?"

কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে' দাঁড়িয়ে থেকে খোকন বললে, "মা দুর্গা এরোপ্লেনে আসতে পারেন না ?"

"না। সিংহ ছাড়া আর কিছুতে চড়েনই না"

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খোকন।

মহা মুশ্‌কিল তো!

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একছুটে চলে গেল সে পাশের ঘরে।

ঠাকুমা মুখ টিপে হাসলেন একটু।

আধঘণ্টা পরে ফিরে এল খোকন।

"ঠাকুমা, আমি দুর্গাকে পিঠে ক'রে বয়ে আনব। এই দেখ সিংহ সেজেছি!'

ঠাকুমা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন খোকন কালি দিয়ে প্রকাণ্ড গোঁফ করেছে, ঝাঁকড়া উলের টুপিটা মাথায় পরে' কেশর করেছে, হামাগুড়ি দিয়ে ঘাড়টা উঁচু করে রেখেছে বীর-বিক্রমে।

ঠাকুমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই খোকন বলে উঠল—গাঁক্—গাঁক্—গাঁক্!

হেসে ফেললেন ঠাকুমা।

পরমুহূর্তে স্নেহ উথলে উঠল তাঁর দুই চোখে! বললেন, "হ্যাঁ, তুই যদি মা শক্তিকে পিঠে করে' বয়ে আনতে পারিস্ নিশ্চয় তিনি আসবেন।"

উৎসাহিত হ'য়ে খোকন বললে, "আমাকে খেতে দিতে তো কোন খরচই লাগবে না, নয় ঠাকুমা? আমি তো ঘরেই খাব।"

"তাতো ঠিকই"

আবার সেলায়ে মন দিলেন তিনি।

"আচ্ছা ঠাকুমা, মা দুর্গাতো কৈলাসে থাকেন, না? কৈলাস কোথায়?"

"হিমালয় পাহাড়ে"

"অনেক উঁচুতে?"

"হ্যাঁ"

"অনেক, উঁচুতে?"

"হ্যাঁ"

"তাহলে সেখানে যাব কি ক'রে আমি?"

"ভেবে চিন্তে উপায় বার করলেই হবে একটা। এখন তুমি একটু শোও দেখি।"

নিজের পাশে টেনে নিয়ে শোয়ালেন তাকে।

"আচ্ছা ঠাকুমা—"

"একটি কথা না, আগে ঘুমোও, তারপর কৈলাসে যাবার ব্যবস্থা করা যাবে"

খোকন চুপটি ক'রে শুয়ে রইল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে, অরণ্যের পর অরণ্য পার হয়ে সে চলেছে মা দুর্গাকে আনতে। সত্যিই যেন সিংহ হ'য়ে গেছে সে। ঘাড়ে গজিয়েছে কেশর, চোখে জ্বলছে আগুন, গায়ে হয়েছে অসীম শক্তি। অরণ্য পর্বত লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে সে। সামনে কোনও বাধা এলেই সিংহগর্জনে ডাক ছাড়ছে—গাঁক্, গাঁক্, গাঁক্।

অসম্ভব গল্প

অভয় হঠাৎ যখন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তখন তার বাড়ির লোকেরা ছাড়া আর সবাই যেন খুশীই হ'ল মনে মনে ; পাড়ার থিয়েটার পার্টিতে অভয় অভিনয় করত, তারা অবশ্য দুঃখিত হ'ল খুব। কারণ চমৎকার অভিনয় করত অভয়। নূতন একটা নাটকে গিয়াসুদ্দিন বলবনের ভূমিকা নিয়েছিল সে। পাড়ার অধিকাংশ লোকেই কিন্তু ভাবলেন—ঠিক হয়েছে, যেমন বাহাদুরি করতে যাওয়া। পূর্ববঙ্গে মুসলমানরা যখন হিন্দুদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করছে, তখন উনি এখানকার মুসলমানদের ওপর দরদ দেখিয়ে তাদের সভায় খাবার বিলি করতে গেছেন। গভর্নমেণ্ট তো পুলিস পাহারা দিয়ে ওদের ষোড়শোপচারে পুজো করছেনই, তোর আবার বাহাদুরি করে' পুলিসের চোখ এড়িয়ে সেখানে খাবার দিতে যাওয়া কেন? ওসমানের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়িস বলেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে? পাগল না ক্ষ্যাপা। ওরা যে কি ভয়ানক জাত তা' কি অজানা আছে কারও? পাড়ার অধিকাংশ লোকেই প্রকাশ্যে অথবা গোপনে এই অভিমত ব্যক্ত করলেন। অভয় যেদিন বাড়ি ফিরল না সেদিন সবাই ভাবলে মুসলমান গুণ্ডার ছোরার ঘায়ে শেষ হয়ে গেছে ছোকরা! হয় তো পুঁতে ফেলেছে লাশটা, কিংবা ফেলে দিয়েছে কোথাও, ড্রেনে, পুকুরে, নয়ত গঙ্গায়।

...কাগজে কাগজে নিরুদ্দিষ্ট অভয়ের ছবি বেরুল যথারীতি। পুরস্কার ঘোষণা করে অভয়ের বাবা বেতারে আর কাগজের অফিসে ঘুরলেন, সন্ধান করলেন থানা এবং হাসপাতালে, কিন্তু অভয়ের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। অভয় আর ফিরল না। পাড়ার অভিজ্ঞ লোকেরা, বিশেষ করে কোটপ্যাণ্ট পরা সেই সব চাকুরের দল, যারা ইংরেজ আমলের পরাধীনতার মোহে এখনও মুগ্ধ, 'স্টেট্‌সম্যান' ছাড়া অন্য কাগজ পছন্দ হয় না যাঁদের, বাইরে তাঁরা মনে মনে অভিজ্ঞ মুচকি হেসে বাইরে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন অভয়ের বাবাকে।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের যে গ্রামে দারোগার সামনে হিন্দু নরনারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়ে গেছে, সেই গ্রামে যে ঘটনাটা ঘটল তার খবর কোন কাগজেই প্রকাশিত হল না। এসব খবর নাকি পাকিস্তানী খবরের কাগজে বেরোয়ও না।

● তৃতীয় শতক ●

মুসলমানের মুখোশ পরা সেই পিশাচ দারোগাটা রাত্রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছিল বাইরের ঘরে। হ্যাঁ, বেশ নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে একাই শুয়েছিল লোকটা, ভয় আর কাকে করবে, সব কাফের তো শেষ হয়ে গেছে। রক্তের দাগ পর্যন্ত ধুয়ে ফেলা হয়েছে। চাঁদ হাসছিল আকাশে। গভীর রাত্রি। খোলা জানালা দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া ঢুকছে। আরামে নাক ডাকাচ্ছিল দারোগা।

জানালা দিয়ে টপ্ করে' ঘরে লাফিয়ে ঢুকল কে যেন। মুখে ঘন কালো গোঁফদাড়ি, হাতে শানিত ছোরা। ঘরে ঢুকেই সে নিমিষের মধ্যে সেই ঘুমন্ত দারোগার বুকে চড়ে বসল। টুঁটি চেপে ধরল বাঁ হাতের বজ্রমুষ্টি দিয়ে।

আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল ভয়ার্ত দারোগা।

"কে, কে তুমি—"

"আমি দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন, ইসলাম ধর্মের মাথা হেঁট করেছ তুমি কাপুরুষ। তোমাকে শাস্তি দিতে এসেছি—"

পরমুহূর্তে শানিত ছোরা আমূল বসে গেল দারোগার বুকে। তারপরই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে, তার গোঁফদাড়ি খুলে গেল। ছুটে এল দারোগার রক্ষীরা।

অভয়ের মৃতদেহটাকেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে লাগল পিশাচেরা। ষোল বছরের ছেলে অভয়।······সত্যই কি অভয় মরেছে?

একালের রূপকথা

ছুটির দিন। রমেন একটা রূপকথার বই পড়ছিল শুয়ে শুয়ে। সেই পুরাতন চার বন্ধুর গল্পটা। পড়তে পড়তে তার মনে হচ্ছিল, "মন্টু, হাবুল, গণশা আর আমি, আমরাও তো চার বন্ধু, কিন্তু আমরা তো রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র আর পাত্রপুত্র নই! আমার বাবা কর্পোরেশনের ক্লার্ক, মন্টুর বাবা ডাক্তার, হাবুলের বাবা ওভারশিয়ার আর গণশার বাবা দালাল। আমাদের নিয়ে কি আর রূপকথা হয়? তাছাড়া আমরা অমন পক্ষিরাজই বা পাব কোথা? আকাশ-পথে অমন হু-হু করে উড়ে যাওয়া সে কি আর সম্ভব আমাদের পক্ষে? নাঃ, এ যুগে আর রূপকথা হয় না। হাবুলের ইচ্ছে এরোপ্লেনের পাইলট হবার, ও হয়তো কোন দিন আকাশ-পথে হু-হু করে উড়বে। কিন্তু সে ওড়া চাকরির ওড়া, তাতে কি আর রূপকথা হয়?"

এই সব ভাবতে ভাবতে রমেন ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুমের ভিতর রূপকথা এসে দেখা দিল স্বপ্ন হয়ে।

টেলিগ্রাম নয়, একটি ছোট্ট পরী এসে ঢুকল রমেনের পড়ার ঘরের কপাট ঠেলে।

"আপনিই রমেনবাবু?"

"হ্যাঁ।"

"হাবুলবাবু চিঠি দিয়েছেন একখানা। মন্টুবাবু আর গণেশবাবু থাকেন কোথায় বলুন তো, তাঁদের নামেও চিঠি আছে।"

মন্টু আর গণেশের ঠিকানাটা বলে দিলে রমেন।

প্রজাপতির মতো ডানা মেলে পরী উড়ে চলে গেল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, রমেন এতে আশ্চর্য হ'ল না একটুও। টেলিগ্রাম, টেলিফোন বা রেডিও দেখে সে কি আশ্চর্য হত? এ দেখেই বা হবে কেন? পরীরা উড়ে উড়ে ঘরে ঘরে গিয়ে প্রত্যেককে চিঠি দিয়ে আসবে এইটাই তো বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার।

হাবুল লিখেছে—"রমেন, ক'দিনের ছুটি পেয়েছি। প্লেন নিয়ে বেড়াতে বেরোব। তোমাদেরও যেতে হবে। পরশু দিন সকাল বেলা আমাদের বাড়ির ছাতে তৈরি হ'য়ে থেকো। মন্টু আর গণেশকেও খবর পাঠালাম। তুমিও তাদের

বলে দিও নিজে গিয়ে। যেতেই হবে সকলকে। আমি কেমন প্লেন চালাতে শিখেছি, দেখিস্। হিমালয় থেকে কুমারিকা আর গুজরাট থেকে আসাম চক্কোর দিয়ে আসা যাবে!"

আনন্দে নেচে উঠল রমেনের মন। এরোপ্লেনে চড়ে' ভারত-ভ্রমণ!

নির্দিষ্ট দিনে সকাল বেলা তিনজনে গিয়ে হাবুলের বাড়ির ছাতে গিয়ে বসে রইল। আজকাল এরোপ্লেনে চড়বার জন্যে এরোড্রোমে যাবার দরকার হয় না।

ছাত একটু বড় হলেই তাতে এরোপ্লেন নামাতে পারে। আকাশের দিকে চেয়ে বসে' রইল তিনজনে। ওটা কি চিল? চিল কি অত বড় হয়? বোঁ বোঁ করে' ছাতের দিকেই তো ছুটে আসছে! গুররর্, গুররর্…শব্দও পাওয়া গেল ক্রমশ। দেখতে দেখতে এসে পড়ল হাবুল। বাঃ, কি চমৎকার প্লেনটি ওর, যেন জীবন্ত একটি রাজহংস! টুক্ করে এসে নাবল ছাতের উপর। নাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজহংস ডানা দুটি তুলে ধরল। হাবুল বসে আছে। আর তিনটি খালি সীট।

"দেরি করিস্ না, চট্ করে' আয়!"

উঠে বসল তারা। রাজহংস ডানা মেলে উড়ল আবার। মাঠ বন নদী পাহাড় সমুদ্র মরুভূমি পার হয়ে উড়ে চলল, কখনও ভোরের আলোয়, কখনও চাঁদের আলোয়, কখনও মেঘের ভিতর দিয়ে, কখনও রামধনুর ভিতর দিয়ে, নক্ষত্রালোকে, সূর্যালোকে —কতদিন কতরাত্রি যে চলল তার ঠিক নেই। রমেনের মনে হতে লাগল, যুগযুগান্ত পার হয়ে গেল বুঝি! কোথায় চলেছে হাবুল?

"কোথায় যাচ্ছি ভাই আমরা?"

"নিরুদ্দেশ যাত্রা আমাদের।"

সামনের দিকে চেয়ে স্টিয়ারিং ধরে চুপ করে বসে রইল হাবুল। রমেন চেয়ে দেখলে, একটু নীচে পেঁজা-তুলোর বিরাট একটা স্তূপ শূন্যে ঝুলছে যেন!

"এই রে—"

হঠাৎ চীৎকার করে' উঠল হাবুল।

"কি হল?"

"ঠিক বুঝতে পারচি না।"

হু-হু করে নীচের দিকে নামতে লাগল রাজহংস।

"ক্র্যাশ্ হ'ল নাকি?"

"তাই তো মনে হচ্চে!"

আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল চারজনেই। কিন্তু কি আশ্চর্য, কেউ মরল না। রাজহংস কিছুদূর নেবেই খুব আস্তে আস্তে নাবতে লাগল। শেষে মনে হ'ল কে যেন তাকে কোলে করে' নাবিয়ে নিলে! একটু শব্দ পর্যন্ত হ'ল না।

নেবে পড়ল চারজনেই। নেবে আরও অবাক্ হ'য়ে গেল, চারিদিকে মখমল বিছানো! অবাক্ কাণ্ড! এ কোথায় এসে হাজির হ'ল তারা? চতুর্দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল—কেবল মখমল আর মখমল! ঘাস নেই, সবুজ মখমলের গদি কেবল! চুমকি-বসানো, জরি-বসানো, কত রকমের!

হাবুল বললে—"একটা 'নাট্' আলগা হ'য়ে পড়ে' গেছে মনে হচ্ছে। এখানে কি পাওয়া যাবে? চল খোঁজ করা যাক।"

হাঁটতে লাগল চারজন।

মন্তু বললে—"মখমলের উপর দিয়েই হাঁটবি? যা ময়লা জুতো আমাদের—"

গণেশ বললে—"তাছাড়া হাঁটাই যে যাচ্ছে না ভাল করে'। মখমলের গদির উপর দিয়ে হাঁটা যায় কখনও? শক্ত মাটির উপর হাঁটা অভ্যেস আমাদের।"

হাবুল বললে—"তবু হাঁটতেই হবে। 'নাট্' চাই একটা।"

"হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। না হলে বাবা বকবে ভাই! আমি বাড়িতে কিছু বলে আসি নি"—রমেন বললে অপ্রস্তুত হাসি হেসে।

হাঁটতে লাগল তারা। হাঁটতে হাঁটতে গলদঘর্ম হয়ে উঠল শেষে।

মন্তু বললে—'অনেক দিন আগে একবার বালির চড়া ভাঙতে হয়েছিল আমাকে। কষ্ট হয়েছিল খুব। কিন্তু এত হয় নি—বাপ্ স্!"

মখমলের গদি মাড়িয়ে হেঁটে চলল তারা। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর একটা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড চোখে পড়ল তাদের। বড় বড় হীরের অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'টাকার দেশ'। কি উজ্জ্বল অক্ষরগুলো!

"দেখ দেখ ওটা কি"—মন্তু বলে' উঠল হঠাৎ। সকলে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে আকাশচুম্বী বিরাট একটা দেওয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে, এত চকচক করছে যে চাওয়াই যায় না তার দিকে! মনে হচ্ছে বরফ, রুপো আর চাঁদের আলো গলিয়ে তৈরি হয়েছে সেটা! তার উপর পড়েছে সূর্যের কিরণ!

হাবুল বৈজ্ঞানিক লোক। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সে বললে—"প্ল্যাটিনামের

তৈরি। চল, ওই দিকেই যাওয়া যাক। একটা গেটও আছে মনে হচ্ছে—"

"ওপাশে আরও একটা গেট আছে।"

"চল—"

আবার হাঁটতে শুরু করলে চারজনে।

সেই মখমলের তেপান্তর পার হ'য়ে প্ল্যাটিনামের প্রাচীরের কাছে পৌঁছতে যুগ-যুগান্ত কেটে গেল রমেনের মনে হ'ল। প্রাচীরের কাছে এসে তারা যখন পৌঁছল অবশেষে, তখন চারজনেই এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে যে আর কারো পা উঠছে না। মন্টু, গণেশ, রমেন তিনজনে বসেই পড়ল। হাবুলের বসতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সে কাজের লোক, ভাবলে একটা গেটের ভিতরে ঢুকে একটু খোঁজ করে' আসা যাক আগে! একটা 'নাট্' না পেলে তো ফেরাই যাবে না এখান থেকে।

"তোরা এখানে বোস, বুঝলি। আমি একবার ভিতরে ঢুকে একটু দেখে আসি কি ব্যাপার! 'নাট্' একটা যোগাড় করতেই হবে কোনও রকমে।"

"বেশী দেরি করিস না যেন!"

"আমরা আর পারছি না ভাই, একটু জিরিয়ে নিই।"

"বেশ, বোস্ তাহলে, আমি আসছি।"

হাবুল যখন যাচ্ছে তখন এক টুকরো আলো এসে পড়ল তার পায়ের কাছে। কিন্তু সেটাকে লক্ষ্যই করলে না কেউ। হাবুল ডান দিকের গেটটা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

হাবুল ভিতরে ঢুকে অবাক্ হয়ে গেল। এটা এরোপ্লেনের কারখানা না কি? আশ্চর্য কারখানা! প্রকাণ্ড বড় বড় সোনার থালায় এরোপ্লেনের জিনিসপত্র সাজানো রয়েছে রাস্তার দু'ধারে! অথচ মানুষ একটিও নেই!

একটু এগিয়ে সে দেখলে, যে 'নাট্' সে খুঁজছিল তা স্তূপাকারে সাজানো রয়েছে একটা সোনার থালায়। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সে একটা তুলে নিলে। তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল একটা। হাবুল নিজেই 'নাট্' হ'য়ে সেই নাটের স্তূপে মিশে গেল!

অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও যখন হাবুল ফিরল না তখন মন্টু চিন্তিত হ'ল খুব। তার খুব পিপাসা পেয়েছিল। রমেন আর গণেশ মখমলের গদির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। গণেশের নাক ডাকছিল।

মন্টু ভাবলে, "ওদের আর ওঠাব না এখন, বেচারারা ঘুমুচ্ছে ঘুমুক। আমি দেখি ভেতরে যদি শরবত-টরবত পাওয়া যায়।"

মন্টু উঠে যখন যাচ্ছে তখনও তার পায়ের কাছে সেই আলোর টুকরোটা এসে পড়ল। কিন্তু সে গ্রাহ্য করলে না তত। সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ল ডান দিকের গেটটায়, হাবুল একটু আগে যেটা দিয়ে ঢুকেছিল। ভেতরে ঢুকে সে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। তার মনে হ'ল এটা শরবতের দোকান না কি? বড় বড় সোনার থালায় স্ফটিকের গ্লাসে সারি সারি শরবত সাজানো রয়েছে। কি চমৎকার দেখতে, দেখলেই খেতে ইচ্ছা করে! কিন্তু লোকজন কোথাও কেউ নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর আর সে স্থির থাকতে পারলে না। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল বেচারার। কিন্তু যেই সে একটি গ্লাসে হাত দিয়েছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সে এক গ্লাস শরবত হয়ে গেল!

গণেশের ঘুম ভাঙল খিদের চোটে। সে ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে—হাবুল মন্টু নেই, রমেন ঘুমুচ্ছে।

"ওরে ওঠ, ওঠ, মন্টু আবার কোথায় গেল? হাবুলও এখনও ফেরেনি দেখছি!"

রমেন উঠে বসল।

গণেশ বলল, "বড্ড খিদে পেয়েছে ভাই! চল্, ওঠা যাক্। মন্টু কোথা গেল বলতো!"

"হাবুলকে খুঁজতে গেছে হয়তো!"

"চল, আমরাও যাই।"

দু'জনে উঠে পড়ল। একটু গিয়ে রমেন বলল, "আমাদের একজনের কিন্তু থাকা উচিত! ওরা যদি ফিরে আসে, আমাদের কাউকে না দেখতে পেলে আবার ভাবনায় পড়বে।"

"বেশ, তুই বোস্ তাহলে। আমি একটু ঘুরে আসি। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে, দেখি যদি খাবার পাওয়া যায় কোথাও।"

"বেশ।"

গণেশ যখন যাচ্ছিল তখনও তার পায়ের কাছে সেই আলোর টুকরোটা এসে পড়ল, কিন্তু গণেশ সেটা দেখেও দেখলে না! গণেশ খাবারের স্বপ্ন দেখছে তখন।

অন্ত কিছু দেখবার তার অবসর কোথায়? ডানদিকের গেট লক্ষ্য করে' হন হন করে' এগিয়ে গেল সে।

গেটে ঢুকেই দেখলে কি আশ্চর্য, চারদিকেই যে খাবার! সোনার থালায় সাজানো নানা রকম খাবার। সন্দেশ রসগোল্লা তো আছেই, আরও কত রকম মিষ্টান্ন! যেমন রং তেমনি সুগন্ধ। শুধু কি মিষ্টান্ন? নিমকি কচুরি সিঙ্গাড়া চপ কাটলেট ডেভিল ফ্রাই—প্রচুর পরিমাণে থরে থরে সাজানো রয়েছে।

গণেশের মুখ লালায়িত হয়ে উঠল। কিন্তু দোকানদার কই? কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। সঙ্গে টাকা রয়েছে, সামনে খাবার, কিন্তু···। যা থাকে কপালে বলে গণেশ রসগোল্লার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু যেই রসগোল্লায় হাত দিয়েছে আর অমনি সে নিজেই রসগোল্লা হয়ে গেল!

রমেন অনেকক্ষণ বসে রইল, কেউ আর ফেরে না। অন্ধকার হ'য়ে এল ক্রমশ। তার মনে হ'ল, আর তো এমন ভাবে অপেক্ষা করা উচিত নয়। খিদে পেয়েছে বেশ। উঠে পড়ল সে, ডান দিকের গেটের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল।

সেই আলোর টুকরোটাও আবার এসে পড়ল তার পায়ের কাছে। অন্ধকার হয়েছিল বলেই হোক কিংবা যে কারণেই হোক, রমেন ভাল করে' চেয়ে দেখলে সেটার দিকে। টর্চ ফেলছে নাকি কেউ? চেয়ে দেখলে, একটা আলোর রেখা বাঁ-দিকের ভেতর থেকে আসছে।

আবার আলোর টুকরোটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে সে। এবার দেখতে পেলে, কি যেন লেখা রয়েছে আলোর অক্ষরে! ঝুঁকে দেখলে লেখা আছে—"ডান দিকের গেটে খবরদার ঢুকো না। বাঁ-দিকের গেটে এস।"

রমেন ইতস্ততঃ করে' বাঁ-দিকের গেটে ঢুকল গিয়ে। গেটের ভিতর ঢুকে দেখে, সামনেই একটি চমৎকার বাড়ি। সেই বাড়ির ছাতে প্রকাণ্ড টর্চ হাতে করে' একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটিকে দেখেই ভাল লাগল রমেনের! যেমন চোখ মুখ নাক, তেমনি রং, প্রশস্ত ললাটে যেন মহিমা জলজল করছে!

রমেনকে দেখতে পেয়েই ছেলেটির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। সে রমেনকে হাতছানি দিয়ে ডেকে ছাত থেকে নেমে এল। রমেন কাছে যেতে আবার সে হাতছানি দিয়ে ডাকল। একটু অবাক্ হ'ল রমেন। ছেলেটি বোবা নাকি?

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভিতরে ঢুকে রমেন দেখতে পেল, ছেলেটি একটি বাংলা টাইপরাইটারে বসে খটাখট্ করে' কি যেন লিখে চলেছে! রমেন ঢুকতেই মুচকি হেসে ইঙ্গিতে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললে। বিস্মিত রমেন বসল। ছেলেটি টাইপ করতে লাগল দ্রুতবেগে। টাইপ করা হ'য়ে গেলে কাগজখানা বার করে' এনে রমেনের সামনে ধরে' দিল সে।

রমেন পড়তে লাগল—"আমার নাম সুবুদ্ধি। আমি বোবা নই, কিন্তু এদেশে আমার কথা কইতে মানা। এ কামনা-যক্ষিণীর দেশ! আমাকে এরা বন্দী করে' রেখেছে। হয় তো মেরেই ফেলত, কিন্তু আমি অমর, আমাকে নিঃশেষ করা যায় না। আমাকে ধরে' এনে এরা নানা রকম যন্ত্রণা দিচ্ছিল। যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে শেষে আমি এদের বললাম—'আমাকে যন্ত্রণা দিও না, আমাকে কি করতে হ'বে বল।' এরা বললে, 'তুমি শুধু চুপ করে' থাক, আর কিছু চাই না।' আমি বললাম, "বেশ, আমি চুপ করে' থাকতে রাজী আছি যদি তোমরা আমাকে সময় কাটাবার জন্যে বই খাতা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি এনে দাও। চুপ করে' বসে থাকব কি করে'?" তাতেই তারা রাজী হ'ল। এই বাড়িতে আমার ল্যাবরেটরি আছে; লাইব্রেরিও আছে। ল্যাবরেটরিতে আমি অনেক জিনিস তৈরি করেছি। যে টর্চের আলো ফেলে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি, সেটাও আমারই তৈরি। এ ভয়ানক দেশ, এখানে যে যা কামনা করে' আসে, তাই হ'য়ে যায়, মানুষ থাকে না আর। হাবুল 'নাটু' হ'য়ে গেছে, মনু হয়েছে শরবত, গণেশ রসগোল্লা। আলো ফেলে ফেলে ওদের সাবধান করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওরা কেউ আমার ইশারা বুঝলে না। যাক, তুমি যখন আমার ইঙ্গিত বুঝে এখানে এসে পড়েছ তখন তোমার আর ভয় নেই। এমন কি, হয় তো তুমি এদের সকলকে উদ্ধারও করতে পারবে!"

রমেন কাগজ পড়া শেষ করে' সুবুদ্ধির দিকে চাইলে। দেখতে পেলে সে একটা পেন্সিল নিয়ে বসে আছে, তার সঙ্গে কথা কইবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে। তার বিস্ময় যদিও সীমা অতিক্রম করে' গিয়েছিল তবু সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায় নি!

সে বললে, "সবাইকে না পারি, হাবুল, মনু আর গণেশকে তো উদ্ধার করতেই হবে। আমাকে কি করতে হবে বলুন।"

সুবুদ্ধি লিখে উত্তর দিলে—"দুঃসাধ্য সাধন করতে হবে। কিন্তু সকলে এ দুঃসাধ্য সাধন ত করতে পারবে না! যে মিথ্যুক, যে চোর, যে পরশ্রীকাতর, তার দ্বারা এ কাজ হবে না।"

"আমি মিথ্যুক নই, চোরও নই, পরশ্রীকাতর নই! কি করতে হবে আমাকে বলুন না!"

"অন্যমনস্ক হলেও চলবে না।"

"আমি মোটেই অন্যমনস্ক নই।"

"সাহসীও হওয়া চাই!"

"কি করতে হবে বলেই দেখুন না, আমি পারি কি না!"

"সে খুব শক্ত কাজ—"

"বলুনই না।"

"কামনা-যক্ষিণীর মুখের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে হবে। কোনও সত্যবাদী সচ্চরিত্র লোক যদি তার মুখের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই যক্ষিণীর মৃত্যু হ'বে। আর তার মৃত্যু হ'লে সবাই বেঁচে উঠবে।"

"তার মুখের মধ্যে লাফাব কি করে' ?"

"তার মুখ মোটেই ছোটখাটো নয়, বিরাট মুখ, বহু যোজন বিস্তৃত, আর সে মুখ থেকে লকলক করে' আগুনের শিখা বেরুচ্ছে!"

"বলুন, কোন্ দিকে আছে, আমি এখনই লাফিয়ে পড়ছি তার মধ্যে—"

"তার কাছে যাওয়াও খুব সহজ নয়। খুব সরু একটা রাস্তা দিয়ে যেতে হয়, ক্ষুরের ধারের মতো সরু! খুব একাগ্র না হ'লে সে রাস্তা দিয়ে চলতে পারবে না।"

"ঠিক পারব"

"বেশ, যাও তাহলে—"

সুবুদ্ধি টর্চের আলোটা আকাশের দিকে ফেললে। রমেন দেখতে পেল খুব সরু তারের মতো একটা পথ চলে' গেছে—টেলিগ্রাফের তারের মতো। চুলের চেয়ে পাতলা সরু তার।

"ওখানে উঠব কি করে ?"

"সিঁড়ি আছে।"

"আগুনের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে তোমার ভয় হচ্ছে না? মারা যাও যদি—"

"গেলামই বা। সবাই যদি বেঁচে ওঠে, আমি একলা না হয় মারাই গেলাম।"

"বাঃ, তুমি ঠিক পারবে মনে হচ্ছে। কিন্তু একটি কথা মনে রেখ। তোমাকে অন্যমনস্ক করে' দেবার জন্যে তোমার দুপাশে সিনেমা, ক্রিকেট ম্যাচ, রেডিওর গান, ভাল ভাল ম্যাজিক, বড় বড় নেতার গালভরা বক্তৃতা, ফুটবল ম্যাচ—এই সব নানারকম হবে, একটু অন্যমনস্ক হলেই পড়ে' যাবে কিন্তু।"

"না, আমি অন্যমনস্ক হ'ব না"

সুবুদ্ধি টর্চের আলো ধরে রইল, রমেন এগিয়ে গেল নির্ভয়ে। একটু গিয়ে সিঁড়ি দেখতে পেলে।

সরু তারের উপর দিয়ে রমেন চলেছে। রমেন যেন আর রমেন নেই, সে যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে অশরীরী আগ্রহে! তার চারিদিকে যে তুমুল কোলাহল ঘটছে, তা সে শুনতেই পাচ্ছে না, সরু তারটা ছাড়া দেখতেও পাচ্ছে না কিছু! কিছুক্ষণ পরে সে কামনা-যক্ষিণীর মুখের কাছে হাজির হ'ল এসে।

দিগন্তবিস্তৃত বিরাট একটা গহ্বর থেকে লকলক কোরে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে। কত রকমের কত রঙের শিখা! লাল নীল সবুজ হলুদ—শত শত ইন্দ্রধনু যেন শিখায় পরিণত হয়েছে! আর তাতে লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ উড়ে উড়ে পড়ছে এসে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

রমেন স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তাকেও পুড়ে মরতে হ'বে। তা হোক। লাফিয়ে পড়ল সে।

লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল! আগুন নিবে গেল। তারপর অসংখ্য লোকের কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল। সবাই বেঁচে উঠেছে! ওই যে হাবুল মনু আর গণেশও আসছে তার দিকে ছুটে।

"রমেন, রমেন, ওঠ, এখনও ঘুমুচ্ছিস্? বি-টিমের সঙ্গে আজকে যে ম্যাচ আমাদের, মনে নেই? ওঠ্ ওঠ্।"

হাবুলের ডাকেই রমেনের ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে মনু আর গণেশও দাঁড়িয়ে আছে।

স্বাধীনতা

"স্বাধীনতা মানে কি ?"—পণ্ডিতমশায় জিজ্ঞাসা করলেন সুবলকে।

সুবল উত্তর দিলে—"নিজের অধীনতা"

"নিজের অধীনতা বলতে কি বোঝ তুমি ?"

ঈষৎ মাথা চুলকে সুবল বললে—"মানে, নিজে আমি যা খুশি করব তারই অধিকার"

"তোমার নিজের যদি খুশি হয় চুরি করব, ডাকাতি করব, মাস্টার ঠ্যাঙাব, পড়াশোনা করব না, সকলের অবাধ্য হ'ব—তাহলে এইসব করবার অধিকার তোমাকে দেওয়ার নামই স্বাধীনতা ?"

"না সার !"

"তাহলে ?"

সুবল চুপ করে রইল। পণ্ডিতমশায় একে একে সব ছেলেকেই জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ সদুত্তর দিতে পারলে না। সুবলই ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছেলে, সে-ই যখন পারলে না তখন আর কে পারবে ?

পণ্ডিতমশায় বললেন—"এখন আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, এখন আমাদের ভাল করে' বুঝতে হবে কথাটার মানে কি ! সুবল, তুমি ঠিকই বলেছ, কথায় কথায় মানে করলে স্বাধীনতা মানে নিজের অধীনতাই বোঝায়। কিন্তু 'নিজের' কথাটার বিশেষ অর্থ আছে একটা। নিজের বলতে কি বোঝায় ? তোমাকে যদি দুটো আম দেওয়া হয়, একটা পচা আর একটা ভালো, আর যদি বলা হয় ওর মধ্যে একটা তুমি নিজের করে' নাও, তাহলে কোন্‌টা তুমি নেবে ? ভালোটাই নেবে নিশ্চয় ! পশুরাও চায় যেটা ভালো সেটা নিজের হোক। মানুষ পশুর চেয়ে অনেক বড়, তাই সে শুধু নিজের ভালো চায় না, নিজেদের ভালো চায়। সকলের ভালো হোক এইটাই সভ্য মানুষের কাম্য এবং সকলের ভালো করবার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলে। যারা পরাধীন জাতি, তারা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা সাহস করে' একটা ভালো কথা পর্যন্ত বলতে পারে না, যদি সেটা শাসক জাতির স্বার্থ-বিরোধী হয়। তাই স্বাধীনতা যাদের থাকে না, ভালো হবার অধিকারই তাদের থাকে না ; কারণ সকলের ভালো হোক—কোনও

বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের এ অভিপ্রায় কখনও হতে পারে না। দেশের ভালো হোক, দশের ভালো হোক, সকলের ভালো হোক, এই-ই হলো স্বাধীনতার লক্ষ্য। যখন তোমরা আর একটু বড় হবে তখন বুঝতে পারবে আমাদের সকলের মধ্যেই ভগবান আছেন, 'স্ব' মানে ভগবান, তাই স্বাধীনতা মানে ভগবানের অধীনতা, যা মঙ্গলময় তারই অধীনতা।"

পণ্ডিতমশায়ের কথা মন দিয়ে সবাই শুনল, কিন্তু তাঁর কথার সমস্তটা বুঝতে পারল না সবাই।

স্কুলের ছুটি হ'য়ে গেল। সুবল পণ্ডিতমশায়ের কথাগুলোই ভাবতে ভাবতে বাড়ি যাচ্ছিল। পণ্ডিতমশায় যা বললেন, তা যেন বড্ড বেশী ঘোরালো গোছের। ভগবান-টগবান এনে এমন একটা ব্যাপার করলেন যে ঠিক বোঝা গেল না সবটা। সে স্বাধীনতার একটা সোজা মানে খুঁজছিল মনে মনে।

একটু পরেই হঠাৎ ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে গেল তার কাছে! যা খুঁজছিল পেয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সুবলের মা বেড়াতে যাচ্ছিলেন একজনের বাড়িতে। দূর-সম্পর্কের আত্মীয় হ'ন তাঁরা, তাঁদের বাড়িতে কার যেন অসুখ করেছে! বেরোবার আগে মা সুবলকে বললেন—"ওরে ভাঁড়ার ঘরের তাকে দুটো আম আছে। যদি খিদে পায় তো তুই একটা নিস্ আর মনুকে একটা দিস্।"

মনুও তাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়—মা-মরা ছেলে—তাদের আশ্রিত।

মা চলে' গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খিদে পেয়ে গেল সুবলের। পড়ছিল, তড়াক করে' উঠে ভাঁড়ার ঘরে চলে' গেল সে। গিয়ে দেখলে দুটো আম রয়েছে বটে, কিন্তু একটা ভালো, আর একটা একটু পচা। পণ্ডিতমশায়ের কথা মনে পড়ল। তিনি এই আমেরই উদাহরণ দিয়েছিলেন। যা ভালো সেটাকেই নিজের করে' নেওয়া উচিত এবং সেইটে নেবার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। পচা আমটা মনুকে দিতে কিছুতেই মন সরছিল না তার। ওকে দিলে ও নেবে; কারণ, ও আশ্রিত। কিন্তু সেটা দেওয়া কি উচিত?

পচা আমটাই নিলে সে, ভালোটা মনুকে দিলে।

একটা অদ্ভুত আনন্দে সমস্ত মনটা ভরে' উঠল সুবলের। পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি সুবলদের বাড়ির কাছে। এক ছুটে সে চলে গেল পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি।

পণ্ডিতমশায় শোওয়ার আয়োজন করছিলেন।

"পণ্ডিতমশায়, স্বাধীনতার আর একটা মানে আমি খুঁজে পেয়েছি। যা করলে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায় তাই করবার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে!" সুবলের মুখ উদ্ভাসিত।

পণ্ডিতমশায় হেসে বললেন—"ঠিক বলেছ।"

খোকনের স্বপ্ন

রাত্রে খোকন ছাতে শুয়েছিল। অগণ্য নক্ষত্র উঠেছে আকাশে। অসংখ্য। ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে। কি অদ্ভুত সমারোহ! লক্ষ কোটি মণিমাণিক্য কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে কালো মখমলের উপর। অবাক্ হ'য়ে দেখছিল খোকন। পাশে শুয়েছিলেন তার কাকা। এম্. এস্. সি. পাস্ করেছেন সম্প্রতি। নামকরা ভাল ছেলে। খোকন কাকাকে জিজ্ঞেস করলে—"কাকা, ওই নক্ষত্রগুলো কি?"

"ওরা প্রত্যেকটা এক একটা সূর্য।"

"তাই নাকি! প্রত্যেকটা?"

"চাঁদ মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো—এই কটা গ্রহ আমাদের পৃথিবীর মতো। বাকী সব সূর্য। অধিকাংশই আমাদের সূর্যের চেয়ে বড়।"

"ওই সাদা মতন চলে গেছে ওটা কি?"

"ছায়াপথ। ওতেও অনেক নক্ষত্র আছে, তাছাড়া আছে নেবুলা, যার বাংলা নাম নীহারিকা—"

কাকা বলতে লাগলেন, খোকন শুনতে লাগল অবাক্ হয়ে। "আমাদের সূর্য নাকি পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। সূর্যের চেয়েও বড় বড় ওই নক্ষত্রগুলো, অত দূরে আছে বলে' ছোট দেখাচ্ছে। বহু দূরে আছে। এত দূরে যে মাইল দিয়ে তা বলা যায় না। কার আলো কতক্ষণে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তাই দিয়ে ওদের দূরত্ব বলা হয়। আমাদের সূর্যের আলো আসে কয়েক মিনিটে। কোনও নক্ষত্রের আলো দু'বছরে, কারও বা চল্লিশ বছরে, কারও বা তার চেয়ে বেশি! বিরাট বিরাট জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড সব মহাশূন্যে ছড়ানো রয়েছে অজস্র। দাউ দাউ করে' জ্বলছে কতদিন থেকে তা ঠিক কেউ জানে না! প্রত্যেকটাই জ্বলন্ত শিখা লক্ লক্ করছে।"

খোকনের ভয় করতে লাগল। সে ছাত থেকে নেবে গেল ঠাকুমার কাছে। ঠাকুমাও শুয়েছিলেন আকাশের দিকে চেয়ে; তাঁর বিছানার পাশে যে খোলা জানালাটা ছিল তাই দিয়ে দেখা যাচ্ছিল আকাশের খানিকটা।

"ওই নক্ষত্রগুলো কি জান ঠাকুমা? কাকা বললে—" কাকা যা যা বলেছিল সবিস্তার বর্ণনা করে' গেল সে। সমস্ত শুনে ঠাকুমা মন্তব্য করলেন—"কাকা তো সব জানে!"

"কি তাহলে ওগুলো—"

ঠাকুমা যা বললেন তা আরও বিস্ময়কর।

ওই ছায়াপথ দিয়ে আসবে নাকি রাজপুত্র। তাই আলো জ্বালিয়ে রেখেছে দেবতারা।

গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল খোকন।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে যা স্বপ্ন দেখলে তা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক।

······চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্ষত্রের মশাল জ্বলেছে। অসংখ্য জ্বলন্ত শিখার উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে চতুর্দিক। দূরে দূরে কালো মেঘের স্তূপ, তাতে আগুন লেগেছে যেন। বজ্রের বাজনা বাজছে। মেঘের পিছনে শোনা যাচ্ছে ঝড়ের গর্জন। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন লক্ষ লক্ষ শাঁখ বাজছে।······ছায়াপথ দিয়ে রাজপুত্র আসছে···ওই যে···মাথায় সোনার মুকুট, হাতে তলোয়ার। নির্ভয়ে এগিয়ে আসছে রাজপুত্র, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই···ওই আসছে···। কাছে এল যখন, তখন খোকন অবাক্ হয়ে গেল। রাজপুত্র অপর কেউ নয়, সে নিজেই। তারই মাথায় সোনার মুকুট, হাতে তলোয়ার, সে বেরিয়েছে দিগ্বিজয়ে।

যুগল যাত্রী

নিতাই মণ্ডল তেমন চটপটে লোক নন। কোথাও যেতে হ'লে তিনি তাই বড় বিব্রত হ'য়ে পড়েন! গ্রাম থেকে স্টেশনটি প্রায় মাইল তিনেক দূরে। গরুর গাড়ি করে' যেতে হয়। শহরে যাবার ট্রেনও মাত্র একটি—সকাল আটটায় ছেড়ে যায়। এই সব কারণে শহরে তাঁর যাওয়াই হয় না বড় একটা। সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরোনো অসম্ভব তাঁর পক্ষে। ছ'টার আগে ঘুমই ভাঙতে চায় না। উঠে পায়খানা সেরে হাত-মুখ ধুতেই প্রায় একঘণ্টা বেরিয়ে যায়। একটি বড় নিমের দাঁতনকে চিবিয়ে ছিন্নভিন্ন না করলে তাঁর তৃপ্তি হয় না। এরপর স্নান! তেল মাখতেই তো আধঘণ্টা লেগে যায়! তারপর পুজো আছে। ঝাড়া একটি ঘণ্টা লাগে। পুজো সেরে জলখাবার নিয়ে বসেন। শুক্‌নো চিঁড়ে আর নারকোল তাঁর প্রিয় খাদ্য। ভাল করে' চিবিয়ে এক বাটি চিঁড়ে খেতে খানিকটা সময় লাগে বই কি! এর পর কাপড়-জামা পরা আছে। কাপড়ের কাছা-কোঁচা ঠিকই হতে চায় না সহজে। জামার বোতাম লাগাতেও সময় লাগে। দর্জি গর্তগুলো এমন ছোট ছোট করেছে যে বোতামগুলো ঢুকতেই চায় না! তারপর জুতো পরা, ফিতে বাঁধা, তারপর চুল আঁচড়ানো—মানে ভদ্রভাবে কোথাও বেরুতে গেলে এ সব অপরিহার্য। নিতাই চট্‌ করে' গুছিয়ে নিতে পারেন না সব, দেরি হয়ে যায়। তিনি বলেন, মানুষ তো আর পাখি নয় যে ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে! এই সব হাঙ্গামার জন্যে বেরুতে চান না তিনি কোথাও। ট্রেন ফেল করে' যে ওএটিং রুমে বসে' থাকবেন, সে ধাতেরও লোক তিনি নন। কোথায় বসে' থাকবেন ওই তেপান্তর মাঠের মাঝখানে!

এবারে কিন্তু যেতেই হবে। একটা জরুরি মোকদ্দমা লেগেছে, না গিয়ে উপায় নেই। আগেই যাওয়া উচিত ছিল। তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলছিলেন কিন্তু আর এড়ানো যাবে না, যেতেই হবে। তাঁর উকীল বিশ্বম্ভর চৌধুরী জরুরি তাগাদা দিয়ে চিঠি লিখেছেন। চিন্তিত হয়ে পড়লেন নিতাই। পুজো সারতেই তো সাতটা বেজে যাবে! তারপর ওই গরুর গাড়ি।

অনেক ভেবে চিন্তে তিনি শেষে ঠিক করলেন যে কিছুদিন আগে থেকেই শুরু

করতে হবে। পনরোই মোকদ্দমার দিন। আট তারিখ থেকেই ট্রেন ধরবার চেষ্টা করতে থাকবেন, যেদিন পেয়ে যান। তাছাড়া আর একটা মুশকিল, ঘড়ি নেই! সূর্য দেখে আন্দাজে সময় ঠিক করতে হবে।

প্রথম দিন তো বাড়ি থেকে বেরুতেই সূর্যঠাকুর শিমুলগাছের মাথায় উঠে পড়লেন অর্থাৎ আটটা বেজে গেল। দ্বিতীয় দিন আর একটু সকাল সকাল বেরিয়ে গেলেন; কিন্তু গ্রাম ছাড়াতে না ছাড়াতেই হরু ঘোষের সঙ্গে দেখা। তিনি ওই আটটার ট্রেনে এসেছেন। সুতরাং সেদিনও ট্রেন পাওয়ার আশা নেই। ফিরতেই হলো! নিতাই মণ্ডল গাড়ির বলদ দুটোর পানে এমনভাবে চাইলেন যেন যত দোষ তাদেরই! তৃতীয় দিন আর একটু ভোরে উঠলেন। এমনি ভাবে চলতে লাগল।

ত্রৈলোক্য তরফদার বেশ চটপটে লোক। তাঁর কাজ হাতে-পায়ে লাগে না! কোনও কাজ ফেলে রাখা তাঁর স্বভাব নয়। যা করতে হবে তা আগে থাকতেই করে' নিশ্চিন্ত হয়ে বসে' থাকতে চান তিনি। মনে কর, বাড়িতে লোক খাওয়াতে হবে, সন্ধ্যা আটটার সময় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের আসবার কথা; ত্রৈলোক্য তরফদার তাড়াহুড়ো করে' ছ'টার মধ্যেই রান্নাবান্না প্রস্তুত করিয়ে ফেলবেন। তাঁর চরিত্রে 'হচ্ছে-হবে' বা 'গয়ংগচ্ছ' ভাব মোটেই নেই। তেমন লোক তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। যা করতে হবে তা আগে থাকতেই চটপট সেরে নাও, কাজ সেরে সময় থাকলে দু'দণ্ড না হয় গল্প কর—এই তাঁর আদর্শ।

তাঁকেও ওই দিন ওই আটটার ট্রেন ধরতে হবে। যদিও নিতাই মণ্ডলের গ্রামে তাঁর বাড়ি নয়, কিন্তু তাঁর গ্রামও স্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে।

তিনি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে শুলেন। বাইক আছে, সুতরাং ভয় নেই। নিতাই মণ্ডলের মতো নিড়বিড়ে লোক নন তিনি। তাছাড়া পুজো-ফুজোর অত হাঙ্গামাও নেই তাঁর! তিনি উঠবেন আর সুট করে' বাইকে চড়ে' বেরিয়ে যাবেন।

নির্দিষ্ট দিনে নিতাই মণ্ডলের গরুর গাড়ি যখন স্টেশনের গুমটির কাছে এসেছে, তখন ট্রেনটি হুস হুস করে' ছেড়ে গেল। নিতাই অসহায় ভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তাঁর। মুখে তুবড়ি ছুটতে লাগল। গাড়োয়ানটাকে

গাল দিতে লাগলেন! গাড়োয়ান বেচারী কি আর বলবে! সে তো যথাসাধ্য জোরেই হাঁকিয়ে এনেছে। কিন্তু মনিবের সঙ্গে তো তর্ক করা যায় না—ঘাড় নিচু করে' বসে রইল সে। কিছুক্ষণ চেঁচামেচি চীৎকার করার পর মণ্ডলমশায় অনুভব করলেন ভয়ঙ্কর ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। আজ না খেয়েই বেরিয়েছিলেন তিনি। চিঁড়ে আর নারকোল পুঁটুলিতে বেঁধে এনেছিলেন।

গাড়োয়ানকে বললেন—জিনিসপত্তর নিয়ে ওয়েটিং রুমে চ। আগে খেয়ে নি, তারপর যা হয় করা যাবে। তোদের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি আমার।

জিনিসপত্র নিয়ে ওএটিং রুমের দিকে রওনা হলেন তিনি।

নিতাই মণ্ডলের পদশব্দে ত্রৈলোক্য তরফদারের ঘুম ভাঙল। ওএটিং রুমের বেঞ্চির উপর ধড়মড় করে' উঠে বসলেন তিনি।

তিনি স্টেশনে এসে পৌছেছিলেন ভোর পাঁচটায়। পৌছে ওএটিং রুমের বেঞ্চিতে শুয়ে ট্রেনের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন, হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, খেয়াল নেই।

বেচুলাল

অতিশয় জীর্ণশীর্ণ লোক। সারাজীবন ধরে' অজীর্ণ রোগে ভুগছে। অথচ সাবধানতারও অন্ত নেই। যে যা বলে তাই করে। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি, হেকিমি, টোটকা—সব রকম করে' দেখেছে। গলায় হাতে গোছা গোছা মাদুলি কবচ। দৈবও করেছে নানারকম। একজন বললে—ভূতেশ্বর শিবমন্দিরে অমাবস্যার রাত্রে বেলতলায় একপায়ে দাঁড়িয়ে বাবার কাছে প্রার্থনা জানালে অব্যর্থ ওষুধ পাওয়া যায়। তাই করলে। প্রার্থনার পর গাছ থেকে একটি শুকনো বেলপাতা পড়ল। বাড়ি ফিরে সেইটেই গঙ্গাজলে বেটে ভক্তিভরে খেলে। কিছু হ'ল না। তারকেশ্বরে গিয়ে ধরনা দিয়েছিল একবার। একটানা তিনদিন তিনরাত্রি নিরম্বু উপবাস করে' পড়ে রইল বাবার মন্দিরে। স্বপ্ন দেখলে—একজন উলঙ্গ সন্ন্যাসী যেন তাকে বলছে—ওষুধ-টষুধে কিছু হবে না। সকাল সন্ধ্যে পেটে হাত বুলো, তা হ'লেই সেরে যাবে। হাত বুলিয়ে দেখলে কিছুদিন। কিছু হ'ল না। পেট তেমনি দমসম, বিকেলবেলা ঠিক সেই চোঁয়া ঢেঁকুর, বুক সমানে জ্বালা করে' চলেইছে। নানাজনে নানা পরামর্শ দেয়। পরামর্শদাতার অভাব নেই। একজনের পরামর্শে তেল খাওয়া বন্ধ করলে, আর একজনের পরামর্শে ঘি খাওয়া, তৃতীয় একজন বললে—মসলাই সব রোগের মূল, ওটাও ছাড়। তিনজনের কথাই শুনলে বেচারা। বিনা তেলে, বিনা ঘিয়ে, বিনা মসলায় অখাদ্য খাওয়া গলাধঃকরণ করতে লাগল। অসুখ একটু কমল, কিন্তু অরুচি এসে গেল। খাবার কথা মনে হলেই গা বমি বমি করত। বমি শুনে একজন ডাক্তার বললেন—পেটে বোধ হয় কৃমি আছে, মলটা পরীক্ষা করাও। বেচুলাল শহরে গিয়ে মল পরীক্ষা করিয়ে এল। কৃমির কিছু পাওয়া গেল না। ডাক্তারবাবু তবু বললেন, অনেক সময় পাওয়া যায় না। না পাওয়া যাক, কৃমির ওষুধ খাও তুমি। কৃমির ওষুধ খেয়ে আধমরা হ'ল বেচারা। কৃমি বেরুল না। পিসিমা বললেন, "তুই পাঁচজনের কথা শুনে মরবি দেখছি। বাঙালীর ছেলে ভাত ডাল মাছ তরকারি দিয়ে সপাসপ করে' কাঁসি ভরতি ভাত খা দিকি দুবেলা পেট ভরে', সব সেরে যাবে।" পিসিমার কথায় বাঙালীর স্বাভাবিক আহার শুরু করতেই আবার সেই পেট দমসম, চোঁয়া ঢেঁকুর! মহা মুশকিল।

অতিশয় চিন্তিত হ'য়ে পড়ল বেচুলাল। ভাবছিল কি করি, এমন সময় বাল্যবন্ধু শ্রীনাথ সিং একদিন একটি কথা বললে। কথাটি বেচুলালের মনে লাগল। শ্রীনাথ সিং লোয়ার প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত, অনেকরকম জানাশোনা আছে লোকটার।

শ্রীনাথ বললে, "দেখ বেচুলাল, অভিধানে দেখলাম জলের একটি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'জীবন'। জলই জীবন, জীবনই জল। আমার বিশ্বাস তুমি যদি বিশুদ্ধ জল পান করতে পার, তোমার অসুখ সারবে। বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট না করে' তুমি বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ করে' পান করবার চেষ্টা কর দিকি। পানাপুকুরের জল বা এঁদো পাতকোর জল কোনটাই বিশুদ্ধ নয়। এমন কি নদীর জলও নয়। নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য থাকে ওসবে"

"শহর থেকে কলের জল আনাতে বলছ? বাবুদের বাড়ির টিউব ওয়েলের জলও খেয়ে দেখতে পারি যদি বল"

"আমার বিশ্বাস ওসবও 'বিশুদ্ধ' নয়। বোতলে করে' একরকম জল আসে—তাই বিশুদ্ধ জল শুনেছি। তাই খেয়ে দেখ দিকি। আমাদের ছিদাম ডাক্তারের কাছে পেতে পার"

বেচুলাল গরীব নয়। ছিদাম ডাক্তারের কাছে থেকে একেবারে ত্রিশ বোতল 'ডিসটিল্‌ড্ ওআটার' কিনে ফেললে সে। তিনদিন অন্য কোন প্রকার জল স্পর্শ পর্যন্ত করলে না। শৌচাদি কর্ম্মও সারলে বিশুদ্ধ জল দিয়ে, রোগের কিন্তু উপশম নেই। ঘড়ি ধরে' চারটের সময় 'ঘেউ' করে চোঁয়া ঢেঁকুরটি ঠিক উঠতে লাগল। শ্রীনাথ সিং বললে,—'পেটে অনেক গরদা জমেছে, তিনদিনে কি হবে, মাসখানেক অন্তত ব্যবহার করে' দেখ···"

ছিদাম ডাক্তারের কাছে বিশুদ্ধ জল আর ছিল না। শহরে লোক পাঠাবে কি না ভাবছিল এমন সময় শ্রীনাথ সিংয়ের চেয়ে বেশী বিদ্বান এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াতে প্ল্যান বদলে ফেলতে হল বেচুকে।

ব্যক্তিটি গ্রামে আগন্তুক। রমেশ চৌধুরীদের পরিচিত। ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। এম্. এস্. সি. পড়ে। পাল বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে আলাপ হয়ে গেল বেচুর সঙ্গে। বিশুদ্ধ জলের প্রসঙ্গ তুলতে সে বললে—"সাধারণ ডাক্তারখানায় যে-সব ডিস্‌টিল্‌ড্ ওআটার থাকে তাকেও ঠিক বিশুদ্ধ জল বলা যায় না। যে-সব সস্তা শিশিতে

রাখা থাকে তার কাঁচ ঠিক 'অ্যালক্যালি ফ্রি' নয়। কিছুদিন পরে জলেও অ্যালক্যালি এসে ঢোকে—"

এই আগন্তুকটির কাছে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করে' অ্যালক্যালি বস্তুটা কি তা জিজ্ঞাসা করতে বেচুর লজ্জা হ'ল! একটু মুচকি হেসে সে এমন ভাবে মাথা নাড়ল যেন অ্যালকালি সম্বন্ধে সে সব কথা জানে। মনে মনে কিন্তু সে ভয়ানক ঘাবড়ে গেল। সর্বনাশ, না জেনে কি বিষই না জানি সে খেয়েছে। ত্রিশ বোতল! অ্যালক্যালি যে সাধারণ সোডা জাতীয় জিনিস তা জানলে এত ভয় হ'ত না তার। সোডা তো সে কত খেয়েছে!

গোপনে গোপনে সে সন্ধান করতে লাগল বিশুদ্ধ জল কোথায় পাওয়া যায়। একটা দৃঢ় ধারণা ক্রমশ তার মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গেল যে 'বিশুদ্ধ জল খেলেই সে ভাল হয়ে যাবে। দুচার ফোঁটা বিশুদ্ধ জলও যদি তার পেটে যায় তাহলেও তার অসুখ কমে যাবে অনেকটা। বিশুদ্ধ জল যোগাড় করতেই হবে যেমন করে হোক।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। শ্রীনাথের সহায়তায় বহু অনুসন্ধান করে' অবশেষে বেচুলাল খবর পেলে যে রাসায়নিক গবেষণাগার ছাড়া বিশুদ্ধ জল অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

…অনেক খরচপত্র করে' কোলকাতায় এসে হাজির হ'ল সে। উঠল মাসতুতো বোনের শ্বশুরবাড়ি শ্যামবাজারে। মাসতুতো বোনের ভাসুর-পো নীলু বেশ চালাক চতুর ছোকরা। তাকেই ধরে' পড়ল বেচুলাল। রাসায়নিক গবেষণাগারে নিয়ে যেতে হবে। নীলুও প্রথমটা 'রাসায়নিক গবেষণাগার' কথাটার তাৎপর্য বোঝেনি—(বেচুলাল কথাটা শিখেছিল শ্রীনাথ সিংয়ের কাছে থেকে)—কিন্তু সে চালাক চতুর ছোকরা। দু'চার কথার পরই সে বুঝতে পারল যে-কেমিস্ট্রির ডিমনস্ট্রেটার শিবনাথ বাবুর কাছে নিয়ে গেলেই সমস্যাটার সহজ সমাধান হয়ে যাবে।

…শিবনাথবাবু রসায়নে পণ্ডিত লোক। বেচুলালের কাতর নিবেদন শুনে বললেন—"বিশুদ্ধ জল করে' দিতে পারি বটে, কিন্তু বেশী তো হবে না। দু'চার ফোঁটা হতে পারে।"

বেচুলাল ঢোঁক গিলে বললেন—"যে আজ্ঞে"

"ওতেই কাজ হবে আপনার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপাতক্…"

কথা আর সে শেষ করতে পারলে না। তার মনে হ'ল যা পাওয়া যাচ্ছে তাই বা ছাড়ি কেন।

"বেশ, তা যদি হয় তো দেব করে'"

ভয়ে ভয়ে বেচুলাল আর একটি প্রশ্ন করলে।

"দাম কি এখনই দিয়ে দেব ?"

"দাম ? দাম লাগবে না।"

দাম লাগবে না! বেচুলালের সন্দেহ হল। ঠিক 'বিশুদ্ধ জল' দেবে তো!

"আজ্ঞে, জলটা ঠিক বিশুদ্ধ হবে তো ?"

"আপনি দুপুরে আমার ল্যাবরেটরিতে আসবেন, আপনার সামনেই করে' দেব..."

সেই দিনই দুপুরে নীলু আপিস যাবার মুখে বেচুলালকে শিবনাথবাবুর ল্যাবরেটরিতে পৌঁছে দিয়ে গেল।

বেচুলাল ল্যাবরেটরি দেখে নি। চমৎকৃত হয় গেল। কি কাণ্ডকারখানা! কত রকমের কাঁচের বাসন, সরু মোটা ঘোরানো কত রকমের নল, কি অদ্ভুত রকম উনুন, একটা নলের মুখে আগুন জ্বলছে নীলচে ধরনের, দেখাই যায় না ভাল করে— একটা কাঁচের ভাঁড়ে টগবগ করে ফুটছে লাল মতো কি একটা। সোঁ সোঁ করে' শব্দ হচ্ছে পাশের ঘর থেকে। রোগা মানুষ সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠেছে, বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল তার।

শিবনাথবাবু প্রবেশ করলেন।

"দেখুন এইটেতে পিওর হাইড্রোজেন আছে, আর এইটেতে পিওর অক্সিজেন আছে। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিশে জল হয় জানেন তো ?"

দুটো পাত্র দেখালেন শিবনাথবাবু। বেচুলাল কিছুই বুঝতে পারছিল না। তার মনে হ'ল দুটো পাত্রই খালি।

"এইবার এই দুটোকে মেশাতে হবে। দাঁড়ান পাশের ঘর থেকে মিশিয়ে আনি..."

বেচুলালের আবার সন্দেহ হ'ল ভদ্রলোক ঠকাচ্ছে না তো। কি মেশাবে! কিছুই তো নেই।

শিবনাথবাবু একটা বেঁটে গোছের শিশি নিয়ে পুনঃপ্রবেশ করলেন। "হাই-

ড্রোজেন আর অক্সিজেন মিশিয়েছি এটাতে। এইবার আগুন দিলেই জল হবে…”

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বেচুলাল শুনছিল। আগুন দিলেই জল হবে!

দড়াম্ করে' প্রচণ্ড শব্দ হ'ল একটা।

“এই দেখুন শিশির গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমেছে। এই হ'ল বিশুদ্ধ জল। উঠে এসে দেখুন…”

বেচুলালের কিন্তু উঠে আসবার মতো অবস্থা ছিল না। প্রচণ্ড শব্দের চোটে তার 'হার্টফেল' করেছিল।

বাবুলের কাণ্ড

বয়স না হয় কিছু কমই হ'ল, কিন্তু তাই বলে' কি ছোটরা মানুষ নয়? তারা কি একলাটি কিছুই পারে না? তারই জবাব দিয়েছে বাবুল। যেমন করেই হোক একটা জবাব তো।

বাবুলের বয়স চৌদ্দ বছর হ'য়ে গেল, এবারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছে, কিন্তু তার মা তবু তাকে একলা যেতে দেবেন না কোথাও। স্কুল থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসা চাই; একটু দেরি হলেই কুরুক্ষেত্রকাণ্ড করবেন তিনি; বাড়ির সামনের মাঠটাতেই খেলতে হ'বে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে।

অনেক জোর-জবরদস্তি করে' স্কুলের ক্রিকেট-খেলাতে যাবার সে অনুমতি পেয়েছিল, তা-ও পাড়ার হারু মাস্টার প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে যে তিনি নিজে মাঠে থাকবেন এবং বাবুলকে নিজে সঙ্গে করে' বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবেন রোজ সন্ধ্যাবেলা।

সেবার গঙ্গার ঘাটে অর্ধোদয় যোগের অতবড় মেলা হয়ে গেল, পাড়ার সবাই দেখতে গেল, যাওয়া হ'ল না কেবল বাবুলের—বিশ্বাসযোগ্য কোনও সঙ্গী পাওয়া গেল না বলে'। বাবুলের বাবা সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত প্র্যাকটিস করে' বেড়ান, বাবুলকে সঙ্গে করে' মেলায় যাবার অবসর নেই তাঁর!' মা নিজেই সঙ্গে করে' নিয়ে যাবেন বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরও সময় হ'ল না। এর কোনও মানে হয়?

স্কুল থেকে স্কাউটের দল কতবার কত জায়গায় ঘুরে এল—খড়্গপুর লেক, মন্দারের পাহাড়, গৈবীনাথ, বটেশ্বরনাথ। মা কোথাও যেতে দিলেন না বাবুলকে! তাঁর কেবলি ভয়--যা অন্যমনস্ক ছেলে, কোথায় হারিয়ে যাবে হয়তো, কোথায় পড়ে যাবে···! সবাই সিনেমা দেখে—সে দেখতে পায় না।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার পর বাবুল জেদ ধরে বসল এবারে সে বেরুবেই এবং একলা।

মাকে বললে—"মা, আমি মামার বাড়ি ঘুরে আসি"

"কার সঙ্গে যাবি?"

"একাই যাব"

"তিন তিনটে স্টেশন একা যাবি কি ? সে কি হয় বাবা ?"

"না আমি নিশ্চয়ই যাব, তুমি বাধা দিও না।"

"মিঠ্ঠু সঙ্গে যাক না হয়"

"না, কেউ সঙ্গে যেতে পাবে না। আমি কি একা যেতে পারি না তুমি ভাব ?"

"গাড়িতে উঠতে গিয়ে পা-টা ফস্‌কে যদি যায় ! যা ভিড় আজকাল বাবা !"

"না, আমি যাব ঠিক"

"কি দরকার বাবা বিপদের মুখে যাবার ?"

"না, আমি যাবই"

সোরগোল তুলে মহা হাঙ্গামা বাধিয়ে বসল বাবুল। মা কিছুতে রাজী হন না তবু। শেষকালে অনশন শুরু করলে সে।

বাবা সকালে উঠেই প্র্যাকটিসে রেরিয়ে যাচ্ছিলেন, মা ডেকে বললেন, "তুমি বাবলুকে কিছু বলছ না, দেখ ও কি কাণ্ড শুরু করেছে !'

বাবা বললেন, "যেতে চাইছে, যাক না কি করবে বাড়িতে বসে' বসে' ?—"

"তিন-তিনটে স্টেশন, একা যেতে পারে কখনও ছেলেমানুষ ?"

"কতদিন আগলে আগলে থাকবে তুমি ওকে ? যাক ঘুরে আসুক"

"চল না, আমরা সুদ্ধু যাই ?"

"আমার সময় কই ? তুমিই বা যাবে কি করে', বিনুর পরীক্ষা সামনে। ও যাক। এই নে—"

বাবা হঠাৎ একখানা পাঁচ টাকার নোট বার করে' দিয়ে দিলেন বাবুলকে। বাবুল হাতে স্বর্গ পেল যেন !

"ও একলা যাবে ?" বিস্মিত মা প্রশ্ন করলেন।

"যাক না। দিনের ট্রেনে যাবে। ঘণ্টাখানেকের তো ব্যাপার !"

বাবুলের বাবা বেরিয়ে গেলেন।

"আমাকে খেতে দাও শিগ্‌গির"—বাবুলের আর তর সইছে না।

"ট্রেনের দেরি কত ?"

"আর ঘণ্টাখানেক আছে মোটে"

"একা যাবি ? আমার ভয় করছে বাপু !"

"খেতে দেবে তো দাও, তা না হলে চললাম আমি"

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেলেন বাবুলের মা।

"কাপড়-জামা নিবি কিসে?"

"পুঁটলি করে' বেঁধে দাও না!"

"আর টাকাটা"

"বুক-পকেটে থাকবে।"

"একটা ছোট মনিব্যাগ নিয়ে যা না হয়। খুচরো পয়সা পকেট থেকে পড়ে যাবে হয় তো—"

বাবুল আর মাকে বেশী কথা বলবার সময় দিলে না। কোন রকমে নাকে-মুখে গুঁজে দৌড় দিলে সে স্টেশনের দিকে। বগলে পুঁটুলি, পকেটে মনিব্যাগ!

"ওরে শোন্ শোন্" মা পিছু ডাকলেন আবার।

"গিয়ে পৌঁছন-সংবাদ দিস্। এই পোস্টকার্ড নিয়ে যা। আর শোন্"

"কি আবার?"

"পুজোর ফুল বেলপাতা নিয়ে যা পকেটে করে'।"

ফিরে এল বাবুল। পুজোর ফুল-বেলপাতা মাথায় ঠেকিয়ে তার পকেটে সেগুলো দিয়ে দিলেন মা।

"খুব সাবধানে যেও। গোঁয়াতুর্মি করে' যাচ্ছ—"

"ঠিক পৌঁছে যাব, কিছু ভেব না তুমি।"

বাবুল কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এল। ফিরে এসে মাকে প্রণাম করল একটা ঢিপ করে'! তারপর দে ছুট!

স্টেশনে ভয়ানক ভিড়। থার্ড ক্লাস বুকিং-আপিসের সামনে তো একটা দাঙ্গা হচ্ছে যেন। থার্ডক্লাস টিকিট করেই যাবে সে। অনর্থক বেশী পয়সা খরচ করতে যাবে কেন? দেখাই যাক চেষ্টা করে।

পুঁটুলিটা প্ল্যাটফর্মে একধারে রেখে ঢুকে পড়ল সে ভিড়ের মধ্যে।

জমাট ভিড়। তবু ঠেলে-ঠুলে এগুতে লাগল সে একটু একটু করে'। কারও বগলের তলা দিয়ে, কারও পাশ কাটিয়ে, কারও পা মাড়িয়ে হাজির হ'ল সে অবশেষে টিকিট-বিক্রির ঘুলঘুলির কাছে।

"বরিয়াপুরের টিকিট দিন তো একখানা।"

টিকিটের দাম বার করতে গিয়েই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল! পকেটে মনিব্যাগ নেই।

সরে এল ঘুলঘুলির কাছ থেকে। যতটা সম্ভব এদিক্ ওদিক্ চেয়ে চেয়ে দেখলে, কোথাও নেই ব্যাগটা। প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে দেখে পুঁটুলিটাও নেই।

বাবুলের পৌছন-সংবাদ না পেয়ে চিন্তিত হ'য়ে বসে আছেন বাবুলের মা। ছেলে চারদিন গেছে, এখনও পর্যন্ত কোনও পৌছন-সংবাদ এল না। সঙ্গে পোস্টকার্ড দিয়ে দিয়েছেন!

"আজকাল ডাকের গোলমাল হচ্ছে"—বাবুলের বাবা বললেন।

"কাল এমন বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি একটা!"

"তুমি চলেই যাওনা না হয় মিঠুকে নিয়ে। পরের ট্রেনে ফিরে এস কাল। বিনুর পরীক্ষার তো দেরি আছে এখনও হপ্তাখানেক। টেলিগ্রাম করতে যা খরচ, তোমাদের যেতে আসতেও তাই! টেলিগ্রামও ঠিক যাচ্ছে না আজকাল"

মিঠুকে নিয়ে চলেই গেলেন শেষে তিনি বাপের বাড়ি। সেখানে গিয়ে কিন্তু অকূল পাথারে পড়লেন! বাবুল আসে নি! বাবুলের মামা-মামী শুনে বললেন—"সে কি!"

হৈ চৈ পড়ে গেল। টেলিগ্রাফের উপর টেলিগ্রাফ, থানায় খবর, হাসপাতালে খবর,—বাবুলের বাবাও চলে এলেন প্র্যাকটিস স্থগিত রেখে। চারিদিক তোলপাড় হ'তে লাগল, কিন্তু বাবুলের কোনও খবর পাওয়া গেল না।

শেষে সপ্তম দিনে—যখন বাবুলের মামা বাবুলের একটা ফটো-সুদ্ধ বিজ্ঞাপন পাঠাতে যাচ্ছেন কাগজে, তখন বাড়ির ছোট ছেলে খোকন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে খবর দিলে—"বাবুল-দা এসেছে!"

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন সবাই।

এসে দেখলেন বাবুলচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন উঠোনে—একপা ধুলো,—একমুখ হাসি!

"কি রে, কোথায় ছিলি তুই?"

"হেঁটে এলাম"

"কেন?"

"স্টেশনেই টাকা পুঁটুলি চুরি হ'য়ে গেল সব"

"ঐ চল্লিশ মাইল রাস্তা তুই হেঁটে এলি ?"—মা জিজ্ঞাসা করলেন।

"তোমাকে বলে' এসেছিলুম যে ঠিক পৌছব। দেখ, ঠিক পৌঁছেছি কি না!"

হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল বাবুলের মুখ।

প্রদীপ

ঘরের কোণে চকচকে পিলসুজের উপর মাটির প্রদীপটি জ্বলছে। বাইরে অন্ধকার থমথম করছে। ঝিঁঝি ডেকে চলেছে ক্রমাগত।

খোকন প্রদীপের আলোয় বসে' পড়ছিল। কাছেই একটি আরামকেদারায় দাদু বসে' বসে' পা দোলাচ্ছিলেন আর টান দিচ্ছিলেন গড়গড়ায়; অম্বুরী তামাকের গন্ধে ঘর ভরপুর।

পিতৃমাতৃহীন খোকনকে তিনিই মানুষ করেছেন। স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসেন এবং নিজে গিয়ে নিয়ে আসেন স্কুল থেকে ছুটির পর। তার সঙ্গে খেলাও করেন, বেড়াতেও যান। এমন কি সিনেমাতেও নিয়ে যান। একদণ্ড চোখের আড়াল করেন না। বাড়িতে নিজেই তাকে পড়ান।

বিজ্ঞানের খুব বড় অধ্যাপক ছিলেন তিনি। এখনও মাঝে মাঝে কলেজে গিয়ে বক্তৃতা দিতে হয়। কিন্তু এখন আর চাকরি করেন না, বছর দুই আগে চাকরির মেয়াদ শেষ হ'য়ে গেছে। এখন পেনসন ভোগ করেন আর খোকনকে নিয়ে থাকেন। পেনসনের সবটুকু তিনি নিজে ভোগ করেন না, অধিকাংশই দান করে দেন। অনেক গরীব ছেলের স্কুলকলেজের মাইনে দেন, অনেক গরীব আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করেন। তাই তাঁর বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো নেই, মাটির প্রদীপ।

খোকন একটা গল্পের বই পড়ছিল। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, দাদু, তুমি হাড় থেকে বজ্র তৈরী করতে পার?"

খোকনের ধারণা তার দাদু মস্তবড় একজন বিজ্ঞানী।

"না, আমি কিছুই পারি না, কেবল খেতে আর ঘুমুতে পারি"

"তুমি খাও ত মোটে এক বেলা আর কখন যে ঘুমোও তাতো দেখতেই পাই না। কলেজে গিয়ে কত রকম এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট কর—আমি সব জানি। নরেশ-বাবু আমাকে সব বলেছেন—। বল না, হাড় থেকে বজ্র তৈরী করা যায় কি না! নিশ্চয় যায়, এইতো লিখেছে দধীচি মুনির হাড় থেকে বজ্র তৈরী করে' বৃত্রাসুরকে মারা হয়েছিল। অ্যাটম্‌ বম্‌ জিনিসটা কি—"

"আর একটু বড় হ'লে বুঝতে পারবে। তবে অ্যাটম্ বম্ আর বজ্র এক জিনিস নয়। অ্যাটম্ বম্ হাড় থেকে হয় না।"

"সেকালে দধীচি মুনির হাড় থেকে যখন বজ্র হয়েছিল, তখন একালেও নিশ্চয় হ'তে পারে,—পারে না?"

"নিশ্চয় পারে। হচ্ছেও।"

"কোথা?"

"সর্বত্র। তোমার চোখের সামনেই হচ্ছে, তুমি দেখতেও পাচ্ছ, কিন্তু বুঝতে পারছ না—"

"হাড় থেকে আমার চোখের সামনে বজ্র হচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না? কি রকম?"

দাদু হাঁটু দোলাতে লাগলেন।

গড়গড়ার মৃদু গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল তারপর। তারপর বাইরের ঝিঁঝির শব্দটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। খোলা জানালা দিয়ে খোকন দেখতে পেল, বাইরে অন্ধকার থমথম করছে। চাপ চাপ জমাট অন্ধকার।

"দাদু, কিছু বলছ না যে—"

দাদু হয়তো কিছু বলতেন। কিন্তু বাধা পড়ল।

রাঁধুনী এসে বললে, "খোকন, খাবার দিয়েছি তোমার। খেয়ে নাও এসে—"

দাদুও বললেন, "যাও খেয়ে এস—"

খোকনকে উঠে যেতে হ'ল।

খেয়ে এসেই খোকন বললে, "দাদু, বল না কোথায় বজ্র হচ্ছে আজকাল। আমার চোখের সামনে হচ্ছে?"

"হচ্ছে। বড় হলে বুদ্ধি বাড়লে চোখের দৃষ্টি আরও পরিষ্কার হবে, তখন দেখতে পাবি—"

"এখন পাব না?"

"কই পাচ্ছিস?—"

খোকন বুঝতে পারলে, দাদু এখন অন্য কিছু একটা ভাবছেন, বজ্র নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী নন। দাদুর মাঝে মাঝে ওরকম হয়। কি যেন ভাবেন বসে' বসে'। চোখ বুজে পা দোলাচ্ছেন খালি। নিশ্চয় ভাবছেন কিছু। খোকনের হঠাৎ মনে

পড়ল, ফোর্থ মাস্টারমশাই চারটে অঙ্ক দিয়েছেন বাড়ি থেকে করে' নিয়ে যাবার জন্য। গল্পের বই পেয়ে সেকথা ভুলেই গিয়েছিল সে। তাড়াতাড়ি গিয়ে অঙ্ক কষতে বসল। দাদু চোখ বুজে পা দুলিয়ে যেতে লাগলেন। বজ্র আর দধীচির কথা চাপা পড়ে গেল।

...অঙ্ক কষা শেষ করে' বই খাতা গুছিয়ে রেখে খোকন যখন শুতে এল, তখনও দাদু তেমনি ভাবে বসে আছেন।

"দাদু, শুতে যাবে না?"

"চল—"

"আজ কিন্তু তোমার একটা গল্প বলবার কথা ছিল। ভুলে গেছ নিশ্চয়—"

"গল্পই ভাবছিলাম। চল বলছি—"

দাদু বলছিলেন, "কল্পনা কর একটা লোক কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। করেছিস?"

"করেছি—"

"দরদর করে' ঘাম পড়ছে তার। হাঁপিয়ে পড়েছে বেচারা। কিন্তু তবু থামছে না, ক্রমাগত কুপিয়ে চলেছে। মাটি কুপিয়ে জমা করছে একধারে। আর তার বউ কুয়া থেকে জল তুলে সেই মাটিতে জল ঢেলে কাদা তৈরি করছে। কল্পনা করেছিস্?"

"করেছি—"

"আচ্ছা, এইবার কোদালটার কথা ভাবা যাক। কোদাল কি করে' তৈরি হয় জানিস?"

"হ্যাঁ। লোহা আর কাঠ দিয়ে—"

"লোহা কোথা থেকে আসে?"

"খনি থেকে—"

"খনির লোহা থেকে কি করে' কোদাল হয়?"

"লোহা গলিয়ে, তারপর—"

খোকন থেমে গেল। লোহা গলাবার পরে আর কি কি করলে কোদাল হয়, তা সে ঠিক জানত না।

"তারপর, ঠিক জানি না। গলানো লোহাটা ছাঁচে ঢালাই করে বোধ হয়—"

"হ্যাঁ। আরও অনেক কিছু করে। লোহাকে যে আগুনে গলাতে হয়, এইটুকুই শুধু মনে রাখ এখন। কোদালের বাঁটের কাঠ আসে কোথা থেকে ?"—

"গাছ থেকে কেটে নেয়—"

"ঠিক। এ কথাটাও মনে রেখ, গাছ কেটে তবে কোদালের বাঁট হয়। আচ্ছা, এবার আর একটা কল্পনা কর। ঘুম পাচ্ছে নাকি ?"

খোকন এবার বিরক্ত হল।

"তোমাকে গল্প বলতে বলছি, আর তুমি আমাকে খালি জেরা করছ—"

"ওর থেকেই একটা গল্প গড়ে' উঠবে, দেখ না—"

"কি কল্পনা করতে হবে এবার—"

"কল্পনা কর, একজন চাষী মাঠে চাষ করছে। কখনও রোদে পুড়ে, কখনও জলে ভিজে। এক কথায় সমস্ত শরীর পাত করে'। ছবিটা মনে মনে দেখ খানিকক্ষণ। দেখছিস ?"

"দেখছি। কিন্তু তোমার গল্প কোথায় ?"

"গল্প তুই নিজে তৈরি করবি। আমি গল্পের মালমসলা তোকে যোগাড় করে' দিচ্ছি। এইবার ভাবতে হবে লাঙলের কথা। আবার সেই কাঠ আর লোহা। গাছ কেটে চিরে ছুলে লাঙল তৈরি হয়েছে, আর খনি থেকে লোহা তুলে তাকে আগুনে গলিয়ে ফাল তৈরি হয়েছে। তারপর, তার গরু দুটোর কথা। কত কষ্ট করে' লাঙল টানছে তারা। কল্পনা করছিস ?"

"করছি। কিন্তু এসবে গল্পের মালমসলা কি আছে—"

"আছে, আছে। আচ্ছা, এইবার মাটির কথাটা ভাব, যার বুক চিরে লাঙলের ফাল চলেছে ক্রমাগত দিনের পর দিন। ভাবছিস ? খুব ভাল করে' ভাব, আমি ততক্ষণ দু'চার টান তামাক খেয়ে নি—"

খোকন ভাবতে লাগল।

সত্যিই একটা নূতন কথা তার মনে হতে লাগল—কষ্টের কথা, দুঃখের কথা, মাটির বুক চিরে লাঙল চলছে, লোহা আগুনের তাতে গলে যাচ্ছে, গরু দুটোর কি কষ্ট, ওই চাষীর কষ্টও কি কম ?

গড়গড়ার মৃদু গম্ভীর শব্দ হচ্ছে মাঝে মাঝে। তার ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে

ঝিঁঝির শব্দ। জানালা দিয়ে চাপ চাপ অন্ধকার দেখা যাচ্ছে, অন্ধকারের ওপারে আকাশ, তাতে তারা জ্বলছে কয়েকটা……

দাদুর তামাক খাওয়া শেষ হ'ল।

বললেন, "এইবার কল্পনা কর মাঠে ফসল্ হয়েছে। চারিদিক সবুজে সবুজ—"

"কি ফসল—"

"রেড়ি আর কাপাস। একটা জমিতে রেড়ি আর একটা জমিতে কাপাস—"

"ধান নয়?"

"তোমাকে যে গল্পের মালমসলা দিচ্ছি তাতে ধান দরকার নেই, রেড়ি আর কাপাসের দরকার। তাই এ কল্পনা করতে বলছি। করছ?"

"করছি—"

"তারপর কল্পনা কর, মানুষ জীবন্ত রেড়ি আর কাপাস গাছ থেকে রেড়ির বীজ আর কাপাসের তুলো সংগ্রহ করছে। অসংখ্য জীবন্ত গাছ রেড়ি আর তুলো দিচ্ছে……"

আবার দাদু চুপ করে' গেলেন।

"তারপর—"

"সেই মাটির কাছে ফিরে যাওয়া যাক এবার।"

"কোন্ মাটি?"

"সেই যে একটা লোক কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখছিল। কল্পনা কর, সে মাটির চেহারা বদলাচ্ছে। তা কুমোরের চাকে উঠে নানারকম বাসনে রূপান্তরিত হচ্ছে। কলসী, হাঁড়ি, সরা, ধুনুচি, প্রদীপ—নানা চেহারার নানারকম বাসন।"

"তারপর?"

"তারপর সেগুলোকেও আগুনে পোড়ানো হচ্ছে। পুড়ে পুড়ে শক্ত হচ্ছে তারা—"

"তারপর?"

"তারপর এইবার চল সেই রেড়ির বিচিগুলির কাছে। ঘানিতে ফেলে তাদের পেষা হচ্ছে। চোখে ঠুলি পরে' একটা গরু ঘানি ঘোরাচ্ছে। ক্রমাগত ঘুরে চলেছে সে, ক্লান্তি আসছে, পা ব্যথা করছে, কিন্তু থামবার জো নেই। থামলেই পিঠে লাঠি

পড়ছে। এইবার ঘানির কথা ভাব। গাছ কেটে যেমন কোদালের বাঁট হয়েছিল, লাঙল হয়েছিল, তেমনি ঘানিও হয়েছে। ঘানিতেও লোহা আছে, যে লোহা আগুনে গলে' তবে মানুষের কাজে লাগে—"

...আবার দাদু চুপ করলেন।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ, ঝিঁঝিগুলোও আর ডাকছে না।

খোলা জানালা দিয়ে কালো আকাশটা দেখা যাচ্ছে, আকাশের নক্ষত্রগুলো কি উজ্জ্বল। নক্ষত্রের আলো কি যেন বলতে চাইছে খোকনকে, কিন্তু খোকন বুঝতে পারছে না...

"কল্পনা করেছিস ?"

"করেছি।"

"আচ্ছা, এইবার চল কাপাস তুলোর কাছে। তুলোকে ছিন্নভিন্ন করে' পেঁজা হচ্ছে, তারপর ধোনা হচ্ছে। তারপর তা পাকিয়ে সুতো হচ্ছে, সেই সুতো থেকে কাপড় হচ্ছে। যে সব যন্ত্র এসব করছে, তা তৈরি হয়েছে লোহা আর কাঠ থেকে। গাছ নিজের অঙ্গচ্ছেদ করে কাঠ হয়েছে, লোহা আগুনে গলেছে।"

দাদু চুপ করলেন আবার।

"তারপর ?"

"এইবার দধীচি আর বৃত্রাসুরের গল্পে ফিরে যাওয়া যাক। অন্ধকারও অসুরের মতোই ভয়ঙ্কর। তাকে নাশ করে আলো। ওই ছোট্ট প্রদীপের আলো অন্ধকার অসুরের মাথায় বজ্র হেনেছে। এইবার ভেবে দেখ্ দিকি, ওই ছোট্ট প্রদীপের আলোটুকুকে সম্ভব করবার জন্যে কতগুলি দধীচিকে আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছে। যখন বড় হবে তখন বুঝবে, নানারকম অসুর নানা ভাবে আমাদের বিব্রত করতে চেয়েছে যুগে যুগে, কিন্তু পারে নি, কারণ দধীচিরাও জন্মেছে যুগে যুগে নানারূপে। এখনও জন্মাচ্ছে—"

দাদু চুপ করলেন।

খোকন চেয়ে দেখলে প্রদীপের শিখাটি যেন হাসছে আর আকাশের নক্ষত্রগুলো যেন যোগ দিয়েছে সে হাসিতে।

টিয়া-চন্দনা

টিয়া আর চন্দনা, দুই বোন।

একই পিতা-মাতার সন্তান তারা, একই পরিবেশে মানুষ হয়েছিল। একরকম খাবার খেয়ে, একরকম পোশাক পরে, এক বিছানায় শুয়ে, একরকম খেলা খেলে ছেলেবেলাটা কেটেছিল তাদের। এক স্কুলে একই মাস্টারের কাছে পড়াশোনাও করেছিল দু'জন একসঙ্গে। কিন্তু জীবন তাদের একরকম হলো না। কেন হলো না তার বিচার করবেন পণ্ডিতেরা, কি হয়েছিল তা শোনো :

টিয়া ও চন্দনার চেহারা যদিও অনেকটা একরকম ছিল, কিন্তু রং ছিল আলাদা। টিয়া ছিল কালো, আর চন্দনা ছিল ফরসা। কি করে' একজনের রং কালো আর একজনের রং ফরসা হয়, আর কেন যে লোকে কালো-ফরসা নিয়ে মাথা ঘামায় তার বিচার করুন পণ্ডিতেরা, কিন্তু রঙের এই সামান্য তারতম্য এদের দু'জনের জীবনে হঠাৎ যে ব্যবধান সৃষ্টি করলো তা বিপুল।

টিয়া-চন্দনার বাবা নিবারণবাবু বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সজ্জন ছিলেন, কিন্তু ধনী ছিলেন না। অল্প বেতনে স্কুলে মাস্টারি করতেন, আর সকাল-সন্ধ্যে করতেন—প্রাইভেট-ট্যুশনি। ভোর থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত পরিশ্রম করেও কিন্তু তিনি মাসে আড়াইশো টাকার বেশী রোজগার করতে পারতেন না। এতে কোনক্রমে সংসার চলতো তাঁর, বিশেষ কিছু বাঁচাতে পারতেন না। মেয়ে দুটিকে কিছুদূর পড়িয়েছিলেন তবু। নিজে মাস্টার ব'লে পড়াতে পেরেছিলেন। তাও সম্ভব হতো না, যদি তাঁর ছেলে থাকতো। আর ছেলেমেয়ে হয়নি ভদ্রলোকের। ছেলে থাকলে তাকেই পড়াতে হতো আগে।

টিয়া-চন্দনা স্বাভাবিক নিয়মে বড় হ'য়ে উঠতো লাগলো। তাদের বাড়ন্ত গড়ন দেখে, স্বাস্থ্য দেখে আনন্দ হওয়ার কথা। কিন্তু নিবারণবাবু আর তাঁর স্ত্রী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিয়ে দিতে হবে, অনেক টাকা চাই। কোথায় পাবেন অত টাকা! রোজগার থেকে কিছুই তো বাঁচাতে পারেন নি। বরং ধারই আছে বাজারে কিছু।

চন্দনা বড়। তার জন্যেই বিয়ের চেষ্টা হ'তে লাগলো আগে। দু'একজন দেখে গেলেন, একজন বললেন, চন্দনা নাকি খুব সুলক্ষণা, কিন্তু পণের পরিমাণ শুনে

পেছিয়ে আসতে হলো নিবারণবাবুকে। দশ হাজার টাকা চায়! কি সর্বনাশ! যতই দিন যায় ততই নিবারণবাবুর চিন্তা বাড়ে। শেষকালে এমন হলো যে, রাত্রে ঘুম হতো না তাঁর। নিবারণবাবুর স্ত্রী একদিন বললেন, "আমার যা দু'একখানা গয়না আছে তা বেচে দাও। দেশের জমিটাও বিক্রি করে' ফেল। কি হবে ওসব থেকে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে যেমন করে' হোক—"

নিবারণবাবু ইতস্ততঃ করছিলেন, এমন সময় একদিন অদ্ভুত কাণ্ড হ'য়ে গেল একটা। ঠিক যেন রূপকথার কাণ্ড! রূপকথায় নিশ্চয় পড়েছো, এক রাজাহীন রাজ্যের রাজহস্তী শূন্য সিংহাসন পিঠে নিয়ে রাস্তায় ছুটে বেরিয়েছিল, আর এক গরীবের ছেলেকে শুঁড়ে করে' তুলে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিল—এও যেন অনেকটা তেমনি হলো।

রাস্তার কলে জল ভরছিল চন্দনা। হঠাৎ তার নজরে পড়লো একটি ক্ষীণকান্তি লোক ভ্রূকুঞ্চিত করে' তীব্রদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে তাকে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো সে, একটু বিরক্তও হলো। তাড়াতাড়ি জল ভরে' বাড়ির দিকে চলে' গেল সে। বাড়িতে এসে দেখে, লোকটি তার পিছু-পিছু আসছে।

—"তোমার নাম কি মা?"

প্রশ্ন শুনে চন্দনা অবাক্ হয়ে গেল।

—"আমার নাম, চন্দনা"

—"তোমার বাবা বাড়ি আছেন?"

—"আছেন"

—"একবার ডেকে দাও তো—"

নিবারণবাবু বেরিয়ে এলেন। সব শুনে অবাক্ হয়ে গেলেন তিনি। ক্ষীণকান্তি লোকটি কেউ-কেটা নন্। মধ্যপ্রদেশের এক রাজ-পরিবারের কুল-পুরোহিত। রাজকুমারের বধূপদে বরণ করবার জন্য তিনি এক সর্বসুলক্ষণা রূপসী কিশোরীর খোঁজে বেরিয়েছেন। চন্দনাকে দেখে পছন্দ হয়েছে তাঁর। তিনি চন্দনার জাতি-বংশ-পরিচয়-গোত্র ইত্যাদি জানবার জন্য উৎসুক হয়ে এসেছেন। সব যদি মিলে যায় তাহলে চন্দনাকে তিনি রাজবধূ করবার জন্য নির্বাচিত করবেন।

আশ্চর্যের বিষয়, সব মিলে গেল। পুরোহিতমশায় চলে' গেলেন, বলে' গেলেন, চন্দনাকেই নির্বাচন করলেন তিনি। যথাসময়ে চিঠি আসবে।

চিঠি এলো সত্যি-সত্যি। অবাক্ হয়ে গেলেন নিবারণবাবু। আরব্য উপন্যাসের আবু হোসেনও বোধ হয় এত অবাক্ হয়নি।

পর-পর সব ঘটনা ঠিক যেন যাদু-মন্ত্রবলে ঘটতে লাগলো। নিবারণবাবু ছুটি নিয়ে গেলেন বরকে আশীর্বাদ করতে। প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, প্রকাণ্ড হাতা, হাতী, ঘোড়া, কুকুর, মোটর, সিপাহী-সান্ত্রী—এলাহি কাণ্ড-কারখানা দেখে হকচকিয়ে গেলেন তিনি। রাজকুমারকে যথারীতি আশীর্বাদ করলেন। রাজকুমার সুশ্রী, কিন্তু একটু রোগা বলে' মনে হলো।

বিবাহের একসপ্তাহ আগে বরপক্ষের লোকেরা এসে পড়লেন কোলকাতায়। প্রকাণ্ড বাড়ি ভাড়া করলেন। তারপর একদিন প্রচুর গয়না, কাপড়, মিষ্টান্ন প্রভৃতি নিয়ে আশীর্বাদ করে' গেলেন চন্দনাকে। তাঁদের খরচেই চন্দনাদের বাড়ির সামনেও নহবত বসলো বিয়ের তিনদিন আগে থেকেই। বিয়ের দিন যা হলো তা অবর্ণনীয়। ফুলের, আলোর, রঙের আর সুরের মহোৎসব পড়ে' গেল। বহুরকম বাজনা বাজিয়ে বাজি পুড়িয়ে বর এলো—ময়ূরে রূপান্তরিত এক প্রকাণ্ড মিনার্ভা গাড়ি চড়ে'।

যে চন্দনা দারিদ্র্যের দুঃসহ শীতে কষ্ট পাচ্ছিলো, অপ্রত্যাশিত ভাবে তার জীবনে বসন্ত এসে গেল হঠাৎ

চন্দনার বিয়ের কিছুদিন পরে—টিয়ার জীবনেও বসন্ত এলো। কিন্তু এ-বসন্ত ঋতুরাজ বসন্ত নয়, বসন্ত রোগ। যমে-মানুষে টানাটানি চললো কিছুদিন, তারপর বাঁচলো সে কোনক্রমে। না বাঁচলেই বোধ হয় ভালো ছিল; একে কালো রং, তার উপর মুখময় বসন্তের দাগ হ'য়ে সে যেন একটা বিভীষিকার মতো হ'য়ে উঠলো।

নিবারণবাবু আবার বিনিদ্র রজনী যাপন করতে লাগলেন।

অনেক কষ্টে টিয়ার বিয়ে হলো অবশেষে। কিন্তু অনেক খুঁজতে হলো, অনেকদিন অপেক্ষা করতে হলো, অনেক লোক এসে টিয়াকে অনেকবার দেখে, অনেকবার অপছন্দ করে' গেল, অনেক জলখাবার খাওয়ান হলো অনেক অবাঞ্ছিত লোককে, নিবারণবাবু অনেকের কাছে অনেকবার হাতজোড় করলেন—তারপর ঠিক লোকটি এলো।

লোকটি অবশ্য পাত্র হিসাবে ভালো। দেখতে ভালো, চরিত্র ভালো, বংশ

ভালো, লেখাপড়ায়ও ভালো। কিন্তু প্রধান খুঁত—অবস্থা ভালো নয়। পিতৃ-মাতৃহীন সুশীল নিজের চেষ্টাতেই বি. এ. পার করেছিল, নিজের চেষ্টাতেই রেলের চাকরি যোগাড় করেছিল। মাথায় বুদ্ধি ছিল, মনে জোর ছিল, কিন্তু ব্যাঙ্কে টাকা ছিল না। এই সুশীলই একদিন এসে বিনা-পণে বিয়ে করে' নিয়ে গেল কুৎসিত টিয়াকে।

চন্দনার স্বামী রাজকুমার গৌরীনাথ অসুস্থ ছিল বলে' বিয়ের সময় চন্দনা আসতে পারেনি। কিছু গয়না আর কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল কেবল।

টিয়া আর চন্দনার বিয়ে হবার কিছুদিন পরেই নিবারণবাবু সস্ত্রীক মারা গেলেন কলেরায়। সাংসারিক কর্তব্য শেষ হওয়ামাত্রই যেন চলে গেলেন তাঁরা।

টিয়া আর চন্দনার মধ্যে যে যোগসূত্রটুকু ছিল তা ছিঁড়ে গেল।

চন্দনা রইলো মধ্যপ্রদেশে এক ধনীর প্রাসাদে, আর টিয়া রইলো এক অখ্যাত স্টেশনের কোয়ার্টারে মালবাবুর বউ হ'য়ে।

বছর-দুই-কাটলো।

চন্দনা আর টিয়ার কোনো খবর রাখে না, টিয়াও আর চন্দনার কোনো খবর পায় না। আপন-আপন সংসার নিয়ে দুজনেই ব্যস্ত। তারা যে এক মায়ের পেটের দুই বোন, একই রক্তধারা যে তাদের শরীরে বইছে, এ-কথা মনে করবার অবকাশই পেতো না কেউ।

চন্দনা ব্যস্ত তার অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে। রাজকুমার গৌরীনাথের রোজ জ্বর হয়, অনেক চিকিৎসা করিয়েও কোনো ফল হচ্ছে না। বিয়ের আগে থেকেই নাকি জ্বর হতো। রাজবাড়ির জ্যোতিষী নাকি কোষ্ঠী গণনা করে' বলেছিলেন, একটি সর্বসুলক্ষণা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'লে রাজকুমার সুস্থ হতে পারেন। জ্যোতিষীর ফরমাশ-অনুযায়ী মেয়ে সুলভ হয়নি। দেশ-দেশান্তরে লোক পাঠাতে হয়েছিল। অনেকদিন পরে সন্ধান মিলেছিল চন্দনার। গৌরীনাথ যে চির-রোগী, এ-খবর সযত্নে গোপন করে' রাখা হয়েছিল চন্দনার বাবার কাছ থেকে। চন্দনার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরে গৌরীনাথ ভালোও ছিল কিছুদিন। কিন্তু তা কিছুদিন মাত্র। আবার জ্বর শুরু হয়েছে। বড়-বড় ডাক্তার আসছে, হাওয়া বদল করবার জন্যে

ভালো-ভালো জায়গায় বাড়ি নেওয়া হচ্ছে, অর্থব্যয় হচ্ছে জলের মতো, জ্বরের কিন্তু উপশম নেই।

টিয়া ব্যস্ত তার গৃহস্থালি সামলাতে। সুশীলের বদলির চাকরি। আজ এ-স্টেশন, কাল ও-স্টেশন। মাইনে বেশী নয়। গ্রামে এক বিধবা পিসী আছেন, প্রতিমাসে মাসোহারা পাঠাতে হয় তাঁকে। সুশীল যদি দুঃশীল হতো—অর্থাৎ অন্যান্য মালবাবুর মতো 'ঘুষ' নিতে পারতো, তাহ'লে টিয়ার সংসারে অসচ্ছলতা থাকতো না। এক-একজন মালবাবুর কি বাড়-বাড়ন্তই দেখেছে টিয়া। মালবাবু তো নয়—যেন লাটসাহেব! রেডিও, গ্রামোফোন, সিঙ্গার মেসিন, দামী-দামী ছিটের জামা, সিল্কের শাড়ি, ভারী-ভারী সোনার গয়না, জড়োয়ার নেকলেস-চুড়ি, ভালো গরু, বিলিতী কুকুর, ময়না, কাকাতুয়া, সিল্কের গেরুয়া-পরা গুরু—কি নেই তাদের! কিন্তু সুশীল কিছুতেই ঘুষ নেবে না। তাই টিয়ার শাড়িতে তালির পর তালি, সুশীলের গেঞ্জি শতছিদ্র, সপ্তাহে একদিনের বেশী মাছ খাবার পয়সা জোটে না, দুধের কথা চিন্তা করাও যায় না। রেডিও-গ্রামোফোন তো কল্পনার বাইরে। চাকর-ঠাকুর রাখবার সামর্থ্য নেই। স্টেশনের একটা কুলীর বউ এসে একটু-আধটু কাজ করে' দিয়ে যায়। জল ঘেঁটে-ঘেঁটে টিয়ার হাতে-পায়ে হাজা হ'য়ে গেছে। অল্প আয়ে সংসার চালাবার ধান্দাতেই ব্যস্ত বেচারী, চন্দনার খবর নেবার অবসরই তার নেই। পাড়াপড়শীর বাড়িতে গিয়ে দু'দণ্ড বসে' গল্প করবার সময়ও পায় না সে।

টিয়ারা তখন ভাগলপুরে।

সুশীল এসে বললে, "তোমার দিদি বোধ হয় এসেছেন এখানে।"

—"দিদি? কোথা?"

—"স্টেশনে। মনে হচ্ছে, তাঁদেরই ফার্স্ট-ক্লাস গাড়ি কেটে রাখা হয়েছে। এখানে বুঢ়ানাথে স্নান করতে এসেছেন শুনলাম। তারপর নাকি গৈবীনাথে যাবেন।"

—"তুমি দেখা করোনি?"

—"আমার সঙ্গে তো আলাপ নেই! তুমি গিয়ে দেখা করে' এসো। ওঁরা বোধ হয় জানেন না যে, আমরা এখানে আছি।"

—"কি করে' জানবেন, চিঠিপত্র তো লেখা হয় না। তুমি খবর নিয়েছো ভালো করে'?"

—"নিয়েছি। তুমি যাও না।"

—"কার সঙ্গে যাবো ?"

—"কিষুণকে নিয়ে যাও।"

কিষুণ, স্টেশনের কুলী। কিষুণের বউই কাজ করে টিয়ার বাড়িতে।

—"তুমি যাবে না ?"

সুশীল হেসে বললে, "আমি জামাইমানুষ, বিনা নিমন্ত্রণে কি যেতে পারি ?"

সুশীলের আড়-ময়লা শতছিদ্র গেঞ্জিটার দিকে চেয়ে টিয়া মুচকি হাসলে একটু, কিছু বললে না। টিয়ার ছেলে হয়েছিল একটি। হৃষ্টপুষ্ট চমৎকার ছেলে। ছ মাস বয়স, কিন্তু এত ভারী যে, টিয়া ভালো করে' কোলে করতে পারে না তাকে। তাকে অতদূর নিয়ে যাওয়া শক্ত। কিষুণ নিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু এখন ঘুমের সময় কাঁদবে হয়তো। তাই তাকে ঘুম পাড়িয়ে একাই গেল সে। ছেলেকে চট্ করে' ঘুম পাড়াবার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিল লখিয়া, কিষুণের বউ।

চন্দনাকে দেখে সে অবাক্ হয়ে গেল।

চন্দনার মাথায় সিঁদুর নেই, চুলে তেল নেই, পরনে থান! চন্দনা বিধবা হয়েছে ? খবর পায়নি তো সে!

টিয়ার দিকে চন্দনা নির্নিমেষে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করলে, "তুই এখানে কি করে' এলি ?"

—"এইখানেই উনি বদলি হ'য়ে এসেছেন কিছুদিন আগে"

—"ও"

টিয়া এরপর কি যে বলবে তা ভেবে পেলে না। মনে হতে লাগলো, চন্দনা যেন তার বোন নয়, অপর কেউ। অনেক দূরে নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে কবে বিধবা হয়েছে, স্বামীর কি হয়েছিল, এসব কথা পাড়বার সাহস হলো না তার। চন্দনাও কিছু বললে না। নিষ্পলক চোখে টিয়ার দিকে চেয়ে চুপ করে' রইলো সে। টিয়ার মনে হচ্ছিলো পাথর হ'য়ে গেছে সে।

প্রায় মিনিটখানেক পরে (টিয়ার মনে হচ্ছিলো যেন যুগ-যুগান্ত পরে) চন্দনা প্রায় অস্ফুটস্বরে বললে, "আয়, ভেতরে আয়—"

ফার্স্ট-ক্লাস গাড়ির ভিতর টিয়া ঢুকলো।

ঢুকে অবাক্ হয়ে গেল। কি ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি চতুর্দিকে! দেখলে, চন্দনার ছেলে হয়েছে একটি। ঘুমুচ্ছে। চমৎকার রেশমের বিছানা, নেটের মশারি। কতরকম খেলনা। বড়-বড় থার্মোফ্লাস্কই তিন-চারটে, থরে-থরে ফল সাজানো রয়েছে, ছোট-বড় রুপোর বাসন ছড়ানো রয়েছে, ওষুধের শিশি হরেক-রকমের···দাই, চাকর, আয়া, নার্স। টিয়া হকচকিয়ে গেল।

চন্দনার ছেলেটি কিন্তু রোগা। নেটের মশারির ভিতর রেশমের বিছানায় দামী কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছে বটে, চেহারায় কিন্তু লালিত্য নেই।

—"খোকার অসুখ না কি?"

—"হ্যাঁ, উনি চলে যাওয়ার পর থেকেই অসুখ হয়েছে। কিছুতেই সারছে না। আমাদের কুলগুরু বশিষ্ঠপ্রসাদ বলেছেন, যেখানে যেখানে শিব আছেন, সেখানে নিয়ে গিয়ে শিবকে গঙ্গাজলে নাইয়ে, সেই জল দিয়ে ছেলেকে নাওয়ালে ভালো হ'য়ে যাবে। তাই তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

দু'বোনের দূরত্ব-ভাবটা কেটে গেল ক্রমশ। আলাপ শুরু হলো আবার। টিয়া শুনে অবাক্ হয়ে গেল, বিয়ের আগেই নাকি গৌরীনাথের যক্ষা হয়েছিল! সুলক্ষণা চন্দনাকে ওরা বউ হিসেবে নিয়ে যান্নি, ওষুধ হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন। রোগের কিন্তু উপশম হয়নি। গৌরীনাথ মৃত্যুর পূর্বে ভুলটা বুঝতে পেরেছিলেন। উইল করে চন্দনাকেই সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। খোকন যতদিন-না সাবালক হচ্ছে, ততদিন চন্দনাই বিশাল বিষয়ের কর্ত্রী থাকবে।

খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে চন্দনা বললে, "তুই ছেলেকে নিয়ে এলি না কেন?"

—"যা ভারী, আমি তুলতেই পারি না। ঘুমুচ্ছে, তাছাড়া—"

—"তোদের বাসা এখান থেকে কতদূর?"

—"কাছেই।"

—"চল্, দেখে আসি তোর ছেলেকে।"

টিয়ার সঙ্গে চন্দনা গিয়ে হাজির হলো টিয়ার বাসায়। সঙ্গে গেল আসাসোটাধারী দু'জন বরকন্দাজ।

"—কই তোর ছেলে?"

—"ঘুমুচ্ছে।"

—"কোথায়?"

টিয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গেল খোকনকে আনতে। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে খোকন। কিন্তু এ কি! ঠোঁট নীল, নিশ্বাস পড়ছে না, চোখের তারা উল্টে আছে…। চীৎকার করে কেঁদে উঠলো টিয়া।

—"কি হলো?"

চন্দনা ছুটে এলো তাড়াতাড়ি।

—"খোকন এমন হয়ে গেল কেন?"

খোকন মারা গিয়েছিল।

দুরন্ত ছেলেকে সামলানো যেতো না, ঘুম পাড়ানো যেতো না বলে' লখিয়া টিয়াকে শিখিয়ে দিয়েছিল, দুধের সঙ্গে একটু আফিম খাইয়ে দিলে ছেলে চট্ করে' ঘুমিয়ে পড়বে। রোজ পড়তোও। সেদিনও পড়েছিল, সেদিন কিন্তু ঘুম আর ভাঙলো না। আফিমের মাত্রা বেশী হ'য়ে গিয়েছিল।

নির্বাক্ টিয়া আর চন্দনা পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একজন স্বামীহারা, আর-একজন পুত্রহারা। ঘটনা প্রবাহে এক বোন আর-এক বোনের কাছ থেকে দূরে সরে' গিয়েছিল, গভীর শোকের মধ্যে আবার তাদের মিলন হলো।

সুশীল আপিস থেকে ফিরে এসে স্তম্ভিত হয়ে গেল। চন্দনার বরকন্দাজ দুজন ফেরবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল, কারণ, বুঢ়ানাথের মন্দিরে যেতে হবে, খোকার স্নানের সময় নাকি উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

চন্দনা সুশীলের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে অদ্ভুত প্রশ্ন করলে একটা।

—"সুশীলবাবু, আমি যদি আপনার বাসায় থেকে যাই, আপত্তি আছে আপনার?"

—"সে কি কথা! আপত্তি হবে কেন, খুব খুশী হবো। টিয়ার কাছে কেউ থাকলে, ভালোই হয় এখন। কিন্তু আপনি কি থাকতে পারবেন এখানে?"

—"খুব পারবো। আমার খোকনকে নিয়ে টিয়ার কাছেই থাকবো আমি।"

—"আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যদি…"

—"আমার শ্বশুরবাড়িতে আমিই কর্ত্রী। আমার উপর হুকুম করবার কারও অধিকার নেই।"

"বেশ, থাকুন, আমার আপত্তি কি।"

আবার সেই রূপকথার কাণ্ড হলো।

চন্দনা আর ঐশ্বর্যের মধ্যে ফিরে গেল না, গরীব বোন টিয়ার কাছেই থেকে গেল। দাই, নার্স আর আয়ার কবলমুক্ত হয়ে, মা-মাসীর স্নেহে খোকনও ভালো হয়ে উঠলো আস্তে-আস্তে। তীর্থে-তীর্থে আর ঘুরতে হলো না।

করুণা

অনেকদিন আগেকার কথা। তখনও আমাদের পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়নি, জনক সূর্যের অগ্নি তখনও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রদীপ্ত হ'য়ে রয়েছে, চতুর্দিক উত্তপ্ত, সবুজের লেশমাত্র নেই কোথাও। কোনও প্রাণীর জন্ম হয়নি তখনও। কোথাও কোন নদী নেই, ঝরনা নেই, হ্রদ নেই, সমুদ্র নেই। পৃথিবী তখন বিশাল একটা উত্তপ্ত গোলকের মতো ঘুরে চলেছে সূর্যের চারিদিকে। যুগ যুগান্তের অবসান হচ্ছে, কল্প কল্পান্তে। কোথাও শান্তি নেই, স্নিগ্ধতা নেই, আনন্দ নেই, জীবনের বৈচিত্র্য নেই। জন্ম-সময়ে সূর্য তার কানে-কানে বলে' দিয়েছিলেন—তোমার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আছে, তোমার মধ্যে অনেক স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করবে। তপস্যা করো, তপস্যা করো।

পৃথিবী বুঝতেই পারেনি, তপস্যা মানে কি। কি করতে হবে তাকে। সে কেবল ঘুরে চলেছিল সূর্যের চারিদিকে। না ঘুরে উপায়ও ছিল না, একটা অদৃশ্য শক্তি ঘোরাচ্ছিলো তাকে। একটা জিনিস কিন্তু বুঝেছিল পৃথিবী। বুঝেছিল সে অসহায়। তাই হতাশা ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিলো তার বুকের মধ্যে, মাঝে-মাঝে তা প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরিতে মূর্তও হচ্ছিলো বুক ফেটে, তার আকাশ-বাতাসকে প্রকম্পিত করে'। কিন্তু তাতে কোনও ফল হচ্ছিলো না। যে অদৃশ্য বন্ধন তাকে বন্দী করেছে তা একটুও শিথিল হচ্ছিলো না, জ্বালা একটুও কমছিল না, তার উত্তপ্ত উষরতায় শ্যামলতার লেশমাত্রও জাগছিল না। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, আসছিল আর যাচ্ছিলো, কিন্তু তার অন্তরের দাহ কম ছিল না একটুও। অবশেষে হঠাৎ একদিন তা কান্নায় রূপান্তরিত হলো। অতি তীক্ষ্ণ, অতি তীব্র সে ক্রন্দন, মহাশূন্য ভেদ করে' ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে তা কোথায় হারিয়ে যেতে লাগলো তা কেউ জানতো না, সে নিজেও না। তার অন্তরের জ্বালা যে কান্নায় রূপান্তরিত হয়েছে তা-ও সে জানতো না। এই কান্নাই যে তপস্যা, এও তার কল্পনাতীত ছিল। এ-তপস্যার ফল ফলেছিল। কেমন করে' ফলেছিল সেই গল্পই তোমাদের আজ বলবো।

দেবকন্যা করুণা স্বর্গের নন্দনকাননে আনমনা হ'য়ে বসেছিল সেদিন। নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গ-সুখ তার ভাল লাগছিল না। স্বর্গে কোন দুঃখ নেই, তাই সুখের কোনও স্বাদ

নেই। কোনও বৈচিত্র্য নেই স্বর্গের জীবনে। পারিজাতের রূপ, মন্দাকিনীর কলধ্বনি, অপ্সরার নৃত্য, ইন্দ্রের সভা, দেবদেবীর আমোদ-প্রমোদ—সবই ছিল, কিন্তু করুণার মনে তারা আর সাড়া জাগাতে পারছিল না। করুণা কিছু একটা করতে চাইছিল, কিন্তু স্বর্গে করবার মতো কিছু তো নেই, স্বর্গে সব করা হয়ে গেছে, নূতন কাজ নেই, নূতন কাজের প্রেরণাও নেই। স্বর্গের জীবন—একঘেয়ে বিস্বাদ-জীবন। করুণা নন্দনকাননে আনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, তার অন্তরের নিগূঢ়-লোকে ভাষাহীন একটা আগ্রহ, কিছু একটা করবার আগ্রহ ধীরে-ধীরে জাগছিল কেবল। সেই ভাষাহীন ভাবকে কেমন করে' রূপ দেবে সে তাই ভাবছিল একা-একা। ভাবতে-ভাবতে মনে পড়লো বান্ধবী বিজলীর কথা। বিজলী হাসি-খুশিতে ভরা, সারা মুখখানিতে তার হাসি চিকমিক করছে সর্বদা। স্বর্গের সবাই ভালোবাসে ওকে ওর এই হাসির জন্য। হাসি নয়—যেন আলো। ফিক-ফিক করে' যখন হাসে, মনে হয়, আলো জ্বলে উঠলো যেন চোখের ভিতর। এই হাসির জন্যই গম্ভীর দেবতারাও ওকে ভালোবাসে। করুণার কেমন যেন আশ্চর্য লাগে। ও ভেবেই পায় না, কি করে' বিজলী এই একঘেয়ে স্বর্গলোকে এমন আনন্দে আছে। তারপর হঠাৎ মনে পড়লো তার পিতা বরুণের কথা। তার মা নেই, কোনদিন ছিল কি না তাও সে জানে না। জ্ঞান হয়ে থেকে সে বাবাকেই দেখছে। বাবাকেও সে ক্বচিৎ দেখতে পায়। সৃষ্টির কাজে তিনি সর্বদাই ব্যস্ত। একদিন হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "করুণা, তুমি নূতন ধরনের কিছু শুনতে পেয়েছো কি ?"

করুণা অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। নূতন ধরনের কি আবার শুনবে সে! স্বর্গের পাখিদের একঘেয়ে কাকলী, মন্দাকিনীর একঘেয়ে কলতান, নন্দনকাননের একঘেয়ে মর্মরধ্বনি আর অপ্সরীদের একঘেয়ে নূপুর-নিক্কণ, এ ছাড়া আর তো কিছুই শোনা যায় না এখানে। তাই সে উত্তর দিয়েছিল, "না, নূতন ধরনের কিছুই শুনিনি তো—"

"শুনবে···"

আর বেশী কিছু বলেন নি তিনি। করুণা কিন্তু জিজ্ঞাসা করেছিল, "কি শুনবো ?"

"কি শুনবে তা আমিও জানি না। শুধু এইটুকু জানি, তোমার সেই শোনার উপর আমার ছুটি নির্ভর করছে। পিতামহ ব্রহ্মা এইটুকু শুধু বলেছেন আমাকে। দিবারাত্রি খেটে-খেটে আমি পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি, সৃষ্টির এ বিশাল ভার আমার

উপর দিয়ে পিতামহ নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন। তাঁর কাছে ছুটি চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, "সেটা তোমার মেয়ে করুণার উপর নির্ভর করছে। সে একদিন নূতন একটা কিছু শুনবে, আর তখনই তোমার ছুটির ব্যবস্থা হবে। এর আগে তোমার ছুটি নেই। তুমি কান পেতে রাখো, শুনবেই নিশ্চয় নূতন কিছু একটা…"

এইটুকু বলেই বরুণ চলে গিয়েছিলেন। কোন্ মহাশূন্যে কোন্ জ্যোতির্ময়লোক সৃষ্টি হচ্ছিলো নাকি। ব্রহ্মা, অগ্নি, বরুণ, মিত্র সকলেই তাই নিয়ে ব্যস্ত। করুণা ভাবতে লাগলো, কি সে শুনবে…কবে শুনবে…

"কি ভাবছো ভাই একা বসে' ?"

হাসতে-হাসতে বিজলী এসে বসলো।

"জানি না"

আর একটু হেসে বিজলী বললে, "কি ভাবছো তা জানো না ?"

"ঠিক জানি না…তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না"

বিজলী এর উত্তরে কিছু বললে না, কেবল তার চোখদুটি হাসতে লাগলো।

"অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি একটা আজ। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে চলে' এলাম তোর কাছে।"

"স্বপ্ন দেখে আমার কাছে ছুটে চলে' আসবার মানে ?"

"স্বপ্নটা শোন্ আগে, তাহলেই মানে বুঝতে পারবি"

"বল"

"স্বপ্নে দেখলাম, আমার বর যেন তোর আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে তোর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে। বর যখন ঘুরছে তখন আমাকেও ঘুরতে হচ্ছে। আমরা দু'জনেই যেন তোকে নিয়েই আছি।"

"তোর বর ? বিয়ে হলো কবে তোর ?"

"বিয়ে হয়নি। কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম হয়েছে। বরটির চেহারা—যমদূতের মতো! একটি পাথর যেন মনুষ্যমূর্তি ধরেছে। গলার স্বর শুনলে মনে হয়, পাথরটি বুঝি ফাটছে। তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হলে তোমার কোন ভয় থাকবে না, কিন্তু আমার দশাটা কি হবে ভাবো তো!"

বিজলীর চোখে-মুখে হাসি ঝিকমিক করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ সে করুণার গলা জড়িয়ে বললে, "কি ভাবছিলি, বলবি না ?"

"তেমন কিছু ভাবছিলাম না। শোনবার চেষ্টা করছিলাম..."

"উর্বশীর মেয়েটা বেশ বীণা বাজায় আজকাল।...বাজাচ্ছে নাকি কোথাও বসে'?"

"না"

"তবে কি শোনবার চেষ্টা করছিলি? আসবার সময় দেখলাম, মেনকা দেবী কি একটা স্বর সাধছেন। এতদূর থেকে তা তো শোনা যাবে না!"

"না, ওসব কিছু নয়।"

"তবে?"

"নূতন ধরনের কিছু একটা। ঠিক জানি না আমি"

"অদ্ভুত মেয়ে তুই। চল্, মন্দার গাছে একটা দোল্না টাঙিয়ে এসেছি, দুল্বি চল্। নূতন ধরনের কিছুর জন্যে এমন করে' কান পেতে রাখলে তা শোনা যাবে না। যখন শোনবার তখন আপনি শুনবি। চল্, এখন দোলা যাক্!"

অবশেষে একদিন শোনা গেল। কান্নার শব্দ! তীক্ষ্ণ তীব্র মর্মভেদী কান্নার শব্দ! করুণা বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলো। তার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো সে। কান পেতে শুনলে খানিকক্ষণ। না, এরকম সে আগে কখনও শোনে নি। কিন্তু কি অদ্ভুত শব্দ! বুকের ভিতরটা যেন মুচড়ে-মুচড়ে উঠতে লাগলো তার। মনে হতে লাগলো, যেন একটা অদৃশ্য ছুঁচ তার কানের ভিতর দিয়ে ঢুকে, মাথা ভেদ করে' অন্তরের অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে। মনে হতে লাগলো, সে আর সহ্য করতে পারছে না। দু'কানে আঙুল দিয়ে বসে' রইলো সে। কিন্তু তবু শোনা যেতে লাগলো। কিসের শব্দ এ? এ শব্দ বেশীক্ষণ শুনলে পাগল হয়ে যাবে সে। ছুটে ঘর থেকে সে বেরিয়ে পড়লো। বেরিয়েই দেখা হলো বিজলীর সঙ্গে।

"তুই শুনতে পাচ্ছিস?"

"কি?"

"একটা অদ্ভুত শব্দ! পাচ্ছিস না? এত জোরে-জোরে হচ্ছে তবু পাচ্ছিস না? ওই যে, ওই যে..."

বিজলী অবাক্ হ'য়ে করুণার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। করুণার চোখের দৃষ্টি কেমন যেন হ'য়ে গেছে।

"পাচ্ছিস না?"

"না"

"শোন্, ভালো করে শোন্।...ওই যে, ওই যে। উঃ, কি করি আমি..."

আবার ছুটে চলে গেল সে। স্বর্গের পথে ফুলের পরাগ, সোনার রেণু ছড়ানো। তারই উপর দিয়ে পাগলিনীর মতো ছুটে চললো করুণা। মহাশূন্য ভেদ করে' পৃথিবীর যে কান্না এসে তার মর্মভেদ করছিল, সে কান্নার তীব্রতা অস্থির করে' তুললে তাকে। তার মনে হতে লাগলো, এই রোদনের শব্দ যদি বন্ধ না করতে পারে তাহলে সে পাগল হয়ে যাবে।

দেব-দেবীরা নন্দনকাননে বেড়াচ্ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে সে প্রশ্ন করতে লাগলো—"শুনতে পাচ্ছো না, শুনতে পাচ্ছো না তোমরা?"

"কি? পাখির গান?"

"না, না..."

"তবে, তরুর মর্মর?"

"না, ওই যে...ওই যে! থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও ওটাকে...আমি আর শুনতে পাচ্ছি না..."

ছুটতে-ছুটতে আবার চলে গেল সে।

অবাক্ হয়ে গেলেন দেব-দেবীরা।

পারিজাতের কুঞ্জে গিয়ে পারিজাতকে সে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি শুনতে পাচ্ছো না?"

পারিজাত কোনও উত্তর দিলে না, তার পাতাগুলি হাওয়ায় দুলতে লাগলো কেবল, করুণার মনে হ'লো, তারা যেন বলছে—"না, কিছু শুনতে পাচ্ছি না।"

রাগে ক্ষোভে পারিজাতের কুঞ্জ ছিন্নভিন্ন করে' চলে গেল করুণা।

শেষে সত্যিই পাগল হয়ে গেল সে। দেবকন্যা পাগল হ'য়ে যাওয়াতে দেব-দেবীরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ইন্দ্র বললেন, "করুণা হবে বরুণের মানস-কন্যা। বরুণ ফিরে না-আসা পর্যন্ত ওকে একটা ঘরে বন্ধ করে' রাখা হোক্। তারপর বরুণ ফিরে এসে যা ভালো বিবেচনা করবেন তাই করা হবে"

করুণা বন্দিনী হ'য়ে রইলো একটি নির্জন ঘরে।

কান্নার শব্দ কিন্তু একটুও কমেনি। বরং উত্তরোত্তর তা যেন বেড়েই চলেছিল।

করুণা পাগল হয়ে গিয়েছিল সত্যি। সত্যি সে দেয়ালে মাথা খুঁড়ছিল, মাথার চুল ছিঁড়ছিল, কানে আঙুল দিয়ে চীৎকার করছিল—"থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও ওই কান্না! আমি আর শুনতে পাচ্ছি না···পাচ্ছি না।

কান্না কিন্তু থামছিল না। দগ্ধ-পৃথিবীর অন্তরের বাণী কান্নার রূপ ধরে' বিরাট আকাশ পার হ'য়ে স্বর্গে এসে পৌছোচ্ছিলো। তপস্যা অহরহ চলছিল। কান্নার শব্দ তাই থামছিল না। করুণার চীৎকার থামছিল না। সে ক্রমাগত চীৎকার করছিল—থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও, আমি আর সহ্য করতে পাচ্ছি না।

দেব-দেবীরা কেউ করুণার ঘরের দিকে যেতেন না। পাগলিনীর হাহাকার সহ্য করতে পারতেন না তাঁরা। করুণার হাহাকার স্বর্গের সৌন্দর্যকে ম্লান করে' দিয়েছিল। একজন কিন্তু রোজই তার খবর নিতে যেতো: সে হচ্ছে—বিজলী। বদ্ধঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রোজই সে এসে প্রশ্ন করতো—"কেমন আছিস ভাই?"

"আমি ওই শব্দ কিছুতেই আর সহ্য করতে পাচ্ছি না। স্বর্গের দেবতারা প্রত্যেকেই শুনেছি শক্তিশালী। তাঁরা কেউ এই শব্দ বন্ধ করতে পারছেন না? এর প্রতিকার করতেই হবে, করতেই হবে, যেমন করে' হোক্ করতেই হবে···"

"পারলে তুই নিজেই পারবি, আর কেউ পারবে না। দেবতাদের দৌড় কতদূর তা জানা আছে।"

বিজলীর চোখে-মুখে হাসি ঝিকমিক করে' উঠতো।

তারপর একদিন অসম্ভব কাণ্ড ঘটলো একটা। করুণার চীৎকার থেমে গেল। বিজলী এসে দেখলে, তার ঘরের জানলা বন্ধ। করুণার নাম ধরে' ডাকলে কয়েকবার, কোন সাড়া এলো না। কি হলো? স্বর্গে মৃত্যু নেই। করুণা যে মরে' গেছে এ-কথা বিজলী ভাবতেই পারলে না। দ্বারে করাঘাত করে' বারবার সে ডাকতে লাগলো। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো বিজলী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে। তারপর আবার ডাকতে লাগলো। কোন ফল হলো না। বিজলী ছাড়বার পাত্রী নয়, ক্রমাগত ডাকতে লাগলো সে। বহুবার ডেকেও যখন কোনও সাড়া পাওয়া গেল না, তখন তার ভয় হলো। সে ছুটে গিয়ে খবর দিলে সকলকে। ইন্দ্রের আদেশে ঘরের কপাট ভেঙে ফেলা হলো। তারপর

যা দেখা গেল তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অপ্রত্যাশিত। প্রথমে কিছুই দেখা গেল না। সমস্ত ঘর তুষারশুভ্র-বাষ্পে পরিপূর্ণ, আর কিছু নেই—করুণা নেই। ঘরের কপাট খোলবার সঙ্গে-সঙ্গে সেই তুষারশুভ্র বাষ্প ধীরে ধীরে বেরুতে লাগলো। দেব-দেবীরা অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে ঘর খালি হয়ে গেল। সবাই ঘরে ঢুকে দেখলেন, করুণা নেই। তারপর দেখলেন, সেই তুষারশুভ্র বাষ্পরাশি আকাশে ভাসতে ভাসতে নীচের দিকে নামছে ক্রমশ। তাঁরা তখন বুঝতে পারলেন না করুণাই মেঘ হ'য়ে পৃথিবীর দিকে নেমে যাচ্ছে।

হাজার হাজার বছর কেটে গেছে তারপর। উত্তপ্ত পৃথিবী শান্ত হয়েছে বিগলিত মেঘের শীতল স্পর্শ লাভ করে'। মেঘ—জল হ'য়ে নেমেছে পৃথিবীর বুকে, পৃথিবীর বুকের উত্তাপ আবার তাকে মেঘে পরিণত করেছে। আবার বর্ষাধারায় নেমেছে সে, হাজার হাজার বছর এইভাবে কেটেছে। পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়েছে। পৃথিবীকে ঘিরে জলের জগৎ সৃষ্টি হয়েছে একটা···সমুদ্র নদী, ঝরনা, উৎস, কত কি হয়েছে। তারপর এসেছে উদ্ভিদ্-জগৎ। যে পৃথিবী উত্তপ্ত ঊষর ছিল, তার সর্বাঙ্গে শ্যাম কান্তি জেগেছে।

যে বন্ধ্যা ছিল সে হয়েছে জননী। প্রাণীদের জন্ম হয়েছে তারপর। ছোট-ছোট জীবজন্তু থেকে শুরু করে' বড়-বড় জীবজন্তু জন্মেছে। অনেক পরে এসেছে দানব, তারপর মানব। আরও কত কি হয়েছে। দানবদের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ হয়েছে। মানুষ সহায়তা করেছে দেবতাদের। বৃত্রাসুরকে বধ করবার জন্য মহামানব দধীচি নিজের অস্থি দিয়েছেন বজ্র নির্মাণের জন্য। ইতিহাসের পর ইতিহাস রচিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কিন্তু করুণা যদি মেঘরূপে এসে উত্তপ্ত পৃথিবীর উপর বারিবর্ষণ না করতো এসব কিছুই হ'তো না।

পিতা বরুণ কিন্তু কন্যা করুণাকে ভোলেন নি।

বিরাট সমুদ্রের বুকে সেদিন বর্ষার ধারা নেমেছে আকাশ থেকে। সমুদ্রের অধিপতি বরুণ, বর্ষাকে সম্বোধন করে' বললেন—"কন্যা, তুমি পৃথিবীর কান্না শুনে মেঘ হয়েছিলে বলে' সমুদ্রের জন্ম সম্ভব হয়েছে, আর আমি তাই সমুদ্রের আধিপত্য লাভ করে' নির্বিঘ্নে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছি। তোমাকে ভুলিনি আমি, তোমাকে আমি

নিত্য আশীর্বাদ করি। সূর্যের উত্তাপ যখন আমার সর্বাঙ্গে পড়ে তখন আমি আবার তোমাকে সৃষ্টি করি নব রূপে। তোমাকে আমি ভুলিনি…”

ঝরঝর শব্দে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। মেঘের ঘনঘটায় আকাশ পরিপূর্ণ।

“আমরাও ভুলিনি তোমাকে। এই দেখ, আমার স্বামীটি তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে তোমার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে। অনেকদিন আগে ঠিক এই স্বপ্নই দেখেছিলাম, মনে নেই?”…বিজলী চকমক করে উঠলো! বজ্রের গর্জন শোনা গেল! বজ্রের সঙ্গে বিজলীর বিয়ে হয়েছিল। করুণা কোন উত্তর দিলেন না। অসংখ্য বৃষ্টিধারায় সে কেবল নিজেকে বিলিয়ে দিতে লাগলো।

হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে

গৌরবগঞ্জের জমিদার হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে ওরফে রিদুবাবু, অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর চেহারাও ছিল অনন্যসাধারণ। প্রকাণ্ড ভারী মুখ, একমাথা কোঁকড়ানো বাবরি চুল, বিরাট গোঁফ, জমকালো জুলফি। চোখ দুটি বড়-বড় লাল-লাল। নাকটা খাঁড়ার মতো। শরীর যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। রিদুবাবুকে সবাই ভয় করতো, আবার ভালোও বাসতো।

আমার সঙ্গে তাঁর দুবার মাত্র দেখা হয়েছিল। প্রথমবার দেখা হয় তাঁর বাড়িতে। আমি তখন সবে ডাক্তারি পাস করে' বেরিয়েছি—কোথায় বসবো ঠিক করতে পারিনি তখনও, পয়সার জোর ছিল না তেমন, একটা চাকরির চেষ্টা করছিলাম; এমন সময় রিদুবাবু হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠালেন একদিন। রিদুবাবুর নামটা শোনা ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখিনি কখনও আমি। বাবার সঙ্গে নাকি বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। তাঁর জমিদারিতে কিছু জমিও ছিল আমাদের। যৌবনকালে, আমাদের জন্মের পূর্বে, বাবা গৌরবগঞ্জে বাসও করেছিলেন। তারপর চাকরি নিয়ে তিনি কোলকাতায় চলে' আসেন। সেই থেকে কোলকাতাতেই আছি আমরা, আর গৌরবগঞ্জে যাওয়া হয় নি।

হঠাৎ রিদুবাবুর চিঠি এসে হাজির হলো। বাবাকেই লিখেছিলেন তিনি—'শুনলাম, তোমার ছেলে এবার ডাক্তারি পাস করেছে। তাকে যদি আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও, খুবই খুশি হবো। আমার একটা অসুখ হয়েছে, তাকে দেখাতে চাই। কবে আসবে, আগে থাকতে একটু জানিও, স্টেশনে লোক রাখবো।'

আগে থাকতে খবর দিয়েই গিয়েছিলাম। স্টেশনে নেবে দেখি, হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড। আমার জন্যে হাতী, ঘোড়া, পালকি, ডুলি, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, মোটরকার—সব রকম যান পাঠিয়েছেন রিদুবাবু। স্বয়ং নায়েবমশাই স্টেশনে এসেছেন আমাকে অভ্যর্থনা করতে। তাঁর সঙ্গে এসেছে, আসা-সোটাধারী বারোজন বরকন্দাজ। আমি তো অবাক্।

নায়েবমশাইকে বললাম, "এত সব কাণ্ড কেন! একটা যে-কোনও গাড়ি পাঠিয়ে দিলেই হতো। না পাঠালেও ক্ষতি ছিল না, কতটুকুই-বা পথ।"

নায়েবমশাই মাথা চুলকে বললেন, "হুজুর বললেন, ডাক্তারবাবুর কিসে সুবিধে হবে তা তো জানা নেই, আমাদের যা আছে সবই নিয়ে যাও তুমি"—তারপর একটু হেসে বললেন, "পরিচয় হ'লে বুঝতে পারবেন, ওঁর স্বভাবই এই রকম।"

—"ওঁর কি অসুখ করেছে ?"

—"অসুখ ? অসুখের কথা শুনিনি তো !"

—"অসুখের জন্যই তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন"

—"তা হবে। আমি কিছু জানি না"

শাল-প্রাংশু মহাভুজ রিদুবাবুকে দেখে আমারও মনে হলো না যে, তিনি অসুস্থ। আমি গিয়ে প্রণাম করতেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। বললেন, "তোমার বাবার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল একদিন। এখানে যখন ছিল, একসঙ্গে মাছ ধরতাম দু'জনে। তোমার বাবা হয়তো সে-সব কথা ভুলে গেছে, আমি কিন্তু ভুলি নি। আমাদের গোমস্তা রমেনের মুখে শুনলাম, তুমি ডাক্তারি পাস করেছো, খুব আনন্দ হলো শুনে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার কি অসুখ করেছে ?"

—"ফুসকুড়ি বেরিয়েছে একটা পিঠের উপর। এরকম ফুসকুড়ি প্রায়ই হয় আমার। দেখ দিকি, এর যদি কোনও একটা ব্যবস্থা করতে পারো"

ফুসকুড়িটি দেখলাম। অতি ছোট ঘামাচির মতো, বিশেষ কিছু নয়। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য আমাকে কোলকাতা থেকে ডেকে আনিয়েছেন ভেবে শুধু যে অবাক্ হলাম তা নয়, মনে-মনে একটু অপমানিতও হলাম। তারপর হঠাৎ সন্দেহ হলো, ভদ্রলোকের মাথা খারাপ নয় তো ! স্টেশনে একজন লোককে আনতে অত রকম যানবাহন যিনি পাঠাতে পারেন···

রিদুবাবু বলে উঠলেন, "থাক্, ফুসকুড়ির কথা পরে চিন্তা কোরো। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে' নাও আগে। নায়েবমশাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি সব ব্যবস্থা করে' দেবেন। কাল সকালে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। ক'টার সময় ওঠো তুমি ?"

—"আমার খুব ভোরে ওঠা অভ্যেস"

—"বেশ ভালোই তো। কটার সময় ওঠো"

—"ভোর তিনটের আমার ঘুম ভেঙে যায়"

—"আমি উঠি সাড়ে-পাঁচটায়। ঘুমটা কিছুতে কমাতে পারছি না। তোমাদের

ডাক্তারি-শাস্ত্রে যদি এরও কোনো ওষুধ থাকে, দিও। আচ্ছা, আমি উঠি এখন। সকাল ছ'টা নাগাদ আবার দেখা হবে।"

রিতুবাবু চলে যাওয়ার একটু পরেই নায়েবমশাই হাজির হলেন এসে।

—"রাত্রে কি খাবেন, ডাক্তারবাবু?"

—"যা আছে, তাই খাবো।"

—"সব রকমই আছে। যা হুকুম করবেন, তাই এনে দেবো"

—"সব রকম মানে?"

—"কয়েক রকম ভালো চালের ভাত, খিচুড়ি, পোলাও, সব রকম ডাল, রুটি, লুচি, পরোটা, ডালপুরী, রাধা-বল্লভী, কচুরি, সিঙ্গাড়া, নিমকি, চার-পাঁচ রকমের মাংস, চার-পাঁচ রকম মাছ, তরি-তরকারি সব রকম, এ ছাড়া দই, ক্ষীর, পায়েস, মিষ্টান্ন, মোরব্বা, চাটনি, এসব তো আছেই—"

—"বলেন কি! সব আমার জন্যে করিয়েছেন?"

—"এসব রান্না রোজ হয়"

—"এত রকম?"

—"হ্যাঁ, মায় সাবু, বার্লি, হর্লিক্স, ওভালটিন পর্যন্ত"

—"রিতুবাবু খুব খাইয়ে লোক বুঝি?"

—"মোটেই না। নিজে খুব সামান্যই খান। কিন্তু কি খাবেন তা আগে থাকতে বলবেন না কিছুতেই। তাই সব রকম তৈরি রাখতে হয়। কোনও জিনিসটা চেয়ে না পেলে কুরুক্ষেত্র করেন"

—"বলেন কি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই রান্নার ব্যাপারের জন্যেই জন-কুড়ি রাঁধুনি, আর গোটাপঞ্চাশেক চাকর রাখতে হয়েছে।"

—"এরকম করবার মানে কি?"

—"খেয়াল! সে যাই হোক, আজ রাত্রে আপনি কি খাবেন বলুন"

—"খানকয়েক লুচি, আর যা হোক দু'একটা তরিতরকারি পাঠিয়ে দেবেন"

—"মাছ মাংস দুই-ই দেবো তো?"

—"দেবেন"

—"মিষ্টান্ন?"

—"আপনার যা খুশি দেবেন মশাই, যা পারবো খাবো"

—"বেশ। চা খাবেন ক'টায় ? হুজুর বলে দিলেন, আপনি তিনটের সময় ওঠেন, আপনাকে ঠিক সময়ে যেন চা দেওয়া হয়। সাড়ে-তিনটেয় দেবো"

—"কি দরকার অত কষ্ট করে"

—"কষ্ট আবার কি ! ছুটো ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে দিলেই হবে। একটা ঘড়ি যজ্ঞেশ্বর গোয়ালার কাছে থাকবে, আর একটা থাকবে হীরু খানসামার কাছে।"

—"গোয়ালার কাছে কেন ?"

—"সে আড়াইটের সময় উঠে ছুধ ছুয়ে আনবে। টাটকা ছুধ না হ'লে কি চা ভালো হয় ? লিপটনের দার্জিলিং চা আছে, অন্য চা-ও আছে, কোন্‌টা—"

"কেন অত হাঙ্গামা করছেন। যা আপনার স্থবিধে হবে, তাই দেবেন"

—"অত হাঙ্গামা না করলে আমার চাকরি থাকবে না। হুজুর যদি শোনেন যে আপনি উঠেই চা পান নি, তাহ'লে ভীষণ কাণ্ড হবে। সাড়ে-তিনটেয় চা পাঠিয়ে দেবো তাহ'লে"

—"বেশ, তাই দেবেন"

—"পাশের ঘরটাই চানের"

—"ভালোই হয়েছে। ভোরে উঠেই আমার স্নান করা অভ্যেস।"

—"ও, তাহ'লে তো সে ব্যবস্থাও করে' রাখতে হয়—।"

নায়েবমশাই ব্যস্ত হ'য়ে বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরে ফিরে এসে বললেন, "পাশের ঘরে স্নানের এবং মুখ ধোয়ার সব ব্যবস্থা রইলো।"

—"আচ্ছা।"

বেশ একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

ঠিক ভোর তিনটেতেই ঘুম ভাঙলো আমার। বিছানা থেকে উঠে বেরিয়ে দেখি, বারান্দায় লণ্ঠন জালিয়ে একটি চাকর বসে আছে। আমাকে দেখেই সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করলো, তারপর বললো, "এখনই স্নান করবেন কি ? গরম জল তৈরি আছে, আনবো ?"

—"নিয়ে এসো"

স্নানের ঘরে ঢুকে দেখি, সেখানেও এলাহি কাণ্ড। দাঁত মাজবার জন্যে কয়েকরকম দেশী-বিলাতী মাজন, টুথ-পেস্ট, টুথ-ব্রাশ, এমন কি, দাঁতন পর্যন্ত

মজুত রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে নানারকম তেল, সাবান, তোয়ালে, গামছা, এমন কি, স্নো, পাউডার, আতর-এসেন্স পর্যন্ত।

স্নান সেরে বেরিয়ে দেখি, হীরু খানসামা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সেলাম করে' বললে, "চা তৈরি হুজুর"

হাত-ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম, ঠিক সাড়ে-তিনটে বেজেছে।

ঠিক ছ'টার সময় রিতুবাবু এলেন।

তাঁর পিঠের ফুসকুড়িটা আর একবার দেখলাম ভালো করে'। সত্যিই বিশেষ কিছু নয়। আমার ব্যাগেই একটা মলম ছিল, লাগিয়ে দিলাম সেটা।

রিতুবাবু বললেন, "মাছ ধরতে ভালোবাসো তুমি ?"

—"কখনও ধরিনি"

—"মাছ ধরা দেখবে ?"

—"তা দেখতে পারি"

—"তাহ'লে বেড়াজালের ব্যবস্থা করতে হয়"

রিতুবাবু তাঁর জলকরের নায়েবকে ডেকে পাঠালেন।

তিনি আসতেই বললেন, "জেলেদের খবর দাও। সাগরবিলে জাল ফেলুক তারা, বিকাশকে নিয়ে আমি যাচ্ছি একটু পরে।"

সাগরবিল থেকে দশমণ মাছ উঠলো। বড় বড় রুই-কাৎলা। জল থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছিল তারা। এত বড় বড় জীবন্ত মাছ আমি জীবনে কখনও দেখিনি। দেখবার মত দৃশ্য বটে! আমি শহুরে-লোক, কোলকাতার গলিতে বাস করি, দৈনিক একপোয়া মাছ কেনা হয় আমাদের বাড়িতে, একটা কথা বারবার মনে হতে লাগলো আমার—দশমণ মাছ ধরবার কি দরকার ছিল। একি অপচয়! বাড়িতে একটিমাত্র মাছ গেল, বাকী সব মাছ বিলিয়ে দেওয়া হলো!

গৌরবগঞ্জে পাঁচ দিন ছিলাম। এই পাঁচ দিনের প্রতি মুহূর্তে একটি কথাই আমার কেবল মনে হয়েছে—ভদ্রলোক বড় বেশী অপব্যয় করেন। নায়েবমশাইয়ের মুখে শুনলাম, হুজুরের একজোড়া কাপড়ের দরকার হলে বিশজোড়া কাপড় আনাতে হয়। পাঞ্জাবি, কামিজ, গেঞ্জি সমস্তই ডজন-ডজন করানো চাই, নানারকম ছিটের। এ-বছরের শাল ও-বছরে গায়ে দেন না। নিজে যে খুব বেশী ব্যবহার করেন

তা নয়, কিন্তু কেনা চাই সব রকম। ওই ওঁর শখ। একটিমাত্র ছেলে, বিলেতে লেখাপড়া করে। স্ত্রী মারা গেছেন বহুদিন আগে।

শেষকালে নায়েবমশাই হেসে বললেন, "বড়লোকের একটা নেশা তো চাই। ওই ওঁর নেশা। অপব্যয়ের নেশায় মশগুল্ হয়ে থাকেন"

আমি যেদিন চলে আসি, সেদিন রিহুবাবুকে বলেছিলাম, "যদি রাগ না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে।"

—"কি বলো"

—"এত অপচয় কেন করেন আপনি।"

"—অপচয়! অপচয় কোথায় দেখলে তুমি ?"

—"রোজ এত রকম খাবার করবার দরকার কি ? খান তো সামান্য একটু।"

—"বাকীটা আর পাঁচজনে খায়"

—"ওদের খাওয়াবার জন্যে অন্নসত্র খুললেই হয়"

—"সেখানে কি এমন খাবার তৈরি হবে? আমার জন্যে তৈরি হয় বলেই যত্ন করে' তৈরি করে সবাই।"

আমি চুপ করে রইলাম।

জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো রিহুবাবুর চোখ দুটো।

বললেন, "তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, তুমি এটা জানো যে, পৃথিবীতে কিছুই নষ্ট হয় না? তুমি হিন্দুর ছেলে, একথাটা শোনো নি যে, তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে! আমি হিন্দু। গৃহস্থ পাঁচজনকে যথাসাধ্য প্রতিপালন করাই যে আমার কর্তব্য।"

আমি কোনও উত্তর দিতে পারি নি। খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে রিহুবাবু হেসে বললেন, "দেখ, বলিষ্ঠপ্রাণের বিকাশই প্রাচুর্যে। ওই বটগাছটার দিকে চেয়ে দেখ, সহস্র-সহস্র পাতা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোটি কোটি বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে চতুর্দিকে, শত শত পাখিকে আশ্রয় দিচ্ছে, পথিককে ছায়া দিচ্ছে। এসব না করলেও ওর চলতো, কিন্তু তাহ'লে ও বটগাছ হতো না—"

আমি চুপ করে' রইলাম।

কোলকাতায় ফিরে আসবার দিন-সাতেক পরে রিহুবাবুর চিঠি পেয়েছিলাম একটা। চিঠিখানা এখনও আছে আমার কাছে। লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু,

আশা করি নিরাপদে পৌঁছিয়াছ। যদিও তুমি আমার ছেলের মতো, তবু তুমি ডাক্তার, তোমাকে 'ফি' না দিলে অন্যায় হইবে। তাই সামান্য কিছু পাঠাইলাম। দ্বিধা করিও না, ইহা তোমার ন্যায্য প্রাপ্য। তোমার বাবাকে আমার ভালোবাসা দিবে, তুমি আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভার্থী

শ্রীহৃদয়েশ্বর মুখোপাধ্যায়

চিঠির সঙ্গে একটি পাঁচ হাজার টাকার 'চেক' ছিল।

রিতুবাবুর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয় কুড়ি বছর পরে কাশীতে। তখন শীতকাল। বিশ্বেশ্বরের মন্দির থেকে বেরুচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়লো, চাতালের একধারে একটি ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে বৃদ্ধ বসে আছেন একজন। গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই। মুখটা চেনা-চেনা ঠেকলো, ক্ষীণভাবে মনে হলো, কোথায় যেন দেখেছি। একটু এগিয়ে গেলাম। বৃদ্ধও আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। তারপর হেসে বললেন, "কে, বিকাশ নাকি !"

হঠাৎ রিতুবাবুকে চিনতে পারলাম। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম।

—"একি, আপনি এমনভাবে এখানে !"

—"আজকাল এখানেই থাকি"

—"এখানেই ? কেন ?"

—"জীবনের শেষ আশ্রম যে, সন্ন্যাস"

অবাক্ হ'য়ে গেলাম।

—"কোথায় বাসা আপনার"

—"বাসা নেই। এই মন্দিরে পড়ে থাকি, ভিক্ষা করে খাই।"

মঞ্জরী

যে-গল্পটি তোমাদের আজ বলতে যাচ্ছি, সেটি আমি স্বপ্নে শুনেছিলাম। ঠিক শুনিনি—দেখেছিলাম। চোখের সামনে ঘটনাগুলো পর-পর যেন ঘটে' গেল।

...জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। পাহাড়ের উপত্যকাটি সাদা কাশফুলে ভরতি। মৃদু হাওয়ায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে সেই ফুলের সমুদ্রে। কুলকুল করে' একটি ঝরনা নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে। ধাপে-ধাপে সুর চড়িয়ে একটা 'চোখ গেল' পাখি ডাকছে কোথায় যেন। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে হাসছে। চাঁদের একটু দূরে একটা ছোট কালো মেঘ কুণ্ডলী পাকাচ্ছে ধীরে-ধীরে, তার কালো রং-এ লেগেছে জ্যোৎস্নার ঢেউ। কালোই অপরূপ হ'য়ে উঠেছে। হঠাৎ কাশফুলের সাদা সমুদ্রেও ছোট একটি কালো মেঘ দেখা গেল। মনে হ'ল, আকাশের মেঘেরই ছোট্ট একটা টুকরো যেন নেমে এসেছে কাশের বনে। তারও চারপাশ ঘিরে জ্বলছে রুপোর জরি। আকাশের কালো মেঘ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল চাঁদের দিকে। হঠাৎ সে চাঁদটাকে ঢেকে ফেলল। চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। তখন কাশের বনে যে ছোট্ট মেঘটি দেখা যাচ্ছিল, সে কথা কয়ে উঠল।

"আকাশের কালো মেঘ, চাঁদকে অমন করে' আড়াল কোরো না। আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না।"

আকাশের কালো মেঘ বলল, "কে তুমি?"

"আমি মানিনী রাজকন্যার সখী—মঞ্জরী। মেহেদিনগরে চলেছি—"

তখন বুঝতে পারলাম, কাশের বনে ছোট্ট মেঘের মতো যেটা দেখাচ্ছিল, সেটা মেঘ নয়—মঞ্জরীর খোঁপা।

আকাশের মেঘ জিজ্ঞেস করল, "এত রাত্রে মেহেদিনগরে কেন? সেখানকার লোকগুলো তো সুবিধে নয়!"

"জানি, তবু আমাকে যেতেই হবে। মানিনী রাজকন্যার শখ হয়েছে, তাঁর হাতের চম্পক-অঙ্গুলিতে মেহেদির রং লাগাবেন। তুমি চাঁদের সামনে থেকে সর, আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না।"

মেঘ চাঁদের সামনে থেকে সরে' গেল।

মঞ্জরী চলল কাশের বন ভেদ করে'। কাশের বন পার হয়ে এল পম্পা সরোবরে, অসংখ্য কুমুদ ফুল ফুটেছিল সেখানে। তারা সকলে ডাকাডাকি করতে লাগল মঞ্জরীকে।

"কোথায় চলেছ, মঞ্জরী ?"

"মেহেদিনগরে"

"আমরাও যাব তোমার সঙ্গে"

"সবাইকে সঙ্গে করে' নিয়ে যাওয়া কি চলে এখন? আমি লুকিয়ে যাচ্ছি, চুপিসাড়ে মেহেদিবনে ঢুকে চারটি মেহেদি পাতা নিয়ে আসব মানিনীর জন্যে। দলবল নিয়ে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে যে!"

"তাহলে আমাকে খালি নিয়ে চল, আমি চুপটি করে' থাকব। নিয়ে চল আমাকে, মঞ্জরী—"

তীরের কাছটিতে যে কুমুদ-কলিটি ছিল, সে একেবারে নাছোড়বান্দা। মঞ্জরী হেঁট হ'য়ে শেষে তুলে নিল তাকে।

সে বলল, "মাথায় পর আমাকে।"

"ইস্! ভারি আবদার দেখছি যে, মাথায় চড়ে যাবেন!"

মঞ্জরী বলল বটে, কিন্তু খোঁপায় গুঁজে নিল তাকে। কুমুদ-কলি ভারি খুশি, দুলতে দুলতে চলল।

পম্পা সরোবরের পর প্রকাণ্ড মাঠ, সবুজ ঘাসে ঢাকা। রাত্রে কিন্তু সবুজকে দেখাচ্ছিল কালো, মনে হচ্ছিল কালো মখমল যেন। তার উপর ফুটেছিল অসংখ্য ছোট-ছোট সাদা ফুল। মনে হচ্ছিল, আকাশের তারারা লুকিয়ে যেন নেমে এসেছে তেপান্তরের মাঠে।

"কোথায় চলেছ, মঞ্জরী ?"

"মেহেদিনগরের মেহেদিকুঞ্জে"

"এত রাত্রে একা সেখানে যেও না। জায়গা ভাল নয়"

"একা যাচ্ছে না, আমি সঙ্গে আছি"—কুমুদ-কলি বলল খোঁপা থেকে মুখ বাড়িয়ে।

মঞ্জরী চলল। মাথার উপর পেঁচা ডাকল, বাদুড়ের সারি উড়ে গেল। টিট্টিভ বলে গেল—কি-যে করিস, কি-যে করিস, কি-যে করিস। মঞ্জরীর ভয় নেই, নির্ভয়ে

এগিয়ে চলল সে। চলতে-চলতে চলতে-চলতে মেহেদিনগরের মেহেদির আভাস দেখতে পাওয়া গেল অবশেষে। মনে হ'ল দূরে আকাশের গায়ে লালচে রঙের একটা কুয়াশা জমে' আছে।

কুমুদ-কলি জিজ্ঞেস করল, "ভোর হয়ে আসছে নাকি, আকাশের গায়ে ওটা কি ঊষার আলো ?"

"না, ওটা মেহেদিকুঞ্জের আভা। দিনের বেলা দেখা যায় না, গভীর পূর্ণিমা রাতে চুপি-চুপি ওই আভা মেহেদিকুঞ্জ থেকে ফুটে বেরোয়। আমি কিন্তু আর চলতে পারছি না। এখনও অনেক দূর। একটু বিশ্রাম করে নিই এইখানে—"

"সেই বেশ। ব'স একটু—"

ঘাসের ফুলরা সাদরে অভ্যর্থনা করল তাকে।

"একটু শুই ?"

"শোও না।"

ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মঞ্জরী। ঘাসের ফুলেরা গুনগুনিয়ে গান গাইতে লাগল :

আকাশ থেকে আসছে নেমে
জ্যোৎস্না-মাখা ঘুমের ঢেউ,
মঞ্জরিণীর ঘুম পেয়েছে
গোল কোরো না তোমরা কেউ।

খানিকক্ষণ পরে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল মঞ্জরী। ওমা কতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে, রাত যে প্রায় শেষ হয়ে এল! রাত্রের মধ্যে মেহেদিনগরে পৌঁছতে না পারলে মেহেদিপাতা আনাই যাবে না যে, সবাই জেগে উঠবে।

ঘাসের ফুলেদের দিকে চেয়ে মঞ্জরী বলল, ছি, ছি, তোমাদের পাল্লায় পড়ে' কত দেরি হয়ে গেল আমার ! মেহেদিনগরে আজ বোধ হয় পৌঁছতেই পারব না—"

"ঠিক পারবে, আমি তোমাকে পিঠে করে পৌঁছে দেব—"

মঞ্জরী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল প্রকাণ্ড এক সারস পাখি লম্বা-লম্বা পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এত বড় আর এমন ধপধপে সাদা সারস পাখি মঞ্জরী আর কখনও দেখেনি।

"তুমি কে ?"

"আমি মহাসারস। পথ চলতে-চলতে কোন ছোট মেয়ে যদি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, আমি তাকে পিঠে করে' বয়ে নিয়ে যাই। এস—"

মঞ্জরী চড়ে' বসল তার পিঠে। দেখতে দেখতে মেহেদিনগরের মেহেদিকুঞ্জে এসে হাজির হল তারা।

মহাসারস বলল, "আমি মেহেদিনগরে ঢুকব না। ওরা অভদ্র লোক। তুমি কাজ সেরে চট করে' চলে এস। আমি এই মাঠে ততক্ষণ একটু চ'রে নি···"

মঞ্জরী মেহেদিকুঞ্জে ঢুকে পড়ল।

"কে ?"

ভাঙা চেরা গলায় চীৎকার করে' উঠল কে যেন! মঞ্জরী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কে, কে তুমি ?"

লম্বা ক্ষীণকান্তি একটা লোক বেরিয়ে এল অন্ধকারের ভিতর থেকে। গালের হাড় উঁচু, লম্বা নাক, চোখ দুটো যেন ভঁাটার মতো জলছে।

"কে তুমি ?"

ভাঙা চেরা গলায় আবার সে জিজ্ঞেস করল।

"আমি মানিনী রাজকন্যার সখী মঞ্জরী"

"কি চাও ?"

"চারটি মেহেদিপাতা নিতে এসেছি"

"বেরিয়ে যাও এখান থেকে"

"পাতা না নিয়ে আমি যাব না"

"বেরোও বলছি—" এগিয়ে এসে লোকটা মঞ্জরীর কান ধরে হিড়হিড় করে' টেনে তাকে বার করে দিল মেহেদিকুঞ্জ থেকে।

মঞ্জরী বলল, "তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়—মেয়েছেলের গায়ে হাত দাও !"

"যা, যা, তোর মতন মেয়েমানুষের মুখ যে জুতিয়ে ছিঁড়ে দিইনি, এই যথেষ্ট"—বলেই লোকটা আবার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুমুদ-কলি বলল, "এরা ভারী ছোটলোক তো! চল, এখানে থাকা আর ঠিক নয়।"

মঞ্জরী বলল, "দেখো, এর কি রকম প্রতিশোধ আমি নিই।"

মহাসারসের পিঠে চড়ে মঞ্জরী নিজের দেশে ফিরে এল।

...সাতদিন সাতরাত্রি মানিনীর মুখে অন্ন, চোখে নিদ্রা নেই। রাজকন্যা পণ করেছেন, মেহেদিনগরের ওই অসভ্য লোকটার যতক্ষণ না শাস্তি হচ্ছে, ততক্ষণ তিনি জলগ্রহণ করবেন না, বিছানায় শোবেন না, গালে হাত দিয়ে গোসা-ঘরে বসে থাকবেন কেবল।

রাজা মহাবিপদে পড়লেন। মঞ্জরীর ডাক পড়ল রাজসভায়।

রাজা প্রশ্ন করলেন, "মঞ্জরী, যে-লোকটি তোমায় অপমান করেছিল, তার চেহারা কেমন?"

মঞ্জরী চেহারার হুবহু বর্ণনা দিল। রাজসভার লেখক সঙ্গে-সঙ্গে টুকে নিল সেটা।

মন্ত্রীমশায় বললেন, "তোমাকে যে অপমান করেছিল, তার প্রমাণ কি?"

"আমি বলছি, এই প্রমাণ"

মন্ত্রী বললেন, "ও প্রমাণ যথেষ্ট নয়, কেবল তোমার কথার উপর নির্ভর করে' আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাজার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি না। সাক্ষী চাই। তোমার সঙ্গে আর কে ছিল?"

"কেউ ছিল না। ও হ্যাঁ, ছিল, দাঁড়ান দেখি, সে বেঁচে আছে কিনা।" একছুটে বেরিয়ে গেল মঞ্জরী এবং একটা স্ফটিকের ফুলদানি হাতে করে' ফিরে এল। ফুলদানিতে ছিল সেই কুমুদ-কলি। বেচারী নেতিয়ে পড়েছিল, কিন্তু বেঁচে ছিল তখনও।

মঞ্জরী বলল, "এও আমার সঙ্গে ছিল। কুমুদ-কলি, তুমি মন্ত্রীমশায়কে বল, কি কি শুনেছ আর কি-কি দেখেছ।"

কুমুদ-কলি অনেকবার থেমে-থেমে ক্ষীণকণ্ঠে সমস্ত কথা খুঁটিয়ে বলল।

মন্ত্রীমশায় তবু মাথা নাড়তে লাগলেন।

শেষে বললেন, "একটা শুকনো ফুলের কথায়—"

মন্ত্রীমশায়ের কথা শেষ হল না! শোঁ-শোঁ করে ঝড়ের মতো হাওয়া উঠল একটা, তারপর ঝটপট ঝটপট পাখার শব্দ হ'ল। পরমুহূর্তেই দেখা গেল, রাজসভার জানালার গরাদের ভিতর দিয়ে মহাসারসের প্রকাণ্ড লম্বা গলাটা ঢুকছে। গলাটা লম্বা হতে-হতে এগিয়ে এল মন্ত্রীমশায়ের কানের কাছ পর্যন্ত। মন্ত্রীমশায় একলাফে উঠে পড়লেন তাঁর আসন থেকে। সভায় সকলেই সন্ত্রস্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠল, এমন কি রাজা পর্যন্ত সিংহাসনে বসে' থাকতে পারলেন না।

বজ্র-নির্ঘোষে মহাসারস বলল, "মঞ্জরী যা বলছে, কুমুদ-কলি যা বলছে, তা বর্ণে-বর্ণে সত্যি। আমার কথাতেও যদি মন্ত্রীমশায়ের বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমি হাজার হাজার ফুল আর ঝিঁঝি পোকাদের এনে হাজির করব। তারাও সব দেখেছে এবং শুনেছে।"

রাজা বলছেন, "আর সাক্ষীতে দরকার নেই, আমাদের বিশ্বাস হয়েছে।"

মন্ত্রীও বললেন, "হ্যাঁ, হয়েছে—হয়েছে—ঢের হয়েছে।"

মহাসারস গলা টেনে নিল, আবার পাখার ঝটপটানি এবং শোঁ-শোঁ শোনা গেল। মহাসারস উড়ে গেল আকাশে।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, "মন্ত্রীমশায়, মেহেদিনগরে রাজদূতের হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে খবর দিন যে, তাঁরা ওই লোকটিকে শাস্তি দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা। যদি না থাকেন, আমরা স্বয়ং তাকে শাস্তি দেব"

মঞ্জরী রাজকন্যার কাছে এই খবর নিয়ে যেতে তিনি আঙুরের শরবত এক ঢোঁক খেলেন। তারপর বললেন, "যতক্ষণ ও লোকটার সমুচিত শাস্তি না হচ্ছে, ততক্ষণ আমি অন্নগ্রহণ করব না।"

পরদিন রাজদূত জবাব নিয়ে এল—মেহেদিনগরের রাজা উক্ত অশিষ্ট লোককে শাস্তি দিতে প্রস্তুত নন।

রাজা বললেন, "মন্ত্রীমশায়, যুদ্ধ ঘোষণা করুন।"

মন্ত্রী বললেন, "এই সামান্য কারণে যুদ্ধ-ঘোষণা করাটা কি সমীচীন হবে?"

"কারণ মোটেই সামান্য নয়। মানিনীর মান রাখতে আমি সমস্ত রাজত্ব বিসর্জন দিতে পারি। অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করুন।"

এর পর কথা চলে না।

...তিন দিন ধরে' ঘোর যুদ্ধ হল। কিন্তু যুদ্ধে মেহেদিনগরের দলই জিতল। রাজা এটা প্রত্যাশা করেন নি। মাথায় হাত দিয়ে বসে' পড়লেন তিনি।

মন্ত্রী তখন বললেন, "মহারাজ, আপনি আপনার গুরুদেব শিবসুন্দরের কাছে যান। এমনি যুদ্ধ করে' ওদের কাবু করা যাবে না।"

...রাজা কুলগুরু শিবসুন্দরের কাছে গেলেন। তপস্বী শিবসুন্দরকে দেখলেই মনে হয়, যেন তিনি মূর্তিমান বিপত্তারণ। সমস্ত শুনে তিনি বললেন, "তোমার সৈন্যরা যে যুদ্ধে জিততে পারবে না, তা আমি জানতাম। চরিত্রবল না থাকলে কেউ

যুদ্ধে জিততে পারে না। তোমার প্রত্যেকটি সৈন্য মিথ্যাবাদী, প্রত্যেকটি সৈন্য ঘুষখোর, এক কথায় প্রত্যেকটি সৈন্য অমানুষ, ওদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করা সম্ভব নয়।"

রাজা বললেন, "তাহলে উপায় ?"

"উপায় একটা আছে। আমার কাছে ভাল একখানি তরবারি আছে, কোনও সত্য বীর যদি সেখানি হাতে করে' যুদ্ধে যায়, তাকে কেউ হারাতে পারবে না, কেউ মারতে পারবে না। সে-ই একা যুদ্ধ জয় করে' ফিরে আসতে পারবে। তোমার রাজ্যে যদি সত্য বীর কেউ থাকে, তাকে পাঠিয়ে দাও গিয়ে।"

"অধিকাংশ বীরই তো যুদ্ধে মারা গেছে।"

"তারা বীর ছিল না—তাই মারা গেছে, আপদ গেছে। যারা আছে, তাদের মধ্যেই বেছে পাঠাও কাউকে।"

"আচ্ছা।"

রাজা চলে গেলেন।

তারপর শিবসুন্দরের আশ্রমে একে একে আসতে লাগলেন বীরেরা। ইয়া ইয়া লম্বা-চওড়া চেহারা, ইয়া গোঁফ, ইয়া দাড়ি, ইয়া বুকের ছাতি—কিন্তু হায়! সবাইকে ফিরে যেতে হল একে একে। শিবসুন্দরের তরবারিকে কেউ তুলতে পর্যন্ত পারল না! বড় বড় সেনাপতি, বড় বড় সর্দার, মাথা হেঁট করে' ফিরে গেলেন সবাই। খবর রটে' গেল, শিবসুন্দরের তলোয়ার তুলতে পারে, এমন লোক রাজার রাজ্যে নেই।

মঞ্জরী তখন ছুটে চলে তার কিশোর বন্ধু অনিরুদ্ধের কাছে।

"তুমি যাও শিবসুন্দরের কাছে"

অনিরুদ্ধ সবিস্ময়ে বলল, "অত বড় বড় বীরেরা যেখানে পালিয়ে এল, সেখানে আমি—"

"আর তো কেউ নেই, তুমিই যাও"

মঞ্জরীর অনুরোধ উপেক্ষা করা অনিরুদ্ধের পক্ষে শক্ত। গেল সে শিবসুন্দরের আশ্রমে।

শিবসুন্দর তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি মিছে কথা বলেছ কখনও ?"

"না"

"চুরি করেছ ?"

"না"

"তা হলে তুমি পারবে"

যা বড় বড় বীরেরা পারেনি, কিশোর অনিরুদ্ধ তাই পারল। তরোয়াল নিয়ে বেরিয়ে এল সে।

তার পর আর দেরি হ'ল না। তপস্বী শিবসুন্দরের কথাই বর্ণে বর্ণে ফলে' গেল।

তার পরদিনই অনিরুদ্ধ সেই অসভ্য লোকটার চুলের ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে এনে হাজির করল রাজসভায়।

"মহারাজ, এইবার এর বিচার করুন"

রাজা বললেন, "এর বিচার করবে মঞ্জরী"

রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এলেন, মঞ্জরী গিয়ে বসল সেখানে।

মঞ্জরী বলল, "কান মল, নাক মল"

লোকটা তাই করল।

তারপর মঞ্জরী বলল, "রাজকুমারী মানিনী, তাঁর সমস্ত সখীরা এবং আমাদের রাজ্যের কিশোরী মেয়েরা হাতে আর পায়ে মেহেদি রং লাগাবে। তার জন্যে যত মেহেদিপাতা লাগবে, তা তোমাকে এনে দিতে হবে, আর নিজের হাতে বেটে দিতে হবে"

লোকটাকে রাজী হ'তে হ'ল!

মায়া-কানন

তাম্রপুরীর রাজপুত্রের মনে সুখ নেই। তাঁর কেবলই মনে হয়—কি হবে রাজ্য-ঐশ্বর্য নিয়ে, যদি মায়ের দুঃখই না ঘোচাতে পারলাম। মায়ের চোখে ঘুম নেই, মুখে অন্ন নেই, তিনি দিবারাত্রি কেবল কাঁদেন। রাজপুত্র ছেলেবেলা থেকেই এই দৃশ্য দেখছেন, মায়ের হাসিমুখ মনে পড়ে না তাঁর। বাবার চেহারা মনেই নেই। রাজপুত্র যখন শিশু, তখনই তিনি দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছিলেন, আর ফেরেন নি। তাঁর সৈন্য-সান্ত্রী, অনুচর-পরিচর, সামন্ত-সেনাপতি, হাতী-ঘোড়া, রথ-রথী কেউ ফেরে নি। তারপর থেকেই রাজ্যে অন্ধকার নেমেছে। অনেকদিন প্রতীক্ষা করে' করে' রানী-মা শেষে শয্যা নিয়েছেন।

রাজপুত্র যতদিন ছোট ছিলেন, মন্ত্রীমশায় রাজ্য চালাতেন। রাজপুত্র বড় হ'তেই তিনি রাজ্যভার তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, "রাজপুত্র, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, তোমার রাজ্য এবার তুমি বুঝে নাও, আমি বানপ্রস্থে যেতে চাই"

রাজপুত্র বললেন, "মন্ত্রীমশায়, আমার বাবা কোথায়?"

"তা'তো জানি না। তিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন আর ফেরেন নি, মনে হয় আর ফিরবেন না, তুমিই সিংহাসনে বসে প্রজাপালন কর"

"—কোন্ দিকে গিয়েছিলেন তিনি, জানেন?"

"তিনি রজতপুরী জয় করতে গিয়েছিলেন"

"কোন্ দিকে সে রজতপুরী?"

"তা জানি না"

"বাবা যখন ফিরলেন না তখন তাঁকে খোঁজবার জন্য লোক পাঠান নি?"

"পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ফল হয় নি। কারণ মহারাজ চলে' যাবার ঠিক পরেই ভীষণ বর্ষা নামে। বহুদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের পর যখন বর্ষা থামল, তখন দেখা গেল আমাদের রাজ্যের চারিপাশে সমুদ্র হ'য়ে গেছে। যে সমুদ্র এখন তাম্রপুরীকে ঘিরে আছে, আগে তা ছিল না।"

"তাই না কি!"

"হ্যাঁ। মহারাজের জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করে' আমরা আমাদের ময়ূরপঙ্খী

নৌকাগুলি সব একে একে পাঠালাম তাঁকে খোঁজবার জন্য, কিন্তু একটিও ফিরল না"

মন্ত্রীমশায় চুপ করে রইলেন।

রাজপুত্র বললেন, "কি উপায় হবে তাহলে মন্ত্রীমশায়? বাবাকে খোঁজবার কোনও চেষ্টাই কি তাহলে আমরা করব না?"

"কি করে' যে করবে, তা তো বুঝতে পারছি না। আমি এতকাল ওই কথাই ভেবেছি কেবল। কিছুই ঠিক করতে পারি নি। ভেবে ভেবে মাথার চুল পেকে গেল, বুড়ো হ'য়ে গেলাম, এখন তো কোনও বুদ্ধিই আমার মাথায় আর খেলে না। আমাদের রাজ্যে আর নৌকো নেই, নৌকো তৈরি করবার লোকও নেই। সকলেই মহারাজের দিগ্বিজয় বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, কেউ ফেরে নি। অথচ নৌকো না হ'লে ওই দুস্তর সাগর পার হওয়ার তো কোন উপায় দেখি না—"

আবার চুপ করলেন মন্ত্রীমশায়।

তারপর বললেন, "আমাকে এবার বিদায় দাও রাজকুমার। আমি অসমর্থ হয়েছি, তোমার রাজ্যের ভার তুমি নাও। আমি বানপ্রস্থে গিয়ে বরং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাতে যদি কোনও ফল হয়—"

মন্ত্রীমশায় চলে গেলেন।

পরদিন তাম্রপুরীর রাজকুমার তামার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তাম্রপুরীর ঘরবাড়ি, পথঘাট, আসবাবপত্র সবই তামার।

রাজপুত্র সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়েছিলেন। সূর্যোদয় হচ্ছিল। উদীয়মান সূর্যের লাল আলোয় সমস্ত তাম্রপুরী জলজল করছিল। মনে হচ্ছিল তাম্রপুরীর অন্তরের আক্ষেপ বুঝি মূর্ত হয়েছে রৌদ্রালোকিত তাম্রবর্ণের রক্তিম আভায়। রাজপুত্রের মনে পড়ল মায়ের চোখ দুটো। কেঁদে কেঁদে ঠিক এই রকমই লাল হয়েছে তারা।

রাজপুত্র সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন।

সমুদ্র দিগন্তবিস্তৃত।

"বন্ধু—"

রাজপুত্র ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন শ্রীধর দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাজবাগানের মালী ভূধরের ছেলে শ্রীধর। ভূধরও মহারাজের সঙ্গে দিগ্বিজয় অভিযানে বেরিয়েছি ।।

সে-ও ফেরে নি। শ্রীধর রাজপুত্রের দুঃখ বুঝত, তাই দু'জনে বন্ধুত্ব হয়েছিল খুব।

রাজপুত্র বললেন, "কি বলছ বন্ধু ?"

"একটা কথা মনে আছে তোমার ? তুমি বলেছিলে, তুমি যখন রাজা হবে তখন আবার বাগান তৈরি করবে। এইবার তো রাজা হয়েছ, এস এইবার দু'জনে মিলে বাগান তৈরি করি। বাগানের কি দুর্দশা হয়েছে! সমস্ত গাছ শুকিয়ে গেছে, একটি ফুল ফোটে না—"

রাজপুত্র নীরবে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন। রাজপুত্রের চোখের দিকে চেয়ে শ্রীধর বললে, "বন্ধু, তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারছি, কারণ তোমার দুঃখ আর আমার দুঃখ সমান। কিন্তু আজ আমার মনে হ'ল এমন ভাবে দিনের পর দিন চুপচাপ বসে' বসে' দুঃখ করে' লাভ কি! তার চেয়ে কিছু কাজ করা ভাল। তাতে দুঃখ খানিকটা কমবে বোধ হয়। তুমিও বাগান ভালবাস, আমিও বাগান ভালবাসি, এস দু'জনে মিলে ভাল বাগান করি একটা।…

ম্লান হেসে রাজপুত্র, "বেশ, তাই হোক।"

কিছুদিনের মধ্যে দেখতে দেখতে রাজপুত্রের বাগান তৈরি হ'য়ে উঠল। সে বাগানে কত রকম যে ফুল ফুটল, কত রকম যে ফল ধরল তার আর ইয়ত্তা নেই। সাগরপার থেকে নানারকম পাখি উড়ে উড়ে এসে বসতে লাগল গাছের ডালে ডালে। রাজপুত্র খুশি হলেন। মাকে গিয়ে একদিন বললেন, "মা, শুনেছি বাবা দোলন-চাঁপা ভালবাসতেন, তাই অনেক দোলন-চাঁপা লাগিয়েছি বাগানে। দোলন-চাঁপার বন হয়ে গেছে। আমি নিজে জল দিই তাতে। মনে হয় যেন বাবারই সেবা করছি।"

পরদিন রানী-মা নিজে এসে হাজির হলেন বাগানে। হাতে তাঁর তামার ঝারি, ঝারিতে ঝর্নার জল। সেই জল তিনি দোলন-চাঁপার গোড়ায় ঢালতে লাগলেন।

একদিন নয়, দুদিন নয়, প্রত্যহ।

দোলন-চাঁপার পাতায় পাতায় জাগল উৎসব। গাঁটে গাঁটে কুঁড়ি ধরল, ফুল ফুটল অজস্র।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল।

কাটল কিছুদিন।

তারপর একদিন আশ্চর্য ঘটনা ঘটল একটা।

রাজপুত্র একা একা বাগানে বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন দোলন-চাঁপা বনে প্রকাণ্ড প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে একটা। মস্ত বড়! অত বড় প্রজাপতি রাজপুত্র আর কখনও দেখেন নি। কি চমৎকার তার রং! সন্ধ্যার মেঘের মতো লাল ডানা দুটি, আর তাতে সোনালি রঙের অসংখ্য ফুটকি। ঠিক যেন লাল মখমলে সোনার চুমকি বসিয়ে দিয়েছে কেউ।

রাজপুত্র বলে উঠলেন, "বাঃ, এমন সুন্দর প্রজাপতি তো আর কখনও দেখি নি।"

রাজপুত্রের কথা শেষ হতে না হতে প্রজাপতি ঘুরে দাঁড়াল। রাজপুত্র সবিস্ময়ে দেখলেন, প্রজাপতির মানুষের মতো মুখ রয়েছে। ছোট্ট একটি মেয়ের মুখ, মাথাটি কালো কোঁকড়া চুলে ভরা, চোখ দুটি হাসছে!

মেয়েটি হেসে বললে, "আমি প্রজাপতি নই, আমি রাঙা পরী। তোমাদের দোলন-চাঁপা বনে আমার সই থাকে, তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

রাজপুত্র বললেন, "কই, দোলন-চাঁপা বনে আর কাউকে তো দেখি নি কোনদিন।"

রাঙা পরী হেসে বললে, "আমার সই বড় লাজুক, মানুষ দেখলেই লুকিয়ে পড়ে।"

তারপর একটি আধফুটন্ত দোলন-চাঁপার দিকে চেয়ে সে বললে, "ওলো সই বেরিয়ে আয় না। রাজপুত্রের সঙ্গে আলাপ কর।"

সঙ্গে সঙ্গে আধফুটন্ত দোলন-চাঁপাটি আর একটি পরীতে রূপান্তরিত হল। এরও চোখ মুখ ঠিক রাঙা পরীর মতো, কেবল ডানা দুটি ধপধপে সাদা। ঠিক যেন দু'টুকরো শরতের মেঘ কেটে কেউ বসিয়ে দিয়েছে তার পিঠের উপর।

রাজপুত্র অবাক্ হ'য়ে গেলেন।

বললেন, "তুমি এখনই ফুল ছিলে, মানুষ হয়ে গেলে কি করে "

"আমরা যখন যা খুশী হতে পারি"

"কি করে?"

"মন্তরের জোরে"

"আমাকে শিখিয়ে দেবে সে মন্তর?"

"দিতে পারি। সরে এস তাহলে এদিকে, এ মন্তর জোরে বলতে নেই, কানে কানে বলতে হয়।"

রাজপুত্র সরে' গেলেন। তাঁর কানের কাছে মুখ এনে রাঙা পরী মন্ত্রটি শিখিয়ে দিলে তাকে।

"এ মন্তর কখ্‌খনো জোরে বোলো না। যখনি দরকার হবে মনে মনে বলবে।"

"আমি পাখি হতে পারব?"

"নিশ্চয়। মন্তরটি বলে' মনে মনে ইচ্ছে করলেই যা ইচ্ছে করবে তাই হয়ে যাবে। পরীক্ষা করে' দেখ না।"

রাজপুত্র সঙ্গে সঙ্গে টুনটুনি পাখি হ'য়ে গেলেন। মনের আনন্দে উড়ে বেড়াতে লাগলেন চারিদিকে, প্রতিটি গাছের ডালে গিয়ে বসলেন। সমুদ্রের দিকে উড়ে গেলেন একবার, ইচ্ছে হ'ল উড়ে সমুদ্রটা পার হয়ে যান, কিন্তু কিছুদূর গিয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়ল ডানা দুটি। ভয় হতে লাগল যদি পড়ে' যান সমুদ্রে। ফিরে এলেন। আবার মানুষ হ'য়ে যখন দোলন-চাঁপা বনে গেলেন তখন পরীরা চলে গেছে। প্রত্যেক দোলন-চাঁপাকে সম্বোধন করে বললেন, "তুমি কি সাদা পরী? কথা কও না।"

দোলন-চাঁপারা নিরুত্তর হয়ে রইল।

দিন কাটে।

পরীর কথা রাজপুত্র কাউকে বলেন নি, এমন কি শ্রীধরকেও না। তাঁর ভয় হ'ত কাউকে বললে যদি মন্ত্রের শক্তি চলে যায়। আর কাউকে বলা চলবে কি না তা পরীদের জিজ্ঞাসা করা হয় নি। ভাবেন, এবার পরীদের দেখা পেলে কথাটা জেনে নিতে হবে। কিন্তু পরীরা আর আসে না। প্রায় প্রতিদিনই তিনি প্রত্যেক দোলন-চাঁপার কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি কি সাদা পরী? এস না গল্প করি একটু।" ফুল কিন্তু ফুলই থাকে, পরী হয় না। যখন কেউ থাকে না, রাজপুত্র পাখি হ'য়ে পাখিদের সঙ্গে গল্প করেন। কত দূর-দূরান্তের পাখি যে আসে! যে সমুদ্র তাম্রপুরীকে ঘিরে রেখেছে সেই সমুদ্রের ওপার থেকে আসে খঞ্জনের দল। তাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে রাজপুত্রের। তারা আসে, কিছুদিন থাকে, আবার চলে' যায়।

হঠাৎ নূতন ধরনের একটা পাখি এল একদিন। গায়ের রং তামাটে, বাঁকানো ঠোঁট, মাথার ঝুঁটি সাদায় কালোয়, চোখের দৃষ্টি প্রখর। অনেকটা চিলের মতো হাবভাব, কিন্তু চিল নয়। চিলের চেয়ে বড় দেখতে। উঁচু তালগাছের মগডালে

এসে বসল সে, তারপর আকাশের দিকে মুখ করে' চীৎকার করে উঠল। রাজপুত্রের মনে হ'ল ঠিক যেন বলছে—"হায় রাজা, হায় রাজা— !"

রাজপুত্র অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। কি বলছে ও?

রাজপুত্র মনে মনে পরীর মন্ত্র স্মরণ করে ইচ্ছা করলেন যেন তিনি ঠিক ওই রকম পাখি হয়ে যান।

সঙ্গে সঙ্গে হয়েও গেলেন।

তখন তিনিও উড়ে গিয়ে বসলেন তার পাশে।

"কে ভাই তুমি—"

"আমি হিমালয়বাসী ঈগল। তোমার বন্ধু খঞ্জনদের সঙ্গে প্রতিবছর আমার দেখা হয়। এ বছরও হয়েছিল। তাদের মুখে তোমার বাবার কথা শুনলাম। তোমার বাবার কি হয়েছে আমি জানি।

"জান?"

"হ্যাঁ। তোমার বাবাকে, তোমার বাবার সৈন্য-সামন্তকে এক বিরাট অজগর গ্রাস করেছে"

"বল কি!"

"হ্যাঁ, হিমালয়চূড়ায় বসে' আমি স্বচক্ষে দেখেছি। শুধু তোমার বাবাকেই নয়, অনেক রাজা মহারাজাকে বণিক সওদাগরকে গ্রাস করেছে ওই অজগর!"

"তুমি স্বচক্ষে দেখেছ গ্রাস করেছে? কি দেখলে?"

"ওই অজগর বিরাট হাঁ করে' বসে থাকে। এত বিরাট যে দেখলে মনে হয় না সাপের হাঁ, মনে হয় বুঝি ওটা রজতপুরীর তোরণদ্বার। ভয়ঙ্কর নয়, মনোহর। তার দাঁত থেকে, জিব থেকে, চোখ থেকে অপূর্ব এক রুপোলী আলো বেরুচ্ছে সর্বদা। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়, আর সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ে। ঢুকে পড়লেই অজগর মুখ বন্ধ করে' দেয়, তখন আর বেরুবার উপায় থাকে না!"

"তাহলে আমার বাবা বেঁচে নেই?"

"তা ঠিক বলা যায় না। শুনেছি ও অনেককে গ্রাস করে বটে কিন্তু সবাইকে হজম করতে পারে না। তোমার বাবা হয়তো ওর পেটের ভেতর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। অজগরকে মেরে তার পেট চিরে যদি দেখা যায় তাহলে ঠিক বোঝা যাবে—"

"কোথায় থাকে সে? আমাকে তার ঠিকানা বলে দাও, খড়্গ দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে' ফেলব তাকে।"

ঈগল হেসে বললে, "খড়্গ দিয়ে তাকে কাটা যায় না। আমরা সাপের শত্রু, সাপকে টুকরো টুকরো করাই আমাদের কাজ, কিন্তু আমরা ওর কিছু করতে পারি নি। বরং ভয় হয় কাছে গেলে ও-ই আমাদের গিলে ফেলবে। ওর নাম কি জান? লোভ। স্বয়ং গরুড় যদি ইচ্ছা করেন তাহলে ওকে মারতে পারেন, আর কারও সাধ্য নেই। তবে তিনি বিষ্ণু আর লক্ষ্মীকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে এসব ছোটখাটো কাজে মাথা ঘামাতে রাজী হবেন কি না সন্দেহ। তবে হ্যাঁ, একটা কাজ করলে হতে পারে—"

ঈগলের মাথার ঝুঁটিটা ফর্‌র্ করে খুলে গেল।

"কি—"

"গরুড় তো আমাদেরই সম্রাট্। সমস্ত পাখিরা যদি গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করে তাহলে তিনি 'না' বলতে পারবেন না। কিন্তু সমস্ত পাখিরা কি তোমার বাবার জন্যে অত করবে? আমি অবশ্য ঈগল সমাজকে বলব, তারা রাজীও হবে হয়তো। তুমি অন্য পাখিদের বলে দেখ তারা যদি রাজী হয়"—

"বেশ, আমি বলে দেখব"

"আমি এখন চললুম তাহলে। এই কথা বলতেই এসেছিলাম। কি হল আমাকে খবর দিও খঞ্জনদের মুখে। কেমন?"

"আচ্ছা।"

ঈগল পাখি উড়ে গেল।

রাজপুত্র শুনতে লাগলেন ঈগল পাখি উড়তে উড়তে যেন বলছে—"হায় রাজা, হায় রাজা, হায় রাজা—"

চামেলীকুঞ্জে বাসা বেঁধেছিল টুনটুনি দম্পতি। তাদের সঙ্গে আগে থাকতেই ভাব ছিল রাজকুমারের। প্রায়ই টুনটুনি সেজে তাদের সঙ্গে গিয়ে গল্প করতেন। টুনটুনিরা জানতই না যে আসলে তিনি রাজপুত্র, মন্ত্রবলে টুনটুনি হয়েছেন।

রাজপুত্র ভাবলেন সত্যি কথাটা এইবার ওদের খুলে বলা উচিত।

সব শুনে টুনটুনিরা প্রথমে অবাক্‌ হ'য়ে গেল, তারপর আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়ল।

"সে কি, তুমি আমাদের রাজপুত্র না কি ?"—পুরুষ টুনটুনি বলে' উঠল !

"কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য"—বলে' উঠল টুনটুনি-গিন্নী।

তারপর তুড়ুক তুড়ুক করে' নাচতে লাগল দু'জনে।

রাজপুত্র বললেন, "সব তো শুনলে, এইবার বল তোমরা গরুড়ের কাছে যাবে কি না"—

"নিশ্চয় যাব। আমাদের দলবল সবাইকে নিয়ে যাব"

রাজপুত্র তখন শালিক সেজে শালিকদের বললেন, টিয়া সেজে গেলেন টিয়াদের কাছে, বুলবুলি সেজে বুলবুলিদের অনুরোধ করলেন। দর্জিপাখি, দোয়েল, বসন্তবউ, বেনেবউ, ফটিকজল, প্রত্যেকের কাছে গেলেন তিনি। ফিঙে, নীলকণ্ঠ, বাদামী-কালো, মাছরাঙা, ছাতারে, কাক, বক, চিল, সারস কেউ বাদ রইল না।

সবাই রাজপুত্রকে কথা দিলে যেদিন রাজপুত্র তাদের যেতে বলবেন সেইদিনই তারা গরুড়ের কাছে যাবে।

তারপর আবার এল খঞ্জনের দল।

"ঈগলের মুখে শুনেছ তো সব ?"

"শুনেছি। এখানকার সব পাখিদের আমি অনুরোধ করেছি গরুড়ের কাছে যাবার জন্যে। তারা রাজীও হয়েছে। কিন্তু অন্য দেশের পাখিদের তো আমি চিনি না—"

খঞ্জনের দল বললে, "আমরা চিনি। তোমার হয়ে আমরা গিয়ে তাদের অনুরোধ করব।"

"তাহলে তো খুব ভাল হয় !"

"নিশ্চয় করব"

মহা-উৎসাহে খঞ্জনের দল উড়ে চলে' গেল। বড় বড় গাছ পাহাড় সমুদ্র নদী পেরিয়ে দেখতে দেখতে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে' গেল তারা।

আবার কবে তারা ফিরবে ?

রাজপুত্র রোজ প্রতীক্ষা করেন।

ইতিমধ্যে রাজপুত্র আর এক কাণ্ড করলেন।

রানী-মা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তামার ঝারিটি নিয়ে বাগানে আসতেন, গাছে গাছে জল দিতেন, কিন্তু তাঁর মুখে হাসি ছিল না। রাজপুত্র মাঝে মাঝে দেখতে পেতেন জল দিতে দিতে তাঁর চোখে জল পড়ছে। রাজপুত্র আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না, মাকে সব কথা খুলে বললেন একদিন। মা-তো বিশ্বাসই করতে চান না প্রথমে। রাজপুত্র তখন বললেন, "এস না আমি তোমার কানে কানে পরীদের সেই মন্ত্র বলে' দিচ্ছি। তুমিও ইচ্ছে করলে পাখি হয়ে যেতে পারবে। তুমি যে পাখি হতে চাও, মনে মনে তাই ইচ্ছে কর।"

রানী-মা সঙ্গে সঙ্গে ময়ূর হ'য়ে গেলেন।

তারপর আবার মানুষ হয়ে বললেন, "পাখিরা যেদিন গরুড়ের কাছে যাবে, আমিও সেদিন ময়ূর সেজে যাব তাদের সঙ্গে। ময়ূরেরা সাপের শত্রু। আমি সে অজগরকে মারতে না পারলেও ক্ষতবিক্ষত করব।"

"আর আমি?"

"তুমি কুমার, তুমি আমার পিঠের উপর বসে থাকবে।"

রানী-মার চোখে ফুটে উঠল একটা অপূর্ব দীপ্তি, যে দীপ্তি নিবে গিয়েছিল এতদিন, যে দীপ্তি রাজপুত্র কখনও দেখেন নি।

কিছুদিন পরে ফিরে এল খঞ্জনেরা।

সব শুনে তারা বললে, "তুমি আর তোমার মা যদি যাও তাহলে তো খুব ভাল হয়। গরুড় নিজে যে মাতৃভক্ত! মাকে সৎমার পীড়ন থেকে উদ্ধার করবার জন্যে তিনি অসাধ্যসাধন করেছেন। তোমার মা যদি যান, নিশ্চয় রাজী হয়ে যাবেন তিনি, আমরাও এদিকে সব ঠিক করে' ফেলেছি। সমস্ত পাখি রাজী হয়েছে। আমরা দিনের পাখি, আমরা সকালে যাব, পেঁচারা যাবে রাত্রে, তাদের দলপতি হুতোম পেঁচা নিয়ে যাবে তাদের। তোমরা কি আমাদের সঙ্গে যাবে?

"নিশ্চয়।"

"তাহলে কাল ভোরে ঠিক হয়ে থেকো। ঊষার রাঙা আলো যেই আকাশের গায়ে লাগবে, অমনি আমরা বেরিয়ে পড়ব। আমাদের ডাক শুনতে পাবে তোমরা—"

"বেশ।"

খঞ্জনের দল আবার উড়ে চলে গেল মাঠ বন গিরি নদী সমুদ্র মরুভূমি পেরিয়ে।

পরদিন ভোরে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল।

রাত দুপুরে পূর্বাকাশে যে মেঘগুলি জ্যোৎস্নায় টগরফুলের রাশির মতো দেখাচ্ছিল ভোর হতে না হতেই সেগুলি হয়ে গেল যেন রক্তজবার রাশি। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল অপূর্ব এক নহবত—লক্ষ পাখির কাকলী।

রানী-মা ময়ূর সেজে অপেক্ষাই করছিলেন। পাখিদের ডাক শোনামাত্র রাজকুমারকে পিঠে নিয়ে উড়লেন আকাশে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

ময়ূরের পিঠে চড়ে চলেছেন রাজকুমার! আর তাঁর পিছু-পিছু চলেছে অসংখ্য রকমের অসংখ্য পাখি। চেনা পাখিদের মধ্যে টিয়া, ময়না, বুলবুল, হীরেমন, দোয়েল, হরবোলা, পাপিয়া, চাতক, কোকিল, ফটিকজল, বউ-কথা-কও, পায়রা, হরিয়াল, ঘুঘু, কাক, বক, সারস, চিল, শঙ্খচিল, বাজ, টুনটুনি, দর্জিপাখি, কুলোপাখি, চোরপাখি, চড়াই, ফিঙে, কাঠঠোকরা, টিট্টিভ, মাছরাঙা, কাদাখোঁচা, ভরত, খঞ্জন, ফুলকি, বসন্তবউ, বাঁশপাতি, সোনাপাখি, মুনিয়া, বাবুই, আবাবিল, শ্যামা, নীল, ময়না, বটের, তিত্তির, বনমুরগী এরা তো ছিলই, অচেনা পাখি কত যে ছিল তার আর ইয়ত্তা নেই। মানস সরোবর আর মেরুপ্রদেশ থেকে এসেছিল হাঁসের দল। হাঁসেদের পিঠে চড়ে চলেছিল পেঙ্গুইনরা, খঞ্জনরা ছিল সব শেষে।

পাখিদের ডাকে মুখরিত হয়ে গেল দশদিক। তাদের ডানায় সমস্ত আকাশ ঢেকে গেল।

বিষ্ণুর রথের চূড়ায় গরুড় বসেছিলেন। কি মনোহর তাঁর রূপ। যেমন গম্ভীর, তেমনি সুন্দর। সমস্ত শুনে বললেন, "যারা লোভের বশবর্তী হ'য়ে অপরের রাজ্য ছিনিয়ে নিতে যায়, তাদের শাস্তি দেবার জন্য ভগবান ওই লোভ-অজগরকে সৃষ্টি করেছেন। ওটা অজগর নয়, আসলে ওটা কারাগার। লোভী-লোকদের ওতে বন্দী করে' রাখা হয়। যতক্ষণ না তারা নির্লোভ হচ্ছে ততক্ষণ ও অজগরকে মারা সম্ভব নয়।"

ময়ূরবেশিনী রানী বললেন, "ক্ষত্রিয় রাজার রাজধর্ম অনুসারে আমার স্বামী

দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন। তিনি সামান্য লোভী নন। তাছাড়া আমার বিশ্বাস এতদিনে সম্পূর্ণ নির্লোভ হয়েছেন তিনি। আপনারা খবর নিন!"

রথের ভিতর বিষ্ণু ও লক্ষ্মী ছিলেন।

পাখিদের চীৎকারে ও ভিড়ে অত্যন্ত বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলেন তাঁরা। রানী-মার কথা শুনে বিষ্ণু বললেন, "আচ্ছা, আমি এখনই খবর নিচ্ছি। ওহে পবন, তোমার তো সর্বত্র গতি, তুমি খবরটা নাও দিকি—"

পবনদেব "যথা আজ্ঞা" বলে' তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন সবাই। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না, পবনদেব চট করে' ফিরে এলেন।

এসে বললেন, "রাজা তো নির্লোভ হয়েইছেন, ওই অজগরের পেটে যারা যারা ছিল সবাই নির্লোভ হয়েছেন। কারও আর লোভ নেই।"

বিষ্ণু গরুড়কে আদেশ দিলেন, "তাহলে আর দেরি করে' লাভ কি! গরুড়, চল তাহলে অজগরটাকে শেষ করে ফেলা যাক"—

বিষ্ণু আর লক্ষ্মীকে পিঠে করে নিয়ে শোঁ করে' গরুড় উড়ে গেলেন।

পাখির দলও সঙ্গে চলল।

শ্যামলতাহীন এক বিশাল মরুভূমি জুড়ে পড়েছিল সেই বিরাট অজগর।

দেখতে দেখতে অজগরকে টুকরো টুকরো করে ফেললেন গরুড়। সৈন্য-সামন্ত অনুচর-পরিচর সবাইকে নিয়ে রাজা বেরিয়ে এলেন। ভূধরও এল। বেরিয়েই দেখেন বিষ্ণু আর লক্ষ্মী।

সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন রাজা।

লক্ষ্মী বললেন, "রুপোর প্রতি তোমার এত লোভ? আচ্ছা, তার জন্যে আর তোমাকে রজতপুরী জয় করতে হবে না। তোমার তাম্রপুরীকেই আমি রজতপুরী বানিয়ে দেব"

রাজপুত্র বললেন, "কিন্তু আমরা বাড়ি ফিরব কি করে? আমাদের রাজত্বের চারিদিকে সমুদ্র হয়ে গেছে, সে সমুদ্র আমরা এত লোকজন নিয়ে পার হব কি করে?"

লক্ষ্মী হেসে বললেন, "সে গেলেই দেখতে পাবে!"

সবাই যখন সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালেন তখন দেখা গেল প্রকাণ্ড

একটা রুপোর সেতু এপার থেকে ওপারে চলে গেছে। কি সুন্দর কারুকার্য তার !

সেই সেতু পার হয়ে তাঁরা এসে দেখলেন তাম্রপুরী সত্যি সত্যিই রজতপুরী হয়ে গেছে। রুপোর তৈরি ঘরবাড়ি ঝকঝক করছে সূর্যালোকে।

শ্রীধর দাঁড়িয়েছিল সেতুর এপারে। রাজপুত্রকে সে চুপি চুপি বললে, "ভাগ্যে বাগান করবার বুদ্ধি দিয়েছিলাম তাই তো এত সব হল !"

"নিশ্চয়। যখন আমরা বাগান তৈরি করেছিলাম তখন ভাবতেই পারি নি যে সাধারণ বাগান মায়া-কানন হয়ে উঠবে।"

শ্রীধর বললে, "ভাল করে তলিয়ে দেখলে সব বাগানই মায়া-কানন। হ্যাঁ, আর একটা মজার ব্যাপার হয়েছে—"

"কি ?"

"ওই দেখ না।"

রাজপুত্র দেখলেন রুপোর তৈরি রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের দু'পাশে শাঁখ হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে রাঙা পরী আর সাদা পরী।

পরিচয়

"আমাকে চিনতে পারছ ?"

"পারছি বই কি।"

"কি করে' পারলে, চেনবার তো কথা নয় !"

"বাঃ, আমি দেখেছি যে। একবার নয়, অনেকবার"

"কি করে' দেখলে ? আমি তো এখানকার নই। কোলকাতা থেকে আমাকে এনেছে এখানে। আমাকে ঠিক নয়, আমার মাকে। আজই ফুটেছি আমি। তুমি কি কোলকাতা গিয়েছিলে কখনও ?"

"না। ওই যে ওই গাছে আমার বাসা"

টুনটুনি উড়ে গিয়ে তার বাসাটির চারপাশে ঘুরে এল একবার। মালতী ফুল সবিস্ময়ে চেয়ে রইল।

টুনটুনি আবার এসে বসল তার কাছে। বলল, "তুমি যাই বল, তোমাকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। মাঝে মাঝে আসব তোমার কাছে। কেমন ?"

"এসো—"

ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে' গেল সে।

তারপর এল হাওয়া।

"এই যে, ভাল আছ ?"

"আছি। তুমি চেন নাকি আমাকে ?"

"বা, চিনি না ? চিরকাল তোমায় দোলাচ্ছি, চিরকাল তোমার সুরভি, তোমার পরাগ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি—"

"কিন্তু আমি তো এখানকার লোক নই। ভাবছি, কি করে চিনলে ?"

"আমিই কি এখানকার লোক না কি ! কাল রেঙ্গুনে ছিলাম, আজ এখানে এসেছি, তার আগে ছিলাম উড়িষ্যায়। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই আমি। আমরা কারো নই, অথচ সকলের—"

হাওয়া তাকে দুলিয়ে দিয়ে চলে' গেল।

"আমিও তোমাকে চিনি"

যে আলো তাকে ঘিরে ছিল সে কথা ক'য়ে উঠল !

"তুমি কোলকাতার লোক কি ?"

"আমি কোলকাতারও নই, ঢাকারও নই। আমি আকাশের। আর তুমি মাটির। আমি আকাশ থেকে নেমে এসেছি মাটিতে তোমাকে ফোটাব বলে। এই পরিচয়ের বাঁধনেই আমরা চিরকাল বাঁধা। আমাদের অন্য পরিচয় নেই।"

আলোর হাসি আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

নূতন স্বপ্ন জাগল মালতী ফুলের পাপড়িতে। হাওয়া আবার দোল দিয়ে গেল।

টুনটুনি পাখি আবার এসে বসল পাশের ডালটিতে।

● তৃতীয় শতক ●

লক্ষ্যভ্রষ্ট

একটা রঙীন স্বপ্ন যেন ডানা মেলে উড়ে চলে' গেল।

রঙীন প্রজাপতি একটা। ঘর ছেড়ে বার হলাম।

ছুটলাম তার পিছু-পিছু। ওই যে করবী গাছের ডালটায় বসল, কিন্তু কাছে যেতে-না-যেতেই উড়ে গেল আবার। বোসেদের পাঁচিল-ঘেরা বাগানটায় ঢুকেছে, তুঁতগাছের ডালে বসে পাখা দুটি নাড়ছে আস্তে-আস্তে। বাগানের গেটটা পশ্চিম দিকে, অনেক ঘুরে যেতে হবে। তা হোক···ঘুরেই যাব।···চলতে লাগলাম।

কুর্-র্-র্-র্···

কি পাখি ওটা? ফিকে সবুজ রং। বাঃ, কি সুন্দর দেখতে! কি নাম ওর? একজন লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওই পাখিটার নাম কি?" "কী জানি" বলে চলে গেল সে। খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম পাখিটার দিকে। ফুড়ুৎ করে' উড়ে গেল। রাস্তার কোণের দিকে একটা ঝোপ ছিল, তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঝোপটার দিকে চেয়ে কিন্তু মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। কি সুন্দর এক রকম লতা দিয়ে ঝোপটা আগাগোড়া ঢাকা! একেই লতা-বিতান বলে নাকি? চমৎকার লতাটি! ঘন সবুজ পাতা, এত ঘন যে প্রায় কালো মনে হচ্ছে! কিন্তু কালো নয়, সবুজের আভা ফুটে বেরুচ্ছে প্রতি পাতাটি থেকে! ছ-কোণা পাতাগুলো, ধারে-ধারে করাতের মতো কাটা-কাটা। গোছা-গোছা ফুল ধরেছে, ফুলও ভারি চমৎকার! কি নাম এ লতার কে জানে?

কালেক্টার সাহেবের কেরানী দ্রুতপদে আপিস যাচ্ছিলেন। তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম—"আচ্ছা, এ লতার নাম কি বলুন তো?"

"কোন্ লতার? ও, ওইটে? ওটা একটা জংলি লতা।"

দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন। বুঝলাম, তিনিও ওর নাম জানেন না।

সত্যি, আমরা কত জিনিসই জানি না! কাল রাত্রে মশারি খাটাবার সময় মনে হচ্ছিল—পেরেক, দড়ি, মশারি এদের আবিষ্কর্তা কারা? এই নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁদের নাম আমরা জানি না। চতুর্দিকে এত ফুল, ফল, লতা, গাছ দেখি—তাদের অধিকাংশেরই নাম আমাদের জানা নেই!

"কে রে ভূতো নাকি ?"

দেখলাম আমাদের ক্লাসেরই গোবিন্দ।

গোবিন্দ এগিয়ে এসে একটি চমকপ্রদ খবর দিলে।

"শুনেছিস, রামা কাল ফুটবল-ফিল্‌ডে মার খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিল।"

"তাই নাকি ?"

"ওঃ! টেরটা পাইয়ে দিয়েছি বাছাধনকে কাল আমরা। আর কখনও গুণ্ডামি করতে আসবেন না আমাদের সঙ্গে। হাবুল-দা এইসা এক লাথি ঝেড়েছিল বাছাধনের পেটে যে সঙ্গে-সঙ্গে কাৎ—"

গোবিন্দ সোৎসাহে বর্ণনা করতে লাগল। গোবিন্দ ফুটবল খেলায় উৎসাহী। আমাদের পাশের গাঁয়ে যে স্কুল আছে, রামা সেই স্কুলে পড়ে। এই রামারই জন্যে আমরা কখনও তাদের ফুটবল খেলায় হারাতে পারি না। সে ক্রমাগত ফেল করে'-করে' কেবল ফুটবল খেলার জন্যে স্কুল আঁকড়ে পড়ে' আছে নাকি! স্কুলের মাস্টাররাও ছাড়তে চান না তাকে। রামার জোরে প্রত্যেক বছর 'কাপ' পাচ্চে ওদের স্কুল। দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়! ইয়া গোঁফ, ইয়া বুকের ছাতি। আমি যদিও ফুটবল খেলায় তাদৃশ উৎসাহী নই; তবু বিপক্ষ দলের এত বড় একটা বীরবাহু-পতনের সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করতে হ'ল।

গোবিন্দর সঙ্গে গল্প করতে-করতে মল্লিকপাড়ার মোড়টা পর্যন্ত চলে' গেলাম। মোড়ে গিয়ে গোবিন্দ বললে—"ওহো, তোকে আসল খবরটা দিতে ভুলে গেছি। আমরা সবাই চাঁদা করে' হাবুল-দা'কে আজ খাওয়াচ্ছি। তোকেও দিতে হবে চার আনা। আমি বাজার থেকে মাংসটা আনতে যাচ্ছি। তুই যদি ভাই গঙ্গার ধার থেকে ইলিশ মাছটা এনে দিস্। তোদের বাড়ির কাছেই তো! ফন্তি মাসি রান্নার ভার নিয়েছে সব। গ্র্যাণ্ড হবে। এনে দিবি তো ?"

"আচ্ছা।"

গোবিন্দ চলে গেল। আমিও ফিরছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়ল মোক্ষদা পিসির বাড়ির কোণটায় যে ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটুকু আছে, তাতে বালি পড়ে আছে খানিকটা, আর সেই বালির উপর একটা বেড়াল মনের আনন্দে লুটোপুটি খাচ্ছে। ভারি মজা লাগল। দেখতে লাগলাম দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

"ওখানে দাঁড়িয়ে ভূতো নাকি ?

মোক্ষদা পিসির শীর্ণ মুখ দেখা গেল জানালায়। বিধবা মোক্ষদা পিসির কেউ নেই। চির রুগ্ন।

"হ্যাঁ আমি……"

"আমাকে একটু মিছরি এনে দিবি বাবা দোকান থেকে? কাল থেকে জ্বর। উঠতে পারিনি। এনে দে বাবা!"

মোক্ষদা পিসির কাছ থেকে পয়সা নিয়ে দোকানে গেলাম। দোকানে ভীষণ ভিড়। 'কিউ' করে দাঁড়িয়ে আছে সব। আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম একজনের পিছনে। লোকটি খালি গায়ে ছিল। তার পিঠে দেখলাম আশ্চর্য দুটি তিল। শিরদাঁড়ার ঠিক দু'পাশে, ঠিক সমান দূরে, যেন কম্পাস দিয়ে মেপে কেউ বসিয়ে দিয়েছে দুটিকে। ভারি আশ্চর্য লাগল! কেন এমন হয়, কি করে' হয় কে জানে?

ভিড়ের মধ্যে নানারকম কথা হচ্ছে। চালের দাম, কাপড়, গান্ধি, জহরলাল, সুভাষ বোস, হিন্দু-মোসলেম দাঙ্গা, মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেন, বন্যা, ট্রেন-কলিশন। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম, একটা মেঘ ঠিক কুমিরের মতো দেখাচ্ছে! ঘণ্টা-দুই লাগল মিছরিটুকু কিনতে। মোক্ষদা পিসিকে মিছরি দিয়ে ফিরছি, ন্যাপলার সঙ্গে দেখা। ন্যাপলা বললে, "স্টেশনে যাবি না?"

"কেন, স্টেশনে কেন?"

"বাঃ, শুনিসনি? শাহ নাওয়াজ পাস করবে যে আজ তিনটের ট্রেনে!"

জানতাম না তো! শাহ নাওয়াজকে দেখবার আগ্রহ ছিল। নেপালের সঙ্গে গেলাম স্টেশনে। বিপুল জনতা সমবেত হয়েছে। 'জয় হিন্দ' বলে' চীৎকার করছে মাঝে-মাঝে। কত লোক, কত রকম লোক! কিন্তু তাদের দেখে, তাদের কথা শুনে মনে হ'ল না যে তারা ঠিক সেই আকুলতা নিয়ে এসেছে যা মানুষকে স্বদেশপ্রেমিকের পর্যায়ে নিয়ে যায়! মনে হ'ল এরা সব মজা দেখতে এসেছে। বিড়ি টানছে, হো-হো করে হাসছে! হুজুগের দল। মনে হ'ল মানুষ নয়, একরাশ ধুলো—যেদিকে হাওয়া বইছে, সেই দিকেই উড়ছে দল বেঁধে। বিরক্ত ধরে' গেল। তবু কিন্তু চলে আসতে পারলাম না। ট্রেনটা আসুক।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করায় ট্রেনটা এল। 'জয়হিন্দ' বলে চীৎকার করে' উঠল সবাই। কিন্তু আমি শাহ নাওয়াজকে দেখতে পেলাম না। আমার সামনে দুটো লম্বা লোক দাঁড়িয়েছিল। তাদের পিঠ এবং জামার ছিট দেখে ফিরে আসতে হ'ল।

গঙ্গার ধারে ইলিশ মাছের আশায় বসে আছি। ডিঙিগুলো আসেনি এখনও। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, রঙের উৎসব পড়ে গেছে। কি সুন্দর রঙ!

হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়লাম। রঙীন প্রজাপতির উদ্দেশে বাড়ি থেকে বার হয়েছিলাম, অথচ বসে' আছি ইলিশ মাছের আশায়! প্রজাপতির কথা সমস্ত দিন মনেও পড়েনি!

চেহারা বদল

বহুকাল পূর্বে ডাক্তার পতিতপাবন চক্রবর্তী যে গ্রামে এসে প্র্যাক্‌টিস শুরু করেছিলেন, সে-গ্রামে তখনও বিদেশী সভ্যতার পত্তন হয়নি ভাল করে'। গ্রামে রেল-স্টেশন হয়নি, ইংরেজী স্কুল হয়নি! লোকে চা খেতে শেখেনি। অ্যালোপ্যাথি-চিকিৎসার নামই শোনেনি। ডাক্তার পতিতপাবন এই হতচ্ছাড়া গ্রামে এসে বসেছিলেন, অর্থাভাবে। তাঁর এক পিসেমশাই এই অঞ্চলে দারোগা ছিলেন। তাঁরই আনুকূল্যে এবং উৎসাহে অতিশয় স-সঙ্কোচে এসেছিলেন তিনি ভাগ্যপরীক্ষা মানসে। টাকা থাকলে শহরে গিয়ে বসতেন, মুরুব্বি থাকলে চাকরি পেতেন, কিন্তু সে-সব কিছুই ছিল না তাঁর। অতি কষ্টে সস্তা জিনের কোট-প্যাণ্ট করিয়ে, কাঠের স্টেথস্‌কোপ কিনে (সেকালে কাঠের স্টেথস্‌কোপই প্রচলিত ছিল) এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ছুরি-কাঁচিগুলি একটি অতি সাধারণ কাঠের বাক্সে সাজিয়ে খড়ের ছোট একটি ঘরে নিজের ডাক্তারি-জীবন আরম্ভ করেছিলেন পতিতপাবন।

দারোগা পিসেমশায়ের উপদেশ অনুসারে কোট-প্যাণ্ট পরে' স্থানীয় হাটে তিনি ঘোরা-ফেরা করতেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে। সকলে সবিস্ময়ে সভয়ে চেয়ে দেখত এই নবীন চিকিৎসককে। চিকিৎসা করাবার বেলায় কিন্তু তারা ডাকত হয় হারু ওঝাকে, না হয় যোগেন মণ্ডলকে, না হয় হনুমান ত্রিবেদীকে। এই তিনজনই ও-অঞ্চলে নামজাদা কবিরাজ ছিল। কোট-প্যাণ্ট পরা এই আগন্তুকটির হাতে নিজেদের জীবন সমর্পণ করবার কথা ভাবতেই পারত না কেউ প্রথম-প্রথম। কিন্তু ভাবতেই হ'ল শেষ পর্যন্ত একদিন। দারোগা-পিসেমশাইয়ের জবরদস্তিতে নয়, পতিতপাবনের নিজেরই কৃতিত্বের জোরে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে ফিরছেন, হঠাৎ নজরে পড়ল, নির্জন প্রান্তরে কি একটা পড়ে' রয়েছে যেন। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, মানুষ একটা অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে' আছে। নাড়ী পরীক্ষা করে' বুঝলেন, মরেনি। কিন্তু মর-মর। চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, আশেপাশে কোনও লোক-জন নেই। তখন অদ্ভুত এক কাণ্ড করলেন পতিতপাবন। নিজেই কাঁধে করে তুলে নিয়ে এলেন তাকে নিজের কুঁড়েঘরে। তার গায়ে, কাপড়ে-চোপড়ে বমি আর বিষ্ঠার দুর্গন্ধ। নিজের

হাতে পরিষ্কার করলেন সব। গরম জল করে' সেঁক দিলেন তার হাতে-পায়ে। নিজের হাতে ওষুধ তৈরি করে' খাওয়ালেন, শুশ্রূষা করলেন সারা রাত জেগে। লোকটা বেঁচে গেল। তার হয়েছিল কলেরা। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে গরুর গাড়ি চেপে সে যাচ্ছিল এক বিয়ের নিমন্ত্রণে। পথে কলেরা হওয়াতে আত্মীয়স্বজনরা তাকে মাঠে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

খবর রটতে বিলম্ব হ'ল না। কোট-প্যাণ্ট পরে' মাসাধিক কাল হাটে ঘোরাঘুরি করে' যা হয়নি, ওই একটি ঘটনাতেই তা হ'য়ে গেল। পতিতপাবন যে সার্থকনামা ব্যক্তি, তা জেনে গেল সবাই। ভিড় করে' আসতে লাগল রোগীর দল তাঁর কাছে।

তবু কিন্তু মুশকিলে পড়লেন পতিতপাবন। সবাই এত বোকা, এমন সাধারণ-জ্ঞানশূন্য যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এদের চিকিৎসা করাই দায়। কথা বললে বোঝে না। অন্ধ-কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে সব।

একবার একটা রোগী দেখতে গেছেন। হয়েছে নিউমোনিয়া। রোগীর বাবা অর্থবান ব্যক্তি। সুতরাং হারু ওঝা, যোগেন মণ্ডল, হনুমান ত্রিবেদী—তিনজন কবিরাজকে ডেকেছেন তিনি। রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় পতিতপাবনের ডাক পড়েছে।

পতিতপাবন গিয়ে দেখলেন, তিনজন কবিরাজ তিনরকম সিদ্ধান্ত করে' বসে আছেন। হারু ওঝার মতে বায়ু প্রকুপিত হয়েছে, যোগেন মণ্ডলের ধারণা—আসল কারণ পিত্তাধিক্য, হনুমান ত্রিবেদী কফ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছেন না। পতিতপাবনকে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই পতিতপাবন বুঝেছিলেন যে, এ-অঞ্চলে প্র্যাক্‌টিস করতে হ'লে এই কবিরাজদের চটালে চলবে না। এদের হাতে রাখতে হবে। সাধারণ লোকের অগাধ বিশ্বাস এদের উপর। চিকিৎসা-ব্যাপারে এদের পরামর্শ অনুসারেই সবাই চলে। এমন কি, ডাক্তারি-চিকিৎসাও যখন করতে হয়, এরাই ডাক্তার ঠিক করে' দেয়। সুতরাং এদের প্রসন্ন রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। পৃথক-পৃথক ভাবে এদের প্রসন্ন রাখাটা এমন কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু পরস্পর-বিরোধী এই তিনজন প্রবীণ কবিরাজকে একসঙ্গে কি করে' তুষ্ট করা সম্ভব? হয়েছে তো নিউমোনিয়া। এর কারণ বায়ু, পিত্ত, না কফ তা পতিতপাবনের জানা নেই। কোন্‌টাকে সমর্থন করবেন তিনি? একজনকে সমর্থন করলে বাকি দু'জন চটে যাবে। মহা দুশ্চিন্তায়

পড়ে গেলেন পতিতপাবন। অবশেষে অনেক ভেবে একটা উপায় মাথায় এল তাঁর।

বললেন, "ওঝাজি ঠিকই বলেছে! বায়ু প্রকুপিত হয়েই জ্বরটা আরম্ভ হয়েছিল।"

হারু ওঝার মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

পতিতপাবন বললেন, "তারপর কিন্তু রুখে উঠল, পিত্ত। বায়ুর সঙ্গে লাগল তার লড়াই। পিত্ত জিনিসটা কিরকম বিশ্রী তা তো আপনারা জানেন—ভয়ানক তেতো। তেতোর চোটে তিতিবিরক্ত হ'য়ে বায়ুকে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে হ'ল শেষটা। পিত্ত জয়ী হ'ল—"

প্রদীপ্ত হয়ে উঠল যোগেন মণ্ডলের চোখ। ঈষৎ গর্বভরে গোঁফে তা দিলেন তিনি।

পতিতপাবন বলে' চললেন—"এদের প্রভুত্ব কিন্তু বেশী দিন থাকে না। পিত্তের প্রভাবও বরাবর রইল না। কফ মাথাচাড়া দিলে এবং পিত্তকে চেটে নিলে। এখন কফেরই প্রাধান্য চলছে—"

খিলখিল করে' হেসে উঠলেন হনুমান ত্রিবেদী আনন্দে হাততালি দিয়ে।

তিনজনেরই মানরক্ষা করে' শুরু করলেন পতিতপাবন চিকিৎসা। ভাল হয়ে গেল নিউমোনিয়া রোগী। পসার বাড়তে লাগল পতিতপাবনের।

কিন্তু ও-অঞ্চলের লোকগুলোই এমন বোকা যে বিপদে পড়তে হ'ত প্রায়ই।

একবার হয়েছে কি, একটা লোককে একশিশি ওষুধ দিয়ে তিনি বললেন—তিনঘণ্টা-অন্তর একদাগ করে খাওয়াবে।

লোকটা মহা চিন্তিত হয়ে পড়ল। ঘণ্টা ঠিক করবে কি করে। তার তো ঘড়ি নেই। একটিমাত্র ঘড়ি আছে জমিদার-বাড়িতে। পতিতপাবন গিয়ে জমিদারকে অনুরোধ করাতে জমিদার বললেন—আচ্ছা, আমি তিনঘণ্টা-অন্তর লোক পাঠিয়ে সময় জানিয়ে দেব আপনার রোগীকে। জমিদার তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন ঠিক। অসুখ কিন্তু সারল না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল বরং। আবার যেতে হ'ল পতিতপাবনকে। গিয়ে দেখেন, ওষুধ একফোঁটা খাওয়ান হয়নি! শিশিতে কাগজের যে দাগ কাটা ছিল, সেইগুলো জলে ভিজিয়ে তুলে কেটে কেটে খাইয়েছে!

আর-একবার একটি রোগী বললে, আমার হজম হচ্ছে না, ভাল একটা ওষুধ দিন।

পতিতপাবন বললেন, ওষুধ খাবার আগে খাবার নিয়ম করে' দেখুন। ভাত-রুটি ছেড়ে দিয়ে ফলটল খেয়ে থাকুন দু'চার দিন।

লোকটি চলে গেল! তারপর দিন তার ভাই ছুটে এল হন্তদন্ত হয়ে।

—"ডাক্তারবাবু, আপনাকে যেতে হবে একবার।"

—"কেন?"

—"দাদার বড্ড পেট নামিয়েছে!"

—"কেন, কি হ'ল?"

—"সে আপনি গিয়েই শুনবেন।"

অন্যদিকে চেয়ে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। যেতে হ'ল পতিতপাবনকে। গিয়ে দেখেন, রোগী শয্যাগত।

—"কি হে, কি হ'ল?"

—"পেটটা একটু নরম হয়েছে"

—"খাওয়ার অত্যাচার করেছ নিশ্চয়"

—"আজ্ঞে না, ফলই খেয়েছিলাম"

—"কি ফল?"

—"তাল। বেশী নয়, গোটা-পাঁচেক"

নির্বাক হয়ে রইলেন পতিতপাবন।

বার্লি কাকে বলে তাই জানত না তখন সে-দেশের লোক। বার্লি খাওয়াতে বলে এসেছেন একজনকে, ক্রমাগত 'বালি' খাইয়েছে, গঙ্গার চরের বালি। রোগী পেটের ব্যথায় মরবার যোগাড়।

দুই

তারপর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হয়েছে।

পতিতপাবন ডাক্তারের বয়স ছিল পঁচিশ, এখন হয়েছে পঁচাত্তর। গ্রামের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামে স্টেশন হয়েছে, 'বাস' হয়েছে, চায়ের দোকান হয়েছে। নিকটবর্তী শহরে সিনেমাও খুলেছে। পাশের বাড়ির রামু পোদ্দার রেডিও কিনেছে একটা ব্যাটারি-সেটের। গাঁক-গাঁক করে' বাজাচ্ছে দিনরাত।

গ্রামে হাইস্কুল তো হয়েছেই, বালিকা বিদ্যালয়ও হয়েছে। প্রতি পাড়ায় চায়ের দোকান হয়েছে একটা করে'!

পতিতপাবনের কাছে লিকলিকে একটি ছোকরা এসে বললে একদিন, "আমার বুকটা এগ্‌জামিন করে' দেখুন তো ডাক্তারবাবু। কাসিটা কিছুতে কমছে না…"

ছোকরাটির নাম স্থলাল। ছুলাল নয়, স্থনীলও নয়। পরনে আদ্দির পাঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কাঁধ-কাটা গেঞ্জি। চোখে রঙিন চশমা। ঘাড় ছাঁটা। প্রথমে দেখলে মনে হয় গোঁফ কামানো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বোঝা যায়, ঠোঁটের উপর ছু'টি অতি সূক্ষ্ম কালো রেখার মতো আছে। সযত্নে ক্ষুর দিয়ে করা হয়েছে। দ্বিধা-বিভক্ত কাছা-পায়ে কাবুলী-চপ্‌পল।

পতিতপাবন ভাল করে' বুক পরীক্ষা করলেন। তারপ গলাটা দেখলেন। তারপর বললেন—"বুক ঠিক আছে। কাসিটা হচ্ছে গলার জন্মে"

—"কি করব বলুন তো ডাক্তারবাবু। মেন্‌থল প্যাস্‌টিল খেয়েছি ছু'শিশি। পেনিসিলিন লজেন্‌স্ বেরিয়েছে আজকাল, তাই ব্যবহার করব ?"

পতিতপাবন বললেন, "দরকার নেই ওসব"

—"কি করব তাহ'লে ?"

—"বিড়িটা ছাড়ো"

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' অপ্রসন্নমুখে চলে গেল স্থলাল। দিনবিশেক পরে এল আবার। বগলে একটা কাগজের মোড়ক।

—"ডাক্তারবাবু কোলকাতা গেসলাম। সেখানে ডাক্তার ভট্‌চাজ আমার পিতত্বতো দাদার শালা হন, তাঁকে দেখালাম। তাঁরই সাহায্যে বুকটা এক্‌স্-রে করলাম, গয়েরও পরীক্ষা করিয়েছি। তাঁরা এইসব ওষুধ লিখে দিয়েছেন।"

পতিতপাবন দেখলেন, একগাদা পেটেণ্ট ওষুধের তালিকা লিখিয়ে এনেছে ছোকরা।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ডাক্তার পতিতপাবন তাঁর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্খ রোগীদের দিকে চেয়ে যেমন দমে' যেতেন, স্থলালের দিকে চেয়েও তেমনি দমে' গেলেন। তাঁর মনে হ'ল—যথা পূর্বং তথা পরং। বাহিরের চেহারাটা বদলেছে খালি।

মৃন্ময়

মৃন্ময়ের কিছুই ভালো লাগে না আজকাল। তার বয়স বেশী নয়, এই সবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছে সে, কিন্তু এরই মধ্যে সে বুঝতে পেরেছে যে ঘরে বাইরে কোথাও যেন শান্তি নেই। খাওয়া-পরার কোনও অভাব নেই তাদের, কিন্তু বাবার মুখ সর্বদাই বিষণ্ণ, মায়ের মুখে হাসি নেই। বাবা যা মাইনে পান তাতে সংসার-খরচ কোনক্রমে চলে। আজকাল বাড়িভাড়াও দিতে পারেন না প্রতিমাসে। বাড়িওলা প্রায়ই এসে তাগাদা দেয়। বাবা তাকে বলেছিলেন যে সে যদি ক্লাসে ফার্স্ট হ'তে পারে তাহলে তাকে ভালো একটা বাঁশী কিনে দেবেন। সে ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে, কিন্তু বাবা তাকে বাঁশী কিনে দেননি এখনও। মৃন্ময় বুঝতে পারছে যে তাঁর হাতে টাকা নেই বলেই কিনে দিতে পারছেন না। টাকা থাকলে নিশ্চয়ই কিনে দিতেন। সে তার বাঁশের বাঁশীতেই গৎ সাধছে তাই। তার বন্ধু কমলদের নাকি আরও দুরবস্থা। কে একজন বলছিল, তাদের দু'বেলা খাওয়াই নাকি জুটছে না আজকাল। তার বাবার যক্ষ্মা হয়েছে, ছুটি নিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন, পুরো মাইনে পান না। মৃন্ময়ের খুব দুঃখ হয়, কিন্তু কি করবে সে। তার যদি অনেক টাকা থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই সে কমলদের দিতো। আহা, বড় কষ্ট বেচারাদের। কিন্তু, আর-একটা কথাও তার সঙ্গে-সঙ্গে মনে হয়। টাকা দিলেই কি কমল টাকা নিতো? তাকে যদি কেউ এখন দয়া করে একটা বাঁশী কিনে দেয়, সে কি নেবে? কখ্খনো না। কমলদের বাড়ি সে রোজই যায়, কমলের বাবাকে বাঁশী শুনিয়ে আসে। তিনি তার বাঁশী শুনতে খুব ভালোবাসেন! তবু কিন্তু মৃন্ময়ের কিছু ভালো লাগে না! দেশের হাওয়ায় কেমন যেন একটা অশান্তির উত্তাপ সঞ্চারণ করে' বেড়াচ্ছে। সংবাদপত্র তো খোলবার উপায় নেই। সংবাদপত্র-গুলো আজকাল দুঃসংবাদপত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার ডাস্টবিনে যেমন যত-রাজ্যের ময়লা এসে জমা হয়, এই খবরের কাগজগুলোতে তেমনি জমা হয় দুনিয়ার যত দুঃসংবাদ। অথচ না পড়েও উপায় নেই। খেলার খবরগুলোর জন্যেও পড়তে হয়। খেলার মাঠেও কি যাচ্ছেতাই কাণ্ড হচ্ছে আজকাল। ভদ্রতা কি উঠে গেল নাকি দেশ থেকে! সত্যি, ভারি কষ্ট হয় মৃন্ময়ের। বাঙালী বলে' পরিচয় দিতে

লজ্জা করে আজকাল। অথচ এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাঙালীর ইতিহাস কত গৌরবময়ই-না ছিল! এই সেদিনই তো নেতাজি···নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কথা ভেবে তার সমস্ত মন স্বপ্নাচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। সত্যিই কি মারা গেছেন তিনি? আর ফিরবেন না? হয়তো ফিরবেন না, ভারি কষ্ট হয় কিন্তু। মৃন্ময়ের ধারণা, তিনি যদি ফিরে আসেন সব ঠিক হ'য়ে যায় আবার। এই সব ঝগড়া, মারামারি, গণ্ডগোল, এই সব অভাব-অনটন, হাহাকার কিছু থাকে না তাহ'লে। সূর্য উঠলে অন্ধকার কি থাকে কখনও? সূর্য রোজ অস্ত যায়, রোজ আবার ওঠে। মহৎ লোক চলে' গেলে আর ফেরে না কেন? সূর্য তো রোজ ফিরে আসে! দেশজোড়া এই অশান্তির মধ্যে কতকাল বাস করতে হবে এমন ক'রে? হিন্দু-মুসলমানের এই ঝগড়া কি মিটবে না কোনও কালে? কুকুরের মতো চিরকাল কি তারা এমনি ঝগড়াই করে' যাবে! সত্যি, থামিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। দলে দলে হিন্দুরা এই যে দেশ ছেড়ে চলে আসছে—শিয়ালদ'তে গিয়ে একদিন দেখে এসেছে সে—শখ করে' নিশ্চয়ই আসেনি ওরা···কিন্তু, কেন ওদের এই শাস্তি···এর প্রতিকারই-বা কি!

একটা কিছু করতে ইচ্ছে করে মৃন্ময়ের···এমন একটা কিছু, যাতে দেশের সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যায়। রবিন্সন ক্রুশোর গল্প পড়েছে সে। ওইরকম অবস্থায় যদি পড়ে, সেও কি পারবে না? নিশ্চয় পারবে। বিরাট একটা সমুদ্রের ছবি ফুটে ওঠে তার চোখের সামনে। সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপ। সেই দ্বীপে সে একা রয়েছে। একটুও ভয় করছে না তার।···জঙ্গলের ডাল-পালা ভেঙে ছোট্ট একটি ঘর তৈরি করেছে। একটি কাঠবিড়ালী।···স্বপ্ন কিন্তু ভেঙে যায় একটু পরে। কেই বা তাকে সমুদ্রে নিয়ে যাচ্ছে! ম্যাট্রিকুলেশনটা যদি পাস করতে পারে (পাস অবশ্য করবেই সে, ভালোভাবেই করবে) তাহলে বাবা তাকে একটা আপিসে ঢুকিয়ে দেবেন বলেছেন! কলেজে পড়াবার সামর্থ্য তাঁর নেই। সমুদ্রযাত্রা করা অদৃষ্টে নেই। পালিয়ে গিয়ে অনেকে জাহাজের খালাসী হয়ে সমুদ্র দেখে এসেছে, অনেক দুঃসাহসিক কাজও করেছে। কিন্তু, মা বাবা মণ্টু মণিকে ছেড়ে তার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। তবে এটা সে জানে যে দরকার হলে সে রবিন্সন ক্রুশো হতে পারবে। শুধু রবিন্সন ক্রুশো কেন, রাণা প্রতাপ সিং, যতীন দাস, নেতাজি সব হতে পারে সে। যদি কোনওদিন সে সুযোগ পায় দেখিয়ে দেবে সকলকে যে বাঙালী এখনও অসাধ্যসাধন করতে পারে। ভাবতে ভাবতে, তার সমস্ত মন আবেগে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। মনে হয় সে

পারবে, পারবে, ঠিক পারতেই হবে, করতেই হবে কিছু একটা। কিন্তু সুযোগই পাচ্ছে না কিছু করবার। ঘরে বাইরে কেবল গ্লানি, গ্লানি আর গ্লানি। পরনিন্দা, পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা আর গবর্ণমেণ্টকে গালাগাল—এই হয়েছে এখন সকলের আলোচনার বিষয়। একটুও ভালো লাগে না মৃন্ময়ের ; তার কেবলই মনে হয়—আহা, যদি একটা সুযোগ পেতাম, দেখিয়ে দিতাম সকলকে, কি করে' দেশের কাজ করতে হয়।

…হঠাৎ একদিন সুযোগ পেয়ে' গেল সে।

রাস্তা দিয়ে আসছিল, হঠাৎ দেখতে পেলে তার সমবয়সী একটি ছেলে ফুটপাতের একধারে চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, গায়ে জামা নেই। মাথার চুল উস্কখুস্ক। হাতে বড়বড় নখ। দেখলে মনে হয় ভিখারী, কিন্তু ভিক্ষা করছে না তো। চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছে শুধু একধারে। কি করুণ দৃষ্টি চোখে! নিশ্চয় কিছু হয়েছে বেচারার। মৃন্ময় এগিয়ে গেল।

—"কোথায় বাড়ি তোমার ভাই ?"

—"পুর্ববঙ্গে।"

নিমিষের মধ্যে মৃন্ময়ের মনে হলো, উদ্বাস্তু নয় তো!

—"তোমার বাবা মা কোথা ?"

—"বাপ্ মা ভাই বুইন্ কেউ নাই। সব কাইট্যা ফেল্‌সে।"

বলেই কেঁদে ফেললে ছেলেটি। ঝরঝর করে' চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো তার।

—"চলো, ওই পার্কে বসবে চলো।"

পার্কে বসে মৃন্ময় তার মুখে সমস্ত শুনলে। এ রকম কাহিনী খবরের কাগজে সে আরও পড়েছে। মুসলমান গুণ্ডার দল এসে বাড়ি পুড়িয়েছে, সবাইকে মেরে ফেলেছে। খালের ধারে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে এই ছেলেটি প্রাণে বেঁচেছে কোনক্রমে। জঙ্গলেই লুকিয়ে-লুকিয়ে থেকেছে অনেক দিন। রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে হেঁটে-হেঁটে শেষকালে এক স্টীমার ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছে। সেখান থেকে স্টিমারে চড়ে' চলে' এসেছে এখানে। এখানে এক উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় পেয়েছিল, কিন্তু কাল থেকে সেখানে খাওয়া বন্ধ করে' দিয়েছে।

নিস্তব্ধ হ'য়ে কিছুক্ষণ বসে রইলো মৃন্ময়। তার মনে হতে লাগলো, দেশের

সমস্ত দুঃখ যেন মূর্তিমান হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে প্রতিকারের প্রত্যাশায়।

—"আমাদের বাড়ি যাবে?"

ছেলেটি সাগ্রহে ঘাড় নেড়ে জানালো যে, যাবে।

—"চলো"

রাস্তায় অনেক কথাই ভেবে নিয়েছিল মৃন্ময়।

বাড়ি গিয়ে মাকে বললে—"মা, এই ছেলেটিকে সঙ্গে করে' এনেছি, এ আমাদের বাড়িতে থাকবে।"

—"ছেলেটি কে…"

সমস্ত ঘটনা খুলে বললে মৃন্ময়।

—"আহা, বসো বাবা, বসো। বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা ওকে মিনু।"

ছেলেটিকে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়ে রেখে ফিরে এলো মৃন্ময়।

—"আগে ওকে খেতে দাও। খাবার আছে কিছু?"

—"তোর জন্যে যে রুটি দু'খানি রেখেছি, তাই আছে"

—"তাই দাও"

রুটি দিতে-দিতে মা বললেন—"ও থাকবে বলছিস, কতদিন থাকবে?"

—"বরাবর থাকুক না"

মা চুপ করে' রইলেন। মায়ের মনের কথা বুঝতে দেরি হলো না মৃন্ময়ের। রাস্তায় আসতে-আসতে তারও একথা মনে হয়েছে। তাদের নিজেদের সংসারই অতি কষ্টে চলছে, তার উপর আর-একজন হলো।

—"আমার খাবার আমি ওর সঙ্গে ভাগাভাগি করে' খাবো। এক বিছানায় পাশাপাশি শোবো। আমি যে চৌকিটায় শুই, তাতে তো অনেকখানি জায়গা খালি পড়ে থাকে। ও ঠিক হয়ে যাবে।"

—"আচ্ছা বেশ, সে-সব ভাবা যাবে' এখন পরে। তুই খাবারটা দিয়ে আয় ওকে।"

সেদিন রাত্রে সেই ছেলেটির সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে মৃন্ময়ের সারা বুক যে আনন্দে ভরে' উঠলো, তেমন আনন্দ তার জীবনে কখনও হয়নি। এমন কি ভূপেনকে হারিয়ে যেদিন সে ফার্স্ট হয়েছিল, সেদিনও না। একটা জিনিস কেবল

খুব খারাপ লাগছিল তার। মা তাকে অর্ধেক খাবার দেন নি, সে রোজ যেমন খায়, সেদিনও তাকে তেমনি খেতে হয়েছিল। সে আপত্তি করাতে মা ধমকে উঠলেন। মা কি যে মনে করেন তাকে। সে কি আধপেটা খেয়ে থাকতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে!

যদু

আমি খুব সংক্ষেপে যে ছেলেটির কথা আজ তোমাদের বলব সে অতি গরীবের ছেলে ছিল। যদিও সে বাপমায়ের একমাত্র সন্তান তবু সৌখীন কোন কিছু তার ভাগ্যে কখনও জোটেনি, এমনকি নাম পর্যন্তও নয়। তার নাম ছিল যদু। দেখতেও যে খুব সুশ্রী ছিল তা নয়, হাড়-পাঁজরা সার জীর্ণ বিশ্রী চেহারা, ম্যালেরিয়া জ্বরে আর পেটের অসুখে ভুগে ভুগে স্বাস্থ্য তার কোনও দিনই ভাল হতে পারেনি। হ'বে কি করে, দুবেলা পেটভরে' খেতেই পেত না।

তার বাপ কালীমোহনবাবু ছোট ছেলেদের প্রাইভেট টিউশনি করে' মাসে গোটা কুড়ি পঁচিশ টাকা রোজগার করতেন আর এই কটা টাকা রোজগার করবার জন্যে উদয়াস্ত খাটতে হত তাঁকে। পরের ছেলেদের পড়িয়ে রাত্রি দশটা নাগাদ ক্লান্ত শরীরে যখন বাড়ি ফিরতেন তখন নিজের ছেলেকে আর পড়াবার সামর্থ্য থাকত না তাঁর। কালীমোহনবাবু খুব বেশী লেখাপড়া করতে পারেন নি। গরীবের ছেলে ছিলেন, কোনক্রমে কায়ক্লেশে সেকালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাটি পাস করতে পেরেছিহেন। অর্থাভাবে আর পড়া হয়নি।

যদুরা থাকত একটি স্যাঁতসেঁতে খোলার ঘরে, তার একদিকে মিউনিসি-প্যালিটির একটা পচা নালা, আর একদিকে বড়লোক প্রতিবেশী হীরেন্দ্রবাবুদের গোটা-দুই খাটা পায়খানা। সামনে সরু একটি রাস্তা, আর রাস্তার উপরে দুনিয়ার যত জঞ্জাল জড়ো করা। কেবল পশ্চিম দিকটায় কাদের কপির ক্ষেত ছিল বলে' সে দিকটা একটু ফাঁকা ছিল কেবল। এই বাড়িরও মাসে পাঁচ টাকা ভাড়া। না দিয়ে উপায় ছিল না, কারণ টাকা রোজগার করবার জন্যে শহরে থাকতেই হবে, আর শহরে থাকতে গেলেই এই ভাড়া টানতে হবে। বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর নিকানো থেকে আরম্ভ করে রান্নাবান্না সেলাই ফোঁড়াই সবই যদুর মাকে নিজের হাতে করতে হ'ত। ওরই মধ্যে যে-দিন একটু সময় পেতেন হীরেন্দ্রবাবুর গোয়াল থেকে গোবর সংগ্রহ করে' ঘুঁটে দিতেন। এত করে'ও তবু তিনি কুলুতে পারতেন না। কি করে' পারবেন, মাত্র তো কুড়ি পঁচিশ টাকা আয়, তার মধ্যে বাড়িভাড়া যেত পাঁচ টাকা, দেশে কালীমোহন

বাবুর বুড়ো বাবা থাকতেন তাঁকে পাঠাতে হত পাঁচ টাকা। বাকী দশ পনরো টাকার মধ্যে তিনজনের খাওয়া-পরা খুঁটি-নাটি বাসা খরচ। এই খুঁটি-নাটি খরচের মধ্যে একটা প্রধান খরচ ছিল কালীমোহনবাবুর ওষুধ। একদিন ছেলে পড়িয়ে আসবার সময় রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে গেছলেন তিনি। সস্তায় হবে ব'লে পাড়ার একজন হাতুড়ে হোমিওপ্যাথের কাছে গেলেন, কিন্তু তাঁর ওষুধে কোন ফল হল না। একজন এ্যালোপাথ ডাক্তারবাবু বিনা দক্ষিণায় তাঁকে একদিন দেখল বটে কিন্তু তিনি এমন একটি ওষুধের ফরমাশ করলেন যার দাম চার টাকা চৌদ্দ আনা। নিয়মমত খেলে একশিশিতে কুড়ি পঁচিশ দিনের বেশী চলে না, এক শিশি খেয়ে বেশ ফল পেলেন কিন্তু তিনি। ডাক্তারবাবু বললেন আরও তিন-চার শিশি খেতে হবে। দ্বিতীয় শিশি কিনতে কিছুদিন সবুর করতে হল। কিনলেন যখন তখন পুরোমাত্রায় খেতে আর সাহস হল না। এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেলে পেরে উঠবেন কি করে' তিনি! যে ওষুধটা কুড়ি পঁচিশ দিনে শেষ করা উচিত, সেটা খেতেন দু'মাস আড়াই মাস ধরে'। যতটুকু উপকার হয়!

এই ভাবেই দিন তাদের কাটছিল। তাদের পাড়ার বড়লোক হীরেন্দ্রবাবুর ছেলেরা দামী দামী জামা কাপড় পরত, সুন্দর সুন্দর খেলনা নিয়ে খেলা করত, সেজেগুজে মোটরে চড়ে' সিনেমা দেখতে যেত, যদু দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখত আর ভাবত, ওদের অমন আর আমাদেরই বা এমন কেন। ছেলেমানুষ সে, তখনও বুঝত না যে টাকাকড়ি থাকলেই লোকে বড়লোক হয় না, যার বড় মন সে-ই বড়লোক। বাইরের ঐশ্বর্য নিয়ে যারা মত্ত থাকে প্রায়ই তাদের ছোট মন হয়, গরীবের ঘরেই পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ লোক জন্মগ্রহণ করেছেন। আমাদের দেশ গরীবের দেশ। এদেশে অনেক লোকই দুবেলা পেট ভরে' খেতে পায় না, রোগে ভুগে ওষুধ পায় না, শীতকালে কাপড় পায় না, বর্ষার জল গ্রীষ্মের রোদ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে না। এদেশে গরীব হওয়া খুব একটা লজ্জার কথা নয়, এ দেশই গরীবের দেশ। আমরা সবাই দরিদ্র। যারা মোটরে চড়ে' সিনেমা দেখে বাইরে আস্ফালন করে' বেড়ায় তারাও দীন দুঃখী। তাদের বাইরের মুখোশটা খুলে ভেতরের চেহারা দেখলে তবে সেটা বোঝা যায়। ছেলেমানুষ যদু অতশত কিছু বুঝত না, নিজেদের দৈন্য দেখে তার ভারী দুঃখ হ'ত কেবল।

যদু যখন একটু বড় হ'ল তখন আর এক সমস্যা দেখা দিল সংসারে। যদুকে স্কুলে

পাঠাতে হবে। তার মানেই খরচ বাড়বে। স্কুলের মাইনে, বই খাতা পেন্সিল, আরও নানা রকমের খরচ। এতদিন যদু বাড়িতেই নিজে যতটুকু পারত পড়াশুনা করত তার মায়ের সাহায্যে। রবিবার দিন তার বাবা একটু সাহায্য করতেন তাকে। কিন্তু একদিন কালীমোহনবাবু বললেন—"এইবার যদু স্কুলে ভর্তি হোক, বাড়িতে থেকে সময় নষ্ট হচ্ছে কেবল—"

রাত্রে শোবার সময় এই নিয়ে আলোচনা হ'ল।

—"আমি না হয় এ মাস থেকে ওষুধটা আর কিনবো না, কি বল ?"

মা বললেন, "উপকার যখন হয়েছে তখন খাও আরও কিছুদিন। ছেলের স্কুলের পড়ার খরচ হয়েই যাবে কোন রকমে—"

"দেখি"— দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল কালীমোহনবাবুর।

ওঁরা মনে করেছিলেন যদু ঘুমিয়েছে, যদু কিন্তু ঘুমোয়নি, সব শুনছিল সে শুয়ে শুয়ে। তার মনে হচ্ছিল, ঠিক কি যে মনে হচ্ছিল তা বর্ণনা করে' বোঝানো শক্ত—অবর্ণনীয় একটা বেদনা তার সারা বুক জুড়ে টনটন করছিল বিষ-ফোড়ার মত।···এত দুঃখ কেন তাদের···

যদু স্কুলে ভর্তি হল।

তার বাবা মা কোনক্রমে পড়ার খরচ চালাতে লাগলেন। প্রধান খরচ স্কুলের মাইনে বই খাতা পেন্সিল কলম। কিছু বই কালীমোহনবাবু চেয়ে-চিন্তে যোগাড় করতেও পেরেছিলেন। এমনিভাবে অতিশয় দীন আয়োজন নিয়ে যদু বিদ্যামন্দিরে ঢুকলো। বাণী মন্দিরে কিন্তু ধনী দরিদ্রের সমান বিচার, যে গুণী তার ললাটেই জয়টীকা। যদু প্রথম হ'য়ে ক্লাস প্রমোশন পেলে। প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম! পাশের বাড়ির হীরেন্দ্রবাবুর ছেলেরা, যারা শৌখীন জামা কাপড় পরে' মোটরে চড়ে' বেড়াত, ঘণ্টায় ঘণ্টায় যাদের প্রাইভেট টিউটাররা পড়িয়ে যেত, তাদের মধ্যে একজন যদুর সঙ্গে পড়ত, তার ঐশ্বর্যের জাঁকজমক সত্ত্বেও তাকে কিন্তু যদুর নিচেই আসন গ্রহণ করতে হ'ল সরস্বতীর দরবারে।

যদু মহা-উৎসাহে পড়াশোনা করতে লাগল। প্রতি বছরই সে ফার্স্ট হয়। সে ভুলে গেল যে সে গরীবের ছেলে, মনুষ্যত্বের বৃহত্তর আদর্শে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল তার মন। হঠাৎ কিন্তু একদিন একটা নিদারুণ আঘাত লাগল।

সেদিন শনিবার ছিল। স্কুল থেকে ফিরে এসে যদু দেখল যে একটা ফেরিওয়ালা

এসে তার মাকে সাধাসাধি করছে কাপড় কেনবার জন্যে। মা যদিও তাকে বার বার বলছেন যে কাপড় কিনবেন না তিনি, তবু সে ছাড়বে না। শেষটা বললে—দেখুনই না মা ঠাকরুন, দেখতে আর ক্ষতি কি—"

খুলে বসল সে কাপড়ের মোট। নানা রকম চক্চকে ঝক্ঝকে সুন্দর সুন্দর পাড়ওলা কাপড়, দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে। যত্নুর মা একটু ঝুঁকে একখানি কাপড়ের জমি দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করলেন, "কত দাম এখানার ?"

"তিন টাকা মা—"

"তিন টাকা !"

যত্নুর মা উঠে দাঁড়ালেন, তিন টাকা দিয়ে একখানা কাপড় কেনা তাঁর পক্ষে অসম্ভব !

"না, আমি কিনব না, তুমি যাও—"

ফেরিওয়ালা চলে গেল। যত্নুর কিন্তু ভারি কষ্ট হল। সে মাকে বললে—"নাও না মা কাপড়খানা—"

"অত টাকা কোথায় পাব বাবা—"

সত্যিইতো, যত্নু চুপ করে রইল।

তারপর সে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়, অনেকক্ষণ একা একা ঘুরে বেড়াল। তার কেবলি মনে হতে লাগল কি হবে লেখাপড়া করে', কি হবে ফার্স্ট হ'য়ে, যদি সে মায়ের দুঃখ ঘোচাতে না পারে। সামান্য তিন টাকা দামের কাপড়, তাও তার মা কিনে পরতে পারে না পয়সার অভাবে। অথচ তার পড়ার জন্যে মাসে মাসে চার পাঁচ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। কি হবে এ-অবস্থায় পড়ে' শুনে! রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে সেই ফেরিওয়ালাটার সঙ্গে আবার তার দেখা হ'য়ে গেল।

"তোমার দোকানটা কোন্খানে বল তো ?"

ফেরিওয়ালা বলে দিলে কোন্খানে তার দোকানটা।

সেদিন সন্ধ্যার সময়—কালীমোহনবাবু তখনও পড়িয়ে ফেরেননি, যত্নুর মা রান্নাঘরে ব্যস্ত—যত্নু চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল হাতে একটা পুঁটুলি নিয়ে। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরল চোরের মতন, তার বগলে কাগজে মোড়া সেই শাড়িখানা। নিজের বইগুলো পুরোনো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে' সেই টাকা দিয়ে সে শাড়ি কিনে এনেছে

মায়ের জন্যে। কালীমোহনবাবু তখনও ফেরেন নি, মা উদ্বিগ্ন হ'য়ে বসে' ছিলেন।

"কোথা গেছলি তুই ?"

যদু কি বলবে, চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। অনেক জেরার পর মার কাছে তাকে সব কথা শেষে বলতে হ'ল। শুনে মা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রদীপের ম্লান আলোয় মা আর ছেলে পরস্পরের দিকে নির্বাক হ'য়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মায়ের পরনে সেলাই-করা তালি-দেওয়া অর্ধমলিন শাড়ি, ছেলে তার প্রাইজের বই বিক্রি করে' মায়ের জন্যে ভাল শাড়ি কিনে এনেছে।···

এর পর যদু আর প্রাইজ পায়নি। কারণ আর সে পরীক্ষা দেবার সুযোগই পায়নি। কিছুদিন পরে কালীমোহনবাবু হঠাৎ মাথা ঘুরে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে' মারা গেলেন। ওষুধ কেনা অনেক দিন আগেই বন্ধ করেছিলেন। কালীমোহনবাবুর যা হ'য়েছিল যদুরও তাই হ'ল, অর্থাভাবে পড়াশুনা বন্ধ করে' দিতে হ'ল।

পাঁচ টাকার বাড়ি ছেড়ে, দু' টাকার একটি বাড়িতে উঠে গেলেন যদুর মা। যদু চাকরি খুঁজে বেড়াতে লাগল। অনেক খুঁজে কিছু না পেয়ে শেষে রিক্‌শা টানার কাজ জুটল একটা। উপায় কি? নইলে যে না-খেয়ে মরতে হয়। যদুর মা একজনের বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করতে লাগলেন। যদু রিক্‌শা টানতে টানতে স্বপ্ন দেখতে লাগ্‌ল—বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বুকারটি ওয়াশিংটনের।

এইখানেই গল্পটি শেষ করে দিলে গল্পের দিক থেকে বোধ হয় ভাল হয়, কিন্তু সবটা বলা হয় না। তোমাদের মধ্যে অনেকে ভবিষ্যতে বড় হবে, দেশের দুঃখ ঘোচাবে, তোমাদের জেনে রাখা দরকার দেশের সত্যিকার দুঃখ কোথায়।

যদুর মত ভাল ছেলে আমাদের দেশে অনেক জন্মগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ভাগ্যবলে ছিটকে পড়ে' দু'চার জন হয়তো মাথা তুলতে পারে! কিন্তু দারিদ্র্যের নির্মম পেষণে অধিকাংশই মরে' যায়। খেতে পায় না, পরতে পায় না, কেউ কিছু সাহায্য করে না, এরা অসহায়ভাবে লুপ্ত হয়ে যায়। আমাদের দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে, এমন রত্নকে আমরা অহরহ হেলায় হারাচ্ছি, এদের দিকে ফিরে তাকাই না পর্যন্ত। *এই যে আমাদের দেশ-জোড়া দারিদ্র্য* এর কারণ কি, এর প্রতিকারের উপায় কি—তোমরা এখন থেকে জানতে চেষ্টা কর, ভাবতে চেষ্টা কর, তাহলে হয়তো

তোমাদের কেউ কেউ সত্যিই দেশের দুঃখ ঘোচাতে পারবে। এই যদুই হয়তো একদিন কত বড় হতে পারতো, কিন্তু পারলে না। খোলার ঘরের কোণে যক্ষ্মায় জীর্ণ হয়ে শেষে তিলে তিলে মরতে হল তাকে অকালে। রুগ্ন অনাহারক্লিষ্ট শরীরে রিক্শা টানা সইল না। .

রাজা

নিপুর মামা বিজয়বাবু এলাহাবাদে থাকেন। সম্প্রতি তিনি কোলকাতায় এসেছেন। গোয়াবাগানে তাঁদের নিজেদের বাড়ি আছে, সেইখানে এসেই উঠেছেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা নিপুদের বাড়িসুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ হয়েছে মামার বাড়িতে। মেয়েরা সকলে আগেই চলে' গেছেন। কথা আছে, বাবা আপিস থেকে সোজা সেইখানেই চলে' যাবেন। নিপুর ঠাকুরদা যান নি। তিনি সন্ধ্যাবেলায় রোজ ঠাকুরঘরে পুজো করেন, আফিং খান। আফিং খাওয়ার ঘণ্টা-দুই পরে তবে ভাত খেতে বসেন। কথা আছে, দশটা-নাগাদ মোটর এসে তাঁকে নিয়ে যাবে। নিপু, মিনু আর জগুও যায় নি। সন্ধ্যাবেলা মাস্টারশাই তাদের পড়াতে আসেন। পড়াশোনা সেরে তারা ঠাকুরদাদার সঙ্গে যাবে এই ঠিক হ'য়ে আছে।

মাস্টারমশাই কিন্তু এলেন না। অগত্যা তারা তখন লুডো নিয়ে বসলো তিনজনে। একঘেয়ে লুডো-খেলা মোটেই ভালো লাগছিল না কারো। কিন্তু কি করা যায়, সময় তো কাটাতে হবে! এমন সময় ঠাকুরদা বেরিয়ে এলেন পুজোর ঘর থেকে।

—"মিনু, এক গ্লাস জল এনে দাও তো দিদি। আফিংটা খেয়ে ফেলি"

মিনু জল এনে দিলে। ঠাকুরদা আফিঙের বড়িটি টুপ করে' খেয়ে ফেললেন।

মিনু বললে—"ঠাকুরদা, যতক্ষণ মোটর না আসে ততক্ষণ একটা গল্প বলুন না—"

নিপু মহা উৎসাহে বললে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বেশ। লুডো-খেলা একটুও ভালো লাগছে না"

জগু জিতছিল, তার খেলা বন্ধ করতে ততটা ইচ্ছে ছিল না, তবু সেও রাজী হ'য়ে গেল। ঠাকুরদার মেজাজ যদি ঠিক থাকে, গল্প জমবে ভালো।

—"গল্প?" ...ঠাকুরদা পাকা গোঁফ-জোড়া চুমরে মিনুর দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, "এখন পড়াশোনার সময়, গল্প কেন?"

—"মাস্টারমশাই আসেন নি যে"

—"ও, আচ্ছা বেশ, এসো তাহলে"

তিনজনে এসে বসলো ঠাকুরদার কাছে।

ঠাকুরদা বললেন, "আলোটা নিবিয়ে দাও"

মিনু উঠে আলোটা নিবিয়ে দিলে।

ঠাকুরদা কিছুক্ষণ চুপ করে' রইলেন। তারপর শুরু করলেন :

—"এক ছিল রাজা—"

—"কি-রকম রাজা?" মিনু প্রশ্ন করলে।

—"রাজা যে-রকম হয়—"

"—চেহারা কি-রকম বলুন"

—"রাজার চেহারা যেমন, তেমনি। শালপ্রাংশু মহাভুজ—"

—"তার মানে?"

—"শাল গাছের মত লম্বা, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড হাত, ইয়া বুকের ছাতি, ইয়া গোঁফের গোছা!"

মিনু নাক সিঁটকে বললে—"ও তো দরোয়ানের চেহারা। ওরকম হোঁৎকা রাজা চাই না"

—"ও বাবা, কি-রকম রাজা তাহলে চাই তোমার!"

—"বেশ ভদ্র-চেহারা হবে। গোঁফের গোছা-টোছা চলবে না"

ঠাকুরদা জগুর দিকে ফিরে বললেন, "জগুর কি মত?"

জগু বললে—"আমার মনে হয়, রাজা যখন পুরুষমানুষ, তখন গোঁফ থাকাটা কিছু অন্যায় নয়"

—"বিমলদা কি পুরুষমানুষ নয়? ফার্স্ট ক্লাস এম. এ., টেনিস-চ্যাম্পিয়ন।" —মিনি ফোঁস করে' উঠলো।

—"আচ্ছা, আচ্ছা, ঝগড়া কোরো না। নিপুর মতটা কি শোনা যাক্"

নিপু বললে—"আমার মনে হয়, রাজার শুধু গোঁফ নয়, গোঁফ-দাড়ি দুই-ই থাকা উচিত। ঐতিহাসিক-রাজাদের ছবি মনে করো—শাজাহান, পঞ্চম জর্জ, সপ্তম এডওয়ার্ড, শিবাজী..."

—"আকবর, জাহাঙ্গীর, রাণাপ্রতাপ, মানসিংহ, এদের কিন্তু দাড়ি ছিল না, কেবল গোঁফ ছিল। গোঁফ-দাড়ি নেই এ-রকম রাজা কল্পনাও করা যায় না"

মিনুর দিকে চেয়ে জগু টিপ্পনী করলে।

মিনু বললে—"কেন, অষ্টম এডওয়ার্ড?"

জগু হটবার পাত্র নয়।

সে বললে—"অষ্টম এডওয়ার্ড? ক'দিন সে রাজত্ব করেছিল, শুনি? আমার বিশ্বাস, গোঁফ-দাড়ি কিছু ছিল না বলেই রাজ্যটি রাখতে পারলে না সে"

মিনু বললে—"আমাদের স্বাধীন ভারতের রাজা, পণ্ডিতজি? তাঁর দেখ গোঁফ-দাড়ি কিচ্ছু নেই"

জগু বললে—"বোকচন্দ্র, পণ্ডিতজি রাজা নয়, মন্ত্রী। রাজা বরং বলতে পারো, রাজেন্দ্রপ্রসাদকে, তাঁর গোঁফ আছে"

নিপু এতক্ষণ কিছু বলে নি। জগু থামতেই সে পুনরায় তার মত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করলে :

—"আমার মতে, রাজার গোঁফ-দাড়ি দুই-ই থাকা উচিত। পশুদের রাজা সিংহ, তার পর্যন্ত গোঁফ-দাড়ি আছে। মানুষের রাজার থাকবে না?"

"—বেশ, তোমরা তাহলে গুঁপো আর দেড়ে-রাজার গল্প শোনো বসে'। আমি অ্যাল্‌জ্যাব্রার অঙ্ক কষি গিয়ে!" মিনু রেগে উঠে যাচ্ছিলো। ঠাকুরদা বললেন, "শোনো, শোনো, অত রাগ কিসের। গল্পটা শুনেই দেখ না শেষপর্যন্ত।"

—"আমার রাজার গোঁফ-দাড়ি কিচ্ছু থাকবে না, তা কিন্তু বলে' দিচ্ছি আগে থেকে"

—"বেশ, বেশ, তাই হবে"

জগু বললে—"মিনু তাহলে একাই বসে গল্প শুনুক, আমরা চললুম। আয় রে নিপু, চল্ আমরা লুডোই খেলিগে"

—"আঃ, তোরা চুপ করে বোস দিকি, গল্পটা শোনই-না শেষ-পর্যন্ত"

নিপু বললে—"রাজার কিন্তু গোঁফ-দাড়ি দুই-ই থাকা চাই"

—"বেশ-বেশ, তাই থাকবে। চুপ করে' বোস আগে"

আবার তিনজনে বসলো তারা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঠাকুরদা শুরু করলেন :

—"এক ছিল রাজা। রাজার গোঁফ-দাড়ি দুই-ই ছিল—"

নিপু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো—"বাঃ!"

জগু বললে—"দুই-ই? অত্যন্ত সেকেলে রাজা তাহলে।"

মিনু ঠাকুরদাকে শাসিয়ে বললে—"আচ্ছা, দেখবো, এবার কে তোমার আফিঙের কৌটো খুঁজে দেয়"

ঠাকুরদা মুখে কিছু বললেন না কিন্তু মিনুর গায়ে ছোট্ট একটি চিমটি কেটে যা জানালেন, তার অর্থ—শোন্ না শেষপর্যন্ত, আগে থাকতেই ছট্‌ফট করছিস কেন ?

নিপু বললে—"তারপর ?

ঠাকুরদা বললেন—"তুমিই বলো তোমার রাজা কি করবে। শিকার করবে, না ব্যবসা করবে, না অনাথাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন করবে ?"

নিপু বললে—"শিকার। স্পোর্টস্‌ম্যান না হলে আর রাজা ?"

ঠাকুরদা শুরু করলেন আবার :

—"এক ছিল রাজা। তাঁর গোঁফ-দাড়ি দুই-ই ছিল। একদিন সকালে উঠে গোঁফে তা দিতে দিতে তাঁর মনটা কেমন হু-হু করে' উঠলো। মনে হতে লাগলো, কি যেন করবার ছিল, কিন্তু করা হয়নি। রাজা বিচলিত-চিত্তে অন্দরমহলে গিয়ে বললেন, রাণী, আমার কি যেন করবার ছিল একটা, কিছুতেই মনে পড়ছে না, কি করি বলো তো ? রাণী বললেন, আমার শুক-পাখীকে জিজ্ঞেস করো, সে উপায় বলে দেবে। রাণীর ছিল একটি অদ্ভুত ধরনের শুক-পাখী। গায়ে ময়ূরকণ্ঠী রং, ঠোঁট যেন প্রবাল দিয়ে তৈরি, চোখ দুটিতে জ্বলছে চুনি। ল্যাজটি বেশ বড়; শুধু বড় নয়, ল্যাজের প্রত্যেকটি পালকে রামধনুর সাতটি রং ঝলমল করছে! মনে হচ্ছে যেন ময়ূরকণ্ঠী পাহাড় থেকে রামধনু-রঙের ঝরণা নেবেছে। রাণীর মর্মর-মহলে সোনার দাঁড়ে দুলছিল সেই পাখী! রাজা গেলেন তার কাছে। গিয়ে বললেন, 'শুক-পাখী, একটু আগে গোঁফে হাত দিয়ে আমার মনে হলো, কি যেন একটা করবার ছিল, কিন্তু করা হয়নি। মনটা কেমন হু-হু করছে, কি করি বলো দেখি ?' শুক-পাখী বললে, 'দাড়িতে হাত বোলাও, তাহলেই মনে পড়বে।' রাজা তখন দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে' গেল, শিকারে বেরুতে হবে। রাজা দ্রুতপদে বেরিয়ে এলেন অন্দরমহল থেকে। এসেই মন্ত্রীকে হুকুম করলেন, 'মন্ত্রিন, আমি শিকারে বেরুবো। সব ব্যবস্থা করো।'…ঠাকুরদা চুপ করলেন।

জগু বললে—"নিতান্ত সেকেলে ধরণের রাজা দেখছি"

—"তোমার একেলে রাজা কি করতেন, শুনি"

—"প্রথমতঃ একেলে রাজার দাড়ি থাকতো না, দ্বিতীয়তঃ শিকার করবার জন্যে তাঁর মন হু-হু করতো না। একেলে রাজা প্লেনে চড়ে' চলে' যেতেন কোরিয়ায় শান্তি স্থাপন করবার জন্যে, কিংবা—"

—"খুব হয়েছে, থাম্"

নিপু থামিয়ে দিলে জগুকে।

—"তারপর ?"...মিনু জিগ্যেস করলে। গল্পটা তার ভালো লাগছিল।

—"তাঁর হাতীশালা থেকে বেরুলো হাতী, ঘোড়াশালা থেকে বেরুলো ঘোড়া। গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ তোপ পড়তে লাগলো। বড় বড় পালোয়ানেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রাজার সঙ্গে শিকারে যাবে বলে'। রাজা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। গম্ভীরভাবে দাড়ির ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে জলদগম্ভীর-স্বরে মন্ত্রীকে সম্বোধন সম্বোধন করে' বললেন—"মন্ত্রিন্, এসব থামিয়ে দাও। আমি বীর, আমি একা শিকারে যাবো। আমার পঞ্চলক্ষণ-কালো ঘোড়াটিকে আনতে বলো কেবল। তার উপর সওয়ার হয়ে আমি একাই বেরুবো। চোলপুর জঙ্গলে ভীষণ একটা বাঘ এসেছে শুনছি। আমি একাই তাকে মারবো"

পঞ্চলক্ষণ-কালো ঘোড়ায় রাজা একাই বেরিয়ে গেলেন। অন্দরমহলে শুক-পক্ষী রাণীকে ডেকে বললেন—"রানি, রাজা আর ফিরবে না। এইবার তুমি আমার পিঠে চড়ে' বোসো। আমি তোমাকে পরজন্মে নিয়ে যাবো। সেইখানেই রাজার সঙ্গে আবার দেখা হবে তোমার। আমি দেহ বাড়াচ্ছি, তুমি একটু ছোট হও।"

শুক-পক্ষী দেখতে দেখতে বিরাট গরুড়-পক্ষী হ'য়ে গেল, আর রাণী হ'য়ে গেলেন ছোট্ট একটি বেণী-দোলানো কিশোরী। অনেকটা আমাদের মিনুর মতো—"

—"ধেৎ!" মিনু ছোট্ট একটি চাপড় মারলে ঠাকুরদাকে।

—"তারপর ?" নিপুর সত্যিই এবার ভালো লাগছিল গল্পটা। জগুরও লাগছিল, যদিও সে চুপ করে ছিল।

"—রাণী শুক-পক্ষীর পিঠে চড়ে সোঁ করে বেরিয়ে গেলেন"

—"রাজার কি হলো ?"

—"রাজা পঞ্চলক্ষণ ঘোড়ার পিঠে চড়ে' টগবগ করে' ছুটে চলেছিলেন চোল-জঙ্গলের উদ্দেশে। হাওয়াতে ফুরফুর করে তাঁর দাড়ি উড়ছিল, আর উড়ছিল শিরস্ত্রাণের পালকটি। গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে চলেছিলেন তিনি। সাত দিন সাত রাত্রি অনবরত ঘোড়া ছুটিয়ে চোল-জঙ্গলের কাছে এলেন যখন তিনি, তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। বাইরে থেকে চোল-জঙ্গলের চেহারা দেখে, রাজার মত বীরের বুকটাও কেঁপে উঠলো। আকাশ পর্যন্ত ঠাসা জঙ্গল, কোথাও একটু ফাঁক নেই,

মনে হচ্ছে, অন্ধকারের একটা বিরাট পাহাড় যেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রাজা। তারপর পঞ্চলক্ষণকে সম্বোধন করে বললেন—"পঞ্চলক্ষণ, এই ভয়ঙ্কর চোল-জঙ্গলে ঢুকতে তোমার ভয় করবে না তো?"

পঞ্চলক্ষণ উত্তর দিলে—"আপনার যদি ভয় না করে, আমারও করবে না"

—"ঢোকা কি উচিত?"

—"আজ না-হয় কাল আমাদের ঢুকতেই হবে, কারণ, আমাদের পরজন্ম অপেক্ষা করে' আছে ওই অন্ধকারের ভিতরে।"

—"তাহলে বিলম্ব করে' লাভ কি?"

—"কোনো লাভ নেই"

—"চলো তাহলে"

ঘাড় বেঁকিয়ে টগবগ-টগবগ করতে করতে ঢুকে পড়লো পঞ্চলক্ষণ চোল-জঙ্গলের ভিতর। গভীর অরণ্য, ছোট-ছোট ঝোপে-ঝাড়ে বারবার গতি রুদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, অদ্ভুত অস্ফুট শব্দে শিউরে উঠছে অন্ধকার, পঞ্চলক্ষণ কিন্তু চলেছে নির্ভয়ে। এইভাবে অনেকক্ষণ চলবার পর আলো দেখা গেল একটু। পঞ্চলক্ষণ এগিয়ে চললো সেই দিকে। ঝোপঝাড় ভেদ করে' শেষে গিয়ে হাজির হলো ফাঁকা জায়গায়, দেখলে, সেখানে দাউদাউ করে' মশাল জ্বলছে একটা। দাঁড়াতেই চতুর্দিক প্রকম্পিত করে' গর্জন হলো—হালুম! তারপরই একলম্ফে বেরিয়ে এলো এক হাফ-প্যাণ্ট-পরা বিরাট বাঘ। এসেই পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের থাবা দিয়ে গোঁফ চুমরে, রাজাকে সম্বোধন করে বাঘ বললে—"তুমি চোল-জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে এসেছো?"

রাজা বললেন—"হ্যাঁ।"

—"মারো আমাকে। এই আমি বুক চিতিয়ে দাঁড়াচ্ছি"

বাঘ পিছনের পা দুটোতে ভর দিয়ে সত্যি-সত্যি বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। রাজার মনে হলো, এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়। তিনি তাঁর তূণ থেকে সবচেয়ে মারাত্মক তীরটি বার করে' ছুঁড়লেন। ঠিক বুকের মাঝখানে লাগলোও গিয়ে তীরটি, কিন্তু হাফ-প্যাণ্ট-পরা বাঘের কিচ্ছু হলো না। হা-হা করে অট্টহাস্য করে' উঠলো সে। তারপর থাবা দিয়ে তীরটাকে ঝেড়ে ফেলে দিলে বুক থেকে, মনে হলো যেন ছোট একটা মাছি তাড়িয়ে দিলে। রাজা আবার একটা তীর ছুঁড়লেন,

আবার সেই ব্যাপার! ফের একটা ছুঁড়লেন, ফের সেই কাণ্ড! রাজা তীরের পর তীর ছুঁড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু বাঘের কিছু হচ্ছে না। বাঘ প্রত্যেকবারই হা-হা করে' হাসছে, আর থাবা দিয়ে তীর ঝেড়ে ফেলছে!

শেষকালে রাজার সব তীর ফুরিয়ে গেল।

হাফ-প্যাণ্ট-পরা বাঘ আবার অট্টহাস্য করে উঠলো :

—"তোমার তীর ফুরিয়ে গেল, রাজা—এইবার তলোয়ার বার করো। আমি গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি—"

রাজা রাগে গরগর করছিল। তাঁর মনে হচ্ছিলো, যে-কামার তীরগুলো বানিয়েছে, সে তীরে শান দেয়নি ভাল করে'। এবার ফিরে গিয়ে তাকে শূলে চড়াতে হবে। তলোয়ারটার উপর কিন্তু তাঁর খুব বিশ্বাস ছিল। এক পারসী ফেরিওলার কাছ থেকে নিজে পছন্দ করে' তিনি কিনেছিলেন তলোয়ারটা। ক্ষুরধার তলোয়ার। খাপ থেকে সড়াৎ করে সেটা বার করে' পক্ষিলক্ষণের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন রাজা।

হাফ-প্যাণ্ট-পরা বাঘ ঘাড় হেঁট করে' দাঁড়িয়েছিল। রাজার মুখের দিকে চেয়ে বাঁ চোখটা ঈষৎ কুঁচকে বলল—"চালাও তোমার তলোয়ার। যত জোরে পারো কোপ মারো—।"

রাজা মারলেন কোপ।

তলোয়ার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। রাজা নির্বাক নিরস্ত্র হয়ে' দাঁড়িয়ে রইলেন। বাঘ আবার হা হা করে' হেসে উঠলো। তারপর রাজার দিকে ফিরে বললে—"রাজা, তুমি আমার কিছু করতে পারবে না। আমার এ বিশ্বাস আছে বলেই তোমার সামনে আমি বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে সাহস করেছি। দোষ তোমার অস্ত্রের নয়"

—"কিসের তবে?"

—"তোমার দাড়ির"

—"দাড়ির?"

—"হ্যাঁ, দাড়ির। যতক্ষণ তোমার দাড়ি আছে, ততক্ষণ তুমি আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। মহর্ষি জগুর শিষ্য আমি। তিনি তপস্যাবলে জেনেছিলেন যে দাড়িওলা প্রায়ই বাজে মার্কা হয়, তাই তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, দাড়িওলা

কোনও রাজা যদি তোমাকে মারতে আসে তাহলে তুমি নির্ভয়ে গিয়ে তার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারো, সে তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না।"

জগু নিপুর কানে ফিসফিস করে' বললে—"ঠাকুরদার আফিঙে নেশাটি বেশ জমে' এসেছে এবার"

মিনু রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। সে বললে—"তারপর ?"

ঠাকুরদা অর্ধ-নিমীলিত নয়নে বলতে লাগলেন: "হাফ-প্যাণ্ট-পরা বাঘের মুখে এই কথা শুনে রাজা তো অবাক্ হয়ে গেলেন। তারপর তিনি জিগ্যেস করলেন—"মহর্ষি জগু তো একজন মহাজ্ঞানী লোক। তুমি বাঘ হয়ে কি করে' তাঁর শিষ্য হলে ?" বাঘ বললে—"আমি বাঘ নই, আমি মানুষ। খাকি হাফ-প্যাণ্ট পরে চুরি করে' বেড়াতাম। মহর্ষি জগু তাই রেগে একদিন অভিশাপ দিয়ে আমাকে বাঘ করে' দিয়েছিলেন। আমি বাঘ হ'য়ে গেলাম, কিন্তু আমার খাকি হাফ-প্যাণ্টটা কিছুতেই খুললো না। সুতরাং বাঘেরাও আমাকে একঘরে করলে। বললে—প্যাণ্ট-পরা বাঘকে আমরা সমাজে স্থান দেবো না। তখন মহর্ষি জগুকে একদিন গিয়ে মিনতি করে বললাম—প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন এবার। আবার মানুষ করে' দিন। এই হাফ-প্যাণ্টের জন্যে বাঘেরাও আমাকে সমাজে নিচ্ছে না। মহর্ষি জগু তখন বললেন, যদি কোনোদিন কোনো দেড়ে-রাজা চোল-জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে আসে, তাহলে তার সামনে তুমি গিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে। আমি বললাম—যদি সে আমাকে মেরে ফেলে ? মহর্ষি বললেন—দেড়ে-রাজারা অতিশয় বাজে-মার্কা রাজা হয়, তারা তোমার কিছু করতে পারবে না। কিন্তু যদি কখনও এমন কোনও রাজা আসে, যার গোঁফ আছে অথচ দাড়ি নেই, সেই রাজার যদি দেখা পাও, তাহলে তাঁকে আমার আশ্রমে নিয়ে এসো। তাঁকে দিয়ে আমার একটু কাজ করিয়ে নিতে হবে।"

রাজা প্রশ্ন করলেন—"মহর্ষি জগুর আশ্রম এখান থেকে কত দূর ?"

—"কাছেই"

রাজা একটু ইতস্তত করছিলেন যে সত্য কথাটা প্রকাশ করে' বলবেন কি না।

পঞ্চলক্ষণ বললে—"মহারাজ, সত্যকথা প্রকাশ করে' বলুন"

রাজা তখন টান মেরে দাড়িটা খুলে ফেলে বললেন, "দেখ, এ দাড়ি আমার নিজের দাড়ি নয়। আমার গুরুদেব মহর্ষি নিপুর আদেশে আমাকে এই দাড়িটা পরে'

থাকতে হয়। রাখবার মতো দাড়ি আমার হয় নি, কিন্তু মহর্ষি নিপুর ধারণা, দাড়ি না থাকলে রাজাকে মানাবে না, তাই তাঁরই আদেশে আমাকে এই দাড়িটা পরে' থাকতে হয়েছে।”

বাঘ বললে—“মহারাজ, তাহলে এইবার আমাকে পদধূলি দিন, আমি আবার মানুষ হই”

রাজা জুতো-মোজা খুলে মাটিতে পা ঘষে' পায়ে খানিকটা ধুলো লাগিয়ে নিলেন, (রাজার পায়ে ধুলো থাকবে কি করে'), তারপর সেই ধুলো বাঘের মাথায় দিতেই বাঘ মানুষ হ'য়ে গেল। ছোট্ট, বেঁটে কালো কুচকুচে চেহারার একটি মানুষ।

সে সবিনয়ে বললে—“আমার নাম রংলাল। চলুন, এইবার আপনাকে মহর্ষি জগুর আশ্রমে নিয়ে যাই”

নিপু মুচকি-মুচকি হাসছিল, এইবার হো-হো করে' হেসে উঠলো।

—“সত্যি দাদু, তোমার আফিঙের নেশাটা আজ জমেছে ভালো”

মিনু বললে—“আঃ, চুপ কর্ না। তারপর কি হলো দাদু ?”

ঠাকুরদা বললেন, “মহর্ষি জগুর আশ্রমে গিয়ে হাজির হলেন সবাই। মহর্ষি জগু তখন ক্রশওয়ার্ড পাজল নিয়ে তন্ময় হ'য়ে বসেছিলেন। রংলালের মুখে সব কথা শুনে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এসে বললেন—তোমার মতোই একজন লোক আমি খুঁজছিলাম। কোরিয়াতে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হয়েছে, তোমাকে যেতে হবে সেখানে শান্তি স্থাপন করতে। তাদের শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে যে, দেখ বাছারা, দুই আর দুই যোগ করলে চারই হয়, পাঁচ কিংবা ছয় কখনও হয় না। এই কথাটি মেনে নিয়ে তোমরা শান্ত হও।” রাজা বললেন—“কোরিয়ায় যাবো কি করে' ?” মহর্ষি উত্তর দিলেন—“সব ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি।” এই বলে' তিনি ঘরে ঢুকে ছোট্ট একটি রেডিও নিয়ে এলেন। বাইরের বারান্দায় একটা গামলায় টগবগ করে' জল ফুটছিল। মহর্ষি রেডিওটি সেই ফুটন্ত জলে ফেলে দিয়ে বললেন— “এই রেডিও-সিদ্ধ জল একটু খেলেই তুমি যে-কোনও ভাষায় কথা কইতে পারবে।” তারপর তিনি রাজার মাথায় ছোট্ট একটি চন্দনের টিপ পরিয়ে দিলেন। দেখতে-দেখতে রাজার চেহারা গেল বদলে। দেখতে-দেখতে তিনি ছিপছিপে একটি যুবক হয়ে গেলেন। কুচকুচে কালো গোঁফ, চমৎকার টানা-চোখ, কোঁকড়ানো চুল। ঠিক অনেকটা মিনুর বিমলদার মতো—”

—"বাজে কথা বললেন না, বিমলদার গোঁফ নেই।"

ফোঁস করে' উঠলো মিনু—"তারপর কি হলো, বলুন।"

—"তারপর, মহর্ষি জগু পঞ্চলক্ষণের কপালেও একটি চন্দনের টিপ দিলেন। পঞ্চলক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে গেল একটি ছোট্ট এরোপ্লেন। মহর্ষি তখন বললেন—এই যে রংলালকে দেখছো, এ একজন ভালো পাইলট। কিন্তু গত যুদ্ধে গিয়ে নানারকম কুসঙ্গে পড়ে' লোকটা গুলি খেতে শিখলো। ফলে—কিছুদিন পরে চাকরি গেল। গুলির পয়সা জোটে না, লোকের পকেট মেরে বেড়াতে লাগলো শেষটা। মানে, ছিঁচ্‌কে চোর হ'য়ে দাঁড়ালো একটি। একদিন দেখি, আমার গাড়ুটা নিয়ে পালাচ্ছে। রেগে আমি ওকে বাঘ করে' দিলুম। তারপর যা-যা হয়েছে তা তো তুমি জানোই। রংলালের পথ-ঘাট সব জানা আছে, সে তোমাকে প্লেনে চড়িয়ে কোরিয়ায় পৌঁছে দেবে ঠিক। ওর সঙ্গে নির্ভয়ে রওনা হ'য়ে পড়ো তুমি।"

প্লেন আকাশে উড়লো। উড়ছে তো উড়ছেই। কত দিন, কত রাত্রি যে পার হ'য়ে গেল তার ঠিক নেই। মাথার উপরে আকাশ কখনও নক্ষত্র-ভরা, কখনও জ্যোৎস্নাময়, কখনও মেঘে-ছাওয়া, কখনো রোদে উজ্জ্বল—আসছে আর চলে যাচ্ছে। আর পায়ের নীচে পৃথিবীরও রূপ বদলাচ্ছে ক্ষণে-ক্ষণে—নদী, পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি, গ্রাম, নগর, শস্যশ্যামল মাঠ, কত যে এলো আর গেল! গর্‌র্ গর্‌র্‌র্ উড়ে চলেছে প্লেন, যে প্লেন একটু আগে ছিল পঞ্চলক্ষণ ঘোড়া।

হঠাৎ রংলাল প্লেনের মুখটা ঘুরিয়ে নিলে। রাজা বললেন, "প্লেনটা ঘোরালে যে?"

রংলাল কিছু না বলে' হাসিমুখে রাজার দিকে চাইলে কেবল একবার। রাজা আর কিছু বললেন না, তাঁর মনে হলো, কোরিয়া যাবার রাস্তাই বুঝি এইটে।

খানিকক্ষণ পরে রংলাল বললে—"ওই যে নীল আকাশের গায়ে কালো মতো একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, দেখতে পেয়েছেন?"

—"হ্যাঁ। কালো মেঘ একটা"

—"মেঘ নয়, পাহাড়, আফিঙের পাহাড়"

—"তাই নাকি?"

—"ওখান থেকে এক-চাঙড় আফিং তুলে নেবো ভাবছি। কোরিয়ায় ডামাডোল এখন, আফিং পাওয়া যাবে কিনা কে জানে, কিছু সংগ্রহ করে' রাখাই ভালো।"

বোঁ-বোঁ করে প্লেন উড়ে চললো আফিঙের পাহাড়ের দিকে। কাছাকাছি

আসতেই রাজা দেখতে পেলেন, কালো পাহাড়ের নীচে প্রকাণ্ড একটা কার্পেটের মতো কি যেন বিছানো রয়েছে।

রংলাল বললে—"আফিঙের ফুল ফুটেছে। এই পাহাড়ের চারদিক ঘিরে আছে আফিঙের বন। বারো মাস, তিরিশ দিন ফুল ফোটে। মায়াবিনী রাজকন্যার রাজত্ব কিনা এটা! আমি টুক্ করে' নেবে, চট্ করে' নিয়ে আসি খানিকটা আফিং, তারপর একেবারে সোজা পাড়ি দেবো কোরিয়ার দিকে।"

আফিঙের বনের পাশে নামলো প্লেন। রংলাল প্লেন থেকে নেবে বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। রাজাও নাবলেন। নেবেই কিন্তু রাজা অপূর্ব একটা গন্ধ পেলেন। চারদিকের বাতাস সেই গন্ধে যেন ভারী হ'য়ে রয়েছে। অদ্ভুত সে গন্ধ, চমৎকার। রাজা আচ্ছন্নের মতো ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগলো, কি সুন্দর! কি অপূর্ব! ক্রমশঃ, তাঁর ঘুম পেতে লাগলো। ভাবলেন, প্লেনের ভিতর ঢুকেই একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক ঠেস দিয়ে। কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, প্লেন নেই, প্রজাপতি হয়ে সেটা ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে আফিঙের ফুলে-ফুলে। স্বপ্নাচ্ছন্ন-নয়নে চেয়ে রইলেন রাজা। তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড হলো। আফিঙের ফুলগুলো একটা যেন আর-একটার সঙ্গে মিশে যেতে লাগলো, দেখতে-দেখতে সমস্ত ফুলগুলো এক হ'য়ে গেল, আর তার থেকে বেরিয়ে এলো এক রাঙা পরী, তার হাতে একটি বাঁশী। সে রাজাকে এসে বললে—রাজা, এই বাঁশী নাও, আর বাজাতে বাজাতে চলো আমাদের রাজকন্যার কাছে। রাজা জিগ্যেস করলেন—কে সেই রাজকন্যা? পরী বললে—মায়াবিনী রাজকন্যা, নাম তাঁর—মীনাবতী। চলো তার কাছে। রাজা বললেন, বেশ, চলো। পরীর সঙ্গে সঙ্গে রাজা চলতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে একটা পুকুর দেখা গেল। পুকুরের ধারে এসে পরী বললে—রাজা, এইবার একটি কাজ করতে হবে। এই নাও 'সেফ্‌টি রেজার'। ওই পুকুরের আয়নার সাহায্যে তোমার গোঁফটি কামিয়ে ফেল। মীনাবতী রাজকন্যা গোঁফ পছন্দ করেন না।

পুকুরের পাড়ে ব'সে পুকুরের স্বচ্ছ জলে রাজা নিজের মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলেন। সেফ্‌টি রেজার দিয়ে গোঁফ কামিয়ে ফেলতে দেরি হলো না।

তারপর রাজা বাঁশী বাজাতে বাজাতে চললেন মীনাবতী রাজকন্যার উদ্দেশে।

মিন্থু বললে—"ধ্যেৎ!"

এমন সময় মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

জগু বললে—ঐ বোধহয় আমাদের নিতে মোটর এলো। মোটর থেকে নাবলেন মিন্নুর বাবা। তিনি ঠাকুরদাকে বললেন, "আপিস থেকে একটা ট্যাক্সি করে' সোজা এইখানেই আগে চলে এলাম, ভাবলাম, তোমাকে সুখবরটা দিয়ে যাই। বিমলের সঙ্গে মিন্নুর বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেল। ওদের মত হয়েছে, বিমলের বাবা টেলিগ্রাম করেছেন, একটু আগে আপিসেই পেলাম টেলিগ্রামটা—"

মিন্নু উঠে একছুটে বাড়ির ভিতর চলে' গেল।

নবাব সাহেব

নবাব সাহেবকে তিনবার দেখেছিলাম। একবার সামনা-সামনি; আর দু'বার মনে মনে। সামনা-সামনিও বেশীক্ষণ দেখিনি, পাঁচ মিনিটের বেশী নয়। সেই গল্পটাই আগে বলি।

আমি সেখানে ডাক্তারি করতাম। একদিন খবর পেলাম, কয়েকজন বড়লোক মিলে নবাব সাহেবকে চা খাওয়াবেন ঠিক করেছেন। তাঁকে সঙ্গ দান করবার জন্য স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোককেও নিমন্ত্রণ করা হবে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আমিও একজন থাকব। যিনি আমাকে খবর দিতে এসেছিলেন, তিনি বললেন, "ডাক্তারবাবু, আপনার বাড়িটা ফাঁকা পড়ে' রয়েছে, আপনার পরিবার কবে আসবেন?"

"আসতে এখনও মাসখানেক দেরি আছে"

"তাহলে নবাব সাহেবের খানা তৈরি করবার জন্যে বাড়িটা যদি ব্যবহার করতে দেন তাহলে আমাদের সুবিধা হয়। আমাদের কারও বাড়িতে এত ফাঁকা জায়গা নেই, তাছাড়া যা শুনছি—"

এই বলে থেমে গেলেন ভদ্রলোক।

"কি শুনছেন?"

"আমাদের মতো সাধারণ কোন লোককে চা খাওয়ালে এত হাঙ্গামা কিছুই করতে হ'ত না। কিন্তু নবাব সাহেবের কথা আলাদা। খানা রাঁধবার জন্য তাঁর নিজের লোকজন আসবে। তিনজন সাধারণ বাবুর্চি, একজন হেড বাবুর্চি। তাঁরা এসে যা যা চাই ফরমাশ করবেন, একদিন আগে এসে রাঁধবার জায়গা, উনুন-টুনুন ঠিক করে' যাবেন। তারপর যেদিন খাওয়ানো হবে সেইদিন ভোর থেকে এসে রাঁধবেন। অনেক ঝঞ্ঝাট মশাই। আপনার বাড়িটা বড়ও আছে, ফাঁকাও আছে, তাই বলছি আপনার বাড়িটা যদি দেন—"

বাড়ির ভিতর এত হাঙ্গামা করবার ইচ্ছে আমারও হচ্ছিল না, কিন্তু অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। বলতে হল—"বেশ তো, আমার আর আপত্তি কি! আচ্ছা, নবাব সাহেবকে আপনারা হঠাৎ চা খাওয়াচ্ছেন কেন বুঝলাম না"

ভদ্রলোক ভুরু দুটো কপালের উপর তুলে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে খানিকক্ষণ।

"নবাব সাহেবকে চা খাওয়াতে পারা একটা সৌভাগ্য তা জানেন? উনি কারও বাড়িতে কখনও খেতে যান না, আমরা গত চার চছর ধরে' অনুরোধ করছি ওঁকে। এবারে কি জানি কেন রাজী হয়েছেন—"

আমি চুপ করে' রইলাম কয়েক মুহূর্ত।

তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের সঙ্গে আলাপ আছে বুঝি খুব—"

"উনি আমাদের একজন মস্ত বড় খাতক"

"তার মানে?"

"আমরা হাজার হাজার টাকা ধার দিই ওঁকে। যখনই দরকার হয় আমাদের খবর দেন, আমরা গিয়ে টাকা পেঁাছে দিয়ে আসি"

এবার আমি অবাক্ হলাম। চিরকাল জানি, যে টাকা ধার নেয় সে-ই কৃতজ্ঞতায় নুয়ে থাকে যে টাকা ধার দেয় তার কাছে। এ যে দেখছি উল্‌টো ব্যাপার!

"উনি অনেক টাকা ধার করেন বুঝি?"

"অনেক!"

"শোধও করেন ঠিক ঠিক?"

"করেন, কিন্তু ঠিক ঠিক নয়। আমরা ওঁর কাছ থেকে কখনও কোনও হ্যাণ্ডনোট নিই না! এমনি টাকা দিই। তারপর যখন শুনি ওঁর হাতে টাকা আছে তখন একদিন গিয়ে কুর্ণিশ করে' বলি যে অমুক দিন আপনার হুকুমে এত টাকা আপনার খিদমতের (সেবার) জন্য দিয়েছিলাম, এখন যদি সেটা পাই তাহলে বড় উপকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে খাজাঞ্চিকে হুকুম দিয়ে দেন। যত টাকা চাইব তৎক্ষণাৎ তত টাকাই পেয়ে যাব। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যদি দশ হাজার টাকা চাই তা-ও পাব। কখনও জিগ্যেস পর্যন্ত করবেন না। সত্যিকার নবাব উনি, বুঝলেন?"

চুপ করে' রইলাম, কি আর বলব! লোকটিকে দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলাম একটু।

নবাব সাহেবের কথা শুনেছিলাম আমিও, কিন্তু দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। ডাক্তার হিসাবে সে অঞ্চলে সেই সবে গেছি।

"কবে আসবেন উনি?"

"দিন চারেক পরে। মানে, আগামী বুধবার বেলা পাঁচটায়। ওঁর বাবুর্চিরা কাল আসবে"

যথাসময়ে বাবুর্চিরা এল। বাবুর্চিদের দেখে আমার চক্ষুস্থির। আসল নবাব সাহেব কি রকম হবেন জানি না, কিন্তু এঁরা দেখলাম প্রত্যেকেই এক একটি ক্ষুদ্র নবাব। একজনের দাড়িতে মেহেদী লাগানো; একজনের পায়ে মখমলের জুতো, আদ্দির পাঞ্জাবির উপর মখমলের বান্ডি পরে' আছেন একজন; আর একজনের আঙুলে যে আঙটিটা রয়েছে, মনে হ'ল তা আসল হীরের। যিনি হেড বাবুর্চি তিনি পরে' এসেছেন, নিখুঁত সাহেবী পোশাক, কথা বলছেন নিখুঁত ইংরেজীতে। শুনলাম ইনি বিলেত-ফেরত। মোগলাই, পাঠানী, ইংরেজী, ফরাসী, ইটালিয়ান, গোয়ানিজ, জার্মানী, জাপানী, চীনা—নানারকম রান্না জানেন। বেতন পান পাঁচ শ' টাকা।

আমি তো দেখে শুনে ঘাবড়ে গেলাম। প্রত্যেককে সাদরে অভ্যর্থনা করে' চেয়ার এগিয়ে দিলাম। তাঁরাও আমাকে সম্ভ্রমসহকারে আদাব করলেন। যিনি হেড বাবুর্চি তিনিই বসলেন চেয়ারে, বাকি তিনজন দাঁড়িয়ে রইলেন। যে বড়লোকেরা নবাব সাহেবকে খাওয়াবেন তাঁদের মধ্যেও একজন এসেছিলেন সঙ্গে। তিনি একটা চেয়ারে বসলেন। হেড বাবুর্চি তাঁকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, "নবাব সাহেবকে কি খাওয়াবেন আপনারা?"

"চায়ের নিমন্ত্রণ করেছি। কিন্তু শুধু চা কি নবাব সাহেবকে দেওয়া যায়? ওর সঙ্গে কিছু পোলাও, মাংস, আর আপনি যা যা ভাল মনে করেন তাই থাকবে। আমরা ফিরপোতে পাঁউরুটি, কেক, বিস্কুট, জ্যাম জেলির অর্ডার দিয়েছি। কিছু প্লেট, আর চায়ের বাসনপত্র নিয়ে সেখান থেকে লোকও আসবে একজন। চায়ের আর বাসনপত্রের ভার তারা নিয়েছে—"

হেড বাবুর্চি বললেন, "কিন্তু তারা সোনার বাসনপত্র আনতে পারবে কি? নবাব সাহেবকে যখন খাওয়াচ্ছেন, তখন—"

স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন তিনি ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোকের চোখ-মুখের ভাব দেখে আমার মনে হ'ল ভিতরে ভিতরে তিনি ঘামছেন।

"ক'জন লোককে খাওয়াচ্ছেন আপনারা?"

"জন দশেক"

"মোটে জন দশেক? তাহলে আমিই সোনার প্লেট আর বাসন নিয়ে আসব"

"ফিরপোকে মানা করে দেব?"

আসুক তারা। চায়ের কাপ-টাপগুলো দরকার হবে। এইবার আমাকে একটা কাগজ দিন তো। ফর্দ করে' ফেলি একটা"

আমি একটা চিঠি লেখবার প্যাড এগিয়ে দিলাম। হেড বাবুর্চি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "দশজনকে খাওয়াচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

হেড্ বাবুর্চি মিনিট খানেক চোখ বুজে রইলেন। তারপর বললেন, "আমার মনে হয় চায়ের সঙ্গে বেশী কিছু করে' দরকার নেই। দু'রকম পোলাও হোক, সফেদ আর জরদা। আর কাবাব হোক চার রকমের। চায়ের সঙ্গে 'কারী' সুবিধে হবে না। আমি সেই অনুসারেই ফর্দ করেছি। কিছু নিমকি, কচুরি, সিঙাড়াও রাখতে পারেন। এখানে ভাল ঘি পাওয়া যাবে কি? যদি না যায় তাহলে আমাকেই সেটা আনতে হবে, ভাল ময়দাও আমি দিতে পারি আমার বাবুর্চিখানা থেকে। নবাব সাহেবের জন্য কাশ্মীরী মেয়েরা নিজের হাতে তৈরী করে' পাঠায়। ময়দা আসে পঞ্জাব থেকে—"

ভদ্রলোক বললেন, "বেশ, ঘি আর ময়দা আপনি আনবেন, দাম যা লাগে দেব"

"দাম? আমরা মুদী নই বাবু সাহেব!"

হেড বাবুর্চির মুখে সম্ভ্রমপূর্ণ বিনীত হাসি ফুটে উঠল একটা।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বললেন, "মাফ করবেন আমাকে"

হেড বাবুর্চি বললেন, "যে-সব জিনিসের ফর্দ করে' দিচ্ছি, আপনারা সেইগুলে যোগাড় করে' রাখবেন। পরশু সকালে, মানে মঙ্গলবার সকালে আমি আবার আসব। কাল গোটা দুই চাকর চাই, তারা উঠোনটাকে পরিষ্কার করুক; রাজমিস্ত্রীও চাই একজন, উনুন তৈরি করবে। রমজান আলী, তুমি নিজে দাঁড়িয়ে উনুন তৈরী করাবে—"

"জি হুজুর"

হীরের আংটি-পরা রমজান আলী সেলাম করে' গ্রহণ করলে তাঁর হুকুম।

তারপর তিনি গফুর খাঁকে হুকুম করলেন, "তুমি বাবুর্চিখানা সাজাবে। ফুলের টব, ফুলদানি, গলিচা, কুর্সি যা যা তোমার দরকার বাবুসাহেবকে বলে দাও, ইনি সব ব্যবস্থা করবেন"

গফুর খাঁ আদাব করে সেই ভদ্রলোককে বললেন, "কুড়ি-বাইশটা ফুলের টব, একটা ভালো ফুলদানি, একটা গালিচা আর একটা আরাম-কুর্সি চাই। আরাম-কুর্সির দুপাশে রাখবার জন্য দুটো ছোট টেবিলও দরকার। একটা আতরদান চাই, সিগারেটের ছাই ফেলবার জন্য একটা ছাই-দানও চাই। আর একটা ভাল চাঁদোয়া—"

আমি একটু অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলাম।

রান্নার জায়গা সাজাবার জন্য এত সরঞ্জাম চাই না কি!

জিজ্ঞাসা করলাম—"যেখানে রান্না হবে সেখানে এত সব জিনিস লাগবে?"

হেড্ বাবুর্চি নিখুঁত ইংরেজিতে উত্তর দিলেন মৃদু হেসে—"নিশ্চয়। বাবুর্চিদের মেজাজ যদি ভালো না থাকে, চারদিকে আবহাওয়া যদি আনন্দপূর্ণ না হয়, তাহলে রান্না ভাল হবে কি করে'? যেখানে নবাব সাহেবের জন্য খানা তৈরি হবে, সেখানে পরিবেশটা ভাল করতে হবে না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়"

সেই ধনী ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। কিন্তু তাঁর চোখ-মুখ দেখে মনে হ'ল ভিতরে ভিতরে তিনি ঘামছেন বেশ।

"এবার ফর্দটা করে' ফেলি। দশজন লোক খাওয়াবেন তো?"

"হ্যাঁ, দশজন"

হেড্ বাবুর্চি ভ্রূকুঞ্চিত করে' বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "আচ্ছা, আমি গিয়েই বাড়ি থেকে ফর্দ পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনই। এখানে করলে হয়তো বাদ পড়ে যেতে পারে কিছু। একটু পরেই আমার লোক এসে ফর্দ দিয়ে যাবে। আমি এখন উঠি। ফর্দটা পেয়ে আপনি জিনিসগুলি আনিয়ে রেখে দেবেন। আবিদ মিঞা, তুমি কাল এসে নবাব সাহেব যে ঘরে খাবেন, সেই ঘরটা সাজিয়ে ফেলো। ঝাড়লণ্ঠন আছে তো?

ধনী ভদ্রলোক বললেন, "আছে। ক'টা লাগবে?"

"যদি বড় হল্ হয় তাহলে দশ-বারোটা লাগবে"

"আচ্ছা। তা সে যোগাড় হয়ে যাবে"

তৃতীয় বাবুর্চি আবিদ মিঞা সেলাম করে' সরে' দাঁড়াল। হেড বাবুর্চি উঠে যথারীতি সকলকে আদাব করে' বিদায় নিলেন। বাকী তিনজনও তাঁর পিছু-

পিছু বেরিয়ে গেল। বলে' গেল কাল সকালে আবার আসবে। সেই ধনী ব্যক্তিটি পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল, মুখ, ঘাড় ভাল করে' মুছলেন, তারপর বললেন, "আমরা ভেবেছিলাম শ'-দুই টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। কিন্তু যে রকম আঁচ পাচ্ছি আরও বেশী লাগবে। লাগবেই তো, নবাব সাহেবকে খাওয়ানো কি সোজা কথা! আচ্ছা, আমিও এখন উঠি। ফর্দটা যদি এখানে দিয়ে যায় আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন"

"আচ্ছা।"

ভদ্রলোক চলে গেলেন।

ঘণ্টা দুই পরে একটি লোক এসে আমার হাতেই ফর্দটি দিয়ে গেল। ফর্দ দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। সন্দেহ হল লোকটা-পাগল নয় তো! আমরা মাত্র দশজন খাব, আর ফর্দ দিয়েছে—সাতটা খাসির (প্রত্যেকটির ওজন ৭ থেকে ১০ সেরের মধ্যে হওয়া চাই), সফেদ পোলাওয়ের জন্য সরু আলো চাল (তুলসী মঞ্জরী বা কাটারি ভোগ) আধমণ, জরদা পোলাওয়ের জন্য ভাল পেশোয়ারী চাল আধমণ। তাছাড়া পোলাওয়ের মশলা কুড়ি রকম, প্রত্যেকটি পাঁচ সের করে', জাফরান কেবল দু' সের। পেঁয়াজ দশ সের, রসুন দশ সের, আদা পাঁচ সের—কিসমিস, পেস্তা, বাদাম প্রত্যেকটি পাঁচ সের! অবাক কাণ্ড! যাই হোক, ফর্দ সেই ভদ্রলোকের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। যাঁরা নবাব সাহেবকে খাওয়াচ্ছেন, তাঁরাই ঠিক করুন কি করবেন। আমি এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি করব! যথাসময়ে গিয়ে খেয়ে আসব আর দেখে আসব নবাব সাহেবকে। ফর্দ পাঠিয়ে দিলাম। তারপর রোগী দেখতে বেরিয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে রমজান আলী, গফুর খাঁ আর আবিদ মিঞা এসে হাজির হ'ল। একজন রাজমিস্ত্রি আর দুটো কুলীও এল। দেখলাম কিছু ইট আর সিমেণ্টও এসেছে। আমার বাড়ির পিছন দিকে যে ফাঁকা জায়গাটা ছিল, সেইটে দেখিয়ে দিয়ে আমি রোগী দেখতে বেরিয়ে গেলাম। ফিরলাম বেলা দুটো নাগাদ। ফিরে দেখি জায়গাটার চেহারাই বদলে দিয়েছে তারা! চেঁছে-ছুলে জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলেছে, পাকা উনুন তৈরি করেছে চমৎকার, ফুলের টব সাজিয়ে দিয়েছে চারিদিকে, সুন্দর চাঁদোয়া টাঙিয়েছে একটা, চাঁদোয়ায় চমৎকার কাজ করা, চাঁদোয়ার বাঁশগুলো পর্যন্ত জরি-বসানো শালু দিয়ে মোড়া। কাছেই দেখলাম একটা ক্যাম্বিসের আরাম-কেদারা আর

গোটা দুই তেপায়া রয়েছে! ফুলদানী, আতরদান, ছাইদানও এসে গেছে। একটা গালিচাও পাট করা রয়েছে দেখলাম।

রমজান আলী সসম্ভ্রমে আমাকে বললে, "গালিচা, তেপায়া, চেয়ার বুধবার সকালে কাজে লাগবে হুজুর! আতরদান, ফুলদানী আর ছাইদানও তখনই দরকার হবে। এখন এগুলো আপনার একটা ঘরে রাখিয়ে দিচ্ছি—"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"এগুলো দিয়ে কি হবে?"

"নূর মহম্মদ সাহেব, মানে, হেড বাবুর্চি সাহেব, বসবেন। গালিচা পেতে তার উপর আরাম-কুর্সিটা বিছিয়ে দেব, আর কুর্সিটা বিছিয়ে দেব, আর কুর্সির দু'পাশে তেপায়া দুটো থাকবে। একটাতে থাকবে আতরদান, ফুলদানী আর একটাতে ছাইদান"

কি কাণ্ড! কিছু না বলে জিনিসগুলো ঘরের ভিতর রাখিয়ে দিলাম। তার পরদিন ফর্দ অনুযায়ী অন্যান্য জিনিসপত্রও এসে পড়ল। সাতটা পুষ্ট খাসী ব্যা ব্যা করতে লাগল আমার বাড়ির সামনে। চাল মশলা সব এসে পড়ল। একটু পরে কাশ্মীরী ঘি আর পাঞ্জাবী ময়দা নিয়ে নূর মহম্মদ সাহেব স্বয়ং এসে গেলেন। সেই ধনী ভদ্রলোকটিও তাঁর সঙ্গে রয়েছেন দেখলাম।

এইবার আর একবার আশ্চর্য হবার পালা। নূর মহম্মদ সাহেব ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি খাসীকে দেখতে লাগলেন ভাল করে'। তারপর আবিদ মিঞাকে একটা খাসীর কোমর ধরে' তুলতে বললেন। আবিদ মিঞা তুলে ধরলে।

তিনি খাসীটির সর্বাঙ্গ ভাল করে' দেখে সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, "এই খাসীটাই থাক। বাকীগুলো ফেরত দিন। এরও সব মাংসটা লাগবে না। আমি এর থেকেই বেছে বেছে সের তিনেক মাংস বের করে' নেব…"

তারপর রমজান আলীর দিকে ফিরে তিনি বললেন—"এইবার তোমরা তিনজন লেগে পড়। দু'রকম চাল, দু'সের করে চাই। কিন্তু প্রত্যেকটি চালের দানা হওয়া চাই গোটা, এবং পাকা। বেশী করে' চাল আনিয়েছি ওই জন্যেই। তোমরা দু'জনে মিলে বেছে ফেল। তারপর মশলাও বাছতে হবে, প্রত্যেক রকম মশলা এক পোয়া করে' হলেই হবে। কিন্তু সেটা বাছাই মশলা হওয়া চাই। লবঙ্গ, এলাচ, গোলমরিচ এগুলো খুব সাবধানে বাছবে, একটিও বাজে দানা যেন না থাকে। মেওয়াগুলোও ভাল করে' বেছে নাও; কিসমিস, পেস্তা এসবের মধ্যে অনেক বাজে জিনিস মেশানো

থাকে। প্রত্যেকটি দানা বেশ পাকা আর পুষ্ট হওয়া চাই, পচা যেন একটি না থাকে—"

"জি হুজুর"

সেলাম করে' রমজান আলী চালের ঝুড়িটির দিকে এগিয়ে গেল। হেড বাবুর্চি হুকুম দিয়ে চলে' গেলেন সেদিন। যাবার আগে বলে' গেলেন, এরা চাল আর মশলা আজ বেছে ধুয়ে রাখবে, তিনি কাল সকালে আসবেন। উনি বলে যাবার পর এরা তিনজনে কাজে লেগে পড়ল এবং রাত নটা পর্যন্ত মেহনত করে' কাজ শেষ করে' ফেললে সব। অধিকাংশ চাল, মশলা আর মেওয়া ফেরত গেল। নিখুঁত জিনিসগুলি রইল কেবল।

পরদিন ভোরে নূর মহম্মদ সাহেব এসে পড়লেন। তাঁর হুকুমমতো রমজান, গফুর আর আবিদই সব করতে লাগল। তিনি গালিচার উপর ইজিচেয়ারে বসে' খুব দামী সিগারেট খেতে খেতে হুকুম দিতে লাগলেন শুধু। রান্নার গন্ধে ভরপুর হ'য়ে উঠল চতুর্দিক। পোলাও রান্নার সময় নূর মহম্মদ সাহবকে একটু শারীরিক মেহনত করতে হচ্ছিল মাঝে মাঝে। পোলাওয়ের চালে মশলা ঘি মেখে আর তাতে আখনির জল মাপ মতো দিয়ে হাঁড়ি দুটোর মুখ একেবারে ময়দার আটা দিয়ে বন্ধ করে' দেওয়া হয়েছিল। নূর মহম্মদ সাহের মাঝে মাঝে উঠে হাঁড়ির গায়ে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে শুনছিলেন হাঁড়ির ভিতরকার অবস্থা কি, আঁচ কমাতে হবে, না বাড়াতে হবে। ডাক্তাররা যেমন রোগীর বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে নানারকম শব্দ থেকে বুঝতে পারেন বুকের অবস্থা কি রকম, নূর মহম্মদ সাহেবও তেমনি ফুটন্ত পোলাওয়ের আওয়াজ থেকে ঠিক করছিলেন, পোলাও হ'তে কত দেরি আছে! আমি তো কাণ্ড দেখে 'থ' হ'য়ে গেলাম।

ঠিক পাঁচটার সময় নবাব সাহেব মোটর থেকে নামলেন এসে। পরিষ্কার ধপধপে সাদা চুড়িদার পাঞ্জাবি আর 'চুস্ত' পায়জামা পরে' এসেছিলেন। মাথায় ছিল একটি সাদা মুসলমানী টুপি। তাঁকে দেখে আমার একটি উপমা হঠাৎ মনে হয়েছিল, মানুষ নয় যেন চকচকে তলোয়ার একখানা! নীল চোখ, মুখে মৃদু হাসি। আমাদের প্রত্যেককে আদাব করে' চেয়ারে এসে বসলেন। যাঁরা তাঁকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কিছু-না-কিছু বললেন। ঘাড় বাঁকিয়ে মৃদু হেসে তিনি শুনলেন, কখনও বা মাথা নাড়লেন একটু।

খাওয়ার জিনিস সোনার থালায় আসতে লাগল একে একে। তাঁর সামনে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর চা এল। নবাব সাহেব চায়ের পেয়ালাটা কেবল তুলে নিলেন, এবং দু'চার চুমুক চা খেলেন খালি। কোন খাবার স্পর্শ পর্যন্ত করলেন না। আধ কাপ চা খেয়ে উঠে পড়লেন তিনি। সবিনয়ে বললেন, "আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে"

সকলকে আদাব করে' বেরিয়ে গেলেন তিনি।

দুই

নবাব সাহেবের দ্বিতীয়বার পরিচয় পাই অন্য সূত্রে। এক গরীব পানওয়ালার ছেলের অসুখের চিকিৎসা করেছিলাম। পানওয়ালা গরীব বলে পুরো 'ফি' দিতে পারেনি আমাকে। তার ভাঙা কুঁড়েঘর আর পানের দোকানটি মাত্র সম্বল। ওষুধ কিনতেই জেরবার হয়ে গিয়েছিল বেচারী। মাস কয়েক পরে সে আবার আমাকে ডাকলে একদিন। এবার তার স্ত্রী অসুখে পড়েছে। গিয়ে দেখলাম, এবার তার অবস্থা ফিরেছে, দোতলা পাকা বাড়ি হয়েছে একটি। এবারও সে আমাকে কম 'ফি' দিতে এল।

আমি বললাম, "এখন তো তোমার অবস্থার উন্নতি হয়েছে মনে হচ্ছে। পাকা বাড়ি করেছ—"

সে বলতে—"ডাক্তারবাবু, আমার অবস্থা তেমনি আছে। ও বাড়ি করিয়ে দিয়েছেন নবাব সাহেব"

"নবাব সাহেব?"

"হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। আমার ভাগ্য ভাল, তাই আমার দোকানের সামনে তাঁর মোটর গাড়ির টায়ার ফেটে যায় একদিন। তাঁর ড্রাইভার যখন চাকা বদলাচ্ছিল তখন আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম একটু। নবাব সাহেবকে কুর্নিশও করেছিলাম। নবাব সাহেব একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এইখানে তুমি থাক?"

আমি উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, হুজুর। এই আমার বাড়ি"

তিনি আমার ভাঙা কুঁড়েটার দিকে চেয়ে দেখলেন একবার, তারপর চলে' গেলেন। পরদিন সকালে এক ইঞ্জিনিয়ার এসে হাজির। ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

"নবাব সাহেব তোমাকে একটা পাকা বাড়ি করিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছেন।" সেই দিনই কাজ শুরু হ'য়ে গেল এবং দেখতে দেখতে আমার কুঁড়েঘরের জায়গায় ওই দোতলা বাড়ি উঠল—

নবাব সাহেবকে আমি যেন দেখতে পেলাম। ধপধপে ফরসা চেহারা, নীল চোখ, মুখে মৃদু হাসি…।

তিন

কিছুদিন আগে খবর পেয়েছি নবাব সাহেব মারা গেছেন। অসুখে ভুগে নয়, সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে। অনেকে বলছেন ইচ্ছে করে' লাফিয়ে পড়েছিলেন তিনি। কারণ তিনি যে উইল করে' গেছেন তা অদ্ভুত। তাতে লেখা আছে, "আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি গরীবদের উপকারের জন্য দান করে' দিলাম। আমার কাছে আর এক কপর্দকও রইল না, বাকী জীবনটা কি করে' কাটাব!"

সেদিন পুরী গিয়েছিলাম। পুরীর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, মনে হ'ল সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে যেন নবাব সাহেবের মুখটা দেখতে পেলাম! নক্ষত্র-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে আছেন, সেই নীল চোখ, মুখে সেই মৃদু হাসি!

দুগ্ধ-সাগর

খোকনের বয়স যখন দেড় বছর ছিল তখন সে পাগল করে' তুলতে বাড়িসুদ্ধ সকলকে। এটা ধরছে, ওটা ভাঙছে, বালতির জলে গিয়ে হাত ডোবাচ্ছে, উলটে দিচ্ছে দুধের বাটি, উলটে দিচ্ছে দাদুর কল্‌কে, উনুনের ধারে গিয়ে জলন্ত কাঠ নিয়ে টানাটানি করছে। কেউ কিছু বললেই হয় কেঁদে-কেটে অনর্থ করছে, না হয় তর্জনী আস্ফালন করে' শাসন করছে—'তোপ্‌'! যতক্ষণ জেগে থাকত ততক্ষণ তাকে কেন্দ্র করে' 'ধর ধর' 'গেল গেল' লেগেই থাকত একটা।

খোকনের অবশ্য এসব কিছুই মনে নেই। সে এখন আর খোকনই নেই। সে এখন অমলেন্দু নন্দী। নূতন চেহারা হয়েছে তার। বয়স সতরো বছর, আই-এস-সি পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিশনে। মাত্র কয়েক নম্বরের জন্য 'কম্‌পিট্' করতে পারেনি। খুব ভাল নম্বর পেয়েছে কেমিস্ট্রিতে আর অঙ্কে। ফিজিক্স প্র্যাকটিক্যালটা খারাপ না হ'য়ে গেলে ঠিক 'কম্‌পিট্' করতো। নামের আগে যদিও 'শ্রী' লেখে না (লেখাটা আজকাল ফ্যাশন নয় নাকি) কিন্তু ওর চেহারায়, ওর পোশাক-পরিচ্ছদে, ওর মার্জিত হাব-ভাবে, বুদ্ধি-দীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে শ্রী যেন উপচে পড়ছে। সত্যই দেখবার মত চেহারা। যেমন রং, তেমনি মুখের গড়ন, খুব রোগাও নয়, খুব মোটাও নয়। চোখ, দাঁত, নখ পর্যন্ত নিখুঁত একেবারে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝকঝক করছে। জামা কাপড় গেঞ্জি ধপধপ করছে সর্বদা। নিজের জামা-কাপড় সম্বন্ধে একটু বেশী সচেতন সে। ময়লা জামা-কাপড় পরতে তো পারেই না, ছুঁতে পর্যন্ত পারে না। তার আটটা গেঞ্জি, চারটে গামছা, বারোটা রুমাল, সব সময় পরিষ্কার। নিজেই সাবান দেয়। হস্টেলের বন্ধুরা বলে—ছুঁচিবাই হয়েছে। তা না হ'লে প্রতিদিন বালিশের ওয়াড় আর বিছানার চাদর বদলাবার মানে হয় কোনও! অমলেন্দু কিন্তু বদলাত। তার ধোপার খরচ, সাবানের খরচ, জলখাবারের খরচের চেয়ে বেশী ছিল। কিছুতেই সে ময়লা জিনিস ব্যবহার করতে পারত না।

এই পরিষ্কার-বাতিকের মূলে ছিল কিন্তু ছেলেবেলার একটা ঘটনা। ছেলেবেলার কোন কথাই তার মনে নেই কেবল এইটি ছাড়া। ঘটনাটা এমনভাবে তার মনে দাগ কেটে বসে' গিয়েছিল যে, তার প্রভাব কাটাতে পারে নি সে এখনও।

ঘটনাটা বিশেষ কিছু নয়। সংক্ষেপে বললে বলতে হয়—একটি চড়, তা-ও মায়ের হাতের।

আর একটু খুলে না বললে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে না তোমাদের কাছে।

খোকনের সেদিন জন্মদিন। খোকনকে ঘিরে একটা সাড়া পড়ে গেছে সেদিন বাড়িতে। তার জন্যে কেনা হয়েছে ঝকঝকে নূতন বাসন, কার্পেটের নূতন আসন। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার নানা আয়োজন হয়েছে। দিদিমা নিজে পায়েস রাঁধতে বসেছেন। সাজ-সজ্জার আয়োজনও কম হয় নি। উপহার এসেছে একটি গাদা। খেলনা, পুতুল, বাঁশী প্রভৃতি তো কেনাই হয়েছে, তাছাড়া দিদিমা করিয়ে দিয়েছেন দামী গরদের পাঞ্জাবি, মাসীর ফরমাশে করানো হয়েছে ছোট ছোট শান্তিপুরী ধুতি-চাদর, তাতে আসল জরি-বসানো টুকটুকে লাল পাড়, মামা দিয়েছে জরির কাজ-করা লাল মখমলের ছোট্ট নাগরা একজোড়া, দাদু দিয়েছেন সিল্কের গোলাপী ছাতা আর রুপো দিয়ে বাঁধানো ছোট্ট একটি লাঠি; বাবা ছোট্ট সোনার আংটি দিয়েছেন তাতে ছোট্ট একটি হীরে-বসানো, মা দিয়েছে হার। দেড় বছরের ছোট্ট খোকন রাজা হ'য়ে গেছে সেদিন যেন।

মাসী সকাল থেকে ব্যস্ত খোকনকে সাজাতে। ভালো সাবান মাখিয়ে পরিষ্কার গরম জলে স্নান করানো হ'ল প্রথমে, তারপর ফুলেল তেল মাথায় দিয়ে মাথাটায় আর একবার জল-হাত বুলিয়ে তেড়ি বাগিয়ে দেওয়া হ'ল। সরু কাজলের রেখা আঁকা হ'ল চোখের কোলে। তারপর কপালে গালে শুরু হ'ল চন্দনের কারুকার্য।

বলা বাহুল্য, এত কাণ্ড সহজে হ'ল না, মাসীর দ্বারা হ'ল না। খোকনের বালক ভৃত্য কয়লা, বড় বোন মান্তি আর ছোট মাসী পারুলকেও হিমসিম খেয়ে যেতে হ'ল। একদণ্ড কি স্থির হয়ে বসে ছেলে! কেউ ধরলে হাত, কেউ ধরলে পা, কেউ মাথা। বাবা মাঝে মাঝে গর্জন করে ধমকাতে লাগলেন, দিদিমা মাঝে মাঝে রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে খোশামোদ করতে লাগলেন—'একটিবার চুপটি করে ব'স দাদু, এক্ষুনি হ'য়ে যাবে!' সে এক কাণ্ড! অনেক কষ্টে সাজ-গোজ যদি শেষ হল, কান্না আর থামে না।

দিদিমা বললেন, 'কয়লা, তুই ওকে একটু বাইরে নিয়ে যা দিকিন। এখুনি ভুলে যাবে'

কয়লা খোকনকে বাইরে নিয়ে গেল। পাশেই ছিল মল্লিকদের বাড়ি, আর সেখানে ছিল কয়লার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ঝমরু, মল্লিক মশায়ের চাকর। সে শুধু বন্ধু নয়, গুরুও। কয়লাকে বিড়ি খেতে শিখিয়েছে, সিনেমার গানও শেখায় মাঝে মাঝে। ডাক দিতেই ঝমরু বেরিয়ে এল। বললে, খোকাকে বারান্দায় ছেড়ে দে না, বেশ খেলা করবে। সেই গানটা রপ্‌তো হয়েছে অনেকটা, শুনবি?'

খোকনকে বারান্দায় ছেড়ে দিয়ে কয়লা আর ঝমরু একটু সরে' গিয়ে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসল। বিড়ি বেরুল, দেশলাই বেরুল। জমে' উঠল বেশ।

বারান্দায় নেমেই খোকনের কান্না থেমে গিয়েছিল। অত্যন্ত লোভনীয় একটি বস্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার। বারান্দার কোণে একটি হুঁকো ঠেসান রয়েছে, একটা কল্‌কেও রয়েছে তার মাথায়। সে ঘাড় ফিরিয়ে কয়লার দিকে চেয়ে দেখলে একবার। দেখলে কয়লা আর ঝমরু দুজনেই তার দিকে পিছন ফিরে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে গান করছে। আপাতত ওদিক থেকে বাধার কোন সম্ভাবনা নেই।

নিঃশব্দে এগিয়ে গেল সে হুঁকোটির দিকে। মনের আনন্দে গালে, কপালে, গরদের পাঞ্জাবিতে, শান্তিপুরী ধুতিতে, কয়লা আর ছাই মেখে হুঁকোর জলে মখমলের জুতোটিকে ভিজিয়ে যখন সে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে চড়েছে, তখন হঠাৎ কয়লার হুঁশ হ'ল!

"এ কি, ছি—ছি—ছি—এ কি করলে—"

কিন্তু তখন আর চারা ছিল না।

ফল যা হ'ল তা নিদারুণ।

মা রেগে ঠাস করে' চড় মারলেন, কাপড়-জামা খুলে ফেললেন, আবার স্নান করালেন, আবার কাজল পরালেন। কপালে আবার চন্দনের আল্‌পনা কাটা হ'ল। জামা-কাপড় জুতো সাবান দিয়ে কেচে শুকোতে দেওয়া হ'ল উঠোনে, যতক্ষণ না শুকোল ততক্ষণ অনাহারে থাকতে হ'ল তাকে। কয়লা চাকরটা বাবার কাছে মার খেয়ে সরে' পড়ল। এক হৈ-হৈ-কাণ্ড!

সেইদিন থেকে ময়লা, বিশেষ করে' কয়লার সম্বন্ধে বিশেষ রকম সচেতন হয়ে উঠল সে। কালো রঙের জিনিসের উপরেই বিতৃষ্ণা এসে গেল তার। কালো ছিটের জামা পরত না, কালো পাড়ের কাপড় পরত না, এমন কি কালো কালিও

ব্যবহার করত না লেখবার সময়। বেগুনি আর সবুজ এই দুই রংয়ের কালি ব্যবহার করত ফাউন্টেন পেনে। নিজের কালো চুল, কালো ভুরু আর চোখের কালো তারা বদলানো সম্ভব নয় বলে ছেলেবেলায় তার ক্ষোভও ছিল। যখন পাঠশালায় পড়ে তখন দাদুর সঙ্গে তার আলাপও হয়েছিল এ বিষয়ে। খোকন দাদুকে বলেছিল, "দাদু, তোমার চুল আর ভুরু দেখে হিংসে হয়"

"কেন ?"

"কেমন চমৎকার ধপধপে সাদা! আমার চুল আর ভুরু বিশ্রী। কুচকুচে কালো, সাবান দিলেও সাদা হয় না। তোমার কি করে' সাদা হ'ল বল না!"

দাদু হাসিমুখে চুপ করে' রইলেন।

"বল না কি করে' চুল ভুরু সাদা হ'ল তোমার ?"

দিন দুই আগে দাদু তাকে দুধ-সাগরের গল্পটা বলেছিলেন। হেসে বললেন, "দুধ-সাগরে স্নান করে'। সেখানে সব কালো সাদা হয়—"

"দুথ-সাগরে স্নান করেছ তুমি! কোথা আছে দুধ-সাগর ? আমি ভেবেছিলাম গল্প বুঝি—"

"বড় হ'লে বুঝতে পারবে ?"

"কোথায় দুধ-সাগর আছে আর তাতে ডুব দিলে কি করে' কালো সাদা হ'য়ে যায়"

"তোমার চোখের তারা তো সাদা হয়নি!"

"ভাল করে' ডুব দিতে পারি নি আমি। তুমি হয়তো পারবে।"

এই দুধ-সাগরের স্বপ্নটাও খোকনের কল্পনায় বাসা বেঁধে ছিল অনেক দিন। তারপর হারিয়ে গিয়েছিল ধীরে ধীরে। সেটা নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করল হঠাৎ একদিন। তখন সে কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি. এস-সি পড়ছে…।

দুই

সকালে পড়তে বসেছে এমন সময় পুরাতন ভৃত্য কয়লা এসে হাজির। খোকনদের বাড়ির চাকরি যাবার পর সে কোলকাতায় চলে এসেছিল একটা ফ্যাক্টারিতে কাজ পেয়ে। খোকনের খবর কিন্তু সে রাখত বরাবর। খোকন যখন ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ

পেয়েছিল, তখন কয়লা এসে দেখা করে বকশিশ নিয়ে গিয়েছিল। তারপর খোকন যখন আই-এস-সি পড়বার জন্যে কোলকাতায় হস্টেলে থাকতে লাগল, তখন প্রায়ই এসে দেখা করে' যেত কয়লা। খোকনের পুরোনো জামা, কাপড়, গামছা, গেঞ্জি তারই পাওনা ছিল। খোকনকে নিজের বাড়িতেও নিয়ে গিয়েছিল সে একদিন। তার বাড়ি গিয়ে কিন্তু খোকনের খারাপ লেগেছিল খুব। কি নোংরা বস্তি, কি নোংরা ঘরদোর! কয়লার বউ কি রোগা! পরনে ময়লা ছেঁড়া শাড়ি, মাথায় চুল রুক্ষ, দাঁত অপরিষ্কার, চোখে পিঁচুটি। তার ছেলেটাও জীর্ণ-শীর্ণ। উঠোনের একধারে কয়লা আর ঘুঁটে গাদা করা ছিল, তার উপর বসে' খেলা করছে ছেলেটা! আপাদমস্তক ঘিনঘিন করে' উঠেছিল খোকনের। আর সে কয়লার বাড়ি যায় নি, কয়লাই আসত মাঝে মাঝে।

"কয়লা, এত সকালে তুই এলি যে আজ?"

"কাল আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণের পুজা হয়েছিল, তারই 'পরসাদ' তোর জন্যে এনেছি—"

শালপাতা-ঢাকা দেওয়া মাটির খুরিটি টেবিলের উপর রাখলে সে ঠুক করে'। খোকন আড়চোখে চেয়ে দেখলে সেটার দিকে। কিছু বললে না।

"খেয়ে নিস, ফেলিস না যেন"

"ও আমি খাব না"

"খাবি না! কেন খাবি না?"

"ভারি নোংরা তোরা"

"আমরা নোংরা হতে পারি, ভগবান তো নোংরা নয়। তার 'পরসাদ' কোখোনও নোংরা হ'তে পারে?"

"ভগবান তোর বাড়িতে এসেছিল?"

"জরুর"

"দেখেছিস নিজের চোখে?"

"নিজের চোখে আর ক'টা জিনিস দেখতে পাই হামি! গির্জার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে তা-ও আজকাল দেখতে পাই না আর"

"বোয়ে গেছে ভগবানের তোর বাড়িতে আসতে!"

চক্ষু বিস্ফারিত করে' দাঁড়িয়ে রইল কয়লা।

"লিখাপড়া শিখে এই বুঝি বিদ্যে হচ্ছে তোর?"

খোকন কোন উত্তর না দিয়ে ক্লাসের নোটগুলো টুকতে লাগল।

"খেয়ে নিস, ফেলিস না, ঠাকুরের পরসাদ ফেলতে নেই। আবার কাজে যাবার সময় হল, আমি চললাম"

কয়লা চলে' গেল। খোকন ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত করে' নোট টুকতে লাগল। মেসের ছোঁড়া চাকরটা এল তারপর।

'এটা নিয়ে যা"

"কি এতে?"

"কয়লা সত্যনারায়ণের প্রসাদ এনেছিল। খারাপ হ'য়ে গেছে বোধ হয়, দেখ তো—"

চাকরটা শুঁকে দেখলে।

না, খারাপ তো হয় নি"

"তবে তুই খেয়ে ফেল"

প্রসাদটা নিয়ে চলে' গেল সে। খোকন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেটে চেটে খাচ্ছে সে প্রসাদটা। মহানন্দে খাচ্ছে। খোকন অবাক্ হ'য়ে গেল। কষ্টও হ'ল তার। মনে হ'ল দেশটা হু-হু করে' কোথায় নেবে যাচ্ছে! কয়লার গাদার উপর উপবিষ্ট কয়লার ছেলেটার ছবি ভেসে উঠল মনে।

একটু পরে নতুন-কেনা কেমিষ্ট্রির বইয়ের পাতা উল্‌টে কিন্তু ভুরু কুঁচকে গেল তার। বলে কি! আমাদের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জিনিসের ভিতরই কয়লা আছে! শুধু উনুনের ভিতর বা কলকের উপরেই নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিসের ভিতরই লুকিয়ে আছে কয়লা। পেট্রোলে, রবারে, কাগজে, তুলোয়, কাপড়ে, ভিনিগারে, এমন কি এসেন্সেও। ডিমে, মাংসে, দুধে, ভাতে, আলুতে কয়লা, ওষুধে কয়লা—অ্যাস্‌পিরিন, কুইনিন, ইথার, ফর্মালিন, লাইজল্—সক্কলের মধ্যে কয়লা! সম্প্রতি ফোটো তোলবার শখ হয়েছে তার। দেখলে কয়লা না থাকলে ক্যামেরা তৈরি হ'ত না, ফোটো ডেভালাপ করা যেত না। সমস্ত রংয়ের মূলে কয়লা। সমস্ত সভ্যতাটাই যেন কয়লাকে বুকে আঁকড়ে ধরেছে! কয়লার ছেলের ছবিটা আবার ফুটে উঠল মনে।

● তৃতীয় শতক ●

তিন

রাত্রে ঘুমিয়ে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলে একটা। অদ্ভুত এবং প্রকাণ্ড। মেঘ-চাপা জ্যোৎস্নার আলোয় তার সমস্ত ঘরটা ভরে' গেছে। চমৎকার আব্‌ছা নীল আলো। আলোটা যেন চুপি চুপি কথা বলছে—আয়, আয়, আয়। হঠাৎ কোণ থেকে একটা কালো ভূত বেরিয়ে এল। প্রকাণ্ড দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দু'দিকে, আর এগিয়ে আসছে তার দিকে। কুচকুচে কালো রং।

কাছে যখন এল তখন ভয়ে শিউরে উঠল খোকন। ভূতটার গলা, মাথা, হাত, পা কিচ্ছু নেই। মনে হচ্ছে, একটা প্রকাণ্ড কালো পাঞ্জাবি দু'দিকে হাত বাড়িয়ে শূন্যে ঝুলে আছে, আর এগিয়ে আসছে তার দিকে। তারপর হা হা করে' হেসে উঠল সেটা। পর-মুহূর্তেই তার শেল্‌ফের উপর থেকে খিলখিল করে' হেসে লাফিয়ে বেরিয়ে এল কালো একটা ব্যাঙ্‌। লাফিয়ে পড়ল কালো পাঞ্জাবিটার উপর আর তার সর্বাঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

মেঘ-চাপা জ্যোৎস্না গান ধরে' দিলে সঙ্গে সঙ্গে—

যে চাঁদের আমি আলো
তাহারও ভিতরে আছে যে অনেক কালো।
অনেক দুঃখ অনেক মরণ
ফেলেছে সেথায় করাল চরণ
তাই বলে' মোরে বাস না কি তুমি ভালো।

তারপর রিমঝিম রিমঝিম করে' কি একটা বাজনা বাজতে লাগল। মনে হল সেতার বাজছে অনেক দূরে। তারপর সেটা রূপান্তরিত হল ঝরণার ঝরঝর সঙ্গীতে। মনে হল সে-ও গান গাইছে :

আমার জলে ভাসছে কত ময়লা
শ্যাওলা, ধুলো, পাতার কুচি
সবাই তারা কয়লা।
তাই ব'লে কি আমার জলে নাইবি ন'
তেষ্টা পেলে জল খেতে কি চাইবি না

ভাল ক'রে দেখ না চেয়ে
ওরে ও সতৃষ্ণ
সবার মাঝে লুকিয়ে আছেন
বংশীধারী কৃষ্ণ।

তাদের বাড়িতে ঠাকুরঘরে যে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আছেন তিনিই যেন মূর্ত হ'লেন চোখের সামনে! কুচকুচে কালো নিকষ-পাথরে তৈরি, মুখে বাঁশি। খোকনের মনে হ'ল, তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন যেন! সে হাসির আলোয় আস্তে আস্তে সমস্ত ঘরটা ভরে' উঠল। খোকন দেখলে কালো পাঞ্জাবি সাদা হয়ে গেছে।

বলছে, "চিনতে পারছ না, আমি যে তোমার সিল্কের পাঞ্জাবি। আজ সকালেই তো পড়লে, সিল্কের ভিতরও কয়লা আছে—"

কালো ব্যাঙ্‌টাও আর কালো নেই, ব্যাঙ্‌ও নেই। হয়ে গেছে সাদা সাবান। হাসছে আর বলছে, "আমি ময়লা সাফ করি বটে, কিন্তু ভুলো না আমার ভিতরও কয়লা আছে—"

কানের কাছে ফিসফিস করে' কে বললে, "অনেক আগেই তো পড়েছ, আমিও কয়লা—"

ডান হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল সে, আংটির হীরেটা কথা বলছে!

ঘুম ভেঙে গেল খোকনের।

উঠে বসল সে।

চার

তার পরদিন সে কেমিষ্ট্রির অধ্যাপকের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। খুলে বললে সব। শুনে তিনি হেসে ফেললেন।

বললেন, "খুব ভাল স্বপ্ন দেখেছ তুমি। আরও যখন বড় হবে, আরও যখন পড়বে তখন বুঝবে যে বাইরের জগতে নানা জিনিসের যে নানা রূপ আমরা দেখি, তা আসলে একই শক্তির নানা রূপ। বিদেশী বিজ্ঞানীরা এই শক্তির নাম দিয়েছেন 'এনার্জি' (Energy)। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা হয় তো একেই বলেছিলেন ব্রহ্ম।

এই শক্তিই নানারূপে প্রকাশিত হয়েছে বাইরের বিশ্বে। লোহাকে লোহার রূপ দিয়েছে যে শক্তি, সোনাকে সোনার রূপও দিয়েছে সেই শক্তি। লোহার ভিতর শক্তি একটা বিশেষ ধরণে আছে বলে' লোহা লোহা, আর সোনার ভিতর সেই একই শক্তি অন্যরকম একটা বিশেষ ধরণে আছে বলে' সোনা সোনা। আসলে লোহা আর সোনা একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। কালো সাদাও রংয়ের খেলা খালি। সূর্যালোকের সাতটা রংই যে সব জিনিস বাইরে ফিরিয়ে দেয় তারাই সাদা, অর্থাৎ সাতটা রঙের সম্মিলনই সাদা। যে সব জিনিস লাল রং ফিরিয়ে দেয় তারা লাল, যে নীল ফিরিয়ে দেয় সে নীল। আর সাতটা রংয়ের সবগুলোকেই যে-সব জিনিস নিজেদের ভিতর টেনে নেয় তাদেরই কালো দেখায়। রঙের যেখানে সম্পূর্ণ অভাব সেখানেই কালো—"

"শ্রীকৃষ্ণের রং কালো কেন তাহলে ?"

অধ্যাপক হেসে বললেন, "যেখানে অভাব সেইখানেই তো ভগবান থাকবেন"

"ও, তাই বুঝি—"

খোকন খানিকটা বুঝলে, খানিকটা বুঝতে পারলে না। কিন্তু অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হ'ল তার। একদিন কয়লার বাড়ি গিয়ে হাজির হ'ল সে। তার বউয়ের হাতের তৈরি রুটি চেয়ে খেলে। তার নোংরা ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলে। গা ঘিনঘিন করছিল, কিন্তু তবু নিলে।

পাঁচ

পুজোর ছুটিতে খোকন যখন বাড়ি গেল, সবাই অবাক্ হল তাকে দেখে। ছিমছাম বাবুটি তো আর নেই সে ! একটু যেন অন্যরকম হয়ে গেছে !

দাদু জিজ্ঞাসা করলেন, "আজব শহর কলকাতা থেকে কি আজব খবর এনেছ, শোনাও"

"একটা খবর এনেছি"

"কি ?"

"দুধ-সাগর কোথায় আছে !"

"বল, বল শুনি—"

"পরে বলব"

মুচকি হেসে চলে গেল সে।

যা হয়

চার বছরের অভি কারও চাকর নয়। সে অনেক বায়না করে' অনেক রকম দুষ্টুমি করে' তবে দুধটুকু খেল। তারপর জামা-পায়জামা পরবার সময়ও অনেক খোশামোদ করতে হ'ল তাকে। অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে, অনেকবার আদর করে', অনেক রকম লোভ দেখিয়ে তবে পরানো হ'ল তাকে জামা-পায়জামা। তারপর ঠাকুমা তার চুল আঁচড়ে দিলেন, তাতেও ঘোর আপত্তি। কিছুতেই সে নিজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হ'তে দেবে না। যা করবে নিজে করবে। সাজ-গোজ যখন শেষ হ'য়ে গেল তখন সে নিজের কাঠের ঘোড়াটার উপর চড়ে' বসে' বলতে লাগল, হেট্ হেট্, চল, চল। আপিসের লেট হ'য়ে যায় যে।

সবাই হাসতে লাগলো।

অভির বাবা চাকুরে। সে সকাল থেকেই তাড়া দিচ্ছে, তাড়াতাড়ি খেতে দাও। তাড়াহুড়ো করে' স্নান সেরে নিলে কোনক্রমে। তারপর গপাগপ করে' তপ্ত ভাত ডাল তরকারী গিলতে লাগলো। কোনক্রমে খেয়ে উঠেই কোট প্যাণ্ট টাই পরতে লাগলো আয়নার সামনে নানারকম মুখভঙ্গী করে'। আর অভির মাকে অকারণে ধমকাতে লাগল এটা দাও ওটা দাও বলে। তারপর চীৎকার করে' চাকরকে বলল—রাম সিংকে তাড়াতাড়ি মোটরটা স্টার্ট করতে বল। আপিসে লেট হ'য়ে যাবে আজ দেখছি—।

হুড়মুড় করে' বেরিয়ে গেল।

কেউ হাসলো না।

কল্পনা সুখ

"ওগো শুনছ ?"

"কি—"

"আমার নতুন স্যুটটা দর্জি দিয়ে যায় নি ?"

"না। তিনবার লোক পাঠিয়েছিলাম।"

স্ত্রী বিছানায় শুয়ে শুয়েই উত্তর দিচ্ছিলেন। কণ্ঠে বিরক্তির আভাস।

"মহা মুশকিল হ'ল তো। কি পরে' যাব এখন—"

"ওই পুরোনোটা পরেই যাও না, কেউ বুঝতে পারবে না।…"

"বরাবরই তো তাই যাচ্ছি, এবার ভেবেছিলাম নতুন পরে' যাব। দর্জি দিলে না কেন ?"

"জানি না। শুনলাম সে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গেছে। আমরা নাকি তাদের ন্যায্য মজুরি দিই না—"

স্ত্রী পাশ ফিরে শুলেন।

"আমার গেঞ্জিটা কই—"

"দেখ না, আলনাতেই আছে।"

"মাটি করেছে। কোটের সামনের দুটো বোতাম যে নেই দেখছি। বোতাম আছে বাড়িতে ?"

স্ত্রী নিরুত্তর।

"ওগো শুনছ ?"

"আঃ, তোমার জ্বালায় আর পারি না। সমস্ত রাত কাল ঘুম হয় নি—"

গজ গজ করতে করতে উঠলেন ভদ্রমহিলা। একটা কৌটো থেকে বোতাম বার করলেন, ছুঁচ সুতোও বার করলেন।

"ও-কি, দু' রঙের দুটো বার করলে যে—"

"এক রঙের দুটো নেই। দাও—"

"বিশ্রী দেখাবে না ?"

"ও, কেউ বুঝতে পারবে না। দাও—, দাও না শিগগির—"

দিতে হ'ল।

"চা করবে না?"

"কাল রাত্রে থারমসে রেখে দিয়েছি খানিকটা। ভেবেছিলাম আজ ভোরে উঠব না। কিন্তু তোমার জ্বালায় তা কি আর হবার জো আছে—"

"পাঁচটা পনরো হ'ল, দাও-দাও শিগগির দাও—"

"দিচ্ছি, দিচ্ছি, দশটা হাত তো নয়—"

অবশেষে বোতাম বসানো হ'ল। সূর্যদেব পুরোনো স্যুট পরে বাসি 'চা' খেয়ে মেষরাশিতে এসে উদিত হলেন।

সংজ্ঞা দেবী আবার শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

পাখী

"এই, তোমার নাচ বন্ধ কর—"

সিংহ সগর্জনে আদেশ করলেন ময়ূরকে। কিন্তু ময়ূর নাচতেই লাগল, মনে হ'ল যেন পশুরাজের আদেশ শুনতেই পায় নি।

"বন্ধ কর তোমার নাচ। আমার রাজকার্যের বিঘ্ন হচ্ছে—"

ময়ূর নাচতে লাগল। কাছেই ময়ূরী রয়েছে, থামবে কি করে।

"বন্ধ কর"

ময়ূর শোনে না।

সিংহের গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হ'য়ে উঠল।

"বন্ধ কর—বন্ধ কর—বন্ধ কর—"

ময়ূরের ভ্রূক্ষেপ নেই।

সিংহ এক লম্ফ দিয়ে তেড়ে গেল ময়ূরটাকে। ময়ূর ময়ূরী উড়ে গিয়ে বসল একটা উঁচু গাছের ডালে। ছোট একটা পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছিল সেখান থেকে। সেই দিকে উড়ে গেল তারা। সেখানে চমৎকার উপত্যকা ছিল একটা চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পাহাড়ের সানুদেশে ঘন সবুজ মেঘ নেমেছে যেন। ময়ূর আবার নাচ শুরু করল। ময়ূরী ঘুরতে লাগল আশে পাশে।

সিংহের আত্মসম্মানে কিন্তু আঘাত লেগেছিল ভয়ানক। মন্ত্রী ব্যাঘ্রকে ডেকে তিনি বললেন—"আমি রাজা, কিন্তু আমার কথা ওই সামান্য ময়ূর গ্রাহ্যই করল না! এতে ভয়ানক অপমানিত হয়েছি আমি। ওকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা কর—"

"নিশ্চয় করব। ওই ময়ূর জাতটাই বড় খারাপ। আমি যখন শিকার করতে বেরুই, চীৎকার করে' করে' সব প্রাণীদের সাবধান করে' দেয়। রাজন, আপনি যখন আদেশ করেছেন তখন এর ব্যবস্থা করব আমি"

দুই

দিন দুই পরে এক শৃগাল এসে ময়ূরকে নমস্কার করল। ময়ূর মাঠে চরছিল, শৃগালকে দেখে সে উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসল।

শৃগাল সবিনয়ে বলল, "আপনি গুণী লোক, আপনার গুণের সমাদর করবার সামর্থ্য আমার নেই। তবু আমার সঙ্গে আপনাকে একবার আমার বাসায় যেতে হবে"

"কেন?"

"আমার গৃহিণীর সম্প্রতি সন্তান হয়েছে। সন্তান হবার পর কেমন যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার। কাক আমাদের চিকিৎসক। সে বললে ওকে যদি ময়ূরের নাচ দেখাতে পার তা হলে উনি সেরে উঠবেন"

ময়ূর কেকারবে হেসে উঠল।

তারপর বলল, "শৃগাল মহাশয়, আপনাকে এই বনের কে না চেনে? আপনার গৃহিণী অসুস্থ শুনে দুঃখিত হলাম। কিন্তু আপনি একটা কথা বোধ হয় জানেন না, আমি নাচি কেবল আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জন করবার জন্য। অন্য কোন কারণে আমি নাচতে পারি না, আমার নাচ আসেই না"

শৃগাল ফিরে গেল। তার গর্তের কাছে যে জঙ্গলটি ছিল সেই জঙ্গলে আত্মগোপন করে বসেছিল বাঘ সিংহ দু'জনেই। তারা ভেবেছিল ময়ূর যখন শৃগালের গর্তের সামনে পুচ্ছ বিস্তার করে নাচবে, তখন তারা লাফিয়ে পড়বে তার উপরে। কিন্তু তাদের এ ষড়যন্ত্র বিফল হ'য়ে গেল!

তিন

তারপর দিন গেল একটা সাপ।

সাপ ময়ূরের খাদ্য। তাকে দেখেই ময়ূর উদ্যত-চঞ্চু-নখর হ'য়ে তেড়ে গেল। কিন্তু সাপটি ছিল ক্ষিপ্রগতি। সে ঘাসের ভিতর দিয়ে ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে আত্মগোপন করে' এগিয়ে যেতে লাগল। সোনার হরিণের পিছু পিছু রামচন্দ্র যেমন ছুটেছিলেন, সাপের পিছু পিছু তেমনি করে' ছুটতে লাগল ময়ূর। একটা বনের ধার দিয়ে একাগ্র মনে সে ছুটে চলেছে, এমন সময় হঠাৎ চতুর্দিক প্রকম্পিত করে' গর্জন উঠল একটা। পরক্ষণেই সিংহ লাফিয়ে পড়ল ময়ূরের উপর। কিন্তু ধরতে পারল না ময়ূরকে। ময়ূর নিমেষের মধ্যে উড়ে গিয়ে বসল একটা গাছের উপর। তারপর সিংহকে সম্বোধন করে' বলল—"মহারাজ, আপনার এ রকম দুর্ব্যবহারের কারণ কি বলুন—"

"তুমি আমাকে অপমান করেছ—"

"আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জন করবার জন্যে আমি নেচে থাকি। এতে যদি আপনি অপমানিত বোধ করেন তা হলে তো আমি নাচার। আপনি সিংহিনীকে ভোলাবার জন্য যখন কেশর ফুলিয়ে, ল্যাজ নেড়ে, গর গর গর্র্র্ শব্দ করেন—তখন তো আমি অপমানিত বোধ করি না।"

"আমি তোমাকে নাচতে মানা করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার মানা শোন নি, তোমার রাজার আদেশ তুমি অমান্য করেছ, সে জন্যই আমি অপমানিত বোধ করছি—"

"কিন্তু মহারাজ, একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। আপনি পশুদের রাজা। আমি পশু নই, পাখি—"

সিংহ স্তম্ভিত হ'য়ে রইল খানিকক্ষণ।

"তাহলে তুমি ভিন্ন দেশের প্রাণী আমার দেশে এসে রয়েছ? তোমার পাসপোর্ট কই, ভিসা কই?"

ময়ূর তার পাখা দুটি নেড়ে দেখাল।

তারপর বলল, "মহারাজ, আমাদের আপনি তাড়াতে পারবেন না। আমরা থাকবই। জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র বিচরণ করবার বিধিদত্ত অধিকার আমাদের আছে। এ কথা ভুলবেন না। আর একটা কথাও আপনাকে স্মরণ রাখতে অনুরোধ করছি। আপনি আজ আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন, এর প্রতিশোধ আমি নেব"

"সামান্য একটা পাখি, তুমি প্রতিশোধ নেবে? হা হা হা—"

সিংহের অট্টহাস্যে বনস্থল প্রকম্পিত হ'তে লাগল।

চার

কয়েকদিন পরে।

সিংহ একটি মেষশাবককে মেরে খাওয়ার যোগাড় করছে, এমন সময় আকাশ থেকে নেমে এল একটা প্রকাণ্ড ঝড়, ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল মেষশাবককে। সিংহ সবিস্ময়ে দেখলে বিরাট এক ঈগল পক্ষ-বিস্তার করে স্থির হ'য়ে রয়েছে—আকাশ-পটে। তার পায়ের নখর থেকে ঝুলছে মেষশাবক।

ঈগল বলল, "পশুরাজ সিংহ, তোমরা স্থলচর জীব। অতিশয় সীমাবদ্ধ তোমাদের শক্তি। আমরা আকাশচারী, আমরা শিল্পী, আমরা কবি, আমরা যোদ্ধা। আমার একজন প্রজাকে অপমান করে' তুমি সমস্ত পক্ষীজাতিকে অপমান করেছ। তাই তোমাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে এসেছিলাম। কিন্তু আমি নীচ নই। পরের মুখের গ্রাস কেড়ে খাই না। এই নাও তোমার খাবার—"

শূন্য থেকে মেষশাবকটা ধপাস্ করে' এসে পড়ল বিস্মিত সিংহের সম্মুখে। সিংহ নির্বাক হ'য়ে বসে' রইল।

ফুলদানীর একটি ফুল

জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে, ট্রেনের আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি, মনে মনে বেশ উত্তেজিত হ'য়ে আছি, ফুলদানীর কথা মনেও ছিল না, এমন সময় হঠাৎ কার্তিক এসে ঢুকল। হাতে তার ফুলদানী।

'এই যে বৌদি যাচ্ছেন তাহলে, একেবারে রেডি—'

গৃহিণী জিজ্ঞেস করলেন—'ফুলদানীটা কিনলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ। আপনি সেদিন আমাদের ফুলদানীটা দেখে বললেন না, যে আমিও যাবার সময় এই রকম একটা কিনে নিয়ে যাব। আমি জগুর কাছে খবর পেয়েছি আপনি কিনতে পারেন নি, কিনতে পারতেনও না, যা ভিড়, তাই আমি বেরিয়ে কিনে ফেললাম। আয়োডিন আছে ?"

'আছে। কেন, আয়োডিন নিয়ে কি করবেন—'

'হাতীবাগানে যা ভিড়। পা-টা মাড়িয়ে দিলে একজন'

'জুতো খুলুন দেখি—' জুতো খুলল কার্তিক।

'ইস, আঙুলটা থেঁতলে গেছে ! কী দরকার ছিল আপনার ভিড়ে গিয়ে ফুলদানী কেনবার। এঃ, কাপড়টাও ছিঁড়েছেন দেখছি—'

কার্তিক হে হে করে' হাসতে লাগল।

'ফুলদানীটা কোথায় নেবেন ? বাক্সের মধ্যে ?'

'না, বাক্স তো শাড়ি কাপড়ে ঠাসা ?'

'তাহলে—'

'ওই বালতিটার মধ্যে নিতে হবে। ওতেও তো জিনিসপত্র ভর্তি একেবারে।

'আমি দিচ্ছি ঠিক ক'রে।

বালতির মধ্যে নানা রকম খুঁটিনাটি বিচিত্র আকারের জিনিস। গৃহিণী সমস্ত দুপুর চেষ্টা করে' নানা কৌশলে ভরেছেন সেগুলি বালতিতে।

'আপনি আবার ওসব বার করবেন ? তার চেয়ে দিন, হাতে করেই নিয়ে যাব ওটা'

তারপরই সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল।

'এই তো খালি নতুন কমোডটা যাচ্ছে। ওর ভিতর কাপড় মুড়ে বসিয়ে দেওয়া যাক—'

'সেই ভালো।"

কার্তিকই একটা কাপড় দিয়ে মুড়ে কমোডের প্যানে ভালভাবে বসিয়ে দিলে সেটা। তারই দায় যেন।

বাড়ি পৌঁছে দেখি বাগানে নানারকম গোলাপ ফুল ফুটেছে। লাল, সাদা, গোলাপী, হলদে, বাদামি। রংয়ের হাট বসে' গেছে যেন। নতুন ফুলদানী আমার মেয়ে মহা উৎসাহে সাজাতে বসল।

বললাম, 'খাবার ঘরের টেবিলে রেখে আয়। আমি আসছি—'

খাবার ঘরের টেবিলের সামনে বসে ফুলদানীর দিকে চেয়ে আমি কিন্তু ভয় খেয়ে গেলাম। চোখে আমার হেমারেজ হ'ল না কি? হওয়া বিচিত্র নয়, আমি ডায়াবিটিক লোক, খাওয়া দাওয়ার কোনও মানা মানি না। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ফুলগুলোর দিকে। ফুলগুলোর মাঝখানে কালো মতন ওটা কি? কাউকে কিছু বললাম না। সোজা চলে গেলাম চোখের ডাক্তারের কাছে। সে ভাল করে' পরীক্ষা করে' বললে, 'না, চোখ ত আপনার ঠিক আছে।'

'তবে কালো মতো ওটা কি দেখলাম?'

'চশমায় ময়লা ছিল বোধ হয়।'

বাড়ি ফিরে এসে চশমাটা ভাল করে' পরিষ্কার করে' আবার দেখলাম। কিছু পরিবর্তন হয় নি। গোলাপফুলগুলোর মাঝখানে ঠিক সেইরকম একটা কালো জিনিস রয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে' বসে' রইলাম। হঠাৎ সেই কালো জিনিসটা নড়ে' উঠল। আরে, এ যে কার্তিক! সেই টাক, সেই কালো রং, সেই টেবো গাল, আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে!

তার ওই কালো মুখখানা হঠাৎ গোলাপ ফুলের চেয়ে সুন্দর মনে হ'ল।

দুইটি চিঠি

ভাই নবদ্বীপচন্দ্র,

আশা করি মঙ্গল-মতো আছো। অনেক দিন তোমার খবর পাই নাই। আমিও অবশ্য খবর লইবার চেষ্টা করি নাই। আমাদের আর খবর কি আছে বলো। এখন খবর মানে, পারের খবর। সে খবর তো জানাই আছে, আর যেটুকু অজানা, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাহা যখন জানিব তখন কাহাকেও জানাইতে পারিব না। বয়স পঁচাত্তর হইল। পারঘাটাতেই তো বসিয়া আছি! কিন্তু নৌকা আসে কই? চোখে ভাল দেখিতে পাই না। ছানি কাটাইয়াও সুবিধা হয় নাই। একটু ঝাপসাভাব থাকিয়াই গিয়াছে। খাওয়া হজম হয় না। দাঁত নাই। দিনে গলা-গলা ভাতে-ভাত আর রাত্রে খান চারেক সরুচাকলি খাই। অনেকে পাঁউরুটি দুধে ভিজাইয়া খাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু পাঁউরুটির গন্ধটা আমি বরদাস্ত করিতে পারি না ভাই। খই দুধ খাইয়া দেখিয়াছি, তাহাতেও পেটে বায়ু জন্মে। সরুচাকলিটা আমার বেশ সহ্য হইয়া গিয়াছে—

তুমি কি এখনও আগের মতো মাংস খাও? আমার তো মাছ মাংস ছুঁইবার উপায় নাই। সর্বাঙ্গে বাত। বিশেষত ডান হাঁটুটায় এত ব্যথা যে লাঠি ছাড়া চলিতে পারি না। তোমার শরীর কেমন আছে? এখনও কি তুমি কবিতা লেখো? সব খবর দিও।

দিবার মতো একটা খবর অবশ্য আমার আছে এবং সেইটি বলিবার জন্যই এতক্ষণ ভণিতা করিলাম। আমি আবার দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়াছি। মেয়েটি খুব গরীবের মেয়ে। পিতৃমাতৃহীনা হইয়া একেবারে অনাথিনী হইয়া পড়িয়াছিল। ভাই বোন নাই। এক জমিদারের ছেলে তাহার উপর কু-নজর দিয়াছিল। আমি তাহার দাদামশায়ের বন্ধু বলিয়া সে আমার কাছে আসিয়া আশ্রয় লয়। আশ্রিতার মতোই থাকিত। কিন্তু পাড়ার লোকের রসনা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলিতে-লাগিলেন, বুড়ো-শালিকের ঘাড়ে রোঁ গজাইয়াছে।

আমার ছেলেমেয়েরাও কড়া-কড়া চিঠি লিখিতে লাগিল। মেয়েটির অবস্থা যাহা হইল তাহা বর্ণনাতীত। শেষটা তাহাকে বিবাহই করিয়া ফেলিলাম। তাহার

সমস্যারও সমাধান হইল, আমারও। আমারও সমস্যা অনেক। বৃদ্ধদেরই জীবন সমস্যা-সঙ্কুল, বিশেষত যদি তাঁহারা বিপত্নীক হন।

পূর্বেই বলিয়াছি আমার শরীর নানাভাবে অপটু হইয়াছে। এ বয়সে সেবার দরকার। কিন্তু সেবা করে কে! ছেলেরা নিজের নিজের বউ লইয়া কর্মস্থলে থাকে। থাকাই উচিত। মেয়েরাও নিজেদের ঘর করিতেছে। সেটাও কাম্য। সুতরাং আমি একা পড়িয়া গিয়াছি। চাকর রাখিয়া সেবা ক্রয় করা যায় অবশ্য। কিন্তু মূল্য এত অধিক যে আমার পেন্সনে কুলায় না। চব্বিশ ঘণ্টা আমার নিকট হামে-হাল হাজির থাকিবে এরকম একটি সমর্থ চাকরের খরচ মাসে প্রায় একশত টাকা। আমি মাত্র দেড়শত টাকা পেন্সন পাই। চাকর রাখিলে অনাহারে থাকিতে হইবে। একটি বুড়ী চাকরানী রাখিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম তাহারই সেবার দরকার, সে আমাকে সেবা করিবে কিরূপে। কমবয়সী চাকরানী রাখিবার উপায় নাই, পাড়ার গার্জেনরা আছেন। এই মেয়েটি আসিয়া আমার বেশ সেবাযত্ন করিতেছিল, কিন্তু ওই গার্জেনদের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই শেষে তাহাকে বিবাহ করিতে হইল।

মেয়েটি বেশ নেটিপেটি, আমার খুব সেবা করে। নাম যদিও কালী, কিন্তু দেখিতে বেশ ফরসা, ঠোঁটের উপর ছোট্ট তিল থাকাতে আরও সুন্দর দেখায়। তাছাড়া চোখে সরু করিয়া কাজল পরে বলিয়া রূপ আরও খুলিয়াছে।

আমার ছেলেরা আমাকে তাহাদের কাছে গিয়া থাকিতে বলিয়াছিল। কিন্তু আমাদের এই বিস্তৃত-পরিসর বাস্তু-ভিটা ছাড়িয়া তাহাদের কোয়ার্টারের পায়রা-খোপে যাইতে ইচ্ছা করে না। আমার বউমারা কেউ খারাপ লোক নন, কিন্তু আমার প্রস্রাবের বোতল পরিষ্কার করিবার সময় তাঁহাদের যে কুঞ্চিত-নাসা মুখভাব দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের ওসব নোংরা কাজ করিতে দিতে ভদ্রতায় বাধে। সর্বদাই যেন তাঁহাদের কাছে অপ্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়। আমি নিজেও এসব করিতে পারি না, অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। আমার গাড়ু-গামছা আগাইয়া দিবার জন্যও একজন লোক দরকার। প্রত্যহ ঘসিয়া ঘসিয়া সর্বাঙ্গে গরম তেল মালিশ না করিয়া দিলে শরীর ভাল থাকে না। রাত্রে সরুচাকলি চাই। কে এসব করিয়া দিবে বলো?

কালীদাসী হাসিমুখে সব করিতেছে। সমস্যার সমাধান হইয়াছে। চার্লি চ্যাপলিন বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো মনীষীরাও বুড়ো বয়সে বিবাহ করিয়াছেন।

ছেলেরা যদি আমাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইত তাহা হইলে ভালো চাকর রাখিতাম, বিবাহ করিতে হইত না। কিন্তু তাহাদের নিজেদেরই কুলায় না, আমাকে পাঠাইবে কি করিয়া। মাঝে মাঝে আমার কাছেই তাহারা টাকা চায়।

তুমি বলিবে কালীদাসীর মতো একটা কচি মেয়েকে বিবাহ করিয়া আমি তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছি। এক হিসাবে তাহা সত্য বটে। কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কি সকলের প্রতি সুবিচার করা চলে? আত্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শাস্ত্রেই এ-কথা বলে; মাছ-মাংস, দুধ, শাক-পাতা, ডালভাত যাহাই খাও, অপর প্রাণীকে পীড়ন করিয়া, বঞ্চিত করিয়া অথবা বধ করিয়া খাইতে হইবে। অর্থ দিয়া যতটা ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব তাহা অবশ্য আমি করিব। আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে সব কালীদাসীকেই লিখিয়া দিব। আমার মৃত্যুর পর কালীদাসী যদি আবার বিবাহ করিতে চায় তাহাও সে করিতে পারিবে, এ কথাও লিখিয়া দিয়া যাইব। দেশের আইনও এখন তাহার স্বপক্ষে থাকিবে।

তুমি বাল্যবন্ধু বলিয়া অনেক কথাই তোমাকে লিখিলাম। বিবাহ করিয়াছি বলিয়া সমস্বরে সকলেই যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিতেছে। আশা করি তোমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ সহানুভূতি পাইব।

তুমি এখন কোথায় আছ জানি না। তোমার পুরাতন ঠিকানাতেই পত্রখানা পাঠাইতেছি। যেখানেই থাকো আশা করি ইহা তোমার নিকট পৌঁছিবে। আমার আন্তরিক ভালবাসা লও। ইতি—

তোমার বাল্যবন্ধু
রসিকলাল

বন্ধু,

কল্য তোমার পত্র ঘুরি' দিগ্বিদিক
ঠিকানায় অবশেষে পৌঁছিয়াছে ঠিক।
আমারও সমস্যা ছিল তোমারি সমান
হোটেলে আশ্রয় ল'য়ে করিয়াছি তাহা সমাধান।
আমারও গৃহিণী গত,
চারি পুত্র সংসারে বিব্রত।

বৃদ্ধের জরার ভার
হাসিমুখে বহিবার
তাহাদেরও কারও সাধ্য নাই,
কলিকালে যযাতিরে কোথা পাব ভাই।

মোরও কণ্ঠে দুলাইতে মালা
হাজির হইয়াছিল কয়েকটি বালা।
কিন্তু ভাই
পারি নাই!
কণ্ঠটিরে সামালিয়া, চাপি বক্ষে মেলে
আশ্রয় লয়েছি এসে বিদেশী হোটেলে।

তুমি যে দিয়েছ যুক্তি, ঠিক তাহা, সারালো জোরালো,
কিন্তু ভাই মোর চিত্তে বহু পূর্বে যে বালিকা
জ্বেলেছিল আলো,
আজও তার শিখা,
চেয়ে আছে মোর পানে মেলি তার দৃষ্টি অনিমিখা
উজ্জ্বল অম্লান,
দ্বিতীয় শিখার আর নাই সেথা স্থান।

তবু যেন শান্তি নাই, মাঝে মাঝে কি যে হয় মনে
বসন্তে শরতে শীতে, সমুদ্রের তরঙ্গ নর্তনে
চলন্ত মেঘের মুখে কী যে বার্তা পাই অভিনব
উড়ন্ত পাখির কণ্ঠে কী যে শুনি কেমনে তা কব।

যেমন আজিকে ধর
চতুর্দিকে বর্ষা ঝর ঝর

বিব্রত বসিয়া আছি অভিভূত অনির্দিষ্ট প্রেমে
শিরো'পরে পাংখা ঘোরে তবু, সখা, উঠিয়াছি ঘেমে।

দাঁড়ায়ে দ্বারের পাশে ভাদ্র আর্দ্র-বাসা
চোখে মুখে সর্ব-অঙ্গে ভাষা
কৃষ্ণ-আঁখি-তারকায় চমকিছে বিজলী নিদয়
গুরু গুরু গুরু গুরু করিতেছে মেঘ, না, হৃদয়!
ভেক কলরব ও কি? কেকার ক্রেংকার?
অথবা এ আর্তনাদ নিষ্পিষ্ট অবচেতনার?
করিতে পারি না ঠিক তাহা
ব্যাকুল পাপিয়া কণ্ঠে ভেসে আসে—কাঁহা, পিউ কাঁহা!
মনে হয় যাই অভিসারে
খুঁজি তারে এ জীবনে পাইনি যাহারে
চলে যাই চিরন্তন পথ চিনে চিনে
কিন্তু হায় পায়ে বাত, শুগার ইউরিনে!
লজ্জা পাই, দুঃখ পাই, ভেবে সারা হই
হেনকালে শুনিলাম—মাভৈঃ মাভৈঃ।

কালী আমারেও ভাই দেখাল সরণী
(নয় তব তিল-ঠোঁটী কাজল-নয়নী)
কালীর দোয়াত মোর,—সে আমারে ডাক দিয়া কহে
"ডুব দাও এই কালীদহে,
কামনা নাগের শিরে দাঁড়াইয়া আপনা পাসরি
কবি তুমি, বাজাও বাঁশরী।"
কবিতায় পত্র তাই লিখিনু নির্ভয়
বাঁশরী বাজিল কি না তুমি তাহা করিও নির্ণয়।
কবিতার সারমর্ম এই
কালী পূজা ভিন্ন জেনো বাঙালীর অন্য গতি নেই!

সে কালী মানবী কভু, লজ্জাবতী, ঘোমটা-টানা, কোমল-রসনা
কভু তিনি লোল-জিহ্বা, খড়্গ-হস্তা দেবী দিগ্বসনা।
কখনও দোয়াতে তিনি যাদুকরী কালী,
কলমের মুখে বসি করেন ঘট্‌কালি,
মিলাইয়া দেন নিত্য কবি ও রসিকে।
নিখিলের মর্মবাণী কাব্যে যান লিখে।

ইতি
তোমার বাল্যবন্ধু
নবদ্বীপচন্দ্র

সতী

"ওটা কার ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন ? চমৎকার চেহারা তো ! আপনার মা ?"

"না, আমার কেউ নয়। আমার এক বন্ধুর স্ত্রীর ছবি—"

"বন্ধুর স্ত্রীর ছবি আপনি টাঙিয়ে রেখেছেন কেন ?"

"ও ছবি দুর্লভ ব'লে !"

"কি রকম—"

"তাহ'লে সব খুলে বলতে হয়। আজকাল সতীর কদর নেই। যত কদর অসতীদের। কাগজে পত্রিকায় সমাজে তাদেরই জয়জয়কার। জীবনে ওই একটি সতী দেখেছিলাম, তাই ছবিটি যোগাড় ক'রে রেখেছি। রোজ সকালে উঠেই প্রণাম করি"

"প্রণাম করেন ?"

"প্রণাম করি। ওই একটি প্রণামই সত্য প্রণাম হয়। তাছাড়া যে-সব প্রণাম রোজ ডাইনে-বাঁয়ে করতে হয় সে-সব মেকি প্রণাম, স্বার্থের জন্যে বা ভদ্রতার খাতিরে। মা বাবাকে অবশ্য সত্যি প্রণাম করতুম, কিন্তু তাঁরা তো অনেকদিন হ'ল গত হয়েছেন। তাঁদের ছবিও নেই, সেকালে ছবি তোলার তত রেওয়াজও ছিল না। তাঁদের আলেখ্য তাই চোখের সামনে নেই। তবে ভাগ্যবলে ওই পুণ্যবতীর ছবিটি পেয়েছি"

ভবতোষবাবু আবার প্রণাম করলেন ছবিটিকে।

তাঁর বেয়াই ত্রিদিববাবু নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন ছবিটির দিকে। তারপর বললেন, "চেহারাটা খুবই অসাধারণ সত্যি—। ইনি যে সতী ছিলেন তা আপনি জানলেন কি ক'রে—"

"আপনি যে সন্দেহ-প্রকাশ করছেন সেজন্য আমি রাগ করছি না। ওরকম রূপসী যে সতী থাকতে পারে এ বিশ্বাসই আমাদের চলে গেছে। আজকাল সমাজে অসতীদের আমরা মেনে নিয়েছি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যেন সতী হওয়াটা একটা কুসংস্কার। যাঁরা বিজ্ঞ তাঁরা এ-কথাও প্রচার করেন, স্ত্রীলোক মাত্রকেই কেনা যায়। তারতম্যটা শুধু দামের। হে হে হে হে—"

গড়গড়ায় টান দিয়ে ভুঁড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগলেন ভবতোষবাবু! তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে চুপ ক'রে গেলেন ভুরু কুঁচকে।

"ওদের দোষ নেই। ওরা দেখছে যারা কবি সাহিত্যিক তাদেরও টাকার জুতো মেরে কেনা যায়, তারাও মঞ্চে দাড়িয়ে 'হাঁ' কে 'না' ব'লে বক্তৃতা দেয়। ওরা দেখছে যে, টাকা দিয়ে অমুকানন্দ তমুকানন্দকে নিয়ে ছিমিমিনি খেলা যায়, ওরা দেখছে যে টাকার মহিমায় বামপন্থী নেতা দক্ষিণপন্থী হ'য়ে যান, দক্ষিণপন্থীর বামপন্থী হ'তে আটকায় না; ওরা দেখছে, ঘরের বউ প্রায়-উলঙ্গ হ'য়ে সিনেমায় নাচছে টাকার লোভে, ওদের দোষ কি। তাছাড়া আর একটা কথা আছে—"

গড়গড়ায় টান দিতে দিতে হাঁটু দোলাতে লাগলেন ভবতোষ। ত্রিদিববাবু আগে দক্ষিণপন্থী ছিলেন, এখন বামপন্থী হয়েছেন, তাছাড়া তিনি মেয়ের বাবা, প্রতিবাদ করতে পারলেন না, ভিজা বিড়ালের মতো চাইতে লাগলেন কেবল।

ভবতোষবাবু বললেন, "আর একটা মস্ত কথা আছে এর ভিতর। সবাই ইচ্ছে করলে সতী হ'তে পারে না। সবাই কি ভক্ত হতে পারে? আমরা জগন্নাথদেবের ওই রকম মূর্তি দেখে কি তাঁকে পরম করুণাময় ভগবান বলে' মনে করতে পারি, চৈতন্য মহাপ্রভু যেমন পেরেছিলেন? আমরা সবাই কলম দিয়ে কাগজের উপর লিখি, কিন্তু সবাই কি আমরা লেখক? আমরা বই পেলেই পড়ি, কিন্তু সবাই কি পাঠক হ'তে পেরেছি? মন সেইভাবে তৈরি হওয়া চাই, সকলের তা হয় না। নিজের অন্তরে ঐশ্বর্য থাকা চাই, সেই ঐশ্বর্য বাইরে আরোপ করবার শক্তি থাকা চাই, তবে ওসব হয়। পুরীর মন্দিরে জগন্নাথদেবের যে গুরুগম্ভীর ভীষণ মূর্তি আছে, শ্রীচৈতন্য কিন্তু ওর মধ্যেই মদনমোহন বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর মনের মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণ ছিল তাকেই তিনি বাইরে দেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—মূর্তিতে ছিল না, ছিল তাঁর মনে, তাঁর চোখের মণিতে। সতীরাও তাই, স্বামীরা যেমনই হোক, তার মধ্যে তাঁরা দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেন। স্বামীর মধ্যে দেবত্ব নাই, দেবত্ব আছে ওই সতীর মনে। সেরকম মন আর কই, আজকাল তো চোখে পড়ে না। এখন স্ত্রীরা স্বামীর রূপ চায়, ধন চায়, খ্যাতি চায়, মর্যাদা চায়, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র চায়—তবেই তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তা-ও হয়তো করেন না। যে স্বামীর রূপ নেই, ধন নেই, খ্যাতি নেই, চরিত্র নেই—এরকম স্বামীকে দেবতার মতো ভক্তি করতে পারে এরকম স্ত্রীলোক ওই একটি ছাড়া আর দেখিনি"

আবার খানিকক্ষণ ছবিটির দিকে চেয়ে রইলেন ভবতোষ। আবার প্রণাম করলেন। ত্রিদিববাবু একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। একটু উসখুস ক'রে বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যেরকম বলছেন সে রকম সতী আজকাল আর কই। আমাদের রজনীবাবুর স্ত্রীকে খুব সতীসাধ্বী ব'লে জানতাম, কিন্তু শেষকালে সে-ও একটা ছোঁড়া অ্যাক্টারের সঙ্গে জুটে গেল, সিফিলিসও হ'ল—"

"হ্যাঁ, ঘরে-ঘরেই তো আজকাল ওই ব্যাপার। সেইজন্তেই ওই ছবিটির এত দাম। শুনবেন ওঁর কথা?"

"আপনার যদি আপত্তি না থাকে, নিশ্চয় শুনব।"

"আপত্তি কিছুই নেই। দেবীর গুণকীর্তন করলে পুণ্যই হবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে বললেন—"আমি নাম-ধাম গোপন করেই বলছি। আমার বন্ধুর অন্য নাম ছিল, আমি তাকে কেষ্ট ব'লে পরিচয় দিচ্ছি আপনার কাছে। কেষ্ট আমার বাল্যবন্ধু ছিল। স্কুল থেকে আরম্ভ ক'রে কলেজ পর্যন্ত পড়েছিলাম একসঙ্গে। ওর মাকে আমি মাসীমা বলতাম। কেষ্টও আমার মাকে মাসীমা বলত। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও প্রাণের সম্পর্ক খুব গভীর ছিল। রক্তের সম্পর্ক ছিল না বলেই বোধহয় প্রাণের সম্পর্কটা এত গভীর হয়েছিল। রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনরা প্রায়ই শত্রু হয়। আমি আই-এ পাশ ক'রে আর পড়লাম না, বাবা বললেন, আর পড়ে' সময় নষ্ট কবছ কেন, দোকানে এসে বোসো, নিজের ব্যবসা দেখে-শুনে নাও। কেষ্ট গরীবের ছেলে ছিল, সে এম. এ. পাশ করে' একজায়গায় চাকরি করতে লাগল। কেষ্ট দেখতে ভালো ছিল না। বেঁটে, কালো, রোগা। মাইনে পেত পঁচাত্তর টাকা। তবু তার বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল অনেক। আমি তার সঙ্গে প্রায়ই মেয়ে দেখতে যেতাম। অনেক মেয়ে দেখার পর এঁকে দেখলাম। একেবারে যেন দেবীমূর্তি, লক্ষ্মীপ্রতিমা। অপছন্দর প্রশ্নই উঠল না, দেনা-পাওনাতেও আটকালো না, বিয়ে হ'য়ে গেল। আমি ওর বন্ধু, আমার আনন্দিত হওয়া উচিত, কিন্তু আনন্দ না হ'য়ে হিংসে হ'ল। আমার আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আমার বউও দেখতে নেহাত খারাপ ছিল না, বেঁচে থাকলে আপনি নিজের চোখেই দেখতে পেতেন। কিন্তু এ-দেবীপ্রতিমার কাছে তার রূপ ম্লান হ'য়ে গেল আমার চোখে। আমি বাইরে যদিও দেঁতো-হাসি হাসতে লাগলাম কিন্তু মনে মনে আমার ঈর্ষার আগুন জলতে লাগল। কিন্তু মনের আগুন মনেই চেপে রাখতে হ'ল, উপায় কি। এইভাবে কাটল কিছুদিন। কেষ্টর

বাড়িতে আমার অবাধ গতি ছিল। রোজ যেতাম। কেষ্টর বউ চা জলখাবার পান দেবার জন্যে আমার সামনে বেরুতও। কিন্তু তার মুখ কখনও দেখতে পাইনি। আলতা-রাঙা পা দুটিই দেখতাম কেবল। বন্ধুর বউ, সুতরাং হাসি-ঠাট্টাও করতাম তার সঙ্গে। কিন্তু ও-তরফ থেকে কোনরকম সাড়া পাইনি কোনদিন। ঘোমটা-টানা সেই নীরব মূর্তি আজও আমি দেখতে পাই চোখের সামনে। কেষ্ট তার বউকে ভালোবাসত খুব। অমন বউকে ভালো না বাসাটাই আশ্চর্য। আমিও ভালো-বাসতুম। যাকে বলে—লভ্ অ্যাট্ ফার্স্ট সাইট—তাই হয়েছিল। মনে মনে দুরভিসন্ধিও ছিল কিছু। বাবার মৃত্যুর পর ব্যবসা যখন আমার হাতে এলো তখন আমার ব্যাঙ্কে পঁচিশ লক্ষ টাকা মজুত। মাথা তখন গগনচুম্বী হয়েছে। ধারণা হয়েছে, টাকার জোরে সব করতে পারি। কিছুদিন পরে আমার স্ত্রী মারা গেল বিনয়কে রেখে। তখন দড়ি-ছেঁড়া ষাঁড়ের মতো আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম চতুর্দিকে। অনেক বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল, অনেক সুন্দরী ধনী-কন্যা এসেছিল, অনেক লেখাপড়াজানা কালচার্ড মেয়ে এসেছিল এই প্রৌঢ় কুদর্শন লোকটার গলায় মালা দেবে বলে'। কিন্তু আমি কাউকে আমোল দিইনি। মনের অন্তরীক্ষে দেবীর মত দাঁড়িয়ে ছিল কেষ্টর বউ। আমি তার হাতে একটা মালাও কল্পনা করেছিলাম। ওই ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের অঙ্ক আমার মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছিল—"

চুপ করলেন ভবতোষবাবু। ভৃত্য আর-এক কলকে তামাক দিয়ে গেল। তিনি ধীরে ধীরে টান দিতে লাগলেন গড়গড়ায়। অনেকক্ষণ চুপ করে' রইলেন। মনে হল অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছেন।

তারপর হঠাৎ বললেন—"কেষ্টর বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা বরাবরই অব্যাহত ছিল। আমার মনে যে এ দুরভিসন্ধি আছে তা ওরা কল্পনাও করতে পারত না। আমি যেতাম বটে, কিন্তু কেষ্টর বউ পারতপক্ষে আমার সামনে আসত না। কি রকম ক'রে সে যেন বুঝতে পেরেছিল আমি নর-রূপী রাবণ একটি। মেয়েরা এটা বুঝতে পারে। যেসব মেয়ে খারাপ হয় তারা রাবণটির সামনে শাড়ির এবং দেহের বাহার ফলিয়ে ঘুর-ঘুর করে, আর যারা ভালো হয় তারা দূরে সরে' থাকে! আমার মধ্যে যে একটা লোলুপ 'রাবণ' আছে, কেষ্টর বউ সেটা টের পেয়েছিল। রাবণ বীর ছিল, জোর করে' সীতাহরণ করেছিল। কিন্তু আমি ছিলাম ভীতু। আড়ালে-আবডালে যেন ফাঁক খুঁজছিলাম। কিন্তু ফাঁক পাচ্ছিলাম না। ওদের দাম্পত্য-প্রণয় ছিল

একেবারে রেকৃতার গাঁথুনিতে গাঁথা! ছুঁচ প্রবেশের উপায় ছিল না। আমি ছুঁচ হ'য়ে ঢুকে, ফাল হ'য়ে বেরুব ভেবেছিলাম। কিন্তু ঢোকবারই রাস্তা ছিল না। কেষ্টর কোনও ছেলেপুলে হয়নি। কেষ্টর বউ কেষ্টকে নিয়েই দিনরাত থাকত। নিজে হাতে তার কাপড় জামা কাচত, নিজে হাতে তার জন্যে রান্না করত, নিজে তাকে সাবান মাখিয়ে চান করাত, নিজে তার চিবুক ধরে' মাথার চুল আঁচড়ে দিতে, নিজে পাখা নিয়ে বসে' থাকত তার খাবার সময়। দুপুরে কেষ্ট যখন আপিসে চ'লে যেত তখনও সে কেষ্টরই সেবা করত। হয় তার জামায় বোতাম লাগাচ্ছে, নয় তার কাপড়ের কোথায় খোঁচ লেগেছে সেটা সেলাই করছে, নয় তার জন্যে মোজা বা সোয়েটার বুনছে। কেষ্ট যেসব খাবার ভালবাসত তা-ও তৈরি করত দুপুরে ব'সে। আমসত্ত্ব দিত, বড়ি দিত, আচার তৈরি করত, মোরব্বা তৈরি করত। একেবারে নিশ্ছিদ্র ব্যাপার। কোনও দিক দিয়ে প্রবেশের উপায় ছিল না।

এইভাবে কিছুদিন কাটবার পর ভগবান একদিন সুযোগ দিলেন আমাকে। সুযোগটা এই—কেষ্টর পদস্খলন হ'ল। খবর পেলাম যে রামবাগানে এক মাগীর ওখানে যাতায়াত করছে। প্রাণে একটু আশা হ'ল। একদিন রাত দশটার সময় কেষ্টর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম কেষ্ট তখনও ফেরেনি, তার বউ জানলার গরাদে ধরে' রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। দেখে চলে' এলাম। তারপর তাদের দাইকে হাত করলাম। তার কাজ হ'ল, কেষ্টর সঙ্গে বউয়ের সম্পর্কটা কিরকম দাঁড়াচ্ছে তার খবর রাখা। দাইটি বেশ ঘাঘি, আড়ি পাততে ওস্তাদ। সে রোজ এসে খবর দিত—কই বাবু, কিছু তো বুঝতে পারি না। আগে যেমন ছিল, এখনও তো তেমনি আছে। তারপর একদিন এসে বললে—আজ ওরা ঘরে অনেকক্ষণ খিল দিয়ে ছিল। আমি বাইরে থেকে আড়ি পেতে সব শুনেছি। বাবু হাউ হাউ করে' কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমি বিপথে গেছি। আর কখনও যাবো না, আমাকে ক্ষমা করো। আমি জিগ্যেস করলুম, কেষ্টর বউ কি বললে? না, কিছু বললেন না, ফ্যালফ্যাল করে' চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, তাই তো, এ কি হ'ল। একটিবার শুধু বললেন। তার পরদিন ঝিটা আবার এলো। বললে, আর বিশেষ কিছু হয়নি, মা খালি মাঝে মাঝে বলছেন, তাই তো, একি হ'ল! একা একা আপনমনেই এ-কথা বলেন। আমার মনে হ'ল এই সুযোগ। আমি দাইয়ের মারফত একটা চিঠি পাঠালাম সাহস করে'। তাতে শুধু

লিখলাম—ওই পাপিষ্ঠের কাছে তুমি আর থেকো না। আমার বাড়িতে এসো, তোমাকে রাজরাজেশ্বরী করে' রেখে দেবো! সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো—

"আমি মহাপাপী, তাই আমার স্বামী বিপথে গেছেন। তাই আপনি (যাঁকে আমি এতকাল দাদার মতো শ্রদ্ধা করে' এসেছি) আমাকে এমন চিঠি লিখতে পারলেন। দোষ আপনাদের কারও নয়, দোষ আমার মধ্যেই আছে নিশ্চয়। তাই এসব ঘটছে। আমি আপনাদের পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবো।" তারপর দিনই আপিং খেলে। কেষ্ট মনে করলে, তারই পদস্খলনের কথা শুনে এই কাণ্ড ঘটল বুঝি। কিন্তু আমি জানতাম আসল কারণ কি। যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসাপত্র করে' বাঁচিয়ে তুললাম তাকে, তারপর থেকে আর তাদের বাড়ি যাইনি। যাবার সাহস হয় নি। এ ঘটনার পর কেষ্ট কিন্তু ভেঙে পড়ল। খেত্তো না, কথা কইত না, বিমর্ষ হ'য়ে বসে' থাকত খালি। দিনকতক পরে শয্যা নিলে। দিনরাত কাঁদত খালি। চোখের জলের ধারায় তার নাকের দু'পাশ হেজে গেল। ডাক্তার এসে বললেন, মানসিক ব্যাধি। কেষ্টর বউ দিবারাত্রি তার মাথার শিয়রে বসে' সেবা করত। ডাক্তারি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী—সবরকম চিকিৎসাই হ'ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেষ্ট বাঁচল না। কেষ্টকে যখন আমরা শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি, তখন কেষ্টর বউ তেতলার ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ সে চীৎকার করে' উঠল—না, না, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। বলেই ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হ'ল তার। এক চিতায় দু'জনকে পোড়ানো হ'ল—"

ভবতোষবাবু নির্নিমেষে ছবিটার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর প্রণাম করলেন আর একবার।

নেপথ্যে

তিনু সেদিন স্টেশন থেকে খুব উত্তেজিত ভাবে বাড়ি ফিরল। চাপা উত্তেজনা, কারণ কথাটা কাউকে বলা চলবে না। তিনি কাউকে বলতে মানা করেছেন, কিন্তু জনকয়েককে ত বলতেই হবে। বিশেষত মণিকে। একটা মালাও তো গাঁথতে হবে অন্তত, তাদের বাগানেই ফুল আছে। বাজারের কেনা মালা তাঁকে দেওয়া চলবে না। তাছাড়া কাকে কাকে খবরটা বলতে হবে সে-ও একটা সমস্যা। যাকে বাদ দেওয়া যাবে সে-ই চটে' যাবে। কারণ শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা জানাজানি হ'য়ে যাবেই। এত বড় ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে চাপা দেওয়া শক্ত। তাছাড়া আর একটা কথা, মেয়েদের কাউকে খবর দেওয়া হবে কিনা। তার বোন অঞ্জলি, কিম্বা মণির বোন মুকুলকে অনায়াসেই নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু ভয়, তাদের পেটে কথা থাকবে কি! অঞ্জলিটা যা বক্তিয়ার খিলিজি। শুধু যে তার পেটে কথা থাকে না তা' নয়, কথা বাড়িয়ে বলে। বেড়াল দেখলে বলে বাঘ দেখেছি। মুকুলটাও প্রায় তাই। মণির সঙ্গে পরামর্শ না করলে কিছুই ঠিক করা যাবে না। তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে সে বেরিয়ে পড়ল মণির বাড়ির উদ্দেশে। মণির বাড়িতে গিয়ে দেখল মণি নেই। এই আশঙ্কাই করেছিল সে। মণি ক্লাসের ভালো ছেলে, প্রায় প্রতি বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করে, তাই মাস্টাররা তাকে ভালোবাসেন সবাই। থার্ড মাস্টার আর ফোর্থ মাস্টার তাকে বিনা পয়সায় পড়ান। তাই সে কোনদিন থার্ড মাস্টার, কোনদিন ফোর্থ মাস্টারের বাড়ি যায়। থার্ড মাস্টার তাকে অঙ্ক পড়ান, ফোর্থ মাস্টার ইংরেজী।

দেখা হ'ল মণির বোন মুকুলের সঙ্গে।

"দাদা তো বাড়িতে নেই। থার্ড মাস্টার মশাইয়ের কাছে গেছে। কেন, এসময় কি দরকার?"

মুকুলের বয়স বছর এগারো। একটু ফাজিল গোছের।

"সিনেমার টিকিট যোগাড় করেছ বুঝি"

মুচকি হেসে বলল সে।

এ কথার জবাব না দিয়ে তিনু বলল—"তুই একটা বেলফুলের মালা গেঁথে দিতে পারিস?"

"কেন। বেলফুলের মালা নিয়ে কি করবে এখন! বিয়ে নাকি?"

"বিয়ে নয়, অন্য দরকার আছে"

"কি দরকার?"

"তুই পারবি কি না বল না"

"পারব। কিন্তু মালা নিয়ে কি করবে তা' বলতে হবে"

"আচ্ছা, সে যখন মালা নেব তখন বলব। তুই গেঁথে রাখিস তাহলে, আমি ঘুরে আসছি—"

"কতক্ষণ পরে আসবে?"

"ঘণ্টাখানেক পরে। আমি যাচ্ছি এখন মণির কাছে। আমরা দু'জনেই আসব এক ঘণ্টা পরে। মালা গেঁথে রাখিস, বুঝলি—"

"আচ্ছা—"

একটু দূর এগিয়ে গেছে, এমন সময় মুকুলের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"তিনু দা—শুনে যা-ও"

"কি—"

"তুমি মাকে বলে' যাও, তা না হলে মা আমাকে সন্ধ্যের পর গাছ থেকে ফুল তুলতে দেবে না।"

"কেন, সন্ধ্যের পর গাছ থেকে ফুল তুললে কি হয়?"

"গাছের ঘুম ভেঙ্গে যায়, কষ্ট হয়—"

মুচকি হেসে মুকুল ছুটে চলে গেল বাড়ির মধ্যে।

একটু বিব্রত হয়ে পড়ল তিনু। দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।

মুকুলের মা ভাঁড়ার ঘরে ছিলেন, বাজার-থেকে-আনা জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে তুলে রাখছিলেন। সেইখানে গিয়ে হাজির হ'ল তিনু।

"কাকীমা, মুকুলকে বলুন না, বেলফুলের একটা মালা গেঁথে দিক। আপনাদের বাগানে তো প্রচুর বেলফুল"

"এত রাত্রে মালা নিয়ে কি করবে বাবা?"

"ভীষণ দরকার"

মুকুলের মা হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তিনুর মুখের দিকে। তাঁর মনে হ'ল 'ভীষণ' কথাটার মানেটা বদলে দিয়েছে আজকালকার ছেলেমেয়েরা। মুকুলের মা

মূর্খ নন, বেথুন থেকে বি-এ পাশ করেছিলেন। কিন্তু বি-এ পাস করলে কি হবে, মনটি একেবারে সেকেলে।

"কি এমন ভীষণ দরকার হ'ল এখন ?"

"তা কাল বলব। যাঁর জন্যে মালা দরকার আজ তিনি কথাটা প্রকাশ করতে বারণ করেছেন"

চুপ করে' রইলেন মুকুলের মা।

তারপর বললেন—"কিন্তু রাত্রে যে ফুলগাছে হাত দিতে নেই বাবা! রাত্রে গাছেরা ঘুমোয়—"

"রাত্রে আমরাও ঘুমোই, কিন্তু খুব দরকার হ'লে কি আমাদের আপনি জাগাবেন না ?"

মুকুলের মা হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তিন্নুর মুখের দিকে। মনে মনে বললেন, ছেলেটা বরাবরই জেদী। মহা মুশকিলে ফেললে দেখছি।

এর ঠিক পরেই কিন্তু তিন্নু যা করলে তাতে কাবু হয়ে পড়তে হ'ল মুকুলের মাকে।

তিন্নু আবদার-মাখা কণ্ঠে বলে' উঠল, "ওসব কিছু শুনব না কাকীমা। মালা একটা চাইই আজ রাত্রে। না পেলে লজ্জায় অপমানে মাথা কাটা যাবে আমাদের। কাল সব কথা বলব আপনাকে"

"তবে বলে যা মুকুলকে গেঁথে রাখুক একটা। এত জ্বালাস তোরা!"

দুই

থার্ড মাস্টার মশায়ের বাড়ির কাছাকাছি গিয়েই তিন্নু দেখতে পেল থার্ড মাস্টার মশাই মণিকে পড়াচ্ছেন। মনি পেন্সিল হাতে করে' একটা খাতার দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে বসে' আছে। তিন্নুর মনে হ'ল খুব সম্ভব শক্ত কোনও অঙ্ক দিয়েছেন। থার্ড মাস্টার মশাইও ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছেন মণির দিকে। পরিবেশটা খুব অনুকূল মনে হ'ল না তিন্নুর। এ অবস্থায় ও ঘরে ঢোকা আর বাঘের মুখে পড়া একই জিনিস। হয়তো তাকেও দেখলে বসিয়ে দেবেন অঙ্ক কষতে। বলবেন, "মণি এটা পারছে না, দেখ দিকি তুমি পার কিনা।" মণি যে অঙ্ক পারছে না তা সে নিশ্চয়ই পারবে না, মাঝ থেকে সময় নষ্ট হ'য়ে যাবে খানিকটা। হঠাৎ একটা কথা তার মাথায় খেলে

গেল, থার্ড মাস্টার মশাইকেও ব্যাপারটা বললে কেমন হয়। নূতন ইন্‌সপেক্টারের ভাইপো সম্প্রতি বি-এ, বি-টি পাস করেছে, তাকে তিনি বসাতে চান থার্ড মাস্টারের জায়গায়। তাই আজকাল তিনি নানা রকমে থার্ড মাস্টারের খুঁত ধরছেন। গতবার এসে তিনি থার্ড মাস্টারকে অপমানই করে' গেছেন ক্লাসের সামনে। থার্ড মাস্টার মশাই এই অশিষ্ট ব্যবহারের প্রতিবাদ করে' ওপরওলার কাছে চিঠি লিখেছেন কিন্তু কোনও প্রতিকার হচ্ছে না। তাঁর দরখাস্তের জবাব পর্যন্ত আসে নি। সব নাকি মুখ শোঁকাশুঁকি আছে। ওপরওলারা নাকি সব অবাঙালী, বাঙালীর কোন নালিশই শুনতে চান না। মাস্টার মশাই ওঁকে যদি সব কথা খুলে বলেন তাহলে হয়তো উনি কিছু ব্যবস্থা করে' দিতে পারেন। তিনু তার নিজের বাবার কথাটাও বলবে ভেবেছে। কিছুতেই তাঁকে প্রমোশন দিচ্ছে না। তাঁর নীচের লোকেরা কেউ মিনিস্টারের আত্মীয়, কেউ শিডিউল্‌ড্ কাস্ট, কেউ বড়বাবুর ভাগনে বলে' প্রমোশন পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার বাবার চাকরিতে উন্নতি হচ্ছে না। ওঁকে বললে উনি হয়তো কিছু ব্যবস্থা করে' দিতে পারবেন। আর উনি বললে কি না হ'তে পারে।

হঠাৎ থার্ড মাস্টার মশাই চোখ তুলে বারান্দার দিকে চাইলেন।

"কে ওখানে দাঁড়িয়ে?"

"আজ্ঞে, আমি তিনু"

তিনু এসে ভিতরে ঢুকল।

"ও তুমি। এমন সময় হঠাৎ কি দরকার?"

"আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেটলি কথা আছে সার"

"আমার সঙ্গে? প্রাইভেটলি? কি কথা—"

চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল তিনু। তার প্রতিমুহূর্তে ভয় হচ্ছিল এইবার বুঝি মাস্টার মশাই ধমক দিয়ে উঠবেন। কিন্তু মাস্টার মশাই তা' করলেন না, খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "আচ্ছা, বল, শুনি কি তোমার প্রাইভেট কথা"

সব শুনে থার্ড মাস্টার মশাইও অবাক হ'য়ে গেলেন। এ যে অবিশ্বাস্য, অথচ একথা বিশ্বাস করবার জন্যে তাঁরও সারা হৃদয় যে উন্মুখ হয়ে আছে।

"তুমি ঠিক দেখেছ?"

"ঠিক দেখেছি সার। আমার একটুও ভুল হয়নি"

"স্টেশনে ওয়েটিং রুমে বসে' আছেন? এখানে নিয়ে এলে না কেন?"

"তিনি যে কিছুতেই আসতে চাইলেন না। বললেন খুব জরুরি দরকারে তিনি দিল্লী যাচ্ছেন। রাত্রি দুটোয় তাঁর গাড়ি। আপনি একবার চলুন সার—"

থার্ড মাস্টার মশাই চুপ করে' রইলেন।

"তিনি কি নিজে মুখে স্বীকার করেছেন যে তিনি—"

তাঁর কথা শেষ করতে দিলে না তিনু।

"না, তিনি স্বীকার করেন নি যদিও, কিন্তু অস্বীকারও করেন নি। মুচকি হেসে চুপ করে' রইলেন। আমার ভুল হয় নি সার। তিনি আর একটা কথাও বলেছেন, খুব যেন জানাজানি না হয়—"

থার্ড মাস্টার মশাই ভ্রূকুঞ্চিত করে' রইলেন আরও কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "বেশ আর কাউকে বোলো না। তুমি, আমি আর মণি স্টেশনে যাব। একটা মালা যোগাড় করে' ফেল—"

"মালা গাঁথতে দিয়েছি সার।"

"বেশ, একটা নাগাদ বেরুব বাড়ি থেকে। ঠিক সময়ে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যেও"

সোৎসাহে তিনু বাড়ি ফিরে গেল।

তিন

স্টেশনের কাছেই এক মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের চূড়ার উপর দপদপ করে' জ্বলছিল একটা বড় নক্ষত্র। অন্ধকারে মনে হচ্ছিল যেন কোনও বিরাট পুরুষ এসে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গগনস্পর্শী ললাটে যেন পরানো হয়েছে এক রহস্যময় অদৃশ্য মুকুট আর সেই মুকুটের মধ্যমণি যেন ওই নক্ষত্র।

তিনু, মণি আর থার্ড মাস্টার মশাই যখন স্টেশনে এসে পৌঁছল তখন ঠিক একটা বেজেছে। মণির হাতে একটি মালা। মুকুল সত্যিই বেশ চমৎকার করে' গেঁথে দিয়েছিল মালাটি। তিনুর হাতে একটি কাগজ। স্টেশনে কোনও লোক নেই বিশেষ। মফস্বলের স্টেশনে লোক থাকেও না বিশেষ এত রাত্রে। স্টেশনের বাবুরা শুধু জেগে কাজ করছেন নিজেদের আপিসে। গোটা কয়েক কুলি একধারে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

"তোমরা নিজেদের দোষের কথা কিছু বল নি। বল নি যে তোমরা দুর্বল বলেই নানারকম মারাত্মক রোগের বীজাণু তোমাদের আক্রমণ করেছে। তোমরা যদি জীবনীশক্তিতে বলীয়ান হ'তে, কেউ তোমাদের কিছু করতে পারত না। তোমরা অবিচার অত্যাচারকে মুখ বুজে মেনে নিচ্ছ, প্রতিবাদ নেই, একতা নেই, গুণীকে শ্রদ্ধা করবার ইচ্ছে নেই, ক্ষমতা নেই, তোমরা সবাই স্ব স্ব প্রধান থাকতে চাও, একজন নেতাকে মুখ বুজে অনুসরণ করবার মতো ধৈর্যও তোমাদের নেই, মনোবৃত্তিও নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তোমরা পিছিয়ে পড়ছ। এরকম অবস্থায় দুর্দশা তো হবেই। তোমরা আগে মানুষের মতো মানুষ হও, বিদ্যায় চরিত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ কর, তাহলেই তোমাদের দুঃখ ঘুচবে।"

একটু থেমে বললেন, "আমাকে তোমরা এখন তোমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে বলছ। যদি আত্মপ্রকাশ করি তাহলে এর একটিমাত্র ফলই হবে, দলাদলি। আমি যখন তোমাদের মধ্যে ছিলাম তখন আমাকে কেন্দ্র করে' যে কি কুৎসিত দলাদলি হয়েছিল তা তোমরা যখন বড় হয়ে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পড়বে তখন বুঝতে পারবে। তাই আমি এখন তোমাদের মধ্যে আসতে ইতস্তত করছি, বুঝতে পারছি আমার আদর্শকে রূপ দেবার মতো যথেষ্ট লোক নেই দেশে, তোমরা যেদিন বড় হ'য়ে উপযুক্ত হ'য়ে আমাকে ডাক দেবে, সেই দিনই আমি আসব তোমাদের কাছে। তোমরা নিজেদের তৈরি কর। সেইটেই এখন সবচেয়ে বড় কাজ। ট্রেনের আর বেশী সময় নেই। আজ তাহলে তোমরা এস। তোমরা সত্যি সত্যি যেদিন বড় হবে সেদিন তোমাদের মহত্ত্বের আকর্ষণেই আবার আসব তোমাদের কাছে। আমি মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে এইবার একা একটু কথা বলব, তোমরা দু'জন বাইরে যাও।"

তিনু আর মণি বাইরে চলে' গেল।

তখন তিনি থার্ড মাস্টার মশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "আমি নেতাজী নই। আমি সামান্য লোক। কিন্তু নেতাজীর সঙ্গে আমার চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। অনেকেই আমাকে নেতাজী বলে' ভুল করে। বয়স্ক লোকেরা যখন করে তখন আমি তাদের ভুল সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দিই। কিন্তু কিশোর ছেলেরা যখন নেতাজী বলে' আমাকে ঘিরে দাঁড়ায়, তখন আমি আর তাদের ভুল ভাঙিয়ে দিই না। আপনার ছাত্র দুটিকে যা বললাম তাদের তাই বলি। আপনিও যেন তাদের ভুল ভাঙিয়ে

দেবেন না। নেতাজীকে ফিরে পাবার আশায় তারা নিজেদের ভাল করে' গড়ে' তুলুক। আর আপনারা তাদের সে গঠনে সহায়তা করুন।"

থার্ড মাস্টার মশাই নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাইরে ট্রেনের হুইস্‌ল্ শোনা গেল।

"আমার ট্রেন এসে গেল। আমি চলি—"

নিজের ছোট পুঁটুলিটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। বেরুবার আগে মাথায় একটা টুপি পরলেন আর মুখের নিচের দিকটা চাদর দিয়ে ঢেকে নিলেন যাতে তাঁর মুখটা কেউ না দেখতে পায়।

কৃতজ্ঞতা

শ্রীঅধর আইচ যে বাড়ির দ্বিতলের ফ্লাটে তখন থাকিতেন সে বাড়িটি অতিশয় জীর্ণ। তাঁহার লোহার দোকানটি বড়বাজারে ছিল। আইচ মহাশয়ের আর্থিক সঙ্গতির সহিত বাড়িটি খাপ খায় নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে চৌরঙ্গীতে ঘর লইয়া থাকিতে পারিতেন। পিতার বিপুল সম্পত্তির তিনি উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। এখন তিনি যে ঘরটিতে থাকেন তাহার দরজা-জানালা পর্যন্ত ভালো বন্ধ করা যায় না। অধর আইচ এই কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছেন তাহার কারণ মিস বোস। মিস বোস টেলিফোনে কাজ করেন।

একদা একটি সদ্য-মুক্ত সিনেমা চিত্রের এলাহি কাণ্ডকারখানার মধ্যে মিস বোসের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। মিস বোস স্বল্প মূল্যের টিকিট কিনিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় অধর আইচ হুড়মুড় করিয়া তাঁহার ঘাড়ে পড়িলেন।

"সরি, কিছু মনে করবেন না। আজ বড্ড রাশ্—। বেরিয়ে আসুন ভিড় থেকে—"

উভয়ে বাহির হইয়া আসিলে আইচ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "টিকিট কিনতে পেরেছেন—"

"না—হাইয়ার ক্লাসের টিকিট ছাড়া সব টিকিট বিক্রি হ'য়ে গেছে শুনছি—"

"আচ্ছা, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি টিকিট কিনে আনছি।"

"আমার টাকাও নিয়ে যান তাহলে—"

"আচ্ছা সে হবে এখন। আগে দেখি টিকিট পাই কি না।"

অধর আইচ চলিয়া গেলেন এবং একটু পরে দুইখানি উচ্চ মূল্যের টিকিট কিনিয়া আনিয়া বলিলেন, "চলুন এবার"

"পেয়েছেন টিকিট ?"

"পেয়েছি। আসুন—"

ভালো গদি-আঁটা চেয়ারে পাশাপাশি বসিয়া দুইজনে সিনেমা দেখিলেন। মাথার উপর পাখা ঘুরিতে লাগিল।

সেই সময়ই অধর আইচ কায়দা করিয়া মিস বোসের বাড়ির ঠিকানা জানিয়া লইয়াছিলেন। কয়েক দিন যাতায়াত করিয়া অবশেষে তিনি সেই ঠিকানাতেই উঠিয়া গেলেন। নোনাধরা নড়বড়ে বাড়িটা দেখিয়া প্রথমটা একটু ইতস্তত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেমই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিল, ওই বাড়িতেই তিনি উঠিয়া গেলেন।

শ্রীঅধর আইচ ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী, শ্রীমতী যুথিকা বসু ক্রিশ্চান। কিন্তু প্রেমের দেবতার অপিসে যে-সব হিসাব রাখা হয় ধর্মের হিসাব তাহার মধ্যে নাই। উভয়ে উভয়কে ভালবাসিতে লাগিলেন; কিন্তু গোপনে, নেপথ্যে। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার সাহস কাহারও হইল না। আইচ মহাশয়ের সহিত মিস বোসের দেখা রোজই হইত। কিন্তু প্রত্যহই তিনি সে সুযোগ মামুলি কুশল প্রশ্ন করিয়া, প্রসঙ্গ তুলিয়া অথবা রাজনৈতিক কথা বলিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেন। যে কথাটি হীরকের মতো মনের অন্ধকারে জ্বলিতেছিল তাহা কিছুতেই তিনি মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। মিস বোসেরও ঠিক ওই অবস্থা।

দুই

একদিন কিন্তু বরফ ফাটিল এক অদ্ভুত উপায়ে।

অধর আইচ অধীর হইয়া অবশেষে ঠিক করিলেন যে পত্রযোগেই মনোভাব ব্যক্ত করিবেন। ফিকে নীল রঙের একটি কাগজে তিনি নিম্নলিখিত পত্রটি ফাঁদিলেন—

সুচরিতাসু,

ভগবানের অসীম কৃপায় কিছুদিন পূর্বে আপনার সহিত সিনেমায় দেখা হইয়াছিল। আপনাকে দেখিবামাত্র মনে হইয়াছিল, এই তো সেই যাহাকে এতকাল ধরিয়া খুঁজিতেছি, যাহার আশায় এতদিন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছি…”

এই পর্যন্ত লিখিয়াই আইচ মহাশয়ের মনে হইল কাজটা ঠিক হইতেছে না। প্যাড হইতে কাগজটি ছিঁড়িয়া গুলি পাকাইয়া সেটি ঘরের কোণে ফেলিয়া দিলেন।

পরদিন আবার তাঁহার মনে হইল, না, লিখিয়াই ফেলি। বিবাহের প্রস্তাব করিব ইহাতে লজ্জার কি আছে। আগের দিন কি লিখিয়াছিলেন তাহা দেখিবার জন্য কাগজের পাকানো গুলিটি ঘরের কোণে খুঁজিতে লাগিলেন। সবিস্ময়ে

দেখিলেন নীল কাগজের গুলি নাই, গোলাপী কাগজের একটি গুলি রহিয়াছে। গোলাপী রঙের কাগজ তো তিনি ব্যবহার করেন না। গুলিটি তুলিয়া লইয়া খুলিয়া পড়িলেন—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অধরবাবু, আপনাকে যে কথা আজ বলতে যাচ্ছি তা বলতে আমার নিজেরই লজ্জা করছে। লজ্জার মাথা খেয়ে তবু বলছি। সেদিন সিনেমায় আপনি আমার টিকিট কিনে দিলেন, দাম নিলেন না, তারপর আমি যে বাড়িতে থাকি সেই বাড়িতে উঠে এসে অসীম কষ্টভোগ করছেন, আমার সামান্য উপকার করবার জন্য আপনি সর্বদাই ব্যস্ত। এ সবের অর্থ কি তা আমি বুঝি। মেয়েরা এসব কথা বুঝতে পারে। কিন্তু আমার মনের কথা কি আপনি বুঝতে পারেন নি? সেটা কি আমাকে খুলে বলতে হবে? বলতে আপত্তি নেই, কিন্তু বড্ড লজ্জা করছে যে—"

চিঠি এইখানেই সমাপ্ত হইয়াছে।

তিন

পরদিন তিনি বড়বাজারে তাঁহার লোহার দোকানে গিয়া প্রধান কর্মচারীকে একটি আদেশ দিলেন।

"ইঁদুর-ধরা কল আর বিক্রি কোরো না। আর চেনা-শোনা কাছাকাছি দোকানে যত ইঁদুর-ধরা কল আছে—সব কিনে গুদোমে পুরে ফেল।"

কর্মচারী প্রশ্ন করলেন, "দাম চড়বে না কি—"

"না। ইঁদুর-ধরা কল আর বিক্রি করব না। কাউকে বিক্রি করতে দেবও না। বাজারে যত কল আছে কিনে ফেল—"

"যে আজ্ঞে"

তাহার পর তিনি ফোন করিলেন তাঁহার হিন্দু বন্ধু হরিপ্রসাদকে।

"হ্যালো, হরি? হরি কথা বলছ? ভাই, তোমাকে এক কাজ করতে হবে। গণেশ পুজোটা তোমাকে করতে হবে। শুধু তাই নয়, সমারোহ সহকারে করতে হবে। যা খরচ লাগে আমি দেব। ঠাকুরের জন্য কুমোরটুলিতে এখুনি অর্ডারটা দিয়ে দাও। ইঁদুরটি যেন বেশ বড় এবং ভাল করে' করে। হ্যাঁ হে ইঁদুরটি।

ওই ইঁদুরের দৌলতেই আমাদের বিয়ে হচ্ছে। ইঁদুরই আমার চিঠি ওঁর কাছে এবং ওঁর চিঠি আমার কাছে নিয়ে এসেছে। হা, হা, হা, ঠিক বলেছ, এখন মেঘদূতের যুগ চলে' গেছে, এখন মুষিকদূতের যুগ। আমার ঠিক পাশের ঘরেই থাকেন উনি। আর বাড়িটায় প্রচুর ইঁদুর। গণেশ পুজোটি ভাল করে' করবার ব্যবস্থা কোরো। আমিই করতে পারতুম, কিন্তু আমি ব্রাহ্ম, উনি ক্রিশ্চান। একটু দৃষ্টিকটু হবে না? তাই তোমার বেনামীতে করতে চাই। কৃতজ্ঞতা বলে' তো একটা জিনিস আছে। ঠাকুরের অর্ডারটা এখুনি দিয়ে দাও। শ' দুই টাকা আমি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। না, না, সে কি কথা, টাকা নিতে হবে বই কি!...আচ্ছা, আচ্ছা—"

স্বরূপ

থার্ড ক্লাস কামরায় অসম্ভব ভিড় সেদিন। অনেকেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার ভাগ্য ভালো ছিল, কারণ আমি একটা বেঞ্চির-এককোণে বসবার জায়গা পেয়েছিলাম। কিন্তু জীবনে কোন সৌভাগ্যই অবিমিশ্র হয় না, গোলাপ ফুলেও কাঁটা থাকে। আমার পাশেই যে লোকটি বসেছিল তার সান্নিধ্য বিষবৎ মনে হচ্ছিল। মাথা ভরতি বড় বড় চুল, মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দাঁতগুলো হলদে, চোখের কোণে পিঁচুটি। সর্বাঙ্গ থেকে ঘামের একটা ভ্যাপসা গন্ধও ছাড়ছিল। পরনের জামা-কাপড় বেশ ময়লা। অত্যন্ত নোংরা লোকটা। এর উপর আর এক বিপদ, ক্রমাগত ঢুলছিল সে। ঢুলে ঢুলে আমার দিকে ঢলে' পড়ছিল। মাথা ঠোকাঠুকি হ'য়ে গেল দু'-একবার। কামরায় জায়গা থাকলে অন্য জায়গায় সরে' যেতুম। কিন্তু সরবার উপায় ছিল না। নিরুপায় হ'য়ে বসে' রইলুম। রাগে ক্ষোভে সর্বাঙ্গ রি রি করছিল। কিন্তু প্রতিকারের উপায় কি! হঠাৎ একটা উপায় মিলে গেল অবশেষে, দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এতক্ষণ লোকটাকে জানোয়ার, অসভ্য মনে হচ্ছিল, মনে মনে তাকে জীবন্ত আস্তাকুঁড়ের সঙ্গে উপমিত করছিলুম। কিন্তু তার মুখের দিকে ভাল করে' চেয়ে দেখবার পরই সব বদলে গেল। মনে হ'ল লোকটি অত্যন্ত ক্লান্ত, বোধ হয় গরীবও খুব। বয়সও হয়েছে, কারণ দাড়ির অনেক চুল পাকা, চুলও কাঁচাপাকা। চোখে মুখে কেমন একটা অসহায় অবসন্ন ভাব। হঠাৎ আমার বাবার কথা মনে পড়ে' গেল। তিনি বুড়ো বয়সে আপিঙ ধরেছিলেন, সন্ধ্যার সময় এমনি ঢুলতেন বসে' বসে'। মা খুব বকতেন তাঁকে। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে কোনও প্রতিবাদ বেরুত না কখনও, অপরাধীর মতো চুপ করে' থাকতেন। মাঝে মাঝে শঙ্কিত মৃদু হাসি হাসতেন অপ্রতিভের মতো।

"শুনছেন?"

"কি"

"আপনি এক কাজ করুন। আমার কাঁধের উপর মাথাটা রেখে ঘুমোন"

"অমন সুন্দর জামাটা মাটি হয়ে যাবে যে আমার মাথার তেল লেগে"

"তা যাক। আপনি ঘুমিয়ে নিন খানিকক্ষণ"

বেশী অনুরোধ করতে হ'ল না, সে আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে ঘুমোতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুমোল সে। ইতিমধ্যে যাত্রীও নেমে গেল অনেক, একটা বেঞ্চ প্রায় খালিই হয়ে গেল। ইঞ্জিনের একটা হ্যাঁচকা টানেই ঘুম ভেঙে গেল তার।

"অনেকক্ষণ ঘুমুলুম। কষ্ট হয় নি তো"

"না, তেমন আর কি"

"এইবার তুমি শুয়ে পড়। তুমি বলছি বলে' কিছু মনে কোরো না। আমার বড় ছেলের বয়সী তুমি। কত বয়স হয়েছে তোমার ?"

"কুড়ি বছর—"

"আমার বিনুর বয়সও কুড়ি বছর হবে। তুমি এবার লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড় ওই বেঞ্চিটাতে। আমি তোমার জিনিসপত্রগুলো পাহারা দিচ্ছি। কোনগুলো তোমার জিনিস ?"

"ওই ট্রাঙ্কটা। আর কিছু নেই"

"বেশ আমি পাহারা দিচ্ছি ওটা। তুমি শোও।"

আমারও ঘুম পাচ্ছিল বেশ। শুয়ে পড়লাম সামনের বেঞ্চিটায়। আমার ঘুম খুব গাঢ়, তাই সাধারণতঃ আমি ঘুমুই না ট্রেনে। কিন্তু লোকটির উপর কেমন বিশ্বাস হ'ল, ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ একটা বড় স্টেশনের গোলমালে ঘুমটা ভেঙে গেল। সামনেই দেখি একটা খাবারওলা খাবার ফেরি করছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কিছু লুচি, তরকারি আর মিষ্টি কিনলাম। ক্ষিধে পেয়েছিল খুব। ট্রেনটাও সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলে।

কামরায় তখন আর কোনও লোক নেই।

লোকটি আমার দিকে চেয়ে বললে, "বেশীক্ষণ তো ঘুমুলে না। আমার উপর বিশ্বাস হ'ল না বুঝি !"

খাবার একটু বেশী করে'ই কিনেছিলাম। অর্ধেকটা তাঁকে দিয়ে বললুম— "খান—"

"আমার জন্যেও কিনেছ না কি ?"—তারপর একটু ইতস্ততঃ করে' হেসে বললে—"ভালই করেছ। খুব ক্ষিধে পেয়েছে আমারও"

অভদ্রের মতো গাঁউ গাঁউ করে' খেতে লাগল। দেখতে দেখতে শেষ হ'য়ে গেল সব।

"আর একটু নেবেন ?"

"না। ওটা তুমি খাও"

খাওয়া-দাওয়া চুকে যাবার পর মুখ হাত ধুয়ে বসলাম তুজনে মুখোমুখি।

"কোথা থেকে আসছ ?"

"হাজারিবাগ থেকে"

"কি কর সেখানে ?"

"কলেজে পড়ি। ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি"

তখন আমিও পরিচয় নিতে অগ্রসর হলাম।

"আপনি কোথা থেকে আসছেন ?"

"হাজারিবাগ থেকেই। আমারও ছুটি হয়েছে, ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি"

"আপনি কি ওখানে চাকরি করেন ?"

"না। আমি জেলে ছিলাম। কাল ছাড়া পেয়েছি"

হঠাৎ মনে হ'ল কোনও দেশ-নেতা বোধ হয়। হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারে কোনও অশোভন আচরণ করে' ফেলেছি ভেবে মনে মনে অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লাম একটু।

"জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ? জেলে গিয়েছিলেন কেন ?"

"চুরি করে'। আমি চোর"

"চোর ?"

বজ্রাহতবৎ বসে' রইলাম তার দিকে চেয়ে। পর্বতের উচ্চ শিখর থেকে গভীর গহ্বরে পতন হ'লে মনের যে অবস্থা হয়, আমারও তাই হ'ল। মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না, নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম কেবল।

"হ্যাঁ, আমি চোর। ওই আমার পেশা। সবশুদ্ধ তিনবার এই নিয়ে আমার জেল হয়েছে। ছাড়া পেয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নিই, তার পর চুরি করি, আবার জেল খাটি। এই আমার জীবন।"

"চুরি করেন কেন ?"

"প্রথমবার সঙ্গদোষে পড়ে' করেছিলাম। মেয়ের বিয়ের জন্য টাকারও দরকার

পড়েছিল কিছু। হাজার বিশেক টাকা চুরি করেছিলুম। আমার বখরায় পাঁচ হাজার পড়েছিল। মেয়ের বিয়েটা দিতে পেরেছিলুম। দু'বছর জেল হয়েছিল এজন্যে। জেলে বসে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম আর চুরি করব না। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে দেখলুম প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা শক্ত। আমি দাগী হ'য়ে গেছি, ভদ্রলোকের সমাজ আমাকে এক-ঘরে' করেছে। কেউ কাজ দেয় না, কথা বলে না পর্যন্ত। এ রকম বেকার এক-ঘরে' হ'য়ে মানুষ কতদিন থাকতে পারে। সুতরাং আবার চুরি করতে হ'ল। চুরি করে' যা পেলুম পরিবারের হাতে দিয়ে জেলে চলে এলুম। বাইরেও খেটে খেতে হয়, জেলেও তাই। বসিয়ে কেউ খেতে দেয় না। জেলখাটার সুবিধেও আছে অনেক। চাকরির জন্যে 'কর্মখালি'র বিজ্ঞাপন দেখতে হয় না। সেখানে বাঁধা কাজ রোজ করতে হয়। নানা রকম কাজ শেখাও যায়। নানা দেশের লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। অসুখ হ'লে ডাক্তার আসে, বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয়। পাকা ঘরে শুতে পাই। আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থাও আছে, নাচ গান থিয়েটার সব হয়। আর ভালভাবে থাকলে জেলারবাবুরা বেশ ভালো ব্যবহার করেন। জেলে কোনও কষ্ট হয় না। তাছাড়া বাইরে থাকবার উপায় তো নেই, একবার পা পিছলে গেলে সমাজ আর ক্ষমা করে না। স্পষ্ট করে' মুখে না বললেও আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়, তুমি চোর, তফাতে থাক।"

একটানা বলে' গেল লোকটা। মনে হ'ল যেন মুখস্থ বলে' গেল। আমি নির্বাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। একটি কথাও বেরুল না আমার মুখ দিয়ে। আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। যদিও সে নিজের সম্বন্ধে যা যা বললে এতক্ষণ, তাতে তার প্রতি আমার ঘৃণা হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু ঘৃণা হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল লোকটা চোর! চোর! কতক্ষণ এমনভাবে বসে' থাকবে আমার সামনে!

"তুমি আমাকে তোমার খাবারের ভাগ দিলে, আমারও তোমাকে কিছু খাওয়াতে ইচ্ছে করছে, তুমি আমার বিনুর বয়সী। জেল থেকে বেরুবার সময় কয়েকটা টাকা পেয়েছিলাম। কিন্তু টিকিটের পয়সাটি রেখে বাকি পয়সায় মদ খেয়েছি, জেল থেকে বেরিয়ে প্রত্যেক বারই আমি মদ খাই, তখন তো জানতাম না যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। দেখা হলে কিছু পয়সা বাঁচিয়ে রাখতুম"

করুণ মর্মান্তিক একটা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

চুপ করে' রইলাম। কি আর বলব। সে-ও ফ্যালফ্যাল করে' চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। অন্ধকার ভেদ করে' ট্রেন ছুটে চলেছে, আমরা পরস্পরের দিকে চেয়ে নীরবে বসে' আছি।

"একটা উপকার কিন্তু তোমার করতে পারি"—হঠাৎ বলে' উঠল সে—"আমি যা যা বলছি তা যদি কর তাহলে তোমার বাড়িতে চুরি হবে না কখনও। আমি পাকা চোর হ'য়ে গেছি তো, এ বিষয়ে কিছু উপদেশ দেবার অধিকার আমার হয়েছে'

আমি চুপ করে' রইলুম।

"বলব ?"

"বলুন"

"আমি অবশ্য সিঁধেল চোর। সিঁধেল চোরদের কথাই বলব। আমরা যে বাড়িতে সিঁধ দিই সে বাড়িটি দশ-পনরো দিন আগে থেকে ওয়াচ করি। বাড়ির আলো কখন নেবে, বাড়িতে রাত বারোটার পর লোকের যাওয়া-আসা আছে কি না, অনেক বাড়িতে নাইট-ডিউটির লোক থাকে কি না। তার পর লক্ষ্য করি সে-বাড়িতে কুকুর আছে কি না, থাকলে কি রকম কুকুর আছে, খাবার দিয়ে তার মুখ বন্ধ করা যায় কি না। কুকুর থাকলে আমরা প্রায় তার সঙ্গে দিনের বেলাই ভাব করতে চেষ্টা করি খাবার দিয়ে দিয়ে। তিন-চার দিন খাবার খাওয়ালেই ভাব হয়ে যায়। তার পর দেখি রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে বাড়িতে এলার্ম ঘড়ি বাজে কি না। অনেক বাড়িতে লেখকরা বা পড়ুয়ারা রাত দুপুরে উঠে পড়াশোনা করে। সে-সব বাড়িতে সিঁধ দেওয়া অসম্ভব। তারপর আর একটা জিনিসও দেখতে হয় আমাদের। যদি দেখি গেরস্ত খুব সাবধানী লোক, শুতে যাবার আগে টর্চ ফেলে ফেলে বাড়ির চারদিক দেখে দেখে বেড়াচ্ছে তাহলে সে বাড়িতেও আমরা পারতপক্ষে যাই না। সুতরাং তুমি এই কটি জিনিস রোজ কোরো। নম্বর ওয়ান—শুতে যাবার আগে টর্চ ফেলে ফেলে বাড়ির চারদিকটা দেখে তবে শুয়ো। নম্বর টু—এলার্ম ঘড়িতে রাত একটার সময় এলার্ম দিয়ে শুয়ো। নম্বর তিন—যদি কুকুর থাকে তাহলে তাকে বেঁধে রেখো, আর নিজের হাতে খেতে দিও। কিছুতেই বাইরে ছেড়ে দিও না তাকে। কেবল শুতে যাবার আগে খুলে দিও। মনে থাকবে তো ?"

"থাকবে—"

একটু পরেই একটা স্টেশনে এসে ট্রেন থামল।

"এই স্টেশনে নামব আমি। আচ্ছা চলি"

মাস খানেক পরে। তখনও গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয় নি। রাত্রে শুয়ে ঘুমুচ্ছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আমার মুখে টর্চের আলো পড়েছে। তড়াক করে' উঠে বসে' বেড সুইচটা টিপলুম। দেখি সেই লোকটা। ফিসফিস করে' বললে, "আরে, এ তোমার বাড়ি না কি! তাতো জানতুম না। আর তুমিতো আমার একটি কথাও শোন নি দেখছি। মিছিমিছি সিঁধ কেটে হয়রান হলাম। চেঁচামেচি কোরো না। চললুম—"

নিমেষে অন্তর্ধান করল। হতভম্ব হ'য়ে বসে' রইলাম আমি। তারপর উঠে দেখলাম প্রকাণ্ড একটা সিঁধ কেটেছে আমারই ঘরের দেওয়ালে। বাবা মা উপরে ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁদের আর জাগালাম না। কারণ দেখলাম ঘরের একটি জিনিসও চুরি যায় নি।

দিন সাতেক পরে একটি লোক এসে একখানি চিঠি দিয়ে চলে' গেল। চিঠির মধ্যে দেখি দুটো দশ টাকার নোট রয়েছে। আর ছোট্ট একটা চিঠি—"দেওয়ালের ফুটোটা সারিয়ে নিও। অন্য জায়গায় বেশ কিছু হাতিয়েছি। ইতি—স্বরূপ।"

মাস খানেক পরে আবার তার সঙ্গে দেখা। ট্রেনেই। তখন তার হাতে হাতকড়ি, সঙ্গে কনেস্টবল। আমাকে দেখে মুচকি হাসল।

"টাকা পেয়েছিলে?"

"একজন স্বরূপ কুড়ি টাকা পাঠিয়েছিল"

"আমার নামই স্বরূপ।"

বিবস্ত্রা বাণী

"এই রোকো—"

ট্যাক্সি-ওলা থেমে গেল, নেমে গেল শ্যামল ভদ্র। ফুটপাথের ধারে ডাস্টবিনের কাছে যে ভিখারিনীটা পিছু-ফিরে দাঁড়িয়েছিল, তার সামনে গিয়ে একটু ঝুঁকে মুখটা দেখল তার। তারপর আমার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ সে নয়।

ভিখারিনী নাকিস্বরে বলল, "একটা পয়সা দাও না বাবু। দু'দিন খাই নি"

শ্যামল ট্যাক্সিতে ফিরে এসে টাকার থলিতে হাত ঢুকিয়ে দু'টো টাকা বার করে' দিয়ে এল তাকে। অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল মেয়েটা। সত্যিই অবাক হ'য়ে গিয়েছিল সে। দু'টাকা ভিক্ষে এর আগে সে কখনও পায় নি।

"সিধা চল—"

এগিয়ে চলল ট্যাক্সি।

"এ-ও সে নয়"—আমার দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বললে শ্যামল।

এই নিয়ে সবসুদ্ধ কুড়িটি ভিখারিনী দেখা হ'ল।

আমি বললাম, "তাকে আর পাবি না"

"পেতেই হবে, সমস্ত কোলকাতা শহর আমি তোলপাড় করে' ফেলব"। উদ্‌ভ্রান্ত একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে বাইরের দিকে। পাগলের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা ভেবে আমি চুপ করে' রইলাম। শিল্পীরা পাগলই। তার ওপর মদ খেয়েছে।

"এই রোকো—"

আবার গাড়ি দাঁড়াল। আবার নেমে গেল শ্যামল। একটা গলির মোড়ে দু'-তিনটে ভিখারিনী জটলা করছিল। দু'টো বুড়ী, আর একটা কমবয়সী, সেটার কোলে আবার শিশু একটা। শ্যামল প্রত্যেকটির মুখ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে' দেখল, আবার মাথা নেড়ে ফিরে এল গাড়ির ভিতর। তারপর এক মুঠো টাকা দিয়ে এল ওদের! থলিতে কত টাকা নিয়ে বেরিয়েছে কে জানে!

"সিধা চল—"

সকাল থেকেই এইভাবে চলছে। হু হু করে' মিটার উঠছে, শ্যামলের সেদিকে

ভ্রূক্ষেপ নেই। এখন সে তো রাজা। 'বিবস্ত্রা বাণী' ছবিটা বিক্রি করে' নগদ পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছে সে। কালই পেয়েছে।

সকাল থেকেই এই কাণ্ড।

এর পিছনে অবশ্য ইতিহাস আছে একটু। বছর দুই আগেকার ঘটনা। হঠাৎ কার কাছে যেন খবর পেলাম শ্যামল কলকাতায় এসেছে। সে কলকাতার বাইরে থাকে। ছবি আঁকাই তার নেশা এবং পেশা। নেশাটা যতটা জমেছিল পেশাটা ততটা জমে নি। শিল্পী শ্যামল ভদ্রের নাম তখন খুব বেশি লোকে জানত না। কিন্তু আমি বরাবরই তার গুণগ্রাহী ছিলাম। তার বাড়িতে গিয়ে দেখা করলাম। দেখলাম বাইরের ঘরটার চারদিকে নিজের আঁকা ছবি টাঙিয়ে বসে' আছে। আর মদ খাচ্ছে।

"কি রে এসেছিস, খবর দিস নি?"

"কাল তোর বাড়ি যাব। পিসিমা কেমন আছেন?"

"ভালই আছেন"

"তাঁর হাতের রান্না খেয়ে আসব কাল"

"খুব খুশি হবেন পিসিমা। কিন্তু ভুলে যেও না যেন"

"না, ভুলব না"

"আমি কাল দু'-চারজনকে নিমন্ত্রণও করি তা হ'লে"

"ওসব ঝামেলা আবার করছ কেন?"

"ঝামেলা কিছুই নয়। অনেকে তোর সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক। ওই কথা রইল তা হ'লে—"

"বেশ"

চ'লে এলাম।

তার পরদিন আশা করেছিলাম সে আটটা-ন'টা নাগাদ এসে পড়বে। কিন্তু এগারোটা পর্যন্ত যখন এল না, তখন চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম একটু। ট্যাক্সি নিয়ে নিজেই গেলাম আবার তার বাড়িতে। গিয়ে দেখি তন্ময় হ'য়ে ছবি আঁকছে একটা।

আমাকে দেখেই হেসে বলল, "চল যাচ্ছি এবার। দেরি হয়ে গেছে, না?"

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। একটা চটি পায়ে দিয়ে বললে—"চল—"

"স্নান করেছিস ?"

"কাল করব"

কিছুদূর এসেছি, হঠাৎ ব'লে উঠল, "ওহো, বড় ভুল হয়ে গেল তো।"

"কি ?"

"হুইস্কির বোতলটা আনলাম না। হাতে এখন পয়সার বড় টানাটানি, তা না হ'লে রাস্তা থেকেই কিনে নিতাম এক বোতল। চল, নিয়ে আসি, ওটা পিসিমাকে লুকিয়ে দু'-এক ঢোঁক খেতে হবে। ও জিনিস পেটে না পড়লে কিছুই জমবে না"

ঘোরাতে হ'ল ট্যাক্সি। একটু পরে মদের বোতল নিয়ে ফিরছি, এমন সময় আবার শ্যামল ব'লে উঠল—"এই রোকো—"

ট্যাক্সি থামল।

"আবার কি—"

"দাঁড়া ওইটেকে একটু দেখে আসি।"

টপ্ করে নেবে গেল ট্যাক্সি থেকে। একটু দূরে ফুটপাথের ধারে একটা ডাস্টবিন ছিল, তার ভিতর থেকে এক ছিন্নবসনা প্রায়-উলঙ্গিনী ভিখারিনী কি যেন কুড়িয়ে নিয়ে খাচ্ছিল। শ্যামল গিয়ে সেইখানে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঘুরে ঘুরে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে লাগল তাকে। অধীর হ'য়ে পড়েছিলাম আমি, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা বোধহয় এসে গেছেন এতক্ষণ। আমিও নেমে গেলাম।

"কি দেখছিস অত ক'রে ?"

"ছবি"

ভিখারিনী মেয়েটা একটু সলজ্জভাবে চাইছিল শ্যামলের দিকে। তার স্বভাবতই মনে হচ্ছিল তার প্রায়-উলঙ্গিনী চেহারাই বোধহয় আকৃষ্ট করেছে শ্যামলকে। ছেঁড়া আঁচলটা গায়ে টেনে দিয়ে করুণকণ্ঠে সে বললে—"একটা কাপড় দাও না আমাকে রাজাবাবু। পরবার কাপড় একেবারে ছিঁড়ে গেছে। অনেককে চেয়েছি, কেউ দেয় না"

শ্যামল পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে' তাকে দিয়ে দিলে, তারপর গম্ভীরভাবে এসে গাড়িতে উঠে বসল।

বললাম, "এই বলছিলি হাতে পয়সা নেই, আর ওই ভিকিরী মেয়েটাকে দশ টাকা দিয়ে দিলি ?"

"ও আমাকে কত দিয়েছে জানিস ? অন্তত হাজার টাকা—"

বস্তুত, তার পাঁচগুণ দিয়েছে সে। 'বিবস্ত্রা বাণী' ছবিটা পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। একটি প্রায়-উলঙ্গিনী মেয়ে ঝুঁকে একটা ডাস্টবিন ঘাঁটছে—এই হ'ল ছবির বিষয়। সেই মেয়েটার ছবি। অপূর্ব হয়েছে ছবিখানা। কাল রাত্রে ছবির পুরো দামটা পাওয়া মাত্রই কিন্তু ক্ষেপে গেছে শ্যামল।

আজ সকালে এসে আমাকে বলছে, "চল, সেই ভিকিরী মেয়েটাকে খুঁজে বার করি। এ টাকার অর্ধেক তাকে আমি দিয়ে দেব—"

আমি অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পাগলকে নিরস্ত করা শক্ত।

সকাল থেকে ঘুরছি।

"আচ্ছা, ছবিখানার নাম 'বিবস্ত্রা বাণী' দিলি কেন"—হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম তাকে।

"চমৎকার সংস্কৃত শ্লোক পড়েছিলাম একটা। শ্লোকটা মনে নেই, কিন্তু ভাবটা মনে আছে। এক রাজার সভায় বহু গুণী-মানী লোক সমবেত হয়েছিলেন একবার। কেউ রাজার স্তুতিগান করছিলেন, কেউ-বা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, কেউ নিবেদন করছিলেন নিজের দুঃখ, কেউ কবিতা শোনাচ্ছিলেন। রাজা মন দিয়ে শুনছিলেন সকলের কথা এবং পুরস্কৃত করছিলেন সকলকে। সভা শেষ হ'য়ে গেলে রাজা লক্ষ্য করলেন, সভার শেষ প্রান্তে সঙ্কুচিতভাবে যে ব্রাহ্মণটি বসেছিলেন তিনি কিছু না ব'লেই উঠে যাচ্ছেন। রাজা তাঁকে ডাকলেন। বললেন, 'আপনি কেন এসেছিলেন?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'রাজ-দর্শন করে' পুণ্যসঞ্চয় করতে।' রাজা প্রশ্ন করলেন, 'সবাই এত কবিতা, বক্তৃতা শোনাল, আপনি তো কিছুই বললেন না, আপনার কি বলবার কিছুই নেই?' ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল চুপ করে' থেকে উত্তর দিলেন—'মহারাজ, দারিদ্র্যের অনলে আমার অন্তরবাসিনী বাণীর বসন দগ্ধ হ'য়ে গেছে। তিনি বিবস্ত্রা, তাই রাজসভায় তিনি আত্মপ্রকাশ করতে পারেন নি।' রাজা তার দারিদ্র্য মোচন করেছিলেন—"

একটু চুপ করে' থেকে শ্যামল বলল, "সেদিন ফুটপাথে ডাস্টবিনের ধারে এই বিবস্ত্রা বাণীকেই মূর্তিমতী দেখেছিলাম আমি। খুঁজে বার করতেই হবে তাকে—"

সমস্ত দিন ঘুরেও কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় নি তাকে। শ্যামলের ট্যাক্সিভাড়া লেগেছিল প্রায় দু'শো টাকা। আর ভিখারীদের বিলিয়েছিল সে পাঁচশো টাকা।

● তৃতীয় শতক ●

যে ধনীর সন্তানটি ছবিখানি কিনেছিলেন তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম একদিন, ছবিখানি আর-একবার ভাল করে' দেখব ব'লে। শ্যামলের বন্ধু শুনে তিনি নিজেই বেরিয়ে এলেন এবং খুব খাতির করে' বসালেন আমাকে। দেখলাম ঘাড়ের চুল ক্ষুর দিয়ে চাঁচা, বাটারফ্লাই গোঁফ, চোখের কোলে কালি। বয়স বেশি নয়, চল্লিশের নিচেই মনে হ'ল। আমাকে নিয়ে গিয়ে বসালেন তাঁর ড্রয়িংরুমে। সেইখানে ছবিখানাও টাঙানো ছিল।

আমাকে বললেন, "সার্থক তুলি ধরেছেন আপনার বন্ধু। মেয়েটার যৌবন কি দারুণভাবে ফুটিয়েছেন দেখুন দিকি—"

লোলুপভাবে চেয়ে রইলেন তিনি ভিখারিনীটির অনাবৃত দেহ-মহিমার দিকে।

আমি চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

বুড়ীটা

"একৃঠো পয়সা দে নি বাবু—"

এই তাহার ভিক্ষা চাহিবার ভাষা। আমার কাছে রোজ আসে। হাতে একটা শুক্‌নো ডাল, তাহার সাহায্যেই পথ হাঁটে। ভিখারিনী বুড়ীকে কে আর লাঠি কিনিয়া দিবে? শুক্‌নো গাছের ডালটা কোথাও বোধ হয় কুড়াইয়া পাইয়াছিল। পরনের কাপড়খানি শতছিন্ন, বহুবার সেলাই-করা আর খুব পাতলা। একটু গোলাপী-রঙের আভা আছে। এককালে বোধ হয় কোনও বিলাসিনীর দেহ-শোভা বর্ধন করিয়াছিল। বুড়ীর গায়ে কিন্তু অত্যন্ত বেমানান। বেচারার শীত পর্যন্ত নিবারিত হয় না।

আমার কাছে প্রায় রোজই আসে বুড়ী। আর আসিয়া ওই একটি প্রার্থনাই জানায়—"একৃঠো পয়সা দে নি বাবু—"। তাহাকে রোজ একটি করিয়া পয়সা দিই। মনে মনে তাহার একটা নামও রাখিয়াছি—পি. পি.—পার্মানেণ্ট পাওনাদার।

যখন আমার ক্লিনিকে লোকের ভিড় থাকে, তখন তাহাকে আসিবামাত্র একটা পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিই। যখন কেহ থাকে না তখন মাঝে মাঝে তাহার সহিত আলাপ করি। একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে ভিক্ষাবৃত্তি কেন অবলম্বন করিয়াছে। বলিল, "ছেলে বউ আর খাইতে দেয় না, আশ্রয় দেয় না, তাড়াইয়া দিয়াছে। যতদিন গতর খাটাইয়া রোজগার করিয়াছিলাম, খাইতে থাকিতে দিত। এখন আর দেয় না। তাহার কম্পিত বাম হাতটি কপালে ঠেকাইয়া বলিয়াছিল—"সভই কপার ছে বাবু—।"

আর একদিন পয়সাটি দিবার পর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আর কি চাস বুড়ী—"

উত্তর দিয়াছিল, "মরণ!"

এ রকম দার্শনিক উত্তর আশা করি নাই। তাহার জরা-বিধ্বস্ত মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিলাম, দেখিলাম সত্যই একটা আর্ত আকুতি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আবার একদিন একা বসিয়া আছি। বুড়ী আসিয়া তাহার প্রাত্যহিক নিবেদনটি জানাইল। দেখিলাম, চোখ উঠিয়াছে। ভালো করিয়া চাহিতে পারিতেছে না। চোখের দুই কোণে পিঁচুটি। একটু ঔষধ দিয়া দিলাম।

"আঁখো মে কি ভেলে বুড়িয়া?"

"ঠান্‌ঢা লাগি গেল্‌ছে বাবু। একঠো কাপড়া দে নি। বড্‌ডি জাড়"

"য়ঁহা কাপড়া কাঁহা ছে, ঘরো পর যা, মিলতৈ"

বুড়ী বলিল, সে আমার ঘর চেনে না, আমি যেন দয়া করিয়া একখানা কাপড় তাহার জন্য লইয়া আসি। প্রতিশ্রুতি দিলাম—আসিব। ভাবিলাম, ভালই হইবে, আমি মোটা খদ্দর পরি, শীতে বুড়ী একটু আরাম পাইবে। পরদিন বুড়ী যথারীতি আসিল। আমি অপ্রতিভ হইলাম। খদ্দর আনিতে মনে ছিল না। পরদিনও ভুলিলাম, তাহার পরদিনও। নিজের বিস্মৃতির জন্য তৃতীয় দিন সত্যই অতিশয় লজ্জিত হইলাম। তখন আমার মোটর ড্রাইভারকে বলিলাম সে যেন আমাকে মনে করাইয়া দেয়। সেও উপর্যুপরি ভুলিতে লাগিল। তৃতীয় দিনের পর বুড়ীটা আর কিন্তু কাপড়ের কথা বলে নাই। কিন্তু সে আসিয়া দাঁড়াইলেই কাপড়ের কথাটা মনে পড়িত। অবশেষে ড্রাইভারের একদিন বিস্মৃতি অপনোদিত হইল। গৃহিণীও বেশ মোটা একটি খদ্দরের কাপড় তাহার জন্য বাহির করিয়া দিলেন। ড্রাইভার সেটি আমার ক্লিনিকের একটা তাকে পাট করিয়া রাখিয়া দিল. বুড়ী আসিলেই তাহাকে দিবে।

বুড়ী কিন্তু আর আসিল না। সে যে আর আসিতেছে না ইহাও প্রথম দুই তিন দিন লক্ষ্য করি নাই, কয়দিন রোগীর বেশ ভিড় ছিল। তাকের কোণে কাপড়টা দেখিয়া হঠাৎ একদিন মনে হইল, তাই তো, বুড়ীটা তো আর আসিতেছে না।

আরও দিন দশেক কাটিল, বুড়ী আসিল না। শেষে বুড়ীর কথা আর মনেও পড়িত না। ভিড়ের সময়ে মনে পড়িত না বটে, কিন্তু একা থাকিলে মাঝে মাঝে মনে হইত বুড়ীর কি হইল। কিন্তু উপর্যুপরি কয়েকদিন একা থাকিবার সুযোগ পাইলাম না। নিজের কাজকর্ম তো ছিলই, তাহার উপর শহরে একটা চাঞ্চল্যও জাগিয়াছিল। সংবাদ রটিয়া গিয়াছিল আমাদের প্রধান মন্ত্রী আসিতেছেন, মাঠে বক্তৃতা দিবেন। চতুর্দিকে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গিয়াছিল।

যেদিন পণ্ডিত নেহেরুর বক্তৃতা দিবার কথা, সেদিন আমাকে একটা দূরের গ্রামে কলে যাইতে হইয়াছিল। খুব ভোরে গিয়াছিলাম, যাহাতে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া পণ্ডিতজীর বক্তৃতাটি শুনিতে পারি। কিন্তু রোগী দেখিতে এবং তাহার পরিবারবর্গের সহিত আলাপ করিতে করিতে বেশ একটু দেরি হইয়া গেল।

আশঙ্কা হইতে লাগিল পণ্ডিতজীর বক্তৃতাটি বোধ হয় আর শোনা হইল না। রোগীর বাড়ির লোকেরা বলিল, মাঠামাঠি একটা শর্টকাট রাস্তা আছে, সেটা দিয়ে গেলে ঠিক সময়ে নাকি পৌছিতে পারিব। সে রাস্তাতে মোটরও চলিবে। সুতরাং সেই মাঠামাঠি রাস্তাই ধরিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতজীর বক্তৃতাটা শোনা হইল না। একটা গ্রামের কাছে ড্রাইভার সজোরে ব্রেক্ কষিয়া গাড়িটা থামাইয়া দিল। পথের উপরই একটা মড়া, তাহাকে ঘিরিয়া শকুনি আর কাক। তাহার চোখ-মুখ ছিঁড়িয়া খাইয়াছে, চেনা যায় না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। গাছের শুক্‌নো ডালটা পাশে পড়িয়া আছে। তখনই মনে হইল—এ তো সেই বুড়ীটা! গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম। ড্রাইভার শকুনি তাড়াইতে লাগিল, আমি হাঁটিয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। খোঁজ করিতে করিতে অবশেষে আমারই চেনা একজন লোক বাহির হইয়া পড়িল। তাহার মুখে শুনিলাম, শীতেই কাল রাত্রে বুড়ী মারা গিয়াছে। তাহার গায়ে একেবারে কাপড় ছিল না।

"বুড়ী কি এইখানেই থাকত?"

"না, আগে তো দেখিনি কখনও"

আর একজন লোক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "বুড়ী দুই দিন আগে এই গ্রামে আসিয়াছিল। কে যেন তাহাকে বলিয়াছিল তাহার ছেলে এই গ্রামে আছে। কিন্তু খবরটি ভুল। লাট্টুলাল বলিয়া কেহ এ গ্রামে নাই।" বলিলাম, "একটা মানুষকে শকুনে ছিঁড়ে খাচ্ছে, তোমরা একটা ব্যবস্থা করতে পার নি?"

লোক দুইটি অপ্রতিভ হইল।

তাহার পর বলিল, "দাহ করতে অন্তত দশটা টাকা খরচ হবে। কে দেবে ডাক্তারবাবু টাকা। যা দুরবস্থা আমাদের আজকাল। অনেকের দুবেলা অন্নই জোটে না। কার কাছে চাঁদা চাইব বলুন—"

"বেশ, তোমরা ব্যবস্থা কর, আমিই টাকা দেব"

কুড়িটা টাকা দিলাম। লোকটা বলিল, "এতে তো একদল কীর্তনীয়াও হয়ে যাবে। শালুও হবে।" তাহাই হইল। কীর্তন করিতে করিতে গ্রামের লোকেরা বুড়ীকে শালু ঢাকা দিয়া মহাসমারোহে গঙ্গার ধারে লইয়া গেল।

ফিরিয়া শুনিলাম বক্তৃতায় নেহেরুজী বলিয়াছেন, দরিদ্র জন-সাধারণের উন্নতির জন্য তাঁহার গভর্ণমেণ্ট প্রাণপণ করিতেছেন। বক্তৃতা দিয়া বিমানযোগে পাটনা

চলিয়া গিয়াছেন, সেখানে আর একটি বক্তৃতা দিবেন। তাহার পরদিন কাগজে তাঁহার বক্তৃতাটাই পড়িতেছিলাম।

"এক্ঠো পয়সা দে নি বাবু—"চমকাইয়া দেখিলাম দ্বারপ্রান্তে সেই বুড়ীটা দাঁড়াইয়া আছে। হাতে সেই শুক্‌নো ডালটা।

"কি বুঢ়িয়া আভিতক্ জিন্দী হ্যায় ?"

"মরণ কাঁহা আবৈছে বাবু"

"তোরা কাপ্‌ড়া রাখ্‌লো ছে। লে যা। কাঁহা ছেলে এত্‌না দিন—"

"পয়ের মে কাঁটি গড়ি গেল্‌ছেলো। থোড়া দাবাই দে নি—"

পায়ে পেরেক ফুটিয়াছিল তাই আসিতে পারে নাই। একটু টিঞ্চার আইয়োডিন্ লাগাইয়া দিলাম। তাহার প্রাত্যহিক পাওনা পয়সাটিও দিলাম। বুড়ী ছেঁড়া খদ্দরটা গায়ে দিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল। অনুভব করিলাম সেদিন আমার ভুল হইয়াছিল। শুক্‌নো-ডাল-হাতে বুড়ী আমাদের দেশে অনেক আছে।

তিমির-সেতু

গোপাল সেন সেকেলে সাব-অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন ছিলেন। বলিষ্ঠগঠন, স্বল্পভাষী, দুঃসাহসীব ্যক্তিটিকে অনেকে ভয় করত, অনেকে শ্রদ্ধাও করত। তখন ইংরেজদের আমল, জেলার সিভিল সার্জন প্রায় সাহেবরাই হতেন। গোপাল সেন সাহেব সিভিল সার্জনদের স্নেহভাজন ছিলেন। এর কারণ ভাল খেলোয়াড় এবং ভাল শিকারীও ছিলেন তিনি। ফুটবল হকি দুটোই চমৎকার খেলতেন। আর শিকারে এমন হাত পাকিয়েছিলেন যে, বড় বড় শিকারীরাও খাতির করতেন তাঁকে। বাঘ, ভালুক, হরিণ, হাতী এমন কি বাইসনও মেরেছেন তিনি, এবং অধিকাংশই পায়ে হেঁটে। তাই সাহেবরা তাঁকে খাতির করতেন খুব। আর একটা কারণও ছিল। যে-সব ডিস্‌পেন্‌সারিতে গেলে বেশী পসার হবার সম্ভাবনা, সে-সব ডিস্‌পেন্‌সারিতে যাওয়ার জন্য সব ডাক্তারই উৎসুক হতেন, এজন্য পৈরবী করতেও কসুর করতেন না; কিন্তু ডাক্তার গোপাল সেন এর ব্যতিক্রম ছিলেন। উপরওয়ালাদের কখনও খোসামোদ করতেন না তিনি, বরং তাঁদের বলতেন যেখানে কেউ যেতে চায় না, সেখানেই আমাকে পাঠিয়ে দিন। তাই বাজে ডিস্‌পেন্‌সারিতে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে তাঁকে। শিকার করেই অধিকাংশ সময় কাটাতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কাজও করতেন। যে-সব জন্তু-জানোয়ার শিকার করতেন তিনি, তা বাঘ হরিণ শেয়াল খরগোশ যা-ই হোক, তাদের চোখের উপর অপারেশন করতেন। তাদের চোখের লেন্স নিখুঁতভাবে বার করবার চেষ্টা করতেন। এই করে' করে' তাঁর ছানি কাটবার অদ্ভুত দক্ষতা হয়েছিল একটা। যে ডিস্‌পেন্‌সারিতেই থাকতেন, সেখানে গরীব লোকদের ছানি কেটে চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতেন। শিকার করে' আর ছানি কেটেই বেশির ভাগ সময় কাটত তাঁর। এইভাবেই চলছিল, এমন সময় মফঃস্বলের এক ডিস্‌পেন্‌সারিতে বদলি হয়ে এলেন তিনি। গুণী লোক, দেখতে দেখতে প্র্যাক্‌টিস জমে' উঠল তাঁর। বিশেষ করে' ছানি-কাটায় এবং অন্যান্য সার্জিক্যাল অপারেশনে খুব খ্যাতি হ'ল। দলে দলে রোগী জুটতে লাগল হাসপাতালে। হাসপাতালে ষোলটি বিছানা ছিল, সবগুলিই প্রায় ছানির রোগীতে ভরতি হ'য়ে গেল। এমন সময় সিভিল সার্জন এলেন হঠাৎ একদিন। সাহেব নন, পাঞ্জাবী।

নাম ক্যাপ্টেন সরদার সিং। মিলিটারিতে ছিলেন, কিছুদিন পূর্বে সিভিল-সার্জন হ'য়ে এসেছেন। সার্জারির 'স' জানেন না, কিন্তু অপারেশন করবার শখ খুব। হাসপাতালের বে-ওয়ারিশ গরিব রোগীদের উপর ছুরি চালিয়ে হাত পাকাবার ইচ্ছা। গোপাল সেনের হাসপাতালে এসে ক্যাপ্টেন সিং যুগপৎ বিস্মিত এবং ঈর্ষান্বিত হলেন। করেছে কি লোকটা। সামান্য একজন সাব-অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জন হ'য়ে এতগুলো ছানি কেটেছে। একটা হার্নিয়া-কেসও রয়েছে দেখলেন।

তিনি উপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে' রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "আপনি খুবই অন্যায় কাজ করছেন ডক্‌টর সেন। এসব মেজর অপারেশন মফঃস্বল হাসপাতালে করা ঠিক নয়, সব রকম ব্যবস্থা এখানে নেই, কেস খারাপ হ'য়ে যেতে পারে—"

"এখনও পর্যন্ত ত হয় নি। আপনি আমার রেকর্ড দেখুন—"

চটে' গেলেন পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন।

"আই অর্ডার-য়ু নট টু ডু ইট। মেজর অপারেশন করবেন না আর।"

নির্বিকার গোপাল সেন বললেন, "আপনার অর্ডারটা লিখে দিন তাহলে"।

ক্যাপ্টেন সাহেব অর্ডার লিখে দিলেন, তারপর বললেন, "মেজর অপারেশনের কেশ যত আসবে, সদরে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

এ-কথাটাও লিখে দিলেন তিনি।

গোপাল সেন তখনও বিয়ে করেননি। তিনি নিজের কোয়ার্টারটিকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করে' ফেললেন। দশটি রোগী রাখবার জায়গা হ'য়ে গেল সেখানে। যারা তাঁর কাছে ছাড়া অন্য জায়গায় অপারেশন করাতে রাজী হ'ল না, তাদের তিনি নিজের কোয়ার্টারে রেখে অপারেশন করতে লাগলেন। আর বাকী রোগীদের তিনি পাঠাতে লাগলেন ক্যাপ্টেন সিংয়ের কাছে। এমন সময় এক দুর্ঘটনা ঘটে' গেল। হাসপাতালের সেক্রেটারির ছেলে ঘোড়ায় চড়ে' আসছিল, হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে' গিয়ে তার হাঁটুতে খুব চোট লাগল। হাড় ভেঙে বেরিয়ে গেল, জোড়ও খুলে গেল হাঁটুর। ডাক্তার সেন বললেন, "আমি ফার্স্ট এড্ দিয়ে দিচ্ছি, ওকে সদরে নিয়ে যান—"

সেক্রেটারী বললেন, "সদরে কেন! আপনিই যা করবার করুন"

"সিভিল সার্জনের হুকুম অনুসারে আমি করতে পারি না। এই দেখুন তাঁর অর্ডার"

অর্ডারটা দেখালেন।

তারপর বললেন, "আমার কোয়ার্টারের সব বেড ভরতি। তাছাড়া, সদরে যাওয়াই ভাল। এখানে ওসব কেসে হাত দেওয়া রিস্‌কি"

সদরে গিয়ে মারা গেল ছেলেটি। সেক্রেটারি মর্মান্তিক চটে' গেলেন ক্যাপ্টেন সিংয়ের উপর। পয়সা-ওলা লোক ছিলেন তিনি, দিলেন এক মকদ্দমা ঠুকে। গোপাল সেন গুটি কয়েক ছানির রোগীও পাঠিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন সিংয়ের কাছে। পাঁচজন অন্ধ হ'য়ে ফিরে এল। ষষ্ঠটি ফিরলই না। মেনিন্‌জাইটিস্‌ হ'য়ে মরে গেল সে। সেক্রেটারি এদের দিয়েও মকদ্দমা রুজু করিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন সিংয়ের নামে। তাছাড়া, ওপর-ওলার কাছে বহু লোকের সই-সমন্বিত এক প্রকাণ্ড দরখাস্তও গেল। তার সংক্ষিপ্ত মর্ম—সিং সবাইকে গুঁতিয়ে বেড়াচ্ছে, ওকে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়া হোক। তদন্ত করবার জন্যে আই. জি. এলেন। খাঁটি সাহেব তিনি। প্রথমেই ডাক্তার গোপাল সেনের কাছে গেলেন। সব শুনলেন, সিভিল সার্জনের অর্ডারটাও দেখলেন। সিভিল সার্জন ক্যাপ্টেন সিংও তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। আই. জি. গোপাল সেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি তাহলে ছানি-কাটা ছেড়ে দিয়েছ?"

"না। আমার প্রাইভেট কেসগুলো আমি আমার বাড়িতেই করি। সেখানেই দশটা বেড্‌ করেছি আমি"

"কই, চল ত দেখি"

আই. জি. গোপাল সেনের কেসগুলো দেখলেন।

তারপর ক্যাপ্টেন সিংয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "আমার যদি কখনও ছানি হয়, আমি কাকে দিয়ে অপারেশন করাব জান? তোমাকে দিয়ে নয়, ডাক্তার সেনকে দিয়ে। কেমন চমৎকার অপারেশন করেছে দেখ দিকি—"

ডাক্তার সেনের মধ্যস্থতায় মকদ্দমাগুলো মিটে গেল।

আই. জি. অর্ডার দিয়ে গেলেন যে ডাক্তার সেন যে-কোন অপারেশন হাসপাতালে করতে পারবেন। ক্যাপ্টেন সরদার সিং বদলি হ'য়ে গেলেন।

বছর পাঁচেক পরে দুটি পুরু-কাচের চশমা-পরা লোক এসে হাজির হ'ল ডাক্তার গোপাল সেনের কাছে। ছাপরা জেলা থেকে এসেছে, ক্যাপ্টেন সিংয়ের চিঠি নিয়ে।

ক্যাপ্টেন সিং লিখেছেন, "তোমাদের চক্রান্তে আমি বদলি হয়ে এসেছি বটে, কিন্তু ছানি-কাটা বন্ধ করিনি। অনেক ছানি কেটেছি তারপর, অন্তত হাজারখানেক হবে,

তার মধ্যে শতকরা নব্বইজন দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। এই দুজনকে পাঠালুম তোমার কাছে, দেখলেই বুঝতে পারবে, কী ধরনের কাজ করছি। আশা করি, ভাল আছ। ইতি—"

গোপাল সেন পরীক্ষা করে' দেখলেন দুটি রোগীকে। অপারেশন সত্যিই ভাল করেছে। কিন্তু রোগী দুটিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে মনোভাব নিহিত আছে, তা অস্পষ্ট রইল না তাঁর কাছে। মনে মনে তিনি শুধু বললেন, ব্যাটা চাষা!

ক্যাপ্টেন সিং কিন্তু সুযোগ পেলেই তাঁর অপারেশন-করা ছানি-রোগী পাঠিয়ে দিতেন ডাক্তার গোপাল সেনের কাছে।

গোপাল সেনের মনে হ'ত তাঁকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই লোকটা এভাবে রোগীর পর রোগী পাঠিয়ে যাচ্ছে। কিছু করবার উপায় ছিল না। একটা নীরব ক্রোধ ঘনীভূত হচ্ছিল কেবল তাঁর মনে।

এইভাবে আরও দশ পনর বছর কেটে গেল। ক্যাপ্টেন সিংয়ের রোগী আসাও বন্ধ হ'য়ে গেল ক্রমশ। ডাক্তার সেন চাকরি থেকে অবসর নিলেন। ক্রমে তাঁর চোখেও ছানি পড়তে লাগল। তাঁর বন্ধুরা বললেন, "চলুন আপনাকে কলিকাতা নিয়ে যাই"

ডাক্তার সেন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "না, কলকাতা যাব না। সেখানে ভদ্দরলোক নেই। আমার বাল্যবন্ধুকে চিঠি লিখেছিলাম, সে-ও ডাক্তার, চিঠির জবাব পর্যন্ত দেয়নি। টাকার গরমে সেখানে ভদ্রতা-বোধ পর্যন্ত লোপ পায়। যাব না সেখানে। আর ক'টা দিনই বা বাঁচব, না-ই বা দেখতে পেলাম। আমার ওই মধু চাকরটা যদি টিকে থাকে, চোখের দৃষ্টি না থাকলেও চলবে—"

তারপর একটু চুপ করে' থেকে বললেন, "একটি লোকের নাগাল পেলে তাকে দিয়ে কাটাতাম, কিন্তু সে যে এখন কোথায় আছে তা তো জানি না। বছর দুই আগে রিটায়ার করেছে—"

"কে—"

"ক্যাপ্টেন সিং"

আরও বছরখানেক কেটেছে।

একদিন সকালে মধু এসে ডাক্তার সেনকে বলল, "একটি রোগী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে"

"বল, দেখা হবে না"

"বলেছি, কিন্তু সে ছাড়ছে না। আপনি একবার দেখা করুন"

মধুর হাত ধরে' বেরিয়ে এলেন গোপাল সেন।

"গুড্ মর্নিং ডক্টর সেন—"

—"গুড্ মর্নিং, কে আপনি ?"

"চিনতে পারছেন না ? আমি ক্যাপ্টেন সিং। আমার চোখে ছানি হয়েছে—আমি আপনাকে দিয়ে কাটাতে চাই। প্লীজ ডু ইট"

"আমার চোখেও যে ছানি—। আমিও আপনাকে দিয়ে কাটাব ভাবছিলাম"

"ও—!"

ক্যাপ্টেন সিং **অন্ধ দৃষ্টি** মেলে ডাক্তার সেনের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁদের মনে হ'ল এক অদৃশ্য তিমির-সেতু পার হ'য়ে দুজনে দুজনের কাছে এসে পড়লেন যেন।

দুধের দাম

ট্রেন আসিয়াছিল। কয়েকটি সুবেশা, সুতন্বী, সুরূপা যুবতী স্টেশনে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই আশে পাশে জনকয়েক বাঙালী ছোকরাও, কেহ অন্যমনস্কভাবে, কেহ বা জ্ঞাতসারে, ঘোরাফেরা করিতেছিল। ভিড়ের মধ্যে এক বৃদ্ধা যে একজনের হোল্ড-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া পড়িয়া গেলেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। করিবার কথাও নয়, বিদেশাগত শিভ্যাল্‌রি জিনিসটা যুবতীদের কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হয়। সকলে অবশ্য যুবতীদিগকে লইয়া প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ব্যস্ত ছিল না। যাঁহার হোল্‌ড-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া বুড়ী পড়িয়া গেলেন, তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোক, কাছেই ছিলেন। তিনি বুড়ীকে স-ধমক উপদেশ দিলেন একটা।

"পথ দেখে চলতে পার না? আর-একটু হলে আমার স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে যেত যে!"

বুড়ীর ডান পা-টা বেশ মচকাইয়া গিয়াছিল। তবু তিনি খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া প্ল্যাটফর্মময় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে একটা স্থান সংগ্রহ করিতেই হইবে। অসম্ভব। ট্রেন বেশীক্ষণ থামিবেও না। হুড়মুড় করিয়া শেষে তিনি একটা সেকেলে ইণ্টার ক্লাসে উঠিয়া পড়িলেন। যথারীতি সকলেই হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। বর্তমানে অবশ্য ইণ্টার ক্লাসের নাম বদলাইয়া সেকেণ্ড ক্লাস হইয়াছে।

একজন বাঙালী ভদ্রলোক ইচ্ছা করিলে একটু সরিয়া বসিয়া জায়গা করিয়া দিতে পারিতেন, তিনি জিনিসপত্র সমেত বেশ একটু ছড়াইয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি সরিয়া বসিলেন না, উপদেশ দিলেন।

"উঠলে ত, এখন বসবে কোথায় বাছা?"

"আমি নিচে তোমাদের পায়ের কাছে বসব বাবা। দুটো স্টেশন মাত্র, তারপরই নেবে যাব। বেশীক্ষণ অসুবিধা করব না তোমাদের।"

বুড়ী তাঁহার পায়ের কাছেই তাঁহার জুতা জোড়া সরাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অসুবিধা তেমন কিছু হইল না, কারণ বৃদ্ধা ছোটখাটো আয়তনের মানুষ, গুটিসুটি হইয়া বসিয়া ছিলেন। একটু পরেই কিন্তু তিনি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। যে পায়ে স্ট্র্যাপটা আটকাইয়া গিয়াছিল সেই পা-টা বেশ ব্যথা করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলেন, পা ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভাবনা হইল নামিবেন কী করিয়া।

আর দুই স্টেশন পরেই শুধু নামিতে হইবে না, আর-একটা ট্রেনে উঠিতেও হইবে। অথচ পা নাড়িতে পারিতেছেন না, দাঁড়ানই যাইবে না যে। ট্রেনের কামরায় অনেক বাঙালী রহিয়াছেন, অনেকে তাঁহার পুত্রের বয়সী, অনেকে পৌত্রের। কিন্তু ইঁহারা যে তাঁহার সাহায্য করিবেন, পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে তাহা তিনি আশা করিতে পারিলেন না। তবু হয়ত ইঁহাদেরই সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে। উপায় কি!

বৃদ্ধা যে-স্টেশনে নামিবেন, সে-স্টেশন একটু পরেই আসিয়া পড়িল। প্যাসেঞ্জাররা হুড়-মুড় করিয়া সবাই নামিতে লাগিলেন, বুড়ীর দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিলেন না।

"আমাকে একটু নাবিয়ে দাও না বাবা, উঠে দাঁড়াতে পাচ্ছি না আমি"

বুড়ীর এই করুণ অনুরোধ সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কিন্তু অধিকাংশই ভান করিলেন যেন কিছু শুনিতে পান নাই।

একজন বলিলেন, "ভিকিরী মাগীর আস্পর্ধা দেখেছেন? যাচ্ছে ত উইদাউট টিকিটে, তার উপর আবার—"

তিনি বৃদ্ধাকে ভিখারিনীই মনে করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা কিন্তু ভিখারিনী নন, তাঁহার টিকিটও ছিল। সেকেণ্ড ক্লাসেরই টিকিট ছিল!

আর একজন বিজ্ঞ মন্তব্য করিলেন, "এই সব হেল্পলেস বুড়ীকে রাস্তায় একা ছেড়ে দিয়েছে, এর স্বামী ছেলে নেই না কি, আশ্চর্য কাণ্ড!"

সিগারেটে টান দিতে দিতে তিনিও নামিয়া গেলেন। গাড়িতে যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জন-দুই টিফিন-কেরিয়ার খুলিয়া আহারে মন দিয়াছিলেন, বুড়ীর কথা তাঁহাদেরও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত করা তাঁহারা সমীচীন মনে করিলেন না।

বৃদ্ধা তখন দুই হাতে ভর দিয়া ঘঁ্যাসটাইয়া দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু নামিতে সাহস পাইতেছিলেন না।

"এই বুড়ী, হটো দরোয়াজাসে—"

এক মারোয়াড়ী যাত্রী বৃদ্ধার গায়ে প্রায় পদাঘাত করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিছনে এক বলিষ্ঠকায় কুলী। তাহার মাথায় স্যুটকেশ হোল্ড-অল। কুলীর পিছনে চপ্পল-পায়ে নীল-চশমা-পরা লম্বা গোছের এক ছোকরা। সে ভঙ্গীভরে বলিল, "দয়াময়ি, পথ ছাড়ুন। দরজার কাছে বসে কেন!"

"পায়ে লেগেছে বড্ড বাবা, নামতে পাচ্ছি না"

"ও দেখি, যদি একটা স্ট্রেচার আনতে পারি"

ছোকরা ভিড়ে অন্তর্ধান করিল, আর ফিরিল না।

যে-বলিষ্ঠ কুলীটা মাল মাথায় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল সে বাহিরে যাইবার জন্য দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"মাইজি, কিরপা করকে থোড়া হাটকে বৈঠিয়ে। আনে-যানেকা রাস্তা পর কাহে বৈঠ্ গ্যয়ে?"

বৃদ্ধা হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

"আমি নামতে পাচ্ছি না, বাবা, পায়ে চোট্ লেগেছে—"

"আপ কাঁহা যাইয়ে গা—?"

"গয়া—"

"চলিয়ে, হাম আপকো লে যাতে হেঁ"

বলিষ্ঠ বয়স্ক ব্যক্তি যেমন করিয়া ছোট শিশুকে দুই হাতে করিয়া বুকের উপর তুলিয়া লয়, কুলীটি সেইভাবে বৃদ্ধাকে বুকে তুলিয়া লইল। সোজা লইয়া গেল ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে।

"আপ হিঁয়া পর বৈঠিয়ে মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জারকা থোড়া দেরি হ্যায়। হাম ঠিক টাইম পর আকে আপকো ট্রেনমে চঢ়া দেঙ্গে"

বৃদ্ধা ওয়েটিং রুমের মেঝেতেই উপবেশন করিলেন।

যে দুইটি ইজিচেয়ার ছিল, সে-দুইটিতেই সাহেবী পোশাক-পরা দুইজন বঙ্গসন্তান হাতলের উপর পা তুলিয়া দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া ছিলেন। একজন পড়িতেছিলেন খবরের কাগজ, আর-একজন একখানি ইংরেজী বই। বইটির মলাটের উপর অর্ধনগ্না হাস্যমুখী যে-নারীমূর্তিটি ছিল, বৃদ্ধার মনে হইল, সেটি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিতেছে।

সম্ভবতঃ আলোচনাটা আগেই হইতেছিল। পুনরায় আরম্ভ হইল।

"শিভ্যলরি আমাদের দেশেও ছিল। নার্য্যস্তু যত্র পুজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা, একথা আমাদের মনুতেই লেখা আছে মশাই"

যিনি নারী-মূর্তি-সম্বলিত ইংরেজী মাসিক পড়িতেছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ এ খবর জানিতেন না। উঠিয়া বসিলেন।

"বলেন কি! এ-কথা জানলে ব্যাটাকে ছাড়তুম না কি! মনুর যুগেও যে

আমাদের দেশে শিভ্যাল্‌রি ছিল, আমরা যে বর্বর ছিলুম না, এ-কথা ভাল করে'ই বুঝিয়ে দিতুম বাছাধনকে—"

বৃদ্ধা অনুভব করিলেন ইতিপূর্বে কোন সাহেবের সঙ্গে বোধহয় লোকটির তর্ক হইয়াছিল। শ্বেতবর্ণ সাহেব সম্ভবতঃ এই সাহেবী পোশাক-পরা কৃষ্ণচর্ম বঙ্গ-সুন্দরকে বর্বর বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধা মনে মনে বলিলেন, "তোমরা বর্বরই বাছা! তোমাদের শিভ্যলরি অবশ্য আছে, কিন্তু তার প্রকাশ কেবল যুবতী মেয়েদের বেলা"

বৃদ্ধার বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে কিঞ্চিৎ দখল ছিল। সেকালের বেথুন স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

হঠাৎ দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন।

"আরে, এ আবার কোত্থেকে জুটল এসে এখানে?"

"কোন ভিকিরী-টিকিরী বোধ হয়"

প্রথম ভদ্রলোক আন্দাজ করিলেন।

"সত্যি, ভিখিরীতে ভরে গেল দেশটা। স্বাধীনতার পর ভিখিরীর সংখ্যা আরও বেড়েছে। সবাই আবার মুখ ফুটে চাইতেও পারে না"

দেখা গেল ভদ্রলোকটি একটি পয়সা বাহির করিয়া বুড়ীর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন।

নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন বৃদ্ধা।

"পয়সাটা তুলে নাও, তোমাকেই দিলাম"

বৃদ্ধা তবু কোন কথা বলিলেন না।

দাতা ভদ্রলোকের সন্দেহ হইল বোধহয় বুড়ী বাঙালী নয়। তখন রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করিলেন। চাকুরির অনুরোধে কিছুদিন পূর্বেই রাষ্ট্রভাষায় পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন।

"পয়সা উঠা লেও। তুম্‌হী কো দিয়া"

তখন বৃদ্ধা পরিষ্কার বাংলায় বলিলেন, "আমি ভিখিরী নই বাবা, আমি আপনাদেরই মত একজন প্যাসেঞ্জার"

"এখানে কেন। এটা যে আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম"

"আমার সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট আছে"

পরমুহূর্তেই সেই বলিষ্ঠ কুলীটি দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

"চলিয়ে মাইজি, গয়া-প্যাসেঞ্জার আ গিয়া"

তাহার বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা পুনরায় বৃদ্ধাকে শিশুর মত বুকে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

গয়া প্যাসেঞ্জারে একটু ভিড় ছিল। কিন্তু কুলীটি বলিষ্ঠ। শক্তির জয় সর্বত্র। সে ধমক-ধামক দিয়া বুড়ীকে একটা বেঞ্চের কোণে স্থান করিয়া দিতে সমর্থ হইল।

বৃদ্ধা তাহাকে দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

এই প্রসঙ্গে কুলীর সহিত হিন্দীতে যে কথাবার্তা হইল তাহার সারমর্ম এই:

"আমার মজুরি আট আনা। দু টাকা দিচ্ছেন কেন?"

"তুমি আমার জন্যে এত করলে বাবা, তাই বেশী দিলুম"

"না মাইজি, আমাকে মাপ করবেন। আমি ধর্ম বিক্রি করি না"

"তুমি আমার ছেলে বাবা, ছেলের কাজই করেছ। আমি ত তোমাকে দুধ খাওয়াইনি, সামান্য যা দিচ্ছি তা দুধের দাম মনে করেই নাও বাবা। দীর্ঘজীবী হও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন"

বৃদ্ধার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। চোখের কোণে জল টলমল করিতে লাগিল।

কুলী ক্ষণকাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর প্রণাম করিয়া নামিয়া গেল।

বল্ মা তারা

সেকেলে লম্বা থার্ড ক্লাস কামরা, প্রচুর জায়গা। ভিড় একেবারে নেই। কামরার একধারে বসিয়া আছেন প্রকাশবাবু, প্রকাশবাবুর স্ত্রী সুলোচনা এবং তাঁহাদের কন্যা উমা। উমার বয়স ষোল কি ছাব্বিশ তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বা চেহারা দেখিয়া নির্ণয় করা সম্ভব নয়। রোগা ছিপছিপে চেহারা। চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। গালের হাড় দুটি একটু বেশী উঁচু। তবু মোটের উপর দেখিতে মন্দ নয়। দেখিতে আরও হয়তো ভালো হইত যদি মুখে আর একটু সজীবতার ছাপ থাকিত। মুখের ভাবটি বড়ই ম্রিয়মাণ। প্রকাশবাবু বেঁটে বলিষ্ঠগঠন ব্যক্তি। কালো রং। গোঁফ দাড়ি কামানো। মুখটি চতুষ্কোণ। চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং রক্তাভ। মুখভাব উপর্যুপরি সাত-গোল-খাওয়া-ফুটবল-টিমের ক্যাপ্টেনের মতো মরীয়া। সাতটি কন্যার পিতা তিনি। উমা তৃতীয়া কন্যা। তাহাকেই দেখাইতে লইয়া যাইতেছেন। টকটকে লালপেড়ে শাড়ি-পরা সুলোচনা, মাথায় আধ ঘোমটা টানিয়া সসঙ্কোচে বসিয়া আছেন একধারে। সাতটি কন্যা প্রসব করিয়া চোরের দায়ে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন যেন। মুখের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখের নিচে ফোলাফোলা ভাব, এবং কোণে জরার চিহ্ন। মাথার সামনের দিকটা টাক। টাকেরই উপর খানিকটা সিঁদুর থ্যাবড়ানো। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয় তিনি স্থবিরা। প্রকাশবাবুর স্ত্রী বলিয়া মনেই হয় না, মনে হয় তাঁহার দিদি বুঝি। তাঁহার মুখের আত্মসমাহিত ভাবটি কিন্তু মুগ্ধ করে। তিনি যেন অদৃষ্টের উপরই হোক বা ভগবানের উপরই হোক সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন। যাহা হইবে তাহাই মানিয়া লইবেন।

কামরার অপর প্রান্তে কোণের দিক ঘেঁষিয়া আর একটি মেয়ে বসিয়াছিল। ইহারও বয়স কত তাহা বলা শক্ত, তবে বুড়ী নয়। ত্রিশের কাছাকাছিই হইবে। এ মেয়েটিও রোগা, কালো। কিন্তু চোখেমুখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি আছে। পোশাক-পরিচ্ছদেও বেশ একটু ছিমছাম ভাব। বাঁ হাতের কব্জিতে রিস্ট-ওয়াচ। অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, কানে ফুল, হাতে একগাছা করিয়া চুড়ি। পাশে যে ভ্যানিটি ব্যাগটি রহিয়াছে তাহাও সুরুচির পরিচয় বহন করিতেছে।

● তৃতীয় শতক ●

মেয়েটি নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া বই পড়িতেছে একটি। আর মাঝে মাঝে আড়চোখে প্রকাশবাবুদের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। সাধারণ মেয়ে হইলে হয়তো আলাপ করিত। কিন্তু অপরিচিতের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করা আধুনিক কায়দা নয়, আর মঞ্জুশ্রী তেমন মিশুক প্রকৃতির মেয়েও নয়। অপরের সম্বন্ধে জানিবার কৌতূহল অবশ্য আছে, কিন্তু অযাচিতভাবে আলাপ করিয়া তাহা সে চরিতার্থ করিতে চায় না। আড়চোখে চাহিয়া এবং কথাবার্তা শুনিয়া যতটা জানা যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে সে। তাহার উপরই কল্পনার রং চড়ায় একটু-আধটু।

দুই

প্রকাশবাবু সহসা বেঞ্চির উপর চাপ-টালি খাইয়া বসিলেন এবং বাম জানুটি নাচাইতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা বলিলেন, "যাই বল, লোকটা ছোটলোক। অত করে যেতে লিখলুম, কানই দিলে না সে কথায়"

সুলোচনা বলিলেন, "ছুটি নেই, কি করবে বল"

"রোববারেও ছুটি নেই ? কাকে বোঝাচ্ছ তুমি !"

"ছেলের ঠাকুমাও না কি দেখতে চায়। বুড়োমানুষ কি অতদূর যেতে পারে ?"

"বুড়ো মানুষ কেদারবদরি যেতে পারে, আর এই পাঁচ ছ ঘণ্টার রাস্তা যেতে পারে না ? কাকে বোঝাচ্ছ তুমি !"

সুলোচনার আত্মসমাহিত মুখে একটু হাসির ঝলক ফুটিয়া উঠিল।

"গরজ তো তোমাদেরই। তুমি মেয়ের বাপ একথা ভুলে যাচ্ছ কেন ?"

"তোমার বাবাও মেয়ের বাপ ছিল। কিন্তু তাঁকে আমরা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে টেনে আনি নি। তোমার বাপের বাড়ি ধাপধাড়া গোবিন্দপুর খুরশিদ্‌গঞ্জেই গিয়েছিলাম আমরা। জাত হিসাবে সত্যিই অত্যন্ত নেবে গেছি আমরা। হু হু করে' নেবে যাচ্ছি, ছি, ছি, ছি, ছি—"

পুনরায় জানু নাচাইতে লাগিলেন।

হঠাৎ উমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি রঙের শাড়ি এনেছিস ?"

"মা বললে লাইট্ গোলাপীটা আনতে। সেইটেই এনেছি"

"তাহলেই হয়েছে! সেদিন যে সবুজ শাড়িটা কেনা হ'ল সেইটে আনলে না কেন—"

"ডীপ ডগমগে রঙের শাড়ি কি তোমার কালো মেয়েকে মানায়? আমার ও শাড়িটা কেনবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু সবুজ রং দেখলে তো তোমার আর জ্ঞান থাকে না। বাড়ির দরজা জানলা সব সবুজ রং করিয়েছ, পর্দা বেড্-কভার সব সবুজ, ফুলদানী সবুজ, কুশনের ছিটগুলো সবুজ। হাঁড়িকুড়ি তাওয়া খুন্তিগুলো সবুজ রঙের পাওয়া যায় না তাই ওগুলো—"

সুলোচনার আত্মসমাহিত মুখভাব হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। স্বামীর দোষ-কীর্তনের সুযোগ পাইলে কোন সতী স্ত্রী হর্ষোৎফুল্ল না হন!

প্রকাশবাবু জানলা দিয়া বহির্দৃশ্য দেখিতেছিলেন। কোন মন্তব্য করিলেন না। পুর্বে মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত "উঃ, কি কুক্ষণে যে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম,"—এখন আর হয় না। কোন খঞ্জ যদি আচমকা কোন গর্তে পড়িয়া যায় তখন গর্তটা হইতে কোনরকমে উঠিবার জন্য যেমন তাহার প্রাণ আকুল-বিকুলি করিতে থাকে, প্রকাশচন্দ্রেরও তাহাই করিতেছিল। গর্তে কেন পড়িলাম, পড়া উচিত ছিল কি না, এসব প্রশ্ন তাঁহার নিকট এখন অবান্তর।

একটু পরে তিনি প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন।

"কে জানে ওয়েটিং রুমটা খালি পাওয়া যাবে কি না। ভিড় হলেই তো মুশকিল। অবশ্য বারোটার পর ওখানে আর গাড়ি নেই পাঁচটার আগে। ওদের সাড়ে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে আসতে বলেছি। আচ্ছা, ওরা এলে ওদের সম্বর্ধনা করা যাবে কি করে? বাজার থেকে কিছু খাবার নেওয়া যাবে, কি বল?"

সুলোচনা বলিলেন, "আমি ঘর থেকে কিছু সন্দেশ আর নিমকি করে' এনেছি। ওসব যেন কিনো না, ভাল রসগোল্লা পাও তো তাই কিনো—"

"খাবে কিসে—"

"আমি প্লেট গ্লাস সব এনেছি—"

সুলোচনা সুগৃহিণী এবং একটু চাপা স্বভাবের। এসব যে করিয়াছেন তাহা স্বামীকে জানিতে দেন নাই।

প্রকাশবাবু পুনরায় ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

"উঃ মেয়ে ঘাড়ে করে' দেখাতে আসা, তা-ও আবার ওয়েটিং রুমে! পূর্বজন্মে কত পাপই যে করেছিলাম"

পুনরায় জানু আন্দোলিত হইতে লাগিল।

উমা আর সহ্য করিতে পারিল না।

"আমি তো তোমাকে বলেছিলাম বাবা, আমাকে পড়াও, কিন্তু তুমি ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে। আমাদের সঙ্গে যারা পড়ত তারা সবাই কলেজে পড়ে এখন। চাকরি করে' নিজের পায়ে দাঁড়াবে!"

"হুঁঃ, পড়াও বললেই কি পড়ানো যায়। খরচ কত। আর পড়ালেই কি নিস্তার আছে? ওই যে আমাদের হালদার, মেয়েকে বি-এ পর্যন্ত পড়িয়েছিল, একটি কাঁড়ি টাকা দিয়ে বিয়ে দিতে হ'ল শেষপর্যন্ত"

তিন

ট্রেন যথাসময়ে স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। প্রকাশবাবু সপরিবারে গিয়া ওয়েটিং রুমটি দখল করিয়া বসিলেন। ওয়েটিং রুমে ভাগ্যক্রমে আর কোন যাত্রী ছিল না। বেশ প্রকাণ্ড ঘর। টেবিল চেয়ার বেঞ্চি আয়না বাথরুম সব আছে। প্রায় সব ঘরটাই দখল করিয়া বসিলেন তাঁহারা।

একটু পরে সেই মেয়েটি আসিলেন, ইঁহাদের সহযাত্রিণী, যিনি কামরায় অপর প্রান্তে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোকও রহিয়াছেন। প্রকাশবাবু বিরক্তমুখে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া ইহাদের দিকে চাহিলেন, ভাবটা, এ আবার কি আপদ জুটল। আপদ কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, "তুমি এইবার ঠিকঠাক হয়ে নাও। আমি রিক্‌শ ডাকি। মাইল দেড়েক যেতে হবে। সাড়ে তিনটের সময় টাইম দিয়েছে—"

তিনি রিক্‌শ ডাকিতে গেলেন, মেয়েটি আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ঠিকঠাক্ হইতে লাগিল। অর্থাৎ ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে পাউডার বাহির করিয়া মুখে ঘাড়ে গলায় মাখিল, ক্রীমও লাগাইল একটু, ঠোঁটে একটু লিপস্টিকও ঘষিয়া লইল। তাহার পর সাধারণ ব্রোচটি খুলিয়া শৌখিন গোছের একটি ব্রোচ কাঁধের পাশটিতে লাগাইয়া লইল। ঘাড় ফিরাইয়া নিজের মুখখানিই নানাভাবে দেখিল। তাহার

পর ছোট একটি আতরের শিশি বাহির করিয়া কাপড়ে জামায় শিশির ছিপিটা ঘষিল। চিরুনি বাহির করিয়া মাথার চুলটাও ঠিক করিয়া লইল একটু।

দ্বারপ্রান্তে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবার। "কই হ'ল, চল এবার—".

"চলুন"

তাঁহারা চলিয়া গেলে সুলোচনা বলিলেন, "এই মেয়েটাই আমাদের গাড়িতে ছিল না?"

প্রকাশ বলিলেন, "হ্যাঁ—"

"তখন তো এ বুড়োটাকে দেখিনি"

"না। অন্য গাড়িতে ছিল বোধ হয়"

"কোথা গেল ওরা?"

"কে জানে। তোমার মেয়েকেও সাজাও এবার। ওদের আসবার সময় হল। গা টা যা ধোবার এই সময় ধুয়ে নে, কোন লোক এসে গেলে মুশকিল হবে—"

উমা সাবান তোয়ালে লইয়া বাথরুমে ঢুকিল।

চার

ঘণ্টা তিনেক পরে।

পাত্র-পক্ষ হইতে আসিয়াছিলেন পাত্রের ঠাকু'মা, বৌদিদি, বড় বোন এবং ছোট ভাই। হাতের লেখা কেমন, গান গাহিতে জানে কিনা, সেতার এস্রাজ শিখিয়াছে কিনা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া, একটি সিনেমার গান শুনিয়া, প্রায় টাকা পাঁচেকের মিষ্টান্ন গলাধঃকরণ করিয়া যখন তাঁহারা উঠিলেন, তখন প্রকাশবাবুও ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাদের পিছু-পিছু গেলেন কিছুদূর। আসল কথাটি তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন বলিলেন না, তখন প্রকাশবাবুকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইল।

"কেমন লাগল আপনাদের? মেয়ে পছন্দ হয়েছে তো?"

"পরে জানাব আপনাকে"

প্রকাশবাবু বুঝিলেন পছন্দ হয় নাই।

যাইতে যাইতে বৌদিদি বলিলেন, "এর আগে যে মেয়েটি দেখেছি সে এর চেয়ে ঢের ফরসা, নাক চোখ মুখও ভালো—"

ছোট ভাই মন্তব্য করিলেন, "ফিগারও বেশ টল—"

প্রকাশবাবু ফিরিয়া আসিয়া উমাকে বলিতেছিলেন, "চল এবার তোকে স্কুলেই ভর্তি করে' দি—"

পাঁচ

একটু পরে তাঁহাদের সহযাত্রিণী মঞ্জুশ্রীও ফিরিলেন। সঙ্গে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মেয়েটির মুখ শুষ্ক।

"আপনি কি ক'রে বুঝলেন যে, আমার হয়নি—"

"কন্‌ফিডেনশ্যাল ক্লার্ক হরিবাবু চুপি চুপি বললেন আমাকে। জ্যোৎস্না রায় মেয়েটিকে নিয়েছেন ডি. এম."

"জ্যোৎস্না রায় তো বি-এ পাশ নয় শুনলাম"

"না। আই-এ পাশ"

"ওর স্পীড্ কি আমার চেয়ে বেশী?"

"না। কিছু কম। কিন্তু মেয়েটি বেশ স্মার্ট যে। দেখতেও ভালো। ফরসা রং, টল ফিগার—"

মঞ্জুশ্রী শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রৌঢ় আশ্বাস দিলেন, "ভয় কি, কোথাও না কোথাও লেগে যাবেই। ক্রমাগত দরখাস্ত করে' যাও। আচ্ছা চললুম।"

প্রৌঢ় চলিয়া গেলেন। মঞ্জুশ্রীর দুই চোখ সহসা জলে ভরিয়া গেল। এই চেহারার জন্য তাহার আর এক জায়গাতেও হয় নাই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আপিসে একজন লেডি স্টেনোর প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন দেখিয়া মঞ্জুশ্রী বোস দরখাস্ত করিয়াছিলেন। আজ ইণ্টারভিউ ছিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাহার পিতৃবন্ধু। ওই আপিসেই কাজ করেন।

ছয়

প্ল্যাটফর্মের একধারে বসিয়া একটি অন্ধ ভিখারী একতারা বাজাইয়া গান গাহিতেছিল

—"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা—"

অদ্ভুত গল্প

জীবন-পথে যুক্তি-চালিত হ'য়ে চলাটাই আমরা গৌরবের মনে করি। কিন্তু এই চালক যুক্তির চেহারাটা সব মানুষের একরকম নয়। অনেক সময় তা এত বিভিন্ন যে, ঠিক করা কঠিন হয় কোন্‌টা যুক্তি আর কোন্‌টা অযুক্তি। খদ্দরপরা অনেকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন, আবার আর একদল লোক আছেন যাঁরা খদ্দর না-পরাটাই জীবনের নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ লোকেরই এই ধরণের যুক্তি-যুক্ত জীবন-নীতি আছে। কেউ জুতো পরেন, কেউ বা পরেন না, কারো মতে ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী হওয়াই গৌরবজনক, কারো মত আবার ঠিক উল্‌টো। তাঁরা বলেন, পয়সা না থাকলে তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে হবে, কিন্তু যদি যথেষ্ট পয়সা হাতে থাকে তাহলে তৃতীয় শ্রেণীতে কষ্ট করে' যাবার দরকার কি।

আমি যে নগেন চৌধুরীর গল্পটা আজ আপনাদের বলছি তাঁরও এই ধরণের একটা জীবন-নীতি ছিল। তিনি ছিলেন ঘোর মাংসাশী এবং উঁচুদরের শিকারী। আর দুটো ব্যাপারকেই তিনি জীবনের নীতি (ইংরেজিতে যাকে বলে 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌') হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মাংস, বিশেষ করে' পাখীর মাংস, যে খাদ্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ খাদ্য এ কথা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং প্রমাণ প্রয়োগ করে' অপরকে বোঝাতেও চেষ্টা করতেন। বিদ্বান লোক ছিলেন। ভূ-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, খাদ্য-তত্ত্ব, শরীর-তত্ত্ব প্রভৃতি নানারকম তত্ত্ব আহরণ করেছিলেন তিনি তাঁর এই নীতির সমর্থন-কল্পে। আর বিজ্ঞান জিনিসটা এমনই অদ্ভুত জিনিস যে, খুঁজলে যে-কোনও মতের স্বপক্ষে কিছু-না-কিছু যুক্তি পাওয়া যায়। আফিং খাওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি আছে, মদ খাওয়ার স্বপক্ষেও আছে। ব্রহ্মচর্যের স্বপক্ষে যেমন জোরালো যুক্তি আছে, বহুবিবাহের স্বপক্ষেও তেমনি আছে। পাখীর মাংস খাওয়ার সমর্থনেও অনেক যুক্তি দেখাতেন নগেনবাবু। শিকার করাটাও যে অবসর বিনোদনের একটা উৎকৃষ্ট উপায় এ বিষয়ে নিজে তো তিনি নিঃসংশয় ছিলেনই অপরকেও নিঃসংশয় করিবার চেষ্টা করতেন। বলতেন—"একঘেয়ে জীবনের খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে বন-জঙ্গল নদ-নদীর সংস্পর্শে এলে যে মনের চেহারা বদলে যায় এ কথা তো সবাই জানেন। কিন্তু আমি বলতে চাই, বন্দুক ঘাড়ে করে' বন-জঙ্গল নদ-নদীর সংস্পর্শ

লাভ করবার বিশেষ শিক্ষা যদি কেউ পান তা হ'লে তিনি যে বিশেষ রকম একটা আনন্দ পাবেন তাতে সন্দেহ নেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে ব্যাধ-জীবন আমরা যাপন করেছি সেই জীবনের উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ সাহস-ধৈর্য একাগ্রতা-সাবধানতার স্বাদ যদি পেতে চান, বন্দুক ঘাড়ে করে' বেরিয়ে পড়ুন। প্রাচীন সাহিত্য রামায়ণ মহাভারত পুরাণ উপনিষদ পড়ে যে সুখ পান সেই সুখ পাবেন।"

নগেন চৌধুরীর এ ধরণের বক্তৃতা অনেক শুনেছি। তাঁর এ বিশেষ নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিনি কখনও। কারণ তিনি এই নীতি মানতেন বলে' আমাদের মতো কুঁড়ে বৈঠকখানা-বিহারীরা নি-খরচায় বুনো-হাঁস প্রভৃতির রসাস্বাদন করে' ধন্য হতাম মাঝে মাঝে। ওসব হাঁস শিকার করে' আনবার সামর্থ্য তো আমাদের ছিলই না, কিনে খাবারও উপায় ছিল না, কারণ বাজারে কুম্-ডাক, মিউস, পিন্-টেল প্রভৃতি সুলভ নয়। আর নগেন চৌধুরী যখন শিকারে বেরুতেন তখন গাড়ি গাড়ি হাঁস মেরে আনতেন। বিতরণও করতেন অকৃপণভাবে।

এইভাবে বেশ চলছিল। কিন্তু চিরকাল একভাবে চলে না। সর্বনাশা প্লেগ এসে দেখা দিল শহরে। সাতদিনের মধ্যে নগেন চৌধুরীর স্ত্রী, দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে মারা গেল। নগেন চৌধুরী বাড়ি ছিলেন না, শিকার করবার জন্য তিনি কাশ্মীর গিয়েছিলেন। তিনি বেঁচে গেলেন।

উক্ত ঘটনার পর বছর খানেক কেটেছে। একদিন সকালবেলা বৈঠকখানায় বসে' খবরের কাগজের মাধ্যমে পর-চর্চা আর পর-নিন্দা করছি, এমন সময় নগেন চৌধুরী প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছনে একটি চাকরের মাথায় সুদৃশ্য একটি বাক্স। মনে হল চন্দনকাঠের ওপর হাতীর দাঁতের কাজ-করা।

"আসুন। বাক্সে কি আছে—"

"হাঁস"

"মরা হাঁস ?"

"হ্যাঁ"

"অমন চমৎকার বাক্সে করে মরা হাঁস এনেছেন !"

"আগে সব শুনুন। ওটা ওই কোণে রেখে দে—"

চাকর বাক্স রেখে চলে গেল।

নগেন চৌধুরী বললেন, "পরশু রাত্রে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। একটা অচেনা

দেশে যেন একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছি পায়ে হেঁটে। হাঁটতে হাঁটতে এক মাঠের ধারে এসে পড়লাম। দেখলাম মাঠের মাঝখানে একটা বাড়ি রয়েছে, মানে বাড়ির দেয়ালগুলো রয়েছে, চাল বা ছাত নেই। কাছে গিয়ে দেখি আমার বাল্যবন্ধু হরিচরণ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"কি হে হরিচরণ এখানে কেন—"

"এখানেই তো আমার বাড়ি। হঠাৎ আগুন লেগে বাড়িটা পুড়ে গেছে ভাই। এবার ভাবছি পাকা করিয়ে নেব—"

"তোমার পরিবার ছেলে-মেয়েরা কোথায়—"

"ওই যে। সব হাঁস করে' রেখে দিয়েছি। ওই গাছটায় থাকে। বাড়ি তৈরী হ'লে আবার মানুষ করে' নেব—। এ বিদ্যেটা শিখেছি।"

পাশেই যে আমগাছটা ছিল তার ডালে দেখি, পাঁচটি হাঁস বসে আছে। দু'টি সাদা, দু'টি কালো, আর একটি বড় রাজহাঁস,"—ঘুমটা ভেঙে গেল। হরিচরণ বহুদিন পুর্বে মারা গেছে। তার কথা ভাবিও নি, হঠাৎ এ স্বপ্ন দেখবার মানে কি বুঝতে পারলাম না।

আজ সকালে শিকারে বেরিয়েছিলাম। একটা গাছে হরিয়াল বসে ছিল একঝাঁক। ফায়ার করলাম, হরিয়ালগুলো উড়ে গেল। এগিয়ে দেখি গাছতলায় পাঁচটি মরা হাঁস পড়ে আছে। দুটি সাদা, দুটি কালো আর একটি বড় রাজহাঁস। ঠিক যেমন স্বপ্নে দেখেছিলাম। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। আমারও তো ঘরে আগুন লেগেছিল, দুই ছেলে, দুই মেয়ে আর স্ত্রী মরে গেছে—তারাই কি—? আমার চার ছেলেমেয়ের মধ্যে দু'জন ফরসা আর দু'জন কালো ছিল। আর আশ্চর্য বড রাজহাঁসটার মুখের ভাবটা যেন আমার স্ত্রীর মুখের মতো। আপনি তো দেখেছেন ওদের, হাঁসগুলো দেখুন তো। ওগুলোকে স্টাফ্ করিয়ে ঘরে রেখে দেব। নিজেই ওগুলো নিয়ে কানপুর যাব ভাবছি। আপনার তো একটা ভালো ফার্মের ঠিকানা জানা ছিল"

"হ্যাঁ, লেখা আছে ঠিকানাটা"—

"দিন তো। আমি নিজেই যাব। হাঁসগুলো দেখুন আগে—"

সসম্ভ্রমে বাক্সটা খুলে হাঁসগুলো আমার বড় টেবিলটার উপর সারি সারি রাখলেন।

আমি অবাক হয়ে বসে' রইলাম।

নগেন চৌধুরীর জীবন-নীতি বদলে গেছে। তিনি মাংস খাওয়া ছেড়েছেন, শিকারও করতে যান না।

ছবি

প্রকাশবাবুর জীবনের বর্তমান ধারা অনেকটা এই রকম। সকালে সাতটার সময় ওঠেন, উঠিয়া মুখ ধুইয়া চা পান করিতে করিতে খবরের কাগজটা পড়েন। খবরের কাগজে সাধারণতঃ দুঃসংবাদ থাকে। প্রতিটি দুঃসংবাদ পড়িয়া তিনি যে-সব মন্তব্য করেন, তাহার একটিও শ্রুতিসুখকর নহে। দেশের নেতা, উপনেতা, মন্ত্রী-উপমন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া ধনী-শ্রমিক সকলেই যে চোর, চোর না হইলে যে এদেশে বড়লোক হইবার উপায় নাই, যথেষ্ট টাকা থাকিলে যে রাতকে দিন এবং দিনকে রাত করিয়া ফেলা যায়, বস্তুতঃ টাকাই যে বর্তমান যুগের একমাত্র উপাস্য দেবতা—তাঁহার মন্তব্যগুলি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয়।

অন্তত, তাঁহার দশবৎসর বয়স্ক পুত্র ছবি তাহাই বোঝে। সে-ও বাবার সহিত এক টেবিলে বসিয়া চা-পান করে। মা-ও যে সব আলোচনা করেন তাহাও উন্নত ধরণের কিছু নহে। প্রথমতঃ তিনি বাজারে কি কি কিনিতে হইবে তাহারই একটা ফর্দ দাখিল করেন। চাল ডাল তরিতরকারি মশলা, যখন যেদিন যেমন প্রয়োজন, তাহারই ফর্দ। প্রকাশবাবু তাহা হইতে কিছু কিছু কমাইবার চেষ্টা করেন, তর্ক হয়, তর্ক শেষটা কলহে পরিণতি লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, মৃন্ময়ী (ছবির মা) যে সব প্রস্তাব স্বামীর নিকট পেশ করেন সেগুলি আরও ব্যয়সাধ্য। অর্থাৎ সিনেমা, শাড়ি বা গহনার ব্যাপার। প্রতিদিনই অবশ্য এসব আলোচনা হয় না; কিন্তু মাঝে মাঝে হয় এবং যখন হয় তখন যে কাণ্ড হয় তাহা শোভনতার সীমা ছাড়াইয়া যায়। প্রকাশবাবুর ধারণা ওগুলি অনাবশ্যক ব্যয়, মৃন্ময়ীর মতে একটুও অনাবশ্যক নয়, সংসারে থাকিতে গেলে সিনেমাও দেখিতে হয়, ভালো শাড়িও পরিতে হয়, গহনাও কিনিতে হয়। তাহা না হইলে মান থাকে না। প্রকাশবাবু ইহার প্রত্যুত্তর দেন। মৃন্ময়ীও ছাড়িবার পাত্রী নহেন, উত্তরে তিনি যাহা বলেন তাহা প্রকাশবাবুর আত্মসম্মানকে আঘাত করে। তিনি টেবিল চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া ওঠেন—"আমি পাব কোথা। চুরি ক'রব, না ডাকাতি ক'রব—!"

ছবি বুঝিতে পারে মূল কারণ অর্থ। বাবার যদি প্রচুর অর্থ থাকিত, তাহা হইলে এসব সমস্যাই থাকিত না! কি মজা হইত! কিন্তু মজা হইবে না, কারণ বাবা সামান্য কেরানী।

তবু মাঝে মাঝে সিনেমা দেখাও হয়, শাড়ি গয়নাও কেনা হয়।

ছবি দেখে স্কুলে বড় লোকের ছেলেরা দামী জামা জুতা পরিয়া আসে। কাহারও হাতে রিস্টওয়াচ, কেহ ফাউণ্টেন পেন কিনিয়াছে, কেহ রঙীন চশমা পরিয়া আসিয়াছে।

মাকে আসিয়া বলে—"মা, আমাকে একটা ফাউণ্টেন পেন কিনে দাও না। পেন্সিলে ভালো লেখা যায় না—"

মা বলেন—"আমি কি কিনে দেবার মালিক। বাবাকে বল,"— বাবাকে বলিতে সাহস হয় না। তবু সাহস করিয়া একদিন বলিল। বাবা কিনিয়া দিলেন না, ধমক দিলেন।

একদিন সে শুনিতে পাইল বাবা বলিতেছেন—"উঃ ভাগ্য বটে যতীনবাবুর। লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে—"

মৃন্ময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাই নাকি! কি করে?"

"চুরি! আবার কি করে? চুরি না করলে কি টাকা হয়?"

দিনকতক পরে ছবি সবিস্ময়ে দেখিল, ওই চোর যতীনবাবুকেই বাবা একদিন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, সসম্ভ্রমে খাতির করিতেছেন। শুধু তাহাই নয়, তাহার ছেলে সুধীরের সহিত তাহার দিদির বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন। সুধীর রূপে বা গুণে এমন কিছু ভালো নয়, কিন্তু ছবির ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না, সুধীরের বাবা বড় লোক, লাখ লাখ টাকা রোজকার করিতেছেন, তাই তাহাকে জামাই করিবার জন্য বাবার এত আগ্রহ। বিবাহ অবশ্য হইল না, কারণ যতীনবাবুর পুত্র আরও বড় ঘরে বধূ-নির্বাচনের সুযোগ পাইল।

আর একদিন ছবি হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া অবাক হইয়া গেল, বাবা মায়ের জন্য একছড়া দামী সোনার হার আনিয়াছেন। কি করিয়া তিনি এই অসাধ্যসাধন করিলেন তাহা তিনি গোপনও করিলেন না।

বলিলেন, "জগুবাবুকে অনেক টাকার পারমিট পাইয়ে দিয়েছি আপিসে তদ্বির করে'। তিনি কিনে দিয়েছেন। আরও দেবেন। আর একটা পারমিট যদি পাইয়ে দিতে পারি, তপুর বিয়ের খরচটা উঠে আসবে—"

বাড়িতে যে-সব আলোচনা হয় তাহা হয় বাবার অফিস লইয়া, কিংবা পাড়াপড়শীদের নিন্দা। ইহার বাহিরে যে-সব আলোচনা হয় তাহার বিষয় সিনেমার অভিনেতা-

অভিনেত্রী, কিংবা দেশের নেতাগণ। প্রকাশবাবুর মতে দেশের একটি নেতাও সৎ নহেন, সকলেই চোর।

ছবি ক্লাস প্রমোশন পাইল না।

ইহা শুনিয়া বাবা মন্তব্য করিলেন, "অতগুলো পয়সা নষ্ট করলে তো? পরীক্ষায় খারাপ করেছ আগে বললেই পারতে। তোমাদের হেডমাস্টারের ছেলে আমাদের আপিসে আমার আণ্ডারেই কাজ করে। তার উপর একটু চাপ দিলেই তার বাবা বাপ বাপ করে' প্রোমোশন দিয়ে দিত তোমাকে—"

ছবি চুপ করিয়া রহিল।

সন্ধ্যাবেলা সে আড়াল হইতে শুনিতে পাইল—"আরে লেখাপড়া শিখে হবে কি! গণ্ডা গণ্ডা এম-এ, বি-এ ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে অলিতে-গলিতে—!"—বাবা মাকে বলিতেছেন।

এই ভাবেই চলিতেছে।

দুই

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাজার হইতে ফিরিতেছি রাস্তার মাঝখানে দেখি বিরাট ভিড় জমিয়াছে একটা দোকানের সামনে। ভিড়ের ভিতর একটা ছেলে আর্তনাদ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে পরুষ কণ্ঠে তর্জন গর্জন করিতেছে আর একজন। তর্জন গর্জন শুধু নয়, প্রহারও চলিতেছে বুঝিতে পারিলাম। কৌতূহল হইল, ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষুস্থির হইয়া গেল। দেখিলাম একটি ভোজপুরী দরোয়ান তাহার মহিষ-চর্ম-নির্মিত জুতা দিয়া ছবিকে প্রহার করিতেছে। তাহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হয়েছে, একে মারছ কেন—"

বিহারী দোকানদারটি আমার পূর্বপরিচিত।

বলিল—"হুজুর, এ বাঙালী লৌণ্ডা (ছোঁড়া) চোর। আমাদের শো কেস থেকে দেখুন এতগুলো জিনিস চুরি করেছে—"

দেখিলাম, ফাউণ্টেন পেন, রিস্টওয়াচ, রঙীন চশমা এবং আরও দুই একটা শৌখিন জিনিস একধারে জড়ো করা রহিয়াছে।

"কি করে' চুরি করেছে এতগুলো জিনিস—"

"আমাদের শো কেসের কাছে রোজই এসে ঘুরে ঘুরে দেখে। আমরা ভাবতাম এমনি দেখছে দেখুক। আজ হঠাৎ নজরে পড়ল একটা শো কেস থেকে কি যেন একটা তুলে কাপড়ের ভিতর কোমরের নীচে ঢুকিয়ে ফেলল। এগিয়ে গিয়ে দেখি, ও বাবা, শুধু একটা জিনিস নয়, অনেক জিনিস সরিয়েছে। করেছে কি জানেন? একটা ইল্যাস্‌টিক্‌-ওলা হাফপ্যাণ্ট পরেছে কাপড়ের নিচে। আর হাফ প্যাণ্টের পা দুটো দড়ি দিয়ে বেশ করে' বেঁধে দিয়েছে নিজের উরুর সঙ্গে। ইল্যাস্‌টিক্‌ গলিয়ে প্যাণ্টের ভিতর যা ঢুকিয়ে দিচ্ছে তা আর নিচে পড়ে' যাচ্ছে না, পড়বার উপায় নেই। শালার বুদ্ধি দেখুন কি রকম!"

বুদ্ধি দেখিয়া আমিও অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।

"কার ছেলে জানেন?"

আমি জানিতাম, কিন্তু স্বীকার করিতে লজ্জা হইল। ছবিও চোখের ইশারায় যেন আমাকে বারণ করিল তাহার পরিচয়টা যেন না দিই।

বলিলাম, "না, আমি চিনি না—"

"কার ছেলে তুমি? বাপের নাম কি?"

"শিশিরবাবু"

"কোন্ শিশিরবাবু?"

"শিশির গুপ্ত—"

"এস. পি. শিশির গুপ্ত?"

অকম্পিত কণ্ঠে ছবি বলিল—"হ্যাঁ—"

আমি যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। ছোকরা বলে কি!

এইবার দোকানদার ঘাবড়াইয়া গেল। এস.-পি.র ছেলেকে এমনভাবে প্রহার করিয়া শেষ পর্যন্ত বিপদে পড়িয়া যাইবে না তো! বলিল—"এ কথা আগে বললেই পারতে। আমি এমনিই তোমাকে দিয়ে দিতাম জিনিসগুলো, চুরি করতে গেলে কেন! নাও, নিয়ে যাও এগুলো—"

অম্লান বদনে ছবি জিনিসগুলি লইয়া চলিয়া গেল। কে বলে বাঙালীর ছেলের বুদ্ধি নাই।

তিন

আড্ডায় গিয়া শুনিতে পাইলাম—"আজকালকার ছেলেরা যা হয়েছে মশাই—" ভাদুড়ী মহাশয় বলিতেছেন।

আমার বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল ছেলের বাপ-মায়েরা আজকাল যাহা হইয়াছেন, ছেলেরাও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু কিছু বলিলাম না। জমাটি আড্ডায় রসভঙ্গ করিয়া কি হইবে।

আর এক দিক

"রক্তটা কী রকম দেখলেন ডাক্তারবাবু—"

"ভাল নয়। হিমোগ্লোবিন বড্ড কম। আর. বি. সি. ডব্লিউ বি. সি.-ও কম।"

"তা হলে, কী করব—"

"কয়েকটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি। দুটো খাবার, আর একটা ইনজেকশনের—"

"রক্ত পরীক্ষার জন্য কত দিতে হবে?"

"আপনার কাছে কিছু নেব না। ইনজেকশনটা কিনে আনুন, আমি দিয়ে দেব, ফি দিতে হবে না"

"রক্তে কী দোষ বললেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"রক্তটা পাতলা হয়ে গেছে আর কি। যে-সব জিনিস যে পবিমাণে থাকা উচিত, তা নেই"

"ও তাই নাকি! রক্ত পাতলা হয়ে যাবার কারণ কি?"

"অনেক কারণ থাকতে পারে। এক কথায় বলা যায় কি চট করে'? এখন যা বললুম, তাই করুন।"

"আমার বুক ধড়ফড়টা ওই জন্যেই তা হ'লে?"

"হ্যাঁ। তাই ত মনে হচ্ছে"

অতুলবাবু তাঁহার কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি আমার মুখেব উপর খানিকক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"ওষুধগুলোর দাম কি রকম পড়বে বলতে পারেন—"

"ঠিক বলতে পারব না, আমাব ত ওষুধের দোকান নেই। দেখুন না খোঁজ করে'"

"আচ্ছা, থ্যাংক ইউ"

অতুল রায় আমাদেরই পাড়ার লোক। বয়স হইয়াছে, কিছুদিন পরেই রিটায়ার করিতে হইবে। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি। বড় ছেলেটির বয়স আঠার বৎসর। উপর্যুপরি দুইবার ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়াছে।

অতুলবাবু বলেন, "ছেলের দোষ নেই মশাই। স্কুলে আজকাল পড়াশোনা কিছু

হয় না। প্রত্যেকটি মাস্টার টিউশনি করে' বেড়ায়, স্কুলে এসে ঘুম মারে। তার উপর পড়ানো হয় হিন্দীতে। ওরা অর্ধেক বুঝতেই পারে না। তা ছাড়া বাঙালী ছেলে বলে' প্রত্যেক বিহারী মাস্টারের বিষদৃষ্টি তার উপর। সুযোগ পেলেই কম নম্বর দিয়ে দেয়। যে দু-একজন বাঙালী মাস্টার আছেন, তাঁরা ভরসা করে' বাঙালী ছেলেদের দিকে ভাল করে' নজর দিতে পারেন না, পাছে বিহারী মনিবরা চটে' যান। এ অবস্থায় ছেলে কখনও পাস করতে পারে? ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত যে উঠতে পেরেছে এই যথেষ্ট।"

তাহার পর একটু থামিয়া অতুলবাবু বলিয়াছিলেন, "সিংজীকে তেল দিচ্ছি রোজ। তিনি ভরসা দিয়েছেন, ম্যাট্রিকটা পাস করলে তাঁর অফিসে ঢুকিয়ে নেবেন। কিন্তু তিনি যা করতে বলছেন, তা করব কিনা এখনও ঠিক করতে পারিনি—"

"কি করতে বলছেন তিনি?"

"বলছেন, আপনার ছেলের নাম বদলে দিন অ্যাফিডেবিট করে'। কানন কুমার বদলে খুবলাল করে দিন। রায় উপাধি ঠিক আছে। অনেক বিহারী ভুঁইহারদের উপাধি 'রায়' হয়। কায়স্থও রায় আছে। সিংজী বলছেন, বাঙালী নাম দেখলে উপর থেকে কেটে দেবে। কি করব তাই ভাবছি। ওর ঠাকুমা অনেক শখ করে' নামটা রেখেছিলেন—"

অতুলবাবুর প্রথম সন্তান কন্যা, ডাকনাম রিনি। তাহার দূরসম্পর্কের এক মাসী শান্তিনিকেতনে পড়িতেন। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নির্ভুল স্বর এবং নানারকম নাচের নিখুঁত মুদ্রা, পদবিন্যাস প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি অসুস্থ হইয়া বায়ুপরিবর্তন-মানসে অতুলবাবুর বাড়িতে কিছুদিন ছিলেনও। সেই সময় রিনি নাচ-গানে তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিল। ভাগ্যিস লইয়াছিল, তাই সে এখন মাসে পঁচাত্তর টাকা রোজগার করিয়া বৃদ্ধ বাবার সংসারভার লাঘব করিতেছে। তাহার মাসী তাহাকে যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন তাহার চর্চা সে ছাড়ে নাই। নানা কৌশলে অনেকের খোশামোদ করিয়া এখন বেশ নৃত্য-গীত-পটীয়সী হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাকে নেকনজরে দেখিয়াছেন এবং তাঁহারই সুপারিশের জোরে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে সে নাচ-গানের শিক্ষয়িত্রী হইয়া বহাল হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নেকনজর যাহাতে আরও কৃপাকোমল হয়, সেজন্য

তাহাকে সপ্তাহে দুই-তিন দিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোয় গিয়া হাজিরা দিতে হয়। অতুলবাবু নিজে গিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া আসেন।

তাঁহার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেহই সুস্থ নয়। নানারকম ব্যাধি লাগিয়াই আছে। আমি পাড়ার ডাক্তার, বিনা পয়সাতেই দেখি। তবু মাঝে মাঝে খবর পাই, তিনি আমার ঔষধ না খাওয়াইয়া হোমিওপ্যাথি করিতেছেন। তাঁহার নিজেরই ছোট একটি হোমিওপ্যাথিক বাক্স আছে, দুই-একখানা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বাংলা বইও আছে। অনেক সময় নিজেই চিকিৎসা চালান। নিজের বুক-ধড়ফড়ানির চিকিৎসা নিজেই করিতেছিলেন, কিন্তু হালে পানি না পাইয়া আমার কাছে আসিয়াছেন।

বৈকালবেলা অতুলবাবু আবার দেখা দিলেন।

"আপনি যে প্রেসক্রপশান লিখে দিয়েছেন, তার দাম কত জানেন? দু শিশি ট্যাবলেটের দাম সাড়ে ন টাকা। আর ইনজেকশনের দাম প্রতিটি অ্যামপুল আড়াই টাকা। আপনি ছটা ইনজেকশন দিতে চাইছেন। তার মানে পনর টাকা। পনের আর স্যাড়ে নয়ে সাড়ে চব্বিশ টাকা। সাত দিনেই শেষ হয়ে যাবে। এ চিকিৎসা করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?"

অতুলবাবু তাঁহার কোটরগত দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। যাহার ঔষধ কিনিবারই সামর্থ্য নাই, তাহার চিকিৎসা করিব কি করিয়া?

"হাসপাতালে চেষ্টা করে' দেখুন না, যদি পান—"

"কোথায় আছেন আপনি স্যার। হাসপাতাল গরিবদের জন্য নয়, হোমরা-চোমরা অফিসারদের জন্যে। ভাল ভাল দামী ওষুধ বিনা পয়সায় ওঁরাই পান। গরিবদের কাছে ঘুষ চায়। বিনা পয়সায় কিছু হয় না ওখানে। কোন্‌খানেই বা হয়! ওই যে গভর্ণমেণ্ট পোলট্রি খুলেছে, ওর একটি ডিম, কি একটা মুরগী কি বাইরের লোকের পাবার উপায় আছে? সব ওই অফিসারদের পেটে যাচ্ছে—"

অতুলবাবু যখন কথা বলেন, তখন একটানা খানিকটা বলিয়া যান, তাহার পর হঠাৎ থামিয়া নির্নিমেষে মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। তাহাই করিলেন।

বলিলাম, "তা হলে খাওয়াটা একটু ভাল করুন। দুধ, মাছ—"

"বাজারে চুনো মাছের সের কত করে' জানেন? পাকা মাছের দিকে ত

চাওয়াই যায় না। দুধ টাকায় পাঁচ পো, মাংস আড়াই টাকা তিন টাকা সের। আলু এগার আনা, পটল আট আনা, ধুঁদুল আট আনা, সেদিন একটা ছোট্ট লাউ কিনতে গেলুম, দাম বললে আট আনা। ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে এলুম। খাওয়া ভাল করব কি করে'? কনট্রোল দোকানগুলোতে গমও পাওয়া যাচ্ছে না আজকাল। সব ব্ল্যাক মার্কেটে। অথচ রোজই একটা করে' মিনিস্টার এরোপ্লেনে উড়ে এসে বক্তৃতা মেরে যাচ্ছে। আমাদের চিকিৎসক কে জানেন? মরণ। তাঁকে 'কল'ও দিচ্ছি রোজ, কিন্তু আসছেন কই—"

আবার তিনি তাঁহার কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি আমার মুখের উপর খানিকক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"আচ্ছা চললুম। থ্যাংক ইউ—"

'থ্যাংক ইউ'টা দিতে তিনি কখনও ভুলিতেন না।

দিন সাতেক পরে একটি নূতন সমস্যায় জড়িত হইতে হইল। ভাষা-সমস্যা। বিহার বিশ্ববিদ্যালয় নোটিশ জারি করিয়াছেন, এইবার সকলকে হিন্দীর মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে হইবে। মাতৃভাষা চলিবে না। রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সংবিধান-বিরোধী এ কি কাণ্ড! এই সেদিনই ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ হায়দরাবাদে বলিয়াছেন যে, জোর করিয়া কাহারও উপর হিন্দী চাপানো হইবে না। অথচ তাঁহার নিজের প্রদেশই তাঁহার কথা অমান্য করিতেছে! কিছুতেই ইহা সহ্য করা হইবে না। দরখাস্ত লিখিতে বসিলাম। তাহার পর একটি হুজুগে ছোকরাকে ধরিয়া বলিলাম, "বাঙালীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সই করিয়ে নিয়ে এস। তারপর মুসলমানদের বাড়িতে যেতে হবে—এই খাতাটাও নাও, কিছু কিছু চাঁদাও আদায় কর।"

ছোকরা বলিল, "আচ্ছা—"

বলিয়া কিন্তু সে কুঞ্চিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

"আমার সাইকেলটার পিছনের চাকাটা একটু জখম হয়েছে। ভাবছি হেঁটে পারব কি—"

"পিছনের চাকা সারিয়ে নাও এক্ষুনি—"

যুবকটি আরও কুণ্ঠিত হইল। তাহার পর মাথা চুলকাইয়া বলিল, "হাতে এখন পয়সা নেই ডাক্তারবাবু। চার পাঁচ টাকা লেগে যাবে—"

রোক চড়িয়া গিয়াছিল।

"তুমি সারিয়ে নাও। যা লাগে আমিই দেব—"

যুবক দরখাস্ত লইয়া সোৎসাহে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া যাইবার একটু পরেই অতুলবাবুর গলা শোনা গেল।

"ডাক্তারবাবু, এই দেখুন—"

দেখিলাম, তিনি রাস্তায় দাঁড়াইয়া বাজারের থলেটি আমাকে তুলিয়া দেখাইতেছেন। থলির ভিতর হইতে একগোছা লাল শাকের পাতা দেখা যাইতেছে। কি দেখাইতেছেন, তাহা ঠিক বুঝিলাম না।

"কি দেখাচ্ছেন? আসুন না—"

অতুলবাবু রাস্তা পার হইয়া আমার ক্লিনিকে ঢুকিলেন।

"লাল শাক মশাই। জিতেনবাবু বলছিলেন, এ খেলেও নাকি হিমোগ্লোবিন বাড়ে। এ-ও চার আনা সের—"

অতুলবাবু চলিয়া যাইতেছিলেন।

বলিলাম, "শুনুন, একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছি। সই করে' দেবেন তাতে। আর পারেন ত কিছু চাঁদাও দেবেন—"

"কি ব্যাপার?"

"দেখবেন, দরখাস্তেতেই লেখা আছে সব।"

দিন তিনেক পরে অতুলবাবু পুনরায় দেখা দিলেন।

"আপনার দরখাস্তে সই করিনি ডাক্তারবাবু। আমাদের মাতৃভাষার উপর যা নির্যাতন হচ্ছে, তা আমি জানি। কিন্তু সই করতে পারলাম না। ওপরওলাকে চটাবার সাহস নেই। সিংজী ঘোর হিন্দীওলা। ওঁর সুনজরে থাকলে রিটায়ার করবার পর এক্সটেনশনও পেতে পারি। এ-সব দরখাস্তে সই করলে আমার আখের মাটি হ'য়ে যাবে। আপনার বাংলা দেশ আর বাংলা আমাকে খেতে দেবে, না পরতে দেবে। কোন বাঙালী কোন বাঙালীকে সাহায্য করবে? কেউ করবে না। সুতরাং যারা আমাকে খেতে পরতে দিচ্ছে, তাদের মন রেখে চলতে হবে। আগে ইংরেজদের সেলাম করতুম, এখন এদের করি। বাঁচতে হবে ত আগে, তারপর ভাষা"

তাহার পর তিনি কোমরের গেঁজে হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া বলিলেন,

"আমার সাধ্যমত চাঁদা আমি কিছু দিচ্ছি, কিন্তু দেখবেন আমার নামটা যেন খাতায় লিখবেন না। যদি কিছু লিখতে চান, এক্স ওয়াই জেড লিখে দেবেন—"

সিকিটি টেবিলের উপর রাখিয়া অতুলবাবু তাঁহার কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি আমার উপর খানিকক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"আচ্ছা, চললুম। যাই হো'ক, আপনি যে এসব করছেন, এটা খুবই ভাল কথা। থ্যাংক ইউ—"

অতুলবাবু চলিয়া গেলেন।

বাংলার বাহিরে যে সব নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাকুরে বাঙালী বাস করেন, তাঁহাদের জীবন-সমস্যার আর একটা দিক সহসা যেন দেখিতে পাইলাম।

দমিয়া গেলাম একটু। সই করেন নাই বলিয়া অতুলবাবুর উপর রাগ করিতে পারিলাম না।

মেঘলা দিনে

মোটরে চলেছি। মোটরেই আজকাল সর্বদা থাকি। বাড়ি আছে একটা কিন্তু বাড়িতে লোকজন কেউ নেই। বাড়ি মানে সিমেণ্ট ইঁট লোহা কাঠের জগদ্দল সমন্বয় একটা। বাড়িকে যারা গৃহ করে' তোলে, তারা আসেনি আমার কাছে এ জন্মে। একজন এসেছিল। সে কিন্তু আমার বাড়িতে আসেনি। বাড়ির বাইরে থেকেই সে আমার জীবন মধুর করে' তুলেছিল। সে-ও আমার নাগালের বাইরে চলে' গেছে। তাকেই খুঁজে বেড়াই। জানি পাব না, তবু খুঁজি। খোঁজাটা নেশার মত হ'য়ে গেছে। ওইটেই জীবনের উদ্দেশ্য হ'য়ে গেছে আজকাল। এ বিশ্বাসও হ'য়ে গেছে, পাব তাকে কোথাও না কোথাও। কোনও অচেনা শহরের গলির মোড়ে কিংবা কোনও পথের বাঁকে কিংবা কোনও বনের ধারে বা পাহাড়ের ঝরনা তলায় কিংবা আর কোথাও। যেখানে মনে হয় তাকে পাব, সেখানেই অপেক্ষা করি, দিনের পর দিন, অনেক সময় মাসের পর মাস। কিন্তু পাইনি। আশা ছাড়িনি কিন্তু। যতবার ব্যর্থকাম হয়েছি, ততবারই বিশ্বাস যেন বেড়ে গেছে, মনে হয়েছে পদ্ম আসবে, একবার অন্তত আসবে, নিশ্চয়ই আসবে।

একবার মনে হয়েছিল এই এলো বুঝি। শরতের সোনালি রোদে ঝলমল করছে নীলাকাশ, দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের শ্যাম-শোভায় আভাসিত হয়েছে যৌবনের মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী, দূরে অনেক দূরে, কোথায় যেন শানাই বাজছে আগমনী স্বরে। সেদিন আকাশে বাতাসে সঙ্গীতে কল্পনায় সর্বত্রই আমন্ত্রণের আগ্রহ মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম, এ-আগ্রহ সে কি উপেক্ষা করতে পারবে? কিন্তু করেছিল। আসেনি।

আর একদিনের কথা। সেদিন পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নার পাথারে আত্মহারা হ'য়ে মিশে গিয়েছিল গঙ্গার ধারা। যে মৃদু কলধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, তা জ্যোৎস্নার, না গঙ্গার, তা বোঝবার উপায় ছিল না। জ্যোৎস্নার পাথারে যে কলধ্বনি হ'তে পারে না, একথাও মনে হচ্ছিল না তখন। মানসিক অবস্থা এমন হয়েছিল যে, কোনও কিছু অসম্ভব বলে মনে করাই অসম্ভব ছিল তখন আমার পক্ষে। আকাশের চাঁদ যদি নেমে এসে আলাপ করত আমার সঙ্গে, একটুও আশ্চর্য হতুম না। হয়তো এক

পেগ হুইস্কি এগিয়ে দিয়ে আপ্যায়িত করতাম তাকে। চারিদিকে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন ঘনিয়ে এসেছিল। রূপালী-আলোয়-মাখা স্বপ্ন, শুভ্র কোমল মেঘমণ্ডিত স্বপ্ন। সেদিন যে হুইস্কি চুমুকে চুমুকে পান করেছিলাম—যা রোজই করি—তা মনে হচ্ছিল যেন অমৃত। হঠাৎ সেদিন নতুন করে' মনে পড়ল, আমার জন্যে হুইস্কি আনতে গিয়েই পদ্ম আর ফেরেনি। তাকে মানা করেছিলুম যেতে। কিন্তু সে শুনলে না। হুইস্কি না হ'লে আমার সন্ধ্যা যে বন্ধ্যা হ'য়ে যায়, একথা তার চেয়ে আর বেশী কে জানত? আমার হুইস্কির বোতলটা হাত থেকে অসাবধানে পড়ে' ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাকে বললুম, ভালই হয়েছে, বিনা সুরায় সুরলোকে পৌঁছতে পারা যায় কিনা, তারই পরীক্ষা হোক আজ। কিন্তু সে শুনল না। হুইস্কি আনতে চলে' গেল। পায়ে হেঁটে গেল। মোটরটা সেদিন বিগড়েছিল। চাকরকে দিয়েও আনাতে পারত, কিন্তু আমার কোনও কাজ চাকরকে দিয়ে করিয়ে তৃপ্তি হ'ত না তার। সেদিনও এমনি পূর্ণিমা ছিল, এমনি জ্যোৎস্নালোকে অবগাহন করছিল প্রকৃতি। কিন্তু সে যে সেই গেল আর ফেরেনি। আশা করছিলুম, কোনও জ্যোৎস্না রাত্রেই হয়তো সে ফিরে আসবে। কিন্তু এল না। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল মধ্যরাত্রে; চাঁপার গন্ধ মদির থেকে মদিরতর হল, রজনীগন্ধার গন্ধ থমকে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ, তারপর মিলিয়ে গেল ভোরের হাওয়ায়। পদ্ম এল না।

আর একদিনের কথা।

পাহাড়ের পাশে ঘন বনের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল আমার গাড়ি। হেমন্তের প্রসন্ন প্রভাত। শিশিরবিন্দুর সমারোহ চতুর্দিকে। প্রতিটি শিশিরবিন্দু থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে সূর্যের আলো। মনে হচ্ছে, অসংখ্য মণি-মাণিক্য ছড়িয়ে দিয়ে গেছে যেন কেউ। বন্য কুক্কুটের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ আহ্বান করছে কুক্কুটিকে। অচেনা নাম-না-জানা ফুলের তীব্র গন্ধে আকাশ-বাতাস ভরপুর। আমার মদিরাচ্ছন্ন চেতনা সহসা সজাগ হ'য়ে উঠল কেন, জানি না। কেমন যেন দৃঢ়বিশ্বাস হ'ল সে নিশ্চয় আসবে আজ। বিশ্বাসের ভিত্তির উপর গড়ে তুললাম প্রত্যাশার দুর্গ। তার মধ্যে বসে রইলাম একাগ্র হ'য়ে, কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ চমক ভাঙল। একটা তীক্ষ্ণ তীব্র চীৎকারে স্তব্ধতা বিদীর্ণ হ'য়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে গেলাম সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে দেখে। সমস্ত দিন এই নির্জন বনের ধারে কেটে গেল, মনে হ'ল যেন কয়েকটা মুহূর্ত।

ড্রাইভার স্বরূপৎ সিং কাছেই রান্না করছিল। তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইতেই সে বললে—"ময়ূর ডাকছে হুজুর। বোধহয় বাঘ বেরুবে। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে এখান থেকে শহরের দিকে চলে' যাওয়াই ভালো।"

বললাম, "যাব না। এইখানেই থাকব সমস্ত রাত। বন্দুক দুটো লোড করে রাখ।"

সমস্ত রাত বসে রইলাম সেই নির্জন বনের ধারে। একাধিকবার বাঘের গর্জন শোনা গেল। মনে হলো যেন আমারই অন্তরের ক্ষোভ গর্জন করছে এই গভীর জঙ্গলে। বাঘ কাছে এল না। সে-ও এলো না। সকাল বেলা অন্য জায়গায় চলে' গেলাম।

সে এল অবশেষে, এক মেঘলা দিনে। ঘড়ি অনুসারে সেটা দিন বটে, কিন্তু আসলে রাত্রিই নেবেছিল সেদিন দিনকে আচ্ছন্ন করে'। অমন ঘন কালো মেঘ আমি আর কখনও দেখিনি। মেঘে বিদ্যুৎ ছিল না। মনে হচ্ছিল, একরাশ ঘন কালো চুল যেন দিগদিগন্ত আবৃত করে' নেমে আসছে পৃথিবীর দিকে। মনে হচ্ছিল ওই নিবিড় কুন্তলের অন্তরালে হয়তো কারও মুখও লুকিয়ে আছে, কিন্তু সে মুখ দেখা যাচ্ছিল না। অন্ধকার ক্রমশ ঘন থেকে ঘনতর হ'তে লাগল। এত ঘন যে, কাছের জিনিসও আর দেখা যায় না। আমার অত বড় মোটরটাও হারিয়ে গেল সেই অন্ধকারের মধ্যে। আমি আর মোটরের ভিতর বসে' থাকতে পারলাম না। দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, একটা সর্বগ্রাসী ক্ষুধার মধ্যে আমি যেন তলিয়ে যাচ্ছি। মোটরের কপাটটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। স্বরূপৎ ছিল না, তাকে হুইস্কি আনতে এলাহাবাদে পাঠিয়েছিলাম। আমার মোটরটা দাঁড়িয়েছিল যমুনার ধারে। নিস্তরঙ্গ যমুনাকে দেখে সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, কেন ওর নাম কালিন্দী হয়েছে। মনে হচ্ছিল, সে-ও যেন গভীর বিরহে স্থির হ'য়ে গেছে, আশার সমীরে আর তরঙ্গ তোলে না, কালো হ'য়ে গেছে তার নীল রং। বাইরে এসে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়েছিলাম যমুনারই দিকে। তারপর খট করে' শব্দ হল একটা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি আমার মোটরের খোলা দরজার পাশে পদ্ম দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ পদ্ম। যদিও তখন ঘন অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হয়েছিল, তবু আমার ভুল হয়নি। স্পষ্ট দেখলাম, পদ্ম দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে হুইস্কির বোতল। তারপর ধীরে ধীরে সে মোটরের ভিতর ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টা উঠল।

আমি নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হ'ল, আমি যেন পাথর হয়ে গেছি, আমার পা দুটো মাটিতে পুঁতে গেছে। আমার গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে' যে তুমুল ঝড় উঠেছে তা যেন স্পর্শও করছে না আমাকে। যমুনার স্রোত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে তরঙ্গে তরঙ্গে। তারপর আমি ছুটে গেলাম মোটরের দিকে, সম্ভবত প্রচণ্ড ঝড়ের বেগই ঠেলে নিয়ে গেল আমাকে। মোটরের দিকে, এসে মুখ থুবড়ে পড়ে' গেলাম। তারপর কি হয়েছে মনে নেই। খানিকক্ষণ পরে দেখি, স্বরপৎ আমাকে তুলছে। ঝড় থেমে গেছে। মোটরে ঢুকে দেখলাম পদ্ম নেই, কেউ নেই। মোটরের সিটের উপর বোতল রয়েছে একটা।

স্বরপৎকে জিজ্ঞাসা করলাম—"পেয়েছ দেখছি। কত দাম নিলে—"

স্বরপৎ বললে—"পেলাম না হুজুর। সব দোকান বন্ধ"

সীট থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে দেখলাম—হুইস্কি নয়। বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—'খাঁটি পদ্মমধু'।

পদ্মর পুরো নাম পদ্মাবতী কি পদ্মলোচনা, তা আমি বলব না। একটা কথা বলব, তার মৃতদেহ আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। আমার জন্য হুইস্কি আনতে গিয়ে একটা লরীর তলায় চাপা পড়েছিল সে। সেদিন কিন্তু এসেছিল সে, সেই মেঘলা দিনের অন্ধকারে। ইঙ্গিতময় অনুরোধ অবহেলা করিনি। মদ ছেড়ে দিয়েছি। এখন মধুই খাই। পদ্মমধু।

বেহুলা

মেয়েটিকে দেখে প্রথমেই একটু যেন অদ্ভুত মনে হয়েছিল আমার। কেন যে হয়েছিল তা তখন অত বিশ্লেষণ করবার সময় ছিল না। চারিদিকে রোগী ঘিরে ছিল আমাকে। যে-সব রোগী-রোগিণী প্রায়ই আসে আমার কাছে, মেয়েটি সে দলের নয়। অচেনা মুখ। দেখেই একটু চমক লেগেছিল, সে সুন্দরী বলে' নয়, কমবয়সী বলেও নয়, তার চোখে-মুখে কি যেন একটা ছিল যা অস্বাভাবিক, যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে জেনেছি চাপা প্রতিহিংসার আগুন ওর অন্তরে জ্বলছিল। তারই হলকা আমি দেখতে পেয়েছিলাম ওর চোখে মুখে। মনের ভিতর যে আগুন জ্বলে তা গোপন করা যায় না।

মেয়েটি রোগারোগা, রঙ কালো, চোখ-মুখের হাব-ভাব মন্দ না হলেও নিখুঁত নয়। একটা বন্য বর্বরতার ছাপ যেন আছে। চুলে তেল নেই। রুক্ষ চুলগুলো কোঁকড়ান। এত কোঁকড়ান যে মনে হয় অসংখ্য সর্পশিশু যেন জড়াজড়ি করে' ফণা তুলে আছে। অধরে অতি সামান্য একটু মুচকি হাসি। তা বাড়েও না, কমেও না। মনে হয় হাসিটা যেন বন্দিনী হয়ে আছে।

আমার কাছে মেয়েটি এসেছিল ঘায়ের ওষুধ নিতে। মাথার ঘায়ের ওষুধ। মেয়েরা যেখানে সিঁদুর পরে ঠিক সেইখানে একজিমার মত হয়েছিল, সমস্ত সীমন্তটা জুড়ে। পরীক্ষা করে' দেখলাম কালো-কালো চাপড়া-চাপড়া মামড়ির মত একটা জিনিস একজিমাটাকে ঢেকে রেখেছে। সেটা পরিষ্কার করে' তলার ঘা-টাকে পরীক্ষা করলাম। একজিমার মত চুলকানিই একটা, কিন্তু তার চেহারাটা বেশ রাগী-রাগী, আমাদের ডাক্তারী ভাষায় অ্যাংগ্রি লুকিং। আমার সন্দেহ হ'ল আলকাতরা জাতীয় কোন জিনিস মেয়েটি ওর ওপর লাগিয়েছে বোধ হয়। একজিমা সারাবার জন্যে অনেকে লাগায়।

বললাম, "ঘায়ের উপর আলকাতরা লাগিও না।"

মেয়েটির মুখের মুচকি হাসি কমলও না, বাড়লও না। চোখের পাতা দুটি কেবল বার কয়েক ঘন ঘন নড়ল। একটি কথা বলল না সে। যে মলমটা দিলাম সেইটে নিয়ে চলে' গেল।

চার-পাঁচদিন মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। একদিন বিকেলবেলা গঙ্গার ধার দিয়ে অতি সন্তর্পণে মোটর চালিয়ে আসছি, রাস্তাটা খুব খারাপ, আশে পাশে ঝোপঝাড়ও প্রচুর, হঠাৎ দেখতে পেলুম মেয়েটি অশ্বত্থগাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে, একটা ভাঙা কুঁড়েঘরের পাশে। জেলেরা যখন মাছ ধরতে আসে, তখন ওই কুঁড়েঘরে থাকে। এখন খালি, ভেঙেচুরেও গিয়েছে।

ওকে দেখে গাড়ি থামালাম আমি। মনে হল ওর মাথার ঘা দিয়ে রক্ত পড়ছে।

"এখানেই থাক না কি তুমি ?"

মাথা নেড়ে ভাঙা কুঁড়েঘরটা দেখিয়ে দিলে।

বললাম, "ওই ভাঙা ঘরে থাক কি করে' ?"

কোন উত্তর দিলে না। মুখের মুচকি হাসি তেমনি স্থির হ'য়েই রইল।

"তোমার বাড়ি কোথা ?"

চুপ করে' রইল। তার চোখের দৃষ্টিতে আগুনের ঝলক যেন দেখতে পেলাম একটু। ভাবটা—আমার সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন তোমার, যেখানে যাচ্ছ যাও না। একটু চুপ করে' থেকে কিন্তু জবাব দিলে, "বৈরিয়া গাঁয়ে।"

"সে আবার কোথা ?"

"আমদাবাদের কাছে"

"কোন্ জেলা ?"

"পুর্ণিয়া"

"মাথার ঘায়ে মলম লাগিয়েছিলে ?"

"রোজ লাগাই"

"তবু ত রক্ত পড়ছে দেখছি"

চুপ করে রইল।

"আবার এসো আমার ডিসপেন্সারিতে। ভাল করে' দেখব। ঠিক সিঁদুর পরাবার জায়গায় একজিমা হ'ল কী করে' ? আশ্চর্য ত! চুলকেছিলে নাকি ? রক্ত পড়ছে"

মেয়েটি কিছু বলল না। হঠাৎ আমার মনে হল রক্তটাই সিন্দুরের স্থান অধিকার করেছে যেন। মনে হল, যে জেলেরা প্রতিবার এখানে মাছ ধরতে আসে, মেয়েটি তাদেরই বোধ হয় আত্মীয়া। তাই ওই কুঁড়েটা অসঙ্কোচে দখল করেছে।

যদিও মেয়েটির চোখে মুখে একটা বিরুদ্ধভাব সজাগ হ'য়ে ছিল, তবু আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমরা কি? জেলে না কি?"

মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল, "না, আমরা সাপুড়ে"

মেয়েটি মলম নিতে আমার কাছে আর আসেনি। দিন সাতেক পরে একটি ছেলে এসে আমায় খবর দিলে গঙ্গার ধারে অশ্বত্থতলায় একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাকে নিয়ে আসব কি? আমি নিজেই গেলুম। গিয়ে দেখি, সেই মেয়েটি! খুব জ্বর হয়েছে। মাথায় ঘা-টা দগগগে হ'য়ে উঠেছে আরও। হাসপাতালে খোঁজ করলাম, বেড খালি নেই। তখন ছেলেদের বললাম, "ওই কুঁড়েঘরটাতেই নিয়ে যাও ওকে। খড় পেতে বিছানা করে' দাও। তোমাদের ছাত্র-সমিতি ফাণ্ডে টাকা আছে?"

ছেলেটি ছাত্র-সমিতির একজন সভ্য। দুর্গত দুঃখীদের সাহায্য করাই তাদের ব্রত।

"খড় কেনবার টাকা আছে, কিন্তু ওষুধ কেনবার টাকা নেই"

ওষুধের ভার আমিই নিলাম।

খড় কিনে বিছানা করবার জন্যে দুটি ছেলে ঘরের ভিতর ঢুকল। আমিও ছিলাম সে-সময়।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ওর বিছানাপত্র কিছু নেই ভিতরে?"

"কিছু না। একটা কাপড়ে বাঁধা ঝুলি শুধু ঝুলছে চাল থেকে"

"আর কিছু নেই?"

"না"

প্রায় মাসখানেক ভুগে মেয়েটির জ্বর ছাড়ল। অবশ্য ছেলেরা তার নিয়মিত শুশ্রূষা করতে পারত না। কেবল পথ্য দিয়ে আসত। আমি প্রায় প্রতিদিন কিংবা একদিন অন্তর তাকে গিয়ে দেখে আসতুম। একদিন একটি ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে আমাকে যে খবর দিলে তা অবিশ্বাস্য। এরকম যে হ'তে পারে তা কল্পনাতীত।

ছেলেটি বললে, "সর্বনাশ হ'য়ে গেছে ডাক্তারবাবু। মেয়েটিকে গোখরো সাপে কামড়েছে। আর বোধ হয় বাঁচবে না।"

"সাপে কামড়েছে? কি করে বুঝলে তুমি?"

"আমি স্বচক্ষে দেখলুম যে। আমি সাবু দিতে গেছি, গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড একটা গোখরো সাপ ওর গলায় পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে আর তার গালে মুখে ছোবলাচ্ছে। কী প্রকাণ্ড ফণা সাপটার! আমি ভয়ে পালিয়ে এলুম। বাদল আর কানাইকে ডাকলাম, তারা বাড়ি নেই। আপনি যাবেন একবার আপনার বন্দুকটা নিয়ে?"

গেলাম। গিয়ে দেখলাম, গলায় নয়, সাপটা তার ডান বাহুতে জড়িয়ে রয়েছে। সাপের ফণাটা খুব জোরে চেপে রয়েছে মেয়েটি হাত দিয়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম আমি খানিকক্ষণের জন্য। বন্দুক কোথায় ছুঁড়ব? তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল লেজের খানিকটা কাটা। রক্ত পড়ছে।

মেয়েটির তখনও জ্ঞান ছিল।

জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, "আজকে ও জো পেয়েছে। মাস খানেক বিছানায় পড়ে আছি, ওকে কামাতে পারিনি। বিষদাঁত উঠেছে ওর"

"সাপ কি তোমার ওই ঝুড়িতে ছিল নাকি?"

"হ্যাঁ। আমার বিয়ের দিন বাসরঘরে ঢুকে আমার স্বামীকে কামড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ধরে' ফেলেছিলাম ওকে আমি। বেহুলা যেমন যমের সঙ্গ ছাড়েনি, আমিও তেমনি ওর সঙ্গ ছাড়িনি। রোজ ওকে বলেছি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও, আর এই গঙ্গার তীরে তীরে হেঁটে হেঁটে আসছি। গঙ্গার জলেই তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল—"

"সাপের ল্যাজটা কাটা দেখছি।"

"ওরই রক্ত দিয়ে সিঁথেয় সিঁদুর পরি যে রোজ। আজও পরতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আজ ওকে সামলাতে পারলাম না"

দেখলাম মাথায় রক্ত-সিঁদুরের রেখা। বাঁ হাতের তর্জনী আর অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে রক্তাক্ত লেজের টুকরোটাও দেখতে পেলাম।

একটু পরেই তার মৃত্যু হল। সাপটারও হল, কারণ যে বজ্রমুষ্টিতে সে সাপের মাথাটা চেপে ধরেছিল মৃত্যুও তা শিথিল করতে পারেনি।

স্নেহ-প্রসঙ্গ

তখনও মোটর কিনিনি, রিক্‌শা চড়েই যাতায়াত করতাম বাড়ি থেকে। হেঁটে যেতে পারতুম, কিন্তু শরীরে কুলোত না। তাই রিকশার ব্যবস্থা করেছিলাম।"

ভদ্রলোক তখন মুচকি হেসে বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললেন, "বুঝেছি, এইজন্যেই আপনার ভুঁড়ি হয়েছে—। একসারসাইজ করাটা খুব দরকার"

"খুব। আচ্ছা আপনি এক কাজ করুন। আমার দিকে পিছু ফিরে রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকুন"

"কেন বলুন তো?"

"রাস্তায় যেসব মোটা লোক হেঁটে যাচ্ছে তাদের দু' একজনকে ডাকুন"

"ডাকব? এখানে?"

"ক্ষতি কি। ডেকেই দেখুন না—"

"আসবে?"

"আসতেও পারে দু' একজন"

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে' শেষকালে আমার দিকে পিছু ফিরে রাস্তার দিকে চেয়ে বসলেন। একটু পরেই ব্রজবিহারীকে দেখা গেল। বেশ মোটা লোক, হন হন করে' হেঁটে যাচ্ছে। ভদ্রলোক ব্রজবিহারীকে চিনতেন না, আমি চিনতুম।

"শুনুন—"

"আমাকে ডাকছেন?"

"হ্যাঁ।"

"ও, ডাক্তারবাবু, নমস্কার"

এগিয়ে এসে ঢুকল আমার ক্লিনিকে।

"কি বলছেন"

"আমি বলছি না কিছু। উনি জানতে চাইছেন তুমি পায়ে হেঁটেই বরাবর চলাফেরা কর, না রিক্‌শা চড়"

"রিক্‌শা চড়বার পয়সা কই। নিদেন পক্ষে দু' আনা পয়সা চাই রিক্‌শা চড়তে

হ'লে। কিন্তু দু' আনা বাজে খরচ করবার সামর্থ্যও যে আমার নেই, তা আপনার তো জানা উচিত ডাক্তারবাবু"

ব্রজবিহারী সত্যিই গরীব ছা-পোষা গৃহস্থ। একশ' টাকা মাইনে পায়। ছেলেমেয়ে আটটি। বউ চিররুগ্ন। বাড়িভাড়া কুড়ি টাকা।

তারপর ব্রজবিহারী সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলে, "হঠাৎ একথা জানতে চাইছেন কেন উনি?"

বললুম, "উনি একটা থিওরি খাড়া করেছেন যে, যারা রিক্‌শা চড়ে তারা মোটা হ'য়ে যায়, আর যারা হাঁটে তাদের এক্‌সারসাইজ হয় বলে' মোটা হয় না। এই কথা হচ্ছিল এমন সময় তুমি এসে পড়লে, তোমাকে রোগা বলা যায় না"

"রোগা মোটেই নয়, বেশ মোটা লোক আমি। কারণটা কি জানেন? হাঁটি বলে' খুব ক্ষিদে পায়, ভাত খেয়ে পেট ভরাতে হয়, প্রায় আধ সের চালের ভাত খাই, ফ্যানটাও ফেলি না। তাই বোধ হয় মুটিয়ে যাচ্ছি, না? আপনি তো ডাক্তার মানুষ, আপনি তো সবই বোঝেন, আপনাকে আমি আর বলব কি। আচ্ছা চলি"

কপালের ঘামটা আঙুল দিয়ে চেঁছে ফেলে ব্রজবিহারী চলে' গেল।

ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললুম, "দেখলেন তো, আপনার থিয়োরি টিকল না। এক্‌সারসাইজ করলে সব সময়ে ভুঁড়ি কমে না, বড় বড় পালোয়ানদের মধ্যেও অনেকের বেশ ভুঁড়ি আছে। কোন একটা নিয়মে সব মানুষকে ফেলা শক্ত। তবে একটা নিয়ম অনেক সময় খাটে—"

"কি নিয়ম?"

"হাতীর বাচ্চা সাধারণতঃ টিকিটিকির মতো রোগা হয় না। অর্থাৎ প্রায়ই দেখা যায় ছেলেরা শেষ পর্যন্ত বাপ-মায়ের মতোই হয়। আমার বাবাকে তো আপনি দেখেছেন, আড়াই মন ওজন ছিল তাঁর। আমার ঠাকুরদাও বেশ স্থূলকায় লম্বা চওড়া লোক ছিলেন। তাই আমি আর আমার ভাইরা সবাই মোটাসোটা"

"তা না হয় হ'ল। কিন্তু প্রায় বছর চল্লিশ আগে যখন আমি আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম তখন তো আপনি বেশ রোগা ছিলেন।'

ভদ্রলোক প্রথমেই এসে আমাকে বলেছিলেন যে, আমি তাঁকে চিনতে পারছি কি না। অকপটে স্বীকার করেছিলাম, পারছি না। তখন তিনি আমার বাবার কথা

তুললেন, বাড়ির অন্যান্য লোকদের কথাও বললেন। বুঝলাম ১৯১৮ সালের কোনো সময়ে তিনি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখন সত্যিই আমি রোগা ছিলুম।

"আপনি যখন গিয়েছিলেন তার কিছুদিন আগেই আমি ম্যালেরিয়ায় খুব ভুগেছিলাম। তাই হয়তো রোগা দেখেছিলেন"

"তা হবে। আজ কিন্তু সত্যিই আপনার এই পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গেছি। এখন আপনার ওজন কত?"

"চোদ্দ স্টোন"

"হাইট্?"

"পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি"

"হাইট্ অনুসারে বেশ বেশী ওজন আপনার। কিছু কমানো দরকার। আপনি ডাক্তার, আপনাকে কিছু বলতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা।"

তারপর একটু হেসে তিনি আসল কথাটি প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন বোধহয়, এমন সময় বাধা পড়ল, লাখপতিয়া এসে হাজির হল। তার মাথায় প্রকাণ্ড এক ঝুড়ি, তার মধ্যে প্রকাণ্ড এক পিতলের হাঁড়ি। তার পরনের শাড়িখানি লাল আর হলুদ রঙের এক বিচিত্র লীলা, আঁটসাঁট করে পরা, আঁচলটি কোমরে জড়ানো। দুহাতে কাঁসার চুড়ি, পায়ে কাঁসার মল। বলিষ্ঠা। প্রৌঢ়া আহিরিণী গোয়ালিনী লাখপতিয়া। গলার স্বরটিও কন্‌কনে; কাঁসার বাসনে আঘাত লাগলে যে ঝঙ্কার ওঠে, সে ঝঙ্কার ওর গলায়। ভাষাটি মধুমাখা।

এসেই বললে, "বাবুয়া, ঘি কব চাহিঁ?"

"কাল—"

"আচ্ছা"

চলে গেল।

ভদ্রলোককে বললাম, "আমার মেদ বহুলতার আর একটা কারণ মনে পড়ছে। তার সঙ্গেও কিন্তু রিক্‌শা জড়িত"

"কি রকম?"

"অনেক দিন আগেকার কথা। থাক···শুনলে হয়তো বিশ্বাস করবেন না—"

"না, না বিশ্বাস করব না কেন?"

"পৃথিবীতে এখনও যে খাঁটি জিনিস আছে একথা বিশ্বাস করে না কেউ। ও কথা

বলে' হাস্তাস্পদ হ'য়ে লাভ কি। বৈজ্ঞানিক গবেষণা আজকাল প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে যে মাতৃস্নেহও খাঁটি নয়, তাতেও স্বার্থের ভেজাল আছে। সুতরাং—"

"না না আপনি বলুন। আমি বিশ্বাস করব—"

"তবে শুনুন। বছর তিনেক আগেকার ঘটনা। তখন যে রিক্‌শাওয়ালাটা আমাকে নিয়ে যেত তার নাম মদন বা পুলক বা ওই জাতীয় কিছু একটা হ'লে মানাতো ভালো। দশ আনা ছ' আনা চুল ছাঁটা, গোঁফটি বাটার-ফ্লাই, মুখে সর্বদাই মুচকি হাসি; বিকেলের দিকে প্রায়ই দেখা যেত এক ছড়া বেল ফুলের মালা গলায় দিয়েছে, কিংবা হাতে জড়িয়ে রেখেছে। নাম ছিল ঝকৃস্থ। প্রিয়দর্শন ছোকরা, মিষ্টি কথা, চোখে মুখে এমন একটা ভাব যেন সে আপনার জন্মে যে কোনও কৃচ্ছ্রসাধন করতে সর্বদাই প্রস্তুত। এইসব কারণে তাকে বাহাল করেছিলুম। তারই রিক্‌শাতে যাতায়াত করতাম। আর সে রোজ এসে ঠিক সময়মতো হাজির হতো আমাকে নিয়ে যাবার জন্মে। এই ভাবেই বেশ চলছিল, এমন সময় হঠাৎ একদিন ছন্দপতন হ'ল। দুপুরবেলা প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ আমি ক্লিনিক বন্ধ করে' বাড়ি যাই, রিক্‌শাও ঠিক সেই সময় আসে। সেদিনও এসেছিল। কিন্তু বেরিয়ে দেখি রিক্‌শাটা রয়েছে, ঝকৃস্থ নেই। রাস্তায় নেবে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলাম, দেখতে পেলাম না। কি করব ভাবছি এমন সময় তার চীৎকার শুনতে পেলাম—বাঁচাও, বাঁচাও। সামনে একটা গলি ছিল সেই গলির ভিতর থেকে চীৎকারটা আসছে। এগিয়ে গিয়ে ঢুকলাম গলিটার মধ্যে। ঢুকে যা দেখলাম তা অপ্রত্যাশিত। একটা বলিষ্ঠ মেয়ে ঝকস্থর গলায় গামছা দিয়ে তাকে ঠাস ঠাস করে' চড়াচ্ছে। জাঁতিকলে পড়লে নেংটি ইঁদুরের যে দুর্দশা হয়, ঝক্‌স্থর তাই হয়েছে। চড়ের চোটে দুটি গালই লাল হ'য়ে উঠেছে, নাক দিয়ে রক্তও পড়ছে। সম্ভবত নাকের উপর ঘুষিও চালিয়েছে মেয়েটি। এ অবস্থায় প্রথমেই যে কথা মনে হওয়া উচিত, আমারও তাই হ'ল। নিশ্চয়ই অবৈধ প্রণয়ঘটিত ব্যাপার কিছু। এসব ব্যাপারে নাক-গলানো সমীচীন হবে কি না ভাবছি, এমন সময় ঝকৃস্থ আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—জান গিয়া, বাঁচাইয়ে হুজুর। মেয়েটি তখন তার বাটার ফ্লাই গোঁফের উপরই ঘুঁষি চালিয়েছে একটা। নাক-গলাতে হ'ল।

"এই ঠহরো। ক্যা হুয়া হ্যায়—"

তখন সেই মেয়েটি আভীর-ভাষায় খনখনে গলায় যা বললে তার সারমর্ম এই যে,

ঝকৃস্থ একদা তার প্রতিবেশী ছিল। তার রোগা চেহারা দেখে তার প্রতি তার একটা অপত্য স্নেহ হয়। ফলে, যে গরুর দুধ বেচে তাকে সংসার চালাতে হয় সেই গরুর দুধ নির্জলা সে ঝকৃস্থকে দিতে লাগল। মানে কোন লাভ না নিয়ে দুধ খাওয়াতে লাগল তাকে। ঝকৃস্থ তখন রিকৃশা চালাত না, মজুর খাটত। ইট মাথায় নিয়ে ভারা বেয়ে উপরে উঠতে হ'তে তাকে। ঝকৃস্থ বলেছিল মজুরি থেকে কিছু কিছু জমিয়ে মাসের শেষে দুধের ন্যায্য দামটা সে দিয়ে দেবে। কিন্তু দুমাস কেটে গেল ঝকৃস্থ একটি পয়সাও দিলে না। তারপর হঠাৎ একদিন সরে' পড়ল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে যেখানে ও কাজ করত সেখান থেকে সমস্ত মজুরী পাই পয়সা নিয়ে নিয়েছে। তারপর একদিন দেখা গেল ও রিকৃশা চালাচ্ছে। গয়লানীর সঙ্গে দেখা হলেই জোরে সাইকেল চালিয়ে সরে পড়ে। ছ'মাস ধরে' এইভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ঝকৃস্থ। আজ ধরা পড়ে' গেছে। আজ পয়সা আদায় না করে' কিছুতে ছাড়বে না সে। মারতে মারতে ওর 'থোৎনা' চুর করে' দেবে।

জিগ্যেস করলুম—"কত পাবে ওর কাছ থেকে?"

সে আহীর ভাষায় জবাব দিলে, "টাকায় পাঁচ পোয়া করে দুধ বেচি আমি। কিন্তু ওকে টাকায় দেড় সের করে' দেব বলেছিলুম। তাই দেব। ও বারো সের দুধ খেয়েছে। আট টাকা পাওনা আমার"

বললাম, "আচ্ছা, আমি দাম দিয়ে দিচ্ছি। ওকে ছেড়ে দাও তুমি"

"তুমি দেবে? তুমি দেবে কেন? দিলে ওর কাছ থেকে আর আদায় করতে পারবে না। বড় বদয়াস ছে—"

আমি ওর রিকৃশা চড়ে' রোজ যাই। আমি ভাড়া থেকে কেটে নেব"

টাকাটা ঝকৃস্থর কাছ থেকে আদায় করেছিলাম কি না সে কথা এ গল্পের পক্ষে অবান্তর হ'ত যদি না সেই গয়লানী একদিন এসে আমাকে প্রণাম করে' আমার সামনে ছোট একটি ঘটি নামিয়ে রাখত।

"খুব ভাল ঘি ডাক্তারবাবু, খেয়ে দেখবেন। আপনার জন্মে এনেছি"

"আমার তো ঘিয়ের দরকার নেই এখন"

লাখপতিয়া প্রথমে একটু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ল, তারপর ধমকের সুরে বলল, "আমি কি তোমার কাছে দাম চাইছি না কি। খেয়ে দেখো এমন খাঁটি ঘি এ তল্লাটে পাবে না"

"আমাকে বিনা পয়সায় ঘি দিচ্ছ কেন ?"

মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হেসে বললে—"এইসেই—"

বুঝলাম আমার প্রতিও ওর স্নেহ সঞ্চার হয়েছে।

বললাম, "ঘি নিতে পারি, কিন্তু দাম নিতে হবে, এমনি নেব না"

"বেশ দামই দিও। তোমার পয়সা আছে দাম দেবে বই কি" কণ্ঠস্বরে অভিমানের সুর। দাম দিয়ে ঘিটুকু নিয়ে নিলুম। ওরকম ভাল ঘি বহুদিন খাইনি। সেই থেকে লাখপতিয়া বরাবর আমাকে ঘি খাওয়াচ্ছে। আমার ভুড়ির এ-ও একটা কারণ।"

পরমুহূর্তেই লাখপতিয়া এসে প্রবেশ করল আবার।

"আমি বাবু, কাল আসতে পারব না, আমার বেটি শ্বশুরবাড়ি থেকে আসবে, তোমার ঘি আজই দিয়ে গেলুম"

চকচকে মাজা একটি ঘটিতে এক ঘটি ঘি দিয়ে লাখপতিয়া চলে গেল। খাঁটি ঘিয়ের গন্ধে ঘর ভরে' উঠল।

ভদ্রলোককে জিগ্যেস করলাম—"আপনার কি কোন কাজ আছে আমার কাছে? না, এমনিই দেখা করতে এসেছিলেন ?"

তিনি বললেন—"অ্যান্টি-ফ্যাট ট্যাবলেট বলে একরকম ট্যাবলেট বেরিয়েছে জার্মানী থেকে। চর্বি কমাবে। আমি তার এজেন্সি নিয়েছি। আপনাকে কিছু স্যাম্পল দিয়ে যাচ্ছি, ব্যবহার করে দেখবেন।"

"আপনার ট্যাবলেট কি লাখপতিয়ার ঘিকে ঠেকাতে পারবে ? কারণ ওর ঘি আমাকে খেতেই হবে। না খাইয়ে ও ছাড়বে না।"

লাখপতিয়া আবার এল। খনখনে গলায় বলল—"বলতে ভুলে গিয়েছিলাম ঘি এক সের এক ছটাক আছে। তুমি একসেরের দামই দিও"

আত্মহত্যা

চন্দ্রমাধব আশ্চর্য লোক। সে ঘোর শীতে আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে, আবার ঘোর গ্রীষ্মে গরম জামা পরতেও তার আপত্তি নেই। উচ্ছে দিয়ে মাংস খেতে এবং হার্ড পেন্সিলে লিখতে ভালবাসে। কথা খুব কম বলে। প্রায়ই গম্ভীর হ'য়ে থাকে। যখন হাসে তখনও নীরবে হাসে, হাসলে টেবো গাল দুটি ফুলে ওঠে, চোখ বুজে যায়। সুপুষ্ট গোঁফের প্রান্ত দু'টি ভুরুর কোণে গিয়ে খোঁচা মারে। আশ্চর্য ওর গোঁফ জোড়া। ওরকম গোঁফ কারো দেখিনি। এক জোড়া জীবন্ত ফিঙে পাখী যেন ওর ওপরের ঠোঁটে মুখোমুখি বসে' আছে। যখন চন্দ্রমাধব রেগে যায় তখন যুগল ফিঙে পাখীর দ্বিধাবিভক্ত পুচ্ছ দুটি খাড়া হ'য়ে উঠে কাঁপতে থাকে। সূক্ষ্ম পাকানো গোঁফের প্রান্ত অনেক দেখেছি কিন্তু এমন দ্বিধাবিভক্ত ব্যঞ্জনা-ভরা ভাষাময় গুম্ফপ্রান্ত আর কারও দেখিনি। অদ্ভুত ওর গোঁফ। ওর মনের ভাব ও গোঁফ দিয়েই প্রকাশ করত। যখন কারো সঙ্গে ওর অমিল হত তখন গোঁফের ডগা দুটি নড়ে' নড়ে' যেন বলত না, না, না।

একদিন সকালে এসে হাজির। দেখলাম গোঁফের ডগা দুটি ঝুলে পড়েছে। তার মুখের দিকে চেয়ে আছি। সম্ভবত আমার দৃষ্টিতে প্রশ্নও ফুটে উঠেছিল একটা। চন্দ্রমাধব পকেট থেকে একটি টাকা বার করে' বললে—"এক টাকার জিলিপি আনিয়ে খা—"

"কেন, হঠাৎ?"

"মা মারা গেছেন। তিনি জিলিপি খেতে এবং জিলিপি খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন"

আমার কাছ থেকে আর কয়েকজন বন্ধুর খবর নিয়ে গেল তারা কোলকাতায় আছে কি না। শুনলাম প্রত্যেককে গিয়ে জিলিপি খাইয়েছে।

আর একদিন দেখি তার গোঁফের ফিঙে দুটি যেন উন্মনা, উড়ু উড়ু করছে। 'মেকি কি' 'মেকি কি' বলে' ডেকে উঠল বুঝি।

"কি ব্যাপার চন্দ্রমাধব—"

চন্দ্রমাধব কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর হাসল। চোখ বুজে গেল,

গোঁফের আলুলায়িত পুচ্ছ গিয়ে মিলল ঘন ভ্রূর সঙ্গে। প্রায় চুপিচুপি বললে,

"প্রেমে পড়েছি—"

"সে কি! কার সঙ্গে?"

"রমলার"

মাসখানেক কেটে গেছে তারপর।

একদিন ঘরে ফিরে দেখি আমার বিছানায় আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে কে যেন ঘুমোচ্ছে।

"কে—"

মুখের ঢাকা খুলতেই যেন ভূত দেখে চমকে উঠলাম। চন্দ্রমাধব। কিন্তু গোঁফ নেই। পরিষ্কার কামানো।

"এ কি করলি!"

"রমলার অন্য জায়গায় বিয়ে হ'য়ে গেছে।"

একই বারান্দায়

আমার ডিসপেন্সারির সংলগ্ন ছোট একটি বারান্দা আছে। তার উপরে দিনে ধুলো জমে, রাত্রে কুলি আর রিক্‌শাওলারা শোয়। গভীর রাত্রে সেখানে মাঝে মাঝে জুয়ারও আড্ডা বসে শুনেছি। একদিন ডিসপেন্সারিতে বসে আছি এমন সময় সেই বারান্দায় আর একরকম সম্ভাবনা আভাষিত হল হঠাৎ।

একটি উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে এসে ডিসপেন্সারিতে প্রবেশ করল এবং নমস্কার করে' কাচুমাচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। রোগী নয়, সাহায্যপ্রার্থী। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। পূর্ববঙ্গের ভাষায় সসঙ্কোচে বললে, "বড় দুরবস্থায় পড়েছি। কিছু সাহায্য চাই।" এর আগে এরকম সাহায্য আরও অনেকে করেছি। দু' এক টাকা দিলেই চুকে যেত। কিন্তু আমার মনে এক উদ্ভট প্রেরণা এল।

বললাম, "সামান্য দু' এক টাকা নিয়ে কি আপনার অভাব মিটবে? এরকম ভিক্ষে করেই বা চলবে কতদিন?"

"আমাকে একটা চাকরী জুটিয়ে দিন কোথাও"

"লেখাপড়া কতদূর করেছ?"

"ম্যাট্রিক পাশ করেছি"

"ম্যাট্রিক পাশ ছেলের তো কোথাও ভাল চাকরি জুটবে না। তার চেয়ে তুমি ছোটখাটো দোকান কর না কোথাও—"

"ক্যাপিটাল কে দেবে আমাকে!"

"বেশী ক্যাপিটাল দিয়ে কি হবে। খুব কম ক্যাপিটাল নিয়ে আরম্ভ কর কিছু, দোকানদারি করবার অভিজ্ঞতাটা হোক আগে। তারপর বেশী ক্যাপিট্যাল নিয়ে বড় কিছু করবার যোগ্যতা হবে—"

"কি করিব বলুন—"

"আমার এই ডিসপেন্সারির সামনে দিয়ে এই বড় রাস্তা চলে' গেছে। কত লোক যাচ্ছে আসছে। তুমি কয়েক বাণ্ডিল বিড়ি দেশলাই নিয়েই বসে' যাও না। অনেক ছেলেমেয়েও রোজ স্কুলে যায় এদিক দিয়ে, খাতা পেন্সিল,

কালির বড়ি—এসবও কিছু কিছু রাখতে পার। আমার এই চওড়া বারান্দা রয়েছে, এরই ওপর বসে' যাও কাল থেকে—"

"ওসব জিনিস কেনবারও টাকা নেই আমার কাছে"

"আচ্ছা আমি দিচ্ছি তোমায় দশটা টাকা—"

দশ টাকা দিলাম। টাকা নিয়ে সে জিনিসপত্রও কিনে আনল। একটা মাদুর দিলাম, সেটা বারান্দায় বিছিয়ে হর্ষকুমার দোকান সাজিয়ে বসল। লজেন্সও এনেছিল কিছু। তাই ছেলেমেয়েরা আসতে লাগল। প্রথম মুশকিল হ'ল ভাষা নিয়ে। হর্ষকুমারের ভাষা বিহারী ছেলেমেয়েরা বোঝে না, তাদের ভাষা হর্ষকুমার বুঝতে পারে না। তারপর লক্ষ্য করলাম হর্ষকুমারের কথা বলবার ধরনটাও মোলায়েম নয়, মুখভাবও স্নিগ্ধ নয়। সে সকলের সঙ্গে যেন খেঁকিয়ে কথা বলছে। যদিও সে মাটির উপর মাদুর বিছিয়ে বসে' আছে এবং তার পুঁজিমাত্র দশ টাকা, কিন্তু তার হাবভাব যেন নবাব খাঞ্জা খাঁর মতো। সম্ভ্রমাত্মক হিন্দী 'আপ' শব্দটা তার জানা ছিল না। কোন ছেলে তাই তার দোকানে এসে জিনিসে হাত দিলেই সে মাতৃভাষায় খিঁচিয়ে উঠত—"এই ছ্যামড়া, ও কি করস।" তার ভাবভঙ্গি দেখে ছেলেগুলো প্রথম প্রথম হাসত খুব। তারপর ছেলেদের যা স্বভাব ক্ষ্যাপাতে শুরু করলে তাকে। নামই বার করে' ফেললে তার একটা—করসবাবু। 'এ করসবাবু' 'এ করসবাবু' বলে রোজ এসে চীৎকার করত তারা তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। আমি শুদ্ধ অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়লুম। বিক্রি অবশ্য হ'ত কিছু-কিছু রোজই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হর্ষকুমার দোকান টিকিয়ে রাখতে পারল না। একদিন এসে বলল আমাকে যে দেশে তার জমিদারি ছিল, সে জমিদারের ছেলে, এরকম উঞ্ছবৃত্তি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যেন তাকে ক্ষমা করি। পরদিনই আমার বারান্দা থেকে উঠে গেল। দিন কয়েক পরে আমার দশটা টাকাও ফেরত দিয়ে গেল। এইখানেই যবনিকাপাত হ'ল—এই আমার মনে হয়েছিল তখন। কিন্তু যবনিকাপাত হ'ল মাস তিনেক পরে। হর্ষকুমার আর একদিন এসেছিল। একেবারে ফুলবাবু সেজে এসেছিল। মাথায় ঢেউ-খেলানো তেড়ি, কব্জিতে রিস্টওয়াচ, পরনে হাওয়াই কোট আর ছিটের প্যাণ্ট। বললে—চাকরি পেয়েছি একটা! জিজ্ঞাসা করলাম মাইনে কত। বললে, পঁয়তাল্লিশ টাকা। পরে আরও বাড়বে। দেখলাম এইতেই সে খুব খুশী।

উক্ত ঘটনার মাস ছয়েক পরে একদিন আর একটি সৌম্যদর্শন যুবক হাজির হল আমার বারান্দায়। এ-ও উদ্বাস্তু। পাঞ্জাব থেকে এসেছে। তার সুন্দর চেহারা দেখে মুগ্ধ হলাম। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সে সবিনয়ে নমস্কার করে' এগিয়ে এল। হিন্দী ভাষায় জানাল তার একটি প্রার্থনা আছে আমার কাছে।

"কি প্রার্থনা ?"

সে বললে যে, আমার বারান্দায় সে ছোটখাটো একটা চায়ের দোকান করতে চায়। সে গরীব উদ্বাস্তু, মাসে পাঁচ টাকার বেশী 'কেরায়া' (ভাড়া) দিতে পারবে না। আমি যদি মেহেরবানি করি তাহলে বড়ই উপকৃত হয় সে।

তাকে বললাম, বেশ দোকান কর। ভাড়া দিতে হবে না।

কৃতার্থ হয়ে গেল সে যেন।

পরের দিনই যজ্ঞদত্ত তার দোকান ফেঁদে ফেললে। তার সম্বল একটা তোলা কয়লার উনান, কিছু পিরিচ পেয়ালা, এক বালতি জল, কিছু চা দুধ আর চিনি। উনুনটা বাইরে থেকেই ধরিয়ে আনত। ধোঁয়ার জন্য আমাকে কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি।

উপরন্তু আমার নানারকম সুবিধা করে' দিয়েছিল সে। আমাকে এবং আমার বন্ধুবান্ধবদের বিনা পয়সায় চা খাওয়াতো। রোজ সকালে এসেই আমার ডিসপেন্সারি ঘরটি ঝাড়ু দিত, টেবিল চেয়ার ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কারভাবে জল ভরে' আনত। একদিন বললে—ডাক্তারবাবু, আপনার জুতোয় অনেক দিন কালি দেওয়া হয়নি, যদি হুকুম করেন কালি বুরুশ করে' দিই। নিজের জুতোর দিকে চেয়ে লজ্জিত হয়ে পড়লাম। সত্যিই অনেক দিন কালি দেওয়া হয়নি।

বললাম, "থাক। তোমাকে করতে হবে না। ভুটুয়া ক'রে দেবে'খন।"

"আমি দিচ্ছি হুজুর। ভুটুয়ার চেয়ে আমি অনেক ভাল পারব। আপনি দেখুন—"

জোর করে' আমার পা থেকে জুতো জোড়া খুলে নিল। আর সত্যিই এমন চমৎকার বুরুশ করে' দিলে যে, তাক লেগে গেল আমার। কোন মুচিও বোধ হয় এমন চমৎকার করে' করতে পারত না।

আমি খুব খুশী হলাম তার উপর। শুধু আমি নয়, আমার গৃহিণীও হলেন। কারণ গৃহিণীর প্রধান সমস্যা ছিল সকাল বেলার বাজার। আমার ডিসপেন্সারির

চাকর ভুটুয়া ডিসপেন্সারির কাজকর্ম সেরে তবে বাজার করতে যেত। যজ্ঞদত্ত তার কাজের ভার নেওয়াতে সে সকাল সকাল ছুটি পেত, বাজারও পৌঁছত ঠিক সময়ে। যজ্ঞদত্তের দোকানও বেশ জেঁকে উঠল।

তার ভদ্র ব্যবহারে আর সুন্দর চেহারায় সবাই আকৃষ্ট হ'ত তার দোকানে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চা খেয়ে যেত অনেকে। ক্রমশ সে বিস্কুট আর কেকও আমদানি করলে। বেশ চলতে লাগল দোকান।

দিনকতক পরে রাস্তার ওপারে একটি ঘর খালি হল। যজ্ঞদত্ত তার দোকান উঠিয়ে নিয়ে গেল সেখানে। টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজাল দোকানটিকে। তারপর একদিন দেখলাম চপ কাটলেটও ভাজা হচ্ছে সেখানে।

যজ্ঞদত্ত দোকান অন্য জায়গায় উঠিয়ে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক আগে যেমন ছিল, তখনও তেমনি রইল। আমার ডিসপেন্সারি ঝাড়ু দেওয়া, চেয়ার টেবিল ঝাড়া, কুঁজোয় জল ভরা এবং মাঝে মাঝে জুতো বুরুশ করা—ঠিক আগের মতোই চলতে লাগল। যজ্ঞদত্ত আমার নির্ভরযোগ্য আপনজন হয়ে উঠল ক্রমশ।

একদিন সে এসে একখানি চিঠি আমাকে দিলে। বললে, "আমি ইংরেজী পড়তে পারি না, চিঠিটাতে কি আছে মেহেরবানি করে' পড়ে দিন।" দেখলাম চিঠিখানা দিল্লী থেকে এসেছে। তাতে যা লেখা আছে, তা পড়ে বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে গেলাম আমি। লেখা আছে তাদের পশ্চিম পাকিস্তানে যে সম্পত্তি ছিল তা বিক্রি করা হয়েছে এবং তার অংশের এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা সরকারের কাছে জমা করা হয়েছে। যজ্ঞদত্ত যেন আইন অনুসারে সে টাকাটা নেবার ব্যবস্থা করে। যজ্ঞদত্তকে চিঠির মর্ম বললাম।

জিজ্ঞাসা করলাম—"কি সম্পত্তি ছিল তোমার?"

"জমিদারি ছিল হুজুর। জুয়েলারির কারবার ছিল। হাতি বাঁধা থাকত আমাদের দুয়ারে—"

ইচ্ছে হল যজ্ঞদত্তকে প্রণাম করি একটা। কিন্তু তা আর পারলাম না।

বিনতা দস্তিদার

শ্রীবিরূপাক্ষ ভৌমিক যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স বাহান্ন বৎসর। তাঁর বন্ধু—একমাত্র বন্ধু—ত্রিপুরা সেন বলেন তিনি প্রেমে পড়ে বিনতাকে বিয়ে করেছিলেন। ত্রিপুরা সেন মানা করা সত্ত্বেও করেছিলেন। প্রেমে পড়লে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

ত্রিপুরাবাবুর সঙ্গে বিরূপাক্ষ ভৌমিকের আলাপ প্রায় বছর দশেকের। আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল ক্রমশ। প্রথম আলাপ হয়েছিল কারণ দু'জনেরই পেশা ছিল এক, দু'জনেই ইন্‌শিওরেন্সের দালাল। অন্তরঙ্গতা হবার আর একটা বিশেষ কারণ ছিল—দু'জনেই বেশ অশ্লীলতাপ্রিয় ছিলেন। দু'জনের কাছেই পর্নোগ্রাফির অনেক বই ছিল এবং দু'জনেই মেয়েদের সম্বন্ধে যে ধরনের আলোচনা করতেন তা ভদ্রলোকের পক্ষে অশ্রাব্য। এই প্রবৃত্তিই তাঁদের বন্ধুত্বকে নিবিড়তর করেছিল। বিরূপাক্ষবাবু বিপত্নীক এবং ত্রিপুরাবাবু অবিবাহিত, সেজন্য আরও জমেছিল অন্তরঙ্গতাটা। ভালবাসার ভাগীদার ছিল না কেউ। এক বাড়িতে বাস করতেন দু'জনে। এক গলিতে দোতলার উপর ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন তাঁরা। পাশাপাশি দুটি শোবার ঘর, তাছাড়া একটি বসবার ঘর এবং রান্নাঘর। দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট।

পর্নোগ্রাফি পড়া ছাড়া দুজনের অবসরবিনোদনের আর একটি উপায় ছিল। সন্ধ্যার পর দুজনে যখন মিলিত হতেন তখন আলোচনা করতেন কার চোখে সেদিন কি রকম মেয়ে পড়েছে। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাব-ভাবের বর্ণনায় মশগুল হ'য়ে যেতেন তাঁরা।

এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন ত্রিপুরা এসে বললেন, "বুকে ছুরি মেরে দিয়েছে দাদা আজ। একেবারে ঘায়েল হয়ে গেছি!"

উৎসুক বিরূপাক্ষ বললেন—"কি রকম? কে মারল বুকে ছুরি—"

"বিনতা দস্তিদার!"

"সে আবার কে—!"

"আমাদেরই কম্পানির একটি এজেন্ট। আজই বাহাল হয়েছে। আপিসে

এসেছিল আজ। তুমি তো গেলে না, গেলে দেখতে পেতে কি মাল একটি। চোখের চাউনি যেন চাকু ছুরি। ঘ্যাঁচ করে' বুকে বসে' যায়।"

লালায়িত হয়ে উঠলেন বিরূপাক্ষ।

"ওফ্ বড্ড মিস করেছি তো!"

"মিস কর নি। আবার সে আসবে কাল। সে তোমাকে চেনে বোধ হয়। তোমার খোঁজ করছিল। আমি তাকে বলেছি কাল তুমি আপিসে আসবে"

"আমাকে চেনে? বিনতা দস্তিদার? মনে পড়ছে না তো। বয়স কত হবে—"

"কুড়ির নীচেই। অর্ধস্ফুট গোলাপ—"

বিনতার সঙ্গে বিরূপাক্ষের যখন দেখা হ'ল তখন একটা জিনিস দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। তার মুখের নিচের দিকটা ওড়না দিয়ে ঢাকা। থুতনিও ভাল করে' দেখা যায় না। মনে হয় যেন কোনও বোরখা-পরা মেয়ে মুখের উপরার্ধটা খুলে দিয়েছে। আলাপ হবার পরই বিরূপাক্ষ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আপনার পোশাকের একটু নতুন রকমের বৈচিত্র্য আছে দেখছি।, এদেশে হিন্দু মেয়েদের এরকমটা প্রায় দেখা যায় না—।"

বিনতা উত্তর দিয়েছিল—"না, এদেশের পোশাক নয়। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে মিশরে গিয়েছিলাম। সেখানে এই রকম পোশাক অনেক মেয়ে পরত। খু-উ-ব ভাল লাগত আমার। সেই জন্যে যখনই বাইরে বেরুই এই পোশাক পরি! দেখতে ভালো নয়?"

"চমৎকার।"

...বিনতার সঙ্গে বিরূপাক্ষের ঘনিষ্ঠতা হ'তে বিলম্ব হয় নি। বিরূপাক্ষকে সেজন্য বেশী চেষ্টাও করতে হয় নি। বিনতাই বিরূপাক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে বেশী উৎসুক এই কথা মনে হয়েছিল ত্রিপুরা সেনের। বিনতাই হোটেলে নিমন্ত্রণ করত বারবার তাকে। সিনেমার টিকিট কিনে আনত তার জন্যে। তাকে একলা ডেকে নিয়ে যেত ইডেন গার্ডেনে, চিড়িয়াখানায়, হঠাৎ ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে উধাও হয়ে যেত দু'জনে মাঠের দিকে। বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন বিরূপাক্ষ, লোলুপ হ'য়ে উঠলেন ত্রিপুরা সেন। স্বাভাবিক নিয়মে ত্রিপুরা সেনের ঈর্ষাও হ'তে লাগল খুব। কিন্তু চতুর লোক ছিলেন ত্রিপুরা, মনের ভাব গোপন করার দক্ষতাও

ছিল তাঁর। তিনি যে ঈর্ষাক্লিষ্ট বা লোলুপ, এটা ঘুণাক্ষরে জানতে দিলেন না বিরূপাক্ষকে। মাঝে মাঝে কেবল ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করতেন—"কি ভায়া, গাঁথতে পারলে ?"

বিরূপাক্ষ বলতেন, "আমারই গলায় বঁড়শি আটকে গেছে। ছটফট করছি।"

"থুতনির সামনের পরদা নেবেছে ?"

"না। সেটা ও সহজে নাবাবে না"

"কেন ?"

"নাবাবে না তার খুশি"

দিন কয়েক পরে বিরূপাক্ষ একদিন বললেন, "এইবার বোধ হয় যবনিকা পতন হবে মনে হচ্ছে"

"কি রকম—"

"ও আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। বলছে বিয়ের পর ও থুতনির পরদা সরিয়ে ফেলবে। ফুলশয্যার রাত্রেই ফেলবে বলছে"

"একটা অজ্ঞাতকুলশীলাকে বিয়ে করবে ? সেটা কি বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে ?"

"হবে না তা বুঝতে পারছি। কিন্তু ওকে আমার চাইই। ওর কালো চোখের চাউনি পাগল করেছে আমাকে। ও স্পষ্ট বলে' দিয়েছে বিয়ে না করলে ও ধরা দেবে না"

"কিন্তু তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। প্রত্যেক স্ত্রীলোককেই কেনা যায়। মূল্যের ইতরবিশেষ হ'তে পারে কিন্তু কেনা যায়। এ লাইনে চেষ্টা করে দেখ না"

"দেখেছি। বিনতাও বিক্রীত হতে রাজী, কিন্তু তার মূল্য ওই—বিবাহ করতে হবে"

বিনতাসঙ্গে রবিরূপাক্ষ ভৌমিকের বিবাহ হয়েছিল অনতিবিলম্বে। ঠিক তার পরের ঘটনাটা খবরের কাগজে অনেকে হয়তো পড়েছেন। ফুলশয্যার রাত্রেই বিরূপাক্ষ ভৌমিকের মৃত্যু হয়েছিল। ডাক্তার ঘোষালের মতে হার্টফেল করে' মারা গিয়েছিলেন ভৌমিকমশাই। কাগজে এর বেশী খবর আর বেরোয় নি।

ত্রিপুরা সেন তাঁর ডায়েরিতে কিন্তু এ বিষয়ে যা লিখেছেন তা বিস্ময়কর।

তিনি লিখছেন—"বিরূপাক্ষবাবুর ফুলশয্যার রাত্রে আমি আড়ি পেতে ছিলাম, তির্যকভাবে আনন্দ উপভোগ করবার জন্যে। ইংরেজীতে যাকে বলে Vicarious pleasure. ঠিক আমার পাশের ঘরেই ফুলশয্যা হয়েছিল, আমাকে খুব অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি এজন্য। একটা জানলার ফুটো দিয়ে আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। বিনতা শেষ পর্যন্ত তার গলার সামনে সেই নীল ওড়না টাঙিয়ে রেখেছিল। বিয়ে হয়েছিল তিন আইন অনুসারে। সুতরাং সে ওড়না সরাবার প্রয়োজন হয় নি। বিনতা যখন ফুলশয্যার খাটে উঠল তখনও তার গলার সামনে নীল-ওড়না। বিরূপাক্ষ বেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। একটু অধীরকণ্ঠে বলল—"এইবার ওটা সরিয়ে দাও না বিনতা।" "এই যে দিচ্ছি"—বলে' বিনতা ওড়নাটা খুলে ফেলে দিয়ে এমন গ্রীবাভঙ্গি করে' বসে রইল যে আমি চমকে গেলাম। আমার মনে হল ঠিক যেন একটা সাপ ফণা তুলে রয়েছে। অনেক সাপের গলায় কালো কালো ডোরা থাকে। বিনতার গলাতেও ছিল। চার-পাঁচটা ঘন-কালো রেখা। হঠাৎ মনে হয় চামড়ার নিচে বুঝি রক্ত জমে' আছে। চীৎকার করে' উঠল বিরূপাক্ষ—"কে, কে, কে তুমি? তুমি কি—?" খিলখিল করে' হেসে উঠল বিনতা। তারপর একেবারে অন্যরকম কণ্ঠে জবাব দিল—"হ্যাঁ, আমি সেই।" আর্তনাদ করে' অজ্ঞান হয়ে গেল বিরূপাক্ষবাবু। বিনতা বিছানা থেকে নেবে এসে ঘরের খিল খুলল। খুলেই আমাকে দেখতে পেল সে। সহজকণ্ঠে বলল—"ডাক্তার ঘোষালকে একবার খবর দিন তো। উনি অজ্ঞান হ'য়ে গেছেন।" ডাক্তার ঘোষাল এসে ভৌমিকমশাইকে আর জীবিত দেখেন নি। বিনতা ঠিক তারপরই চলে গেল। ঠিক যেন উপে গেল। শবানুগমনও সে করে নি। আশ্চর্য মেয়ে—"

বিরূপাক্ষবাবুর মৃত্যুর এক বছর পরে সি. আই. ডি. বিভাগের একটি কর্মচারী একদিন বিরূপাক্ষবাবুদের অফিসে এলেন। তিনি একটি ফোটো ত্রিপুরা সেনকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন—"এই চেহারার কোনও লোক কি আপনাদের আপিসে কাজ করেন?" ত্রিপুরা সেন অনেকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইলেন ফোটোটার দিকে। চেনা-চেনা মনে হচ্ছে অথচ ঠিক চিনতে পারছেন না। তারপর হঠাৎ পারলেন। বিরূপাক্ষবাবুর ফোটো, কিন্তু অনেকদিন আগের, সম্ভবত তাঁর যৌবনকালের।

বললেন—"বিরূপাক্ষবাবুর ফোটো মনে হচ্ছে—"

"হ্যাঁ, তিনি ওই ছদ্মনামেই আপনাদের আপিসে কাজ করেন শুনেছি। তিনি কোথায় ?"

"তিনি তো বছরখানেক আগে মারা গেছেন"

"ও"

"তাঁকে কেন খুঁজছেন ?"

"তিনি একজন ফেরারি আসামী। প্রায় একুশ বছর আগে তিনি তাঁর স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করেছিলেন—"

"বলেন কি—!"

ত্রিপুরা সেনের চোখের সামনে বিনতার গলার কাল দাগগুলো সহসা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বোবা

মা-মরা মেয়ে মিনু। বাবা জন্মের আগেই মারা গেছে। সে মানুষ হচ্ছে এক দূর-সম্পর্কীয় পিসিমার বাড়িতে। বয়স মাত্র দশ, কিন্তু এই বয়সেই সব রকম কাজ করতে পারে সে। সব রকম কাজই করতে হয়। লোকে অবশ্য বলে যোগেন বসাক মহৎ লোক বলেই অনাথা বোবা মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছেন। মহৎ হ'য়ে সুবিধাই হয়েছে যোগেন বসাকের। পেটভাতায় এমন সর্বগুণান্বিতা চব্বিশঘণ্টার চাকরানী পাওয়া শক্ত হ'ত তাঁর পক্ষে। বোবা হওয়াতে আরও সুবিধা হয়েছে, নীরবে কাজ করে। মিনু শুধু বোবা নয়, ঈষৎ কালাও। অনেক চেঁচিয়ে বললে, তবে শুনতে পায়। সব কথা শোনার দরকারও হয় না তার। ঠোঁট-নাড়া আর মুখের ভাব দেখেই সব বুঝতে পারে। এছাড়া তার আর একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে যার সাহায্যে সে এমন সব জিনিস বুঝতে পারে, এমন সব জিনিস মনে মনে সৃষ্টি করে, সাধারণ বুদ্ধিতে যার মানে হয় না। মিনুর জগৎ চোখের জগৎ, দৃষ্টির ভিতর দিয়েই সৃষ্টিকে গ্রহণ করেছে সে। শুধু গ্রহণ করে নি, নূতন রূপ, নূতন রং আরোপ করেছে তাতে।

খুব ভোরে ওঠে সে। ভোর চারটের সময়। উঠেই দেখতে পায় পুব আকাশে দপ দপ করে' জ্বলছে শুকতারা। পরিচিত বন্ধুকে দেখলে মুখে যেমন মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, তেমনি হাসি ফুটে ওঠে মিনুর মুখেও। মিনু মনে মনে বলে—সই ঠিকসময়ে উঠেছ দেখছি। বৈজ্ঞানিকের চোখে শুকতারা বিরাট বিশাল বাষ্পমণ্ডিত প্রকাণ্ড গ্রহ, কবির চোখে নিশাবসানের আলোক দূত, কিন্তু মিনুর চোখে সে সই। মিনুর বিশ্বাস সে-ও তার মতো কয়লা ভাঙতে উঠেছে ভোর বেলায়, আকাশবাসী তার কোন পিসেমশায়ের গৃহস্থালিতে উনুন ধরাবার জন্যে। আকাশের পিসেমশায়ও হয়তো ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে তার নিজের পিসেমশাইয়ের মতো। শুকতারার আশেপাশে কালো মেঘের টুকরো যখন দেখতে পায়, তখন ভাবে ওই যে কয়লা। কি বিচ্ছিরি করে' ছড়িয়ে রেখেছে আজ। মাঝে মাঝে এমন মুংকুড়ি হয় ও। বলে আর মুচকি মুচকি হাসে। তারপর নিজে যায় সে কয়লা ভাঙতে। কয়লাগুলো ওর শত্রু। শত্রুর উপর হাতুড়ি চালিয়ে ভারি তৃপ্তি হয় ওর। হাতুড়িটার নাম

রেখেছে গদাই, আর যে পাথরটার উপর রেখে কয়লা ভাঙে তার নাম দিয়েছে শান্থ। শানের সঙ্গে মিল আছে বলে বোধ হয়। কয়লা-গাদার কাছে গিয়ে রোজ সে ওদের মনে মনে ডাকে—ও গদাই, ও শান্থ, ওঠ এবার, রাত যে পুইয়ে গেছে। সই এসে কয়লা ভাঙছে। তোমরাও ওঠ। কয়লা ভাঙতে ভাঙতে সে অস্পষ্ট হিসহিস শব্দ করে একটা। মনের ঝাল মিটিয়ে শত্রুর মাথা ভাঙছে যেন। কয়লা ভেঙে তারপর যায় সে ঘুঁটের কাছে। ঘুঁটে তার কাছে ঘুঁটে নয়, তরকারি। উন্থনের নাম রাক্ষসী। উন্থন রাক্ষসী কেরোসিন তেল-দেওয়া ঘুঁটের তরকারি দিয়ে শত্রুদের মানে কয়লাদের, খাবে। আঁচটা যখন গনগন করে' ধরে' ওঠে তখন ভারি আনন্দ হয় মিন্থর। জলন্ত কয়লাগুলোকে তার মনে হয় রক্তাক্ত মাংস, আর আগুনের লাল আভাকে মনে হয় রাক্ষসীর তৃপ্তি। বিস্ফারিত-নয়নে সে চেয়ে থাকে। তারপর ছুটে চলে যায় উঠোনে; আকাশের দিকে চেয়ে দেখে সেখানে উষার লাল আভা ফুটেছে কি না। উষার লাল আভা যেদিন ভাল করে' ফোটে, সেদিন সে ভাবে সইয়ের উন্থনে চমৎকার আঁচ এসেছে। যেদিন আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে সেদিন ভাবে, ছাই পরিষ্কার করে নি, তাই আঁচ ওঠেনি আজ। এই ভাবে নিজের একটা অভিনব জগৎ সৃষ্টি করেছে সে মনে মনে। সে জগতের সঙ্গে বাইরের জগতের মিল নেই। সে জগতে তার শত্রু মিত্র সব আছে। আগেই বলেছি কয়লা তার শত্রু। তার আর একদল শত্রু আছে, বোলতা ভীমরুল। একবার কামড়েছিল তাকে। সে যন্ত্রণা সে ভোলে নি। প্রতিশোধ নিতেও ছাড়ে না। দুপুরে যখন পিসিমা ঘুমোয় তখন সে ঘুরে বেড়ায় কোমরে কাপড় জড়িয়ে আর গামছায় একটা প্রকাণ্ড গেরো বেঁধে। বোলতা বা ভীমরুল দেখতে পেলেই সোঁ করে' গামছাটা ঘুরিয়ে মারে। অব্যর্থ লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে' যায় মাটিতে। অনেক সময় মরে' যায়, অনেক সময় মরে না। না মরলে ঝাঁটা-পেটা করে মারে তাকে। আর হিসহিস শব্দ করে। বোলতা বা ভীমরুল মেরে সে খেতে দেয় পিঁপড়েদের। পিঁপড়েরা তার বন্ধু। মরা বোলতাটাকে নিয়ে যাবার জন্যে শত শত পিঁপড়ে ভিড় করে' আসে। তারা কেমন করে খবর পায় কে জানে। বোলতাটাকে টানতে টানতে নিয়ে যায় যখন তারা, তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে মিন্থ। কুঁই কুঁই কুঁই কুঁই শব্দ বেরোয় তার মুখ থেকে। এটা তার উচ্ছ্বসিত আনন্দের অভিব্যক্তি।···পিঁপড়েরা ছাড়া আরও অনেক বন্ধু আছে তার।

রান্নাঘরের বাসনগুলি সব তার বন্ধু। তাদের নাম রেখেছে সে আলাদা আলাদা। ঘটিটার নাম পুঁটি। ঘটিটা একদিন হাত থেকে পড়ে' গিয়ে তুবড়ে গেল। মিনুর সে কি কান্না! তোবড়ানো জায়গাটায় রোজ হাত বুলিয়ে দেয়। গেলাস চারটের নাম হারু, বারু, তারু আর কারু। চারটে গেলাসই একরকম। কিন্তু মিনুর চোখে তাদের পার্থক্য ধরা পড়ে। গেলাসগুলোকে যখন মাজে বা ধোয় তখন মনে হয় সে যেন ছোট ছেলেদের স্নান করাচ্ছে। মিটসেফ-টা ওর শত্রু। ওটার নাম দিয়েছে গপগপা। গপগপ করে' সব জিনিস পেটে পুরে নেয়। মাঝে মাঝে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে মীটসেফের চকচকে তালাটার দিকে, আর মনে মনে বলে—আ মর, মুখপোড়া সব জিনিস পেটে পুরে বসে আছে। মিনুর আর একটি দৈনন্দিন কর্তব্য আছে। যখন অবসর পায় টুক্ করে' চলে' যায় ছাতে। ছাত থেকে একটা বড় কাঁটাল গাছ দেখা যায়। কাঁটাল গাছের মাথার দিক থেকে একটা সরু শুক্‌নো ডাল বেরিয়ে আছে। সেই ডালটার দিকে সাগ্রহে চেয়ে থাকে মিনু। মনে হয় তার সমস্ত অন্তর যেন তার দৃষ্টিপথে বেরিয়ে গিয়ে আশ্রয় করেছে ওই ডালটাকে। এর কারণ আছে। তার জন্মের পূর্বেই তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। বাবাকে সে দেখেনি। অনেকদিন আগে তার মাসিমা তার কানের কাছে চীৎকার করে' একটা বিস্ময়কর খবর বলেছিল তাকে। তার বাবা নাকি বিদেশ গেছে, অনেক দূর বিদেশ, মিনু বড় হ'লে তার কাছে ফিরে আসবে, হয়তো তার কোলেই আসবে। মিনু বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা ভাল করে'। একটা জিনিস কেবল তার মনে গাঁথা হ'য়ে ছিল—বাবা ফিরে আসবে। কবে আসবে? মিনু কত বড় হলে আসবে? কথাটা মাঝে মাঝে ভাবত সে। এমন সময় একদিন একটা ঘটনা ঘটল। সে সেদিনও ছাতে দাঁড়িয়েছিল। দেখতে পেল পাশের বাড়ির টুনুর বাবা এল বিদেশ থেকে অনেক জিনিসপত্র নিয়ে, আর ঠিক সেই সময়ে তার নজরে পড়ল ওই সরু ডালটায় একটা হলদে পাখিও এসে বসল। সেইদিন থেকে তার বদ্ধ ধারণা হ'য়ে গেছে ওই সরু ডালে যেদিন হলদে পাখি এসে আবার বসবে, সেইদিনই তার বাবা আসবে বিদেশ থেকে। তাই ফাঁক পেলেই সে ছাতে উঠে কাঁঠাল গাছের ওই সরু ডালটার দিকে চেয়ে থাকে। হলদে পাখি কিন্তু আর এসে বসে না। তবু রোজ একবার ছাতে ওঠে মিনু। এটা তার দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে একটা। ছাতে উঠে উঠে আর একটা জিনিস চোখে পড়ল তার। রাস্তার কালো কুকুরটার

পায়ের থাবার উপরে ঘা হয়েছিল একটা, মিন্নু দেখত কুকুরটা রোজ সেটাকে চাটে। নিবিষ্ট মনে চেটে যায় খালি। তারপর মিন্নু সবিস্ময়ে একদিন লক্ষ্য করল ঘা-টা সেরে গেছে। কেবল চেটে চেটে ঘা-টাকে সারিয়ে ফেলেছে কুকুরটা। অবাক হয়ে গেল মিন্নু। তার মনে হল ঘা-টা বোধ হয় আমসত্ত্বের মতো। তাই চাটতে পেরেছে। তাক লেগে গেল ওর ডাক্তারি দেখে। আর একটা জিনিসও বসে' গেল ওর মনে—ঘা নিশ্চয় আমসত্ত্ব, তা না হ'লে চাটতে পারে কেউ?······দিন কয়েক পরে পিসিমার বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুলটা ছেঁচে গেল শিল পড়ে'। পিসেমশাই কি একটা ওষুধ দিলেন। বোধ হয় হোমিওপ্যাথিক। বললেন, সাতদিন পরে আর এক দাগ দেবেন। এই সাতদিনে ঘা কিন্তু খুব বেড়ে গেল। যন্ত্রণায় পিসিমার চোখে জল পড়তে লাগল। পাড়ার হারু ডাক্তার সকালে এসে ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেলেন। ঘুমের ওষুধ খেয়ে পিসিমা ঘুমুচ্ছেন, পায়ের পটিটা আলগা হ'য়ে সরে' গেছে, ঘা-টা দেখা যাচ্ছে। মিন্নুর মনে হল আমসত্ত্ব, আমসত্ত্বের মতোই তো কালচে দেখতে। তার ইচ্ছে হল চেটে দিই একটু, হয়তো সেরে যাবে, কুকুরটা তো চেটে চেটেই সারিয়েছে ঘা-টা। মিন্নু জিব বার করে' চেটে দিলে ঘা-টা। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল পিসিমার, আঁৎকে চীৎকার করে' উঠলেন তিনি—কি করলি পোড়ামুখী। পাখাটা ছুড়ে মারলেন তিনি মিন্নুকে। মিন্নু পালিয়ে গেল। লুকিয়ে রইল সমস্ত দিন। সেইদিনই রাত্রে কম্প দিয়ে জ্বর এল তার। কাউকে কিছু বললে না। মনে হ'ল জ্বর হওয়াটাও বুঝি অপরাধ একটা।······ভোরে ঘুম ভেঙে গেল, রোজ যেমন কয়লা ভাঙতে যায় সেদিনও তেমনি গেল, সেদিনও চোখে পড়ল শুকতারাটা দপদপ করে' জ্বলছে। মনে মনে বলল—সই এসেছিস। আমার শরীরটা আজ ভাল নেই ভাই। তুই ভাল আছিস তো? উনুনে আঁচ দিয়ে কিন্তু সে আর জল ভরতে পারলে না সেদিন। শরীরটা বড্ড বেশী খারাপ হতে লাগল। আস্তে আস্তে গিয়ে শুয়ে পড়ল নিজের বিছানায়। কেমন যেন ঘোর-ঘোর মনে হতে লাগল।······চাটবার পর থেকে পিসিমার ঘা-টাও বেড়ে গিয়েছিল খুব। মিন্নু টের পায়নি, কারণ পিসিমার কাছে আর সে ঘেঁষে নি। এ-ও জানত না যে পিসেমশায় পাশের গাঁয়ে তাঁর শালাকে খবর পাঠিয়েছিলেন পিসিমাকে দেখে যাবার জন্য। পাশের গাঁয়ে পিসিমার যে ভাই আছে একথাও মিন্নু জানত না। নিজের ছোট্ট ঘরটিতে মিন্নু জ্বরের ঘোরে শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। জ্বরের ঘোরেই হঠাৎ তার মনে হল একটা দরকারী কাজ

করা হয় নি কিন্তু। আস্তে আস্তে উঠল সে বিছানা থেকে, তারপর খিড়কির দরজা দিয়ে দাঁড়াল ছাতের সিঁড়ির কাছে। সিঁড়ির কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেল ছাতে। কেউ দেখতে পেল না। পিসিমা পিসেমশাই তখনও ঘুমুচ্ছেন। ছাতে উঠেই চোখে পড়ল লালে লাল হয়ে গেছে পূর্বাকাশ। বাঃ চমৎকার আঁচ উঠেছে তো সইয়ের। একটু হাসল সে। তারপর চাইল সেই সরু ডালটার দিকে। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তার। একটা হলদে পাখি এসে বসেছে! তাহলে তো বাবা নিশ্চয় এসেছে। আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না ছাতে, যদিও পা টলছিল তবু সে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। এসেই দেখতে পেল বাইরের বারান্দায় একটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। ছুটে গিয়ে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরল, তার মুখ থেকে কুঁই কুঁই কুঁই কুঁই শব্দ বেরুতে লাগল। ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে পিসেমশাই বেরিয়ে এলেন কপাট খুলে।

"কে এই মেয়েটা আমার পায়ে মুখ ঘষছে এমন করে!"

"তোমার পায়েও মুখ ঘষছে! তোমার দিদির পায়ে কাল কামড়ে দিয়েছে ও! পাগল হ'য়ে গেছে বোধ হয়।"

চুলের ঝুঁটি ধরে হিড় হিড় করে সরিয়ে দিলেন তিনি মিনুকে।

সাতদিন পরে হাসপাতালে মৃত্যু হল মিনুর। তার সমস্ত মুখ ঘা-য়ে ভ'রে' গিয়েছিল। সেপ্‌টিসিমিয়া হয়েছিল, ডাক্তাররা বললেন। সমস্তক্ষণই সে প্রায় অজ্ঞান হ'য়ে ছিল। মৃত্যুর খানিকক্ষণ আগে জ্ঞান হ'ল কয়েক মিনিটের জন্য। চোখ খুলে দেখল সামনে একটা খোলা জানালা দিয়ে আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। দপদপ করে' জ্বলছে শুকতারাটা। মুখে মৃদু হাসি ফুটল মিনুর। মনে মনে বলল—সই এবার তোর কাছে যাচ্ছি।

কে জানে শুকতারার দেশের লোকেরা বোবা মিনুর মনের কথা বুঝতে পেরেছে কি না।

ভিখু দি গ্রেট

ভিখু লেখাপড়া শেখে নি। সভ্যতার যে সব বাহ্যিক প্রকাশকে আমরা সম্ভ্রমের চোখে দেখি তা-ও তার ছিল না। মাথার চুল রুক্ষ, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, পরনে ময়লা কাপড়। পেটে অন্ন নেই। কিন্তু তবু মুখে একটি সদাপ্রসন্ন হাসি। আমার চাকর হ'য়ে বাহাল হয়েছিল সে। তার কাজ ছিল বাসন মাজা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, কাপড় কাচা—এই সব। পারত না ভালো করে'। আমি নটার সময় আপিস চলে' যেতাম, ফিরতাম সন্ধ্যার পর। ফিরে এসেই শুনতে পেতাম গৃহিণীর নানা রঙের নালিশ। ভিখু এটা পারে নি, ওটা করে নি, পেয়ালা ভেঙেছে, বাজারে গিয়ে পয়সা হারিয়েছে, কাজকর্মে অত্যন্ত 'মাটো,'—ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভিখু এসবের কোন প্রতিবাদ করত না, মৃদু হেসে একটু অপ্রস্তুতমুখে দূরে দাঁড়িয়ে সব শুনত, কিছু বলত না নিজে থেকে। জিজ্ঞাসা করলে বলত—মাইজি যা বলছেন তা ঠিকই। আমি এসব কাজ ভাল করে' করতে পারি না। আমি 'ক্ষেতি-গিরস্তি'র কাজ বরাবর করেছি, তাই করতে পারি। এসব আমার তেমন আসে না। 'ক্ষেতি-গিরস্তি' মানে, চাষবাস। জিগ্যেস করলাম কি ধরনের চাষবাস ছিল তার? নিজের জমি ছিল কি? ভিখু বললে নিজের বিঘে দুই জমি ছিল তার।

"জমি আছে তাহলে চাকরি করতে বেরিয়েছ কেন?"

ভিখু কুণ্ঠিতভাবে চুপ করে' রইল একটু।

তারপর বললে—"জমি এখন আর নেই, ছিল এককালে। বোনের বিয়েতে আর আমার নিজের বিয়েতে অনেক ধার করতে হয়েছিল। সেই দেনার দায়ে জমি বিকিয়ে গেছে। মহাজন যদি সুদের সুদ না নিত তাহলে বিকোত না, কিন্তু মহাজন ছাড়লে না"

ভিকু কাজ করতে লাগল প্রচুর বকুনি খাওয়া সত্ত্বেও। বস্তুত কাজ না করে' তার উপায় ছিল না। আমার মাঝে মাঝে কষ্ট হ'ত, লজ্জাও হ'ত একটু। মনে হ'ত একটা অসহায় জীবকে কোণঠাসা করে' আমরা যেন নির্যাতন করছি। অথচ সমাজে আমরা নিজেদের সভ্য বলে' পরিচয় দিয়ে থাকি। আমরা নিজেদের কাজ নিজেরা করতে পারি না, যে অসহায় লোকটা নিরুপায় হ'য়ে আমাদের

কাজ করে' দেবার জন্যে বাহাল হয় সামান্য বেতনের পরিবর্তে, তাকে অহরহ গাল-মন্দ করি।

সমাজের এই রেওয়াজ। তা উলটে দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই, সুতরাং এই ভাবেই চলতে লাগল। গৃহিণীর অসন্তোষ এবং গালাগালির লক্ষ্যস্থল হয়ে ভিখু কাজ করে' যেতে লাগল অপটু হস্তে।

একদিন গৃহিণী এসে বললেন, "তোমার ভিখু আজ আসে নি। তোমার সংসার কিভাবে চালাবে চালাও। আমি ওই এককাঁড়ি বাসন মাজতে পারব না"

যদিও আমার এবং গৃহিণীর সহযোগেই একদা এই সংসার স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু গৃহিণী এটাকে অভিহিত করতেন 'তোমার সংসার' বলে'। পতিব্রতা রমণীদের এইটেই কায়দা বোধ হয়।

সংবাদটা শুনে বিব্রত হ'য়ে পড়লাম। কি করব ভাবছি এমন সময় আমাদের পাশের বাড়ির ছায়ালু মিত্তির এসে হাজির হলেন। ছায়ালু মিত্রের নামটি যত মিষ্টি, ছায়ালু মিত্র লোকটি তত মিষ্টি নন। তাঁকে দেখলেই আমার আপাদমস্তক জলে' যেত। কেমন যেন ভিজা-বিড়াল-গোছ ভাব। মুচকি মুচকি হাসেন, মিটি-মিটি চান, আস্তে আস্তে কথা বলেন। অতি পাজি।

"ইমিজেট্‌লি একটা ব্যবস্থা না করলে সিসির ভারি মুশকিল হবে"

মিটি-মিটি চাইতে লাগলেন। তারপর ফিক্ করে' মুচকি হাসলেন একটু। ইচ্ছে হ'ল লোকটার কান ধরে' টানতে টানতে বার ক'রে দি। ইচ্ছে হ'ল বলি—তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে, সিসির মুশকিল নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না তোমাকে। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার নিয়ম যা ইচ্ছে হয় তা করা যায় না সব সময়ে। ভণ্ডামির মুখোশ পরে' থাকতে হয়। তাই আমিও একটু মুচকি হেসে বললাম—"দেখি'—"।

ছায়ালু মিত্রকে খাতির করার বিশেষ কারণও ছিল একটু। ছায়ালু আমার স্ত্রীর বাল্যবন্ধু। ওরা তিন ভাই, দয়ালু, মায়ালু, ছায়ালু। এককালে আমার শ্বশুরের প্রতিবেশী ছিলেন ওঁরা। আমার বউ সিসি ছেলেবেলায় ছায়ালুদা'র কাছে গীটার শিখতেন। বিয়ের পর গীটার শেখা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। আমি এখানে বদলি হ'য়ে আসার পর আবার হঠাৎ একদিন সমুদিত হলেন ছায়ালু। এ শহরে তিনি নাকি লাইফ্ ইনসিওরেন্সের দালালি করতে এসেছেন। শহরের একপ্রান্তে একটা মেসে থাকতেন। সিসির সান্নিধ্য লাভ করবার জন্যে যোগাড়-যন্ত্র করে' ঠিক আমার পাশের

বাড়িতে উঠে এসেছেন। সেটাও একটা মেস। সুতরাং আমার বাড়িতে গীটার-বাদ্যের চর্চা আবার প্রবল হ'য়ে উঠেছে ইদানীং। এর মধ্যে বাসন মাজা বা ঘর ঝাড়ু দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই পারে না। সংস্কৃতি বাদ দিয়ে বাঙালীর বাঁচা তো অসম্ভব। সুতরাং চাকরের চেষ্টায় আমাকে উঠতে হ'ল। উঠে বাইরে এসেই দেখি ভিখু উঠোনের একপ্রান্তে কাচুমাচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে পনর ষোল বছরের একটি মেয়ে।

ভিখু হাত কচলে সবিনয়ে বললে—"হুজুর, আমি আপনাদের কাজ ঠিকমতো করতে পারছি, না আমার কাজ মাইজির একটুও 'পসন্দ' হয় না। তাই আমি আমার বদলে আমার বউকে নিয়ে এসেছি। সে চৌকা-বরতনের কাজ (রান্না-বাসনের কাজ) ভাল জানে। ঘর ঝাড়ু দেবে, কাপড়ও কাচবে। ও আমার চেয়ে ঢের বেশী কাজের। ওকে যদি আপনারা রাখেন তাহলে ও আপনাদের খুশী করতে পারবে"

ভিখুর বউ দেখলাম ঘাড় নিচু করে' আছে, মুচকি মুচকি হাসছে। ছায়ালুও আমার পিছু-পিছু বেরিয়ে এসেছিলেন। বললেন, "ওই আপাতত থাক, আজকের প্রব্‌লেমটা তো মিটুক"

ভিখুকে জিগ্যেস করলাম—"তুই কি করবি ?"

"একটা ফেরি-ওলার কাজ পেয়েছি, হুজুর।"

ভিখুর বউ সিমিয়া থেকে গেল। সিসি বেরিয়ে এসে তাকে তার কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে গীটার নিয়ে চলে' গেল নতুন একটা গৎ শিখতে। আমিও একটু পরে আপিসে বেরিয়ে গেলাম।

দুই

সমস্যার সমাধান কিন্তু হ'ল না। আরও জটিল সমস্যার সূত্রপাত হ'ল সিমিয়াকে কেন্দ্র করে'। আমাদের বাড়িতে দু'চার দিন খাওয়ার পর সিমিয়ার শ্রী ফিরে গেল। আমরা সবাই আবিষ্কার করলুম সে পরমাসুন্দরী, নবোদ্ভিন্নযৌবনা কামিনী। একদিন শুনলাম আমার স্ত্রী তাকে ভর্ৎসনা করছেন।

"সোমত্ত মেয়ে, ওই ছেঁড়া কাপড় পরে' তোর সবার সামনে বসে' বাসন মাজতে লজ্জা করে না ? বেহায়া কোথাকার—"

আপিসে বসে' কাজ করছি চাপরাশি এসে খবর দিলে—"এক জেনানি আপসে মুলাকাত্ মাংতী হ্যায়"

বললাম, "ডেকে নিয়ে এস"

সিমিয়া এসে প্রবেশ করল এবং বেশ সপ্রতিভভাবে বলল—"পাঁচটা টাকা দিন, শাড়ি কিনতে হবে। নতুন শাড়ি পরে' না গেলে মাইজি কাজ করতে দেবে না। আজ খুব বকছিলেন। আর শাড়িটা তো সত্যিই ছিঁড়ে গেছে"

বলে সে নিজের দেহখানাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল শাড়ির কোন্ কোন্ অংশ ছেঁড়া। আমি একটু ধমকের স্বরে বললাম—"এখানে এসেছিস কেন। মাইজির কাছে শাড়ির দাম চেয়ে নি গে যা—"

মাইজি বাড়িতে নেই। ছায়ালু বাবুর সঙ্গে কোথায় বেরিয়েছেন"

তখন মনে পড়ল ওদের আজ একটা পিক্‌নিকে যাবার কথা ছিল। ছায়ালু আর সিসি ডুয়েট বাজাবে সেখানে।

আর অধিক বাক্যব্যয় না করে' পাঁচটা টাকা সিমিয়াকে দিয়ে দিলাম। সে আমার দিকে অপাঙ্গে চেয়ে একটা মিষ্টি হাসি হেসে চলে' গেল।

পাঁচ টাকায় যে অমন সুন্দর ফুল-পাড় গোলাপী শাড়ি পাওয়া যায় এমন ধারণা আমার ছিল না। পরদিন সকালে দেখলাম শাড়ির বাহার দিয়ে সিমিয়া ছাইগাদার পাশে বসে' বাসন মাজছে। ছাইগাদায় পদ্মফুল ফুটেছে যেন। আমি যে তাকে ওই শাড়ি কেনার টাকা দিয়েছি একথা অবিদিত রইল না। ছায়ালুও এ আলোচনায় মুচকি হেসে হেসে যোগ দিল। গৃহিণী যে সব ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ উক্তি করলেন তাতে যুক্তি ছিল না। ছিল জ্বালা। এর চেয়ে তুচ্ছতর কারণেও গৃহিণী ইদানীং জ্বালাময়ী হ'য়ে উঠছিলেন। সামান্য সামান্য কারণে বাদ-প্রতিবাদের ঝড় বয়ে' যাচ্ছিল আমাদের সংসারের উপর দিয়ে। সিমিয়ার ব্যাপারটায় আমি আর বাদ-প্রতিবাদ করলাম না, চুপ করে' থাকাটাই উচিত মনে হ'ল। কিন্তু কষ্ট হ'তে লাগল গৃহিণীর ব্যবহারে। তিনি যেন আমাকে এবং সিমিয়াকে পাহারা দিতে লাগলেন। এইভাবে দিন কতক কাটল। হঠাৎ একদিন দেখি ভিখু এসে কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে আমার বৈঠকখানার দরজার সামনে।

"কি খবর ভিখু ?"

ভিখু বললে যে সিমিয়া আমার বাড়িতে আর কাজ করতে চায় না। মাইজি

ওকে বড্ড বেশী বকেন। অত বকুনি সহ্য করা ওর অভ্যাস নেই। তারপর ট্যাঁক থেকে পাঁচটি টাকা বার করে' বললে—"ওকে যে শাড়ি কিনে দিয়েছিলেন তার দামটা আমি ফেরত দিচ্ছি। আপনি ওর মাইনের হিসাবটা করে' দিন।"

দিতে হ'ল। কারণ সিমিয়া আর কিছুতেই আমার বাড়িতে কাজ করতে রাজী হ'ল না।

কয়েকদিন পরে দেখলাম সে লাতুরাম মাড়োয়ারীর বাড়িতে বাহাল হয়েছে। লাতুরাম মাড়োয়ারীর বাড়ি আমাদের বাড়ির কাছেই। তার বাড়ির সামনেই রাস্তার একটি কল আছে। সেই কলের ধারে আমার গোলাপী শাড়ি পরে' সিমিয়া প্রায় অসীমা হ'য়ে উঠল। নানা জাতের ছোকরা নানারকম পোশাক পরে' নানা ধাঁচে আলাপ করতে লাগল তার সঙ্গে। সিমিয়া বাসন মাজতে মাজতে এক মুখ হেসে তাদের সঙ্গে জুড়ে দিত গল্প। কলতলার আসর বেশ জমে' উঠতে লাগল। এইভাবে কাটল কিছুদিন। তারপর হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম সিমিয়া আর কলতলায় বসছে না। মনে হ'ল, স্রোতের ফুল অন্য কোন ঘাটে গিয়ে ভিড়েছে সম্ভবত।

দিন দুই পরে ভিখু এসে হাজির হ'ল আমার আপিসে। সেলাম করে' বললে—সিমিয়ার খুব অসুখ। আমি যদি আমার বন্ধু ডাক্তার সেনকে একটু অনুরোধ করি তাহলে সে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে। সে গরীব মানুষ, চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ বহন করবার সামর্থ্য তার নেই। ডাক্তারবাবু যেন একটু দয়া করেন। ডাক্তার সুশীল সেন আমার বাল্যবন্ধু, লিখে দিলাম তাকে একখানা চিঠি। দিন পনরো পরে তার সঙ্গে দেখা হ'ল একটা পার্টিতে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সিমিয়ার কি হয়েছিল। মুচকি হেসে সে বললে, "গনোরিয়া। তুই ওর সম্বন্ধে অত ইন্‌টারেস্ট নিচ্ছিস যে—?"

"ওর স্বামী আমার চাকর ছিল, এসে ধরলে, তাই লিখে দিলাম তোকে।"

"ওর সম্বন্ধে আর ইন্‌টারেস্ট নিও না। শি ইজ রট্‌ন"

মুচকি মুচকি হাসতে লাগল সুশীল।

ভিখুকে মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখতাম। চানাচুর তৈরি করছে। আমাকে দেখে একদিন সেলাম করে' বললে, "আমার জেনানি বেশ ভাল আছে—"

"তাকে তো আর দেখি না, অন্য কোথাও চাকরি করছে না কি?"

"না, হুজুর তাকে আর চাকরি করতে দিই না। বাইরে বেরুলে লোকে তাকে বড় জ্বালাতন করে। ছেলেমানুষ তো, নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। এখন ও বাড়িতে বসেই চানা-ভাজা, ফুলুরি, খাবুনি তৈরি করে' দেয়, আমি বিক্রি করি। আগে আমাকেই করতে হ'ত সব নিজের হাতে, এখন ও সাহায্য করে। ভালই হয়েছে—"

কিন্তু মাসখানেক পরেই দেখা গেল বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ রেখেও সিমিয়াকে কায়দা করতে পারে নি ভিখু। একদিন এক ডুলি করে' প্রায় অর্ধ-মৃতা সিমিয়াকে নিয়ে ভিখু হাজির হ'ল আমার বাড়িতে। সঙ্গে প্রায় দশ পনরো জন লোক। সবাই কলরব করছে। তাদের কথাবার্তা থেকে বুঝলাম সিমিয়া তাদের পাশের বাড়ির এক ছোকরার সঙ্গে কি যেন 'লট্‌পট্‌' করেছে। ছোকরাটি বাবু হর্চন্দ সিং জমিদারের ছেলে। কিন্তু ছোকরার বউও ছোট ঘরের মেয়ে নয়, তার বাবা সিংহেশ্বর সিং আরও বড় জমিদার। বউ তার বাপকে খবর দিয়ে বাপের বাড়ি থেকে লাঠিয়াল আনিয়েছিল। তারা সিমিয়াকে চুলের ঝুঁটি ধরে' রাস্তায় এনে খুব ঠেঙিয়েছে। মেরেই ফেলত, পাড়ার লোকেরা কোনরকমে বাঁচিয়েছে। ভিড়ের মধ্যে দেখলাম ভিখু কুণ্ঠিত অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সমস্ত দোষ তারই। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই সে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরল।

"হুজুর, বাঁচান ওকে আপনি। ওর কোনও দোষ নেই। ওর একমাত্র দোষ ও মেয়েমানুষ। মেয়েদের দোষটাই সকলের চোখে পড়ে। হর্চন্দবাবুর ছেলে যে কাণ্ড করত রোজ, তা যদি দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন। কিন্তু ও বড়লোকের ছেলে, বড়লোকের জামাই, ওর দোষ তো কেউ দেখবে না। আপনার বন্ধু সেই ডাক্তারবাবুকে একটা চিঠি লিখে দিন দয়া করে' হুজুর। চিকিৎসার খরচ যা লাগে আমি দেব—"

সিসি ঘরের ভিতর থেকে তর্জন করে' উঠল—"ওসব নোংরা ব্যাপারের মধ্যে তুমি থেকো না"

বললাম—"আমি থাকব না। ওকে সুশীলের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি"

সুশীলকে লিখে দিলাম একটা চিঠি। সুশীলের মুচকি হাসিটা মনে পড়ল, তবু লিখে দিলাম।

মাসখানেক পরে ভিখুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে ফেরি

করছিল। বললে সিমিয়া সম্পূর্ণরূপে ভালো হয়ে গেছে, যদিও চোট লেগেছিল অনেক জায়গায়। ডাক্তারবাবু বাঁচিয়ে দিয়েছেন তাকে।

"হর্চন্দবাবুর ছেলে আর উৎপাত করছে না তো? যদি করে বোলো আমাকে। এখানে আজকাল যিনি এস. পি. তিনি আমার বন্ধু। তাঁকে বললে তিনি শায়েস্তা করে' দেবেন ছোকরাকে—"

"ওকে ওর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি হুজুর। এই শহরের আবহাওয়া ওর সহ্য হ'ল না। গাঁয়ে নিজের মায়ের কাছে গিয়ে আছে এখন। আমি মাসে দশ টাকা করে' পাঠিয়ে দিই।"

আরও বছর পাঁচেক কেটে গেছে।

ভিখুর দেখা অনেক দিন পাই নি। তার খোঁজখবরও করি নি। কারণ আমারও জীবনের উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে' গেছে এই ক'বছরে। মাথার-ঘায়ে-পাগল কুকুরের মতো আমিও ছুটোছুটি করে' বেড়িয়েছি চারিদিকে।

হঠাৎ সেদিন দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে। দেখলাম রিক্‌শা টানছে। ডাকলাম। রিক্‌শাই খুঁজছিলাম একটা।

"ভিখু, আজকাল রিক্‌শা চালাচ্ছ বুঝি—"

"হাঁ হুজুর"

"চল তাহ'লে তোমার রিক্‌শাতেই যাই। আমাকে কোর্টে নিয়ে চল"

ভিখুর রিক্‌শাতেই উঠে বসলাম।

"আপিস না গিয়ে কোর্টে যাচ্ছেন কেন হুজুর? কোন মকোর্দমা আছে না কি—"

"হাঁ—"

কি মকোর্দমা তা আর তাকে তখন বললাম না।

ভিখু একটু পরে আবার জিগ্যেস করল, "মাইজি ভাল আছেন?"

আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে' রইলাম। তারপর বললাম, "না, মাইজির খবর ভাল নয়। তোর বউ সিমিয়া কেমন আছে?"

ভিখু বলল, "সিমিয়া পালিয়ে গেছে হুজুর"

"পালিয়ে গেছে? পুলিশে খবর দিস নি?"

"না হুজুর। পুলিশে খবর দিয়ে কি হবে? পুলিশে খবর দিলে মন পাওয়া যায় না। রূপে গুণে সব দিক দিয়েই আমার চেয়ে সিমিয়া অনেক ভালো। সে স্বর্গের দেবী, সে আমার মতো লোকের সঙ্গে থেকে নরক-ভোগ করবে কেন—"

ভিখুর গলার স্বরটা শেষের দিকে কেঁপে গেল। তার কথা শুনে আমার হঠাৎ চৈতন্য হ'ল যেন। কিছুদিন আগে সিসি পালিয়েছিল ছায়ালুর সঙ্গে। আমি কেস করেছিলাম। সেদিনই মকোর্দমার শুনানি ছিল। ঠিক করলাম আর মকোর্দমা করব না। ভিখুর সহজ জীবন-দর্শনে সহজ সত্যটা যেন দেখতে পেলাম।

আরও বছর খানেক কেটেছে।

সিসি অনুতপ্তচিত্তে ফিরে এসেছে আবার আমার কাছে। শুধু তাই নয়, একজন বিখ্যাত গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে ধর্মে-কর্মে মনও দিয়েছে।

ভিখু আবার একদিন এসে হাজির।

"হুজুর, আপনার বন্ধু ডাক্তারবাবুকে আর একটা চিঠি লিখে দিন। সিমিযা ফিরে এসেছে কাল। কিন্তু তার বড অসুখ। পক্ষাঘাত হয়েছে, দুটো পা-ই পড়ে' গেছে—"

ভিখু হাউ হাউ করে' কাঁদতে লাগল।

সুশীলকে আর একটা চিঠি দিলাম।